জীবন ও প্রকৃতি

ড. এ এইচ এম মোস্তাইন বিল্লাহ

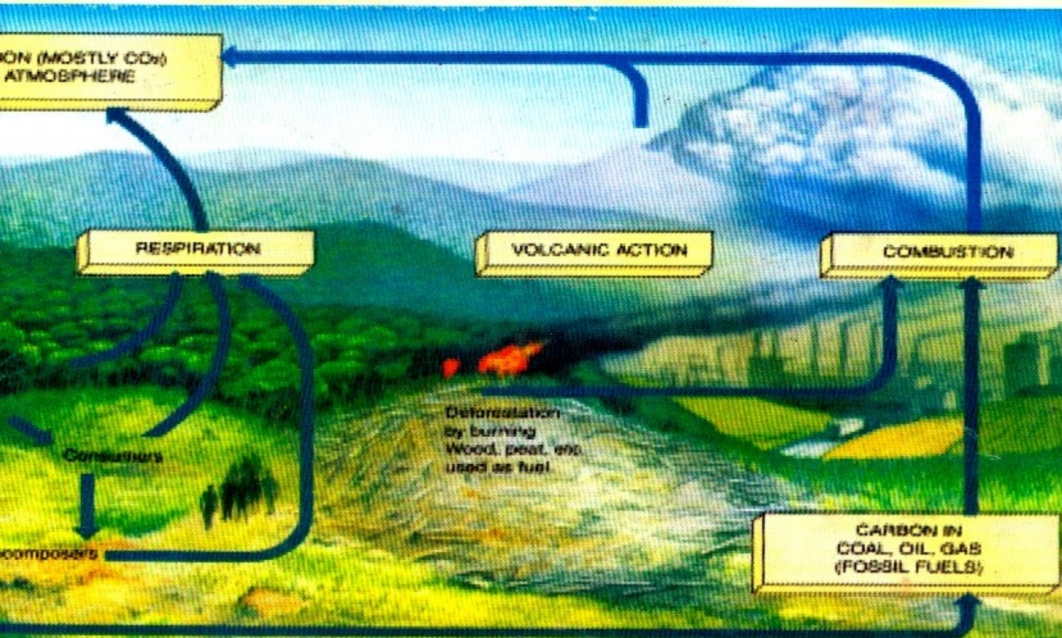

জীবন ও প্রকৃতি

গ্রন্থটি দশ অধ্যায়ে। প্রথম অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের সম্পর্ক নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশের দারিদ্র্য চিত্র ও তা বিমোচনের কৌশলগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

লেখকের নিজ জেলা পূর্ব ময়মনসিংহের হাওর এলাকা নেত্রকোণাকে গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এই এলাকার ভৌগলিক ও নৈসর্গিক বৈচিত্রের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার অপূর্ব নৈসর্গিক বৈচিত্রের লীলাভূমি দীর্ঘদিন ধরে তীব্রভাবে অবহেলিত তাই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর একটি ঐতিহাসিক বিবরণী দেয়া হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়ে নেত্রকোণা এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের নির্বিচারে আহরণ ও অব্যবস্থাপনার একটি বিবরণী দেয়া হয়েছে। বিশেষত: জীববৈচিত্র্য, বন, মৎস্য, হাওড় বাওড় ও ভূমি সম্পদের, ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলি এবং ইংরেজ আমল থেকে শাসন ও শোষনের ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে। স্বচ্ছ রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাবে স্বাধীনতাত্তোর ভূমি সংস্কারের বিভিন্ন ব্যর্থ প্রয়াসের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সে সাথে বন নিধন, মৎস্য ও পশু সম্পদের ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ ও ব্যর্থতার কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে দূর্গাপুরের প্রাকৃতিক সম্পদ সাদামাটি ও কালো পাথরের অপরিনামদর্শী ও অপিরকল্পিত আহরণের বিবরণী রয়েছে। পাশাপাশি দরিদ্র বিমোচনে এ সম্পদের সম্ভাবনা ও গুরুত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এ সম্পদ বিলুপ্ত হতে থাকলে ভবিষ্যত প্রজন্মের ভয়াবহ পরিনতির প্রতিও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রা ও আচার অনুষ্ঠানের কথা আলোচনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিপন্ন আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও জীবন ব্যবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভূমি ভিত্তিক সামাজিক বিবর্তন ও দীর্ঘদিনের শাসন ও শোষণের ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে, সে সাথে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিকার ও প্রতিরোধের বিবরণীও দেয়া হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে উপজেলা ভিত্তিক নেত্রকোণার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতির সম্পদের অবক্ষয় ও বিলুপ্তির বিবরণ দেয়া হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে এ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের বিবরণী দেয়া হয়েছে। সর্বোপরি একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে নেত্রকোণার কতিপয় খন্ড চিত্রের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে ঢাকা বিভাগের অন্যান্য জেলার সাথে নেত্রকোণার দারিদ্র্য চিত্রের একটি তুলনামূলক বিবরণী দেয়া হয়েছে। সর্বশেষে সহস্রাব্দ লক্ষ্যার্জনে নেত্রকোণা জেলার দূর্গাপুরের বিপিনগঞ্জ এবং কলমাকান্দা উপজেলার কেশবপুর গ্রামের জরিপের ফলাফল ও তৃণমূল পর্যায়ে সহস্রাব্দ লক্ষ্যার্জনের পন্থা তুলে ধরা হয়েছে।

ISBN 984 445 199 10

www.pathagar.com

জীবন ও প্রকৃতি

ড. এ এইচ এম মোস্তাইন বিল্লাহ

৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৭

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ
ফোরকান আহমদ, বিএ অনার্স; এমএ
পালক পাবলিশার্স
৮/২, নর্থ সাউথ রোড
পুরানা পল্টন
ঢাকা-১০০০।

বাণিজ্যিক কার্যালয় :
১৭৯/৩, ফকিরের পুল
জিপিও বক্স ৪১৫, ঢাকা-১০০০।

প্রথম প্রকাশনা
ফেব্রুয়ারী ২০০৭ খ্রিঃ
মাঘ ১৪১৩ বাংলা

কপিরাইট © লেখক

কভার ডিজাইন
মোঃ আমান উল্লাহ্

গ্রাফিক্স ডিজাইন :
মোঃ নুরুল হক

মুদ্রণ:
কলেজ গেট বাইন্ডিং এন্ড প্রিন্টিং
১/৭ কলেজ গেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯১২২৯৭৯

মূল্য ঃ ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা
Tk. 500 .00 US $ 25

ISBN : 984 445 199 10

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যাঁদের ত্যাগের ফসল এ গ্রন্থ তারা হলেন আমার স্ত্রী
ডাঃ মালিহা পারভীন, আমার কন্যাদ্বয়
ফারাহ্ বিল্লাহ বিনতি
শাজিনাত বিল্লাহ শ্রাবন্তী।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় পরিবেশ সংরক্ষণ ও তার টেক্সই ব্যবস্থাপনা। পৃথিবীর সর্বত্রই টেক্সই উন্নয়নের জন্য পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও এসবের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। সাধারণত: পরিবেশ সংরক্ষণ ও দারিদ্র বিমোচনকে পরস্পর বিরোধী বলে মনে করা হয়। আজ হতে দু'দশক আগেও পৃথিবীর নির্মল পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার অফুরন্ত বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য মানব প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি জীবনধারণের আরাম আয়েশের জন্য নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। তাছাড়া দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং এর ব্যাপক ব্যবহারের সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের নির্বিচার আহরণ। ফলে দ্রুত বিনষ্ট হচ্ছে জীববৈচিত্র, বিপর্যস্ত হচ্ছে খাদ্য চক্র (Food chain), ও খাদ্যমান এবং ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে প্রতিবেশ। এভাবে মানব কর্মকান্ডের ফলে প্রতিবেশগত পরিবর্তন আসছে মারাত্নকভাবে, দ্রুত বিনষ্ট ও বিপন্ন হয়ে উঠেছে পৃথিবীর পরিবেশ। পরিবর্তনশীল এ পৃথিবীর সার্বিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া প্রকৃতিকে তার নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে চলতে দেয়া এবং এর মাধ্যমে নিজেদের আরাম, আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও শান্তি নিশ্চিত করার দায়িত্ব মানুষেরই। এ কথা সবার জানা, পৃথিবীর সকল সৃষ্টিই মানব কল্যাণে নিয়োজিত। আর "এ ভূমন্ডলে ও সমূদ্রে যত বির্পযয় আসে সবকিছুই মানুষের কৃতকর্মের ফল" (আল কোর'আন)।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডকে আলাদা করে দেখার কোন উপায় নেই। বাস্তব জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, উন্নয়ন কর্মকান্ড ও পরিবেশ অবক্ষয় ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। অপরিনামদর্শী ও অপরিকল্পিত দ্রুত উন্নয়ন কর্মকান্ডের অর্থ হল নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ নিধন ও আহরণ। এ ধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ডে যত দ্রুতই প্রবৃদ্ধি হোক না কেন তা কখনই টেক্সই হতে পারে না ও দীর্ঘমেয়াদী সুফল বয়ে আনতে পারেনা। আবার পরিবেশ বিপন্ন হতে পারে বলে সব ধরণের উন্নয়ন কর্মকান্ড বন্ধ করে দেয়া যেতে পারে না। ভবিষ্যত প্রজন্মের সার্বিক চাহিদা মিটানোর ক্ষমতা রহিত না করে বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন মিটানো নিশ্চিত করার নামই টেক্সই উন্নয়ন। এর জন্যে প্রয়োজন তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিত নীতি ও কর্মকৌশল নির্ধারণ। তাই বর্তমান প্রজন্মের জন্য টেক্সই উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমেই আগামী প্রজন্মের জন্য এই পৃথিবী দারিদ্রমুক্ত ও বাসযোগ্য করে রেখে যেতে হবে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে আগামী প্রজন্মের এ দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আলোকময় পৃথিবীর প্রত্যাশায়।

অনেক ঐতিহ্য ও গৌরবের স্বর্গরাজ্য বৃহত্তর ময়মনসিংহ। এ জেলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী অংশ পূর্ব ময়মনসিংহের নেত্রকোণা। এ অঞ্চলের ইতিহাস ঐতিহ্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও এ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও প্রকাশনা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না। সাহিত্য ক্ষেত্রে খনার বচন, মহুয়া ও ময়মনসিংহ গীতিকার মত অনেক মৌলিক গ্রন্থের প্রকাশনা রয়েছে বটে, তবে বহু সুপ্ত ও বিলুপ্ত বিষয় নিয়ে গবেষণা করে আরো মৌলিক রচনার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের ইতিহাস সকলেরই জানা, বৃহত্তর ময়মনসিংহের মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠ এ দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতাকামী তৃষ্ণাকে আরো তীব্রতর করেছিল এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। বর্তমান গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন বিষয়ের রচনা ও প্রকাশনা খুঁজে আমি ভীষণ হতাশ হয়েছিলাম। প্রথমত: এত সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভান্ডারের বিচিত্র বিষয় থাকা সত্ত্বেও এসব নিয়ে

www.pathagar.com

রচনা, গ্রন্থনা ও প্রকাশনা একবারেই সীমিত। দ্বিতীয়তঃ যে সব প্রকাশনা ইতোমধ্যে হয়েছে সেগুলোও দুর্লভ ও দুস্প্রাপ্য। কারণ জেলার এমন কোন সমৃদ্ধ লাইব্রেরী নেই, যেখানে সব প্রকাশনা সুবিন্যস্তভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

আমরা জানি পূর্বময়মনসিংহের নেত্রকোণার হাওড় বাওড়, আঁকা-বাঁকা নদীনালা, মনোরামভাবে সাজিয়ে রেখেছে এলাকাটির প্রাকৃতিক পরিবেশকে। এ নৈসর্গিক পরিবেশকে আরো সমৃদ্ধশালী এবং সুশোভিত করে রেখেছে উত্তরের সবুজ শ্যামল গারো পাহাড়, নদীর দুপাড় জুড়ে ছড়িয়ে আছে ঘন জঙ্গলে ঢাকা সবুজ বৃক্ষলতা সুশোভিত সারি সারি টিলা আর ছোট ছোট পাহাড়-এর পাদদেশে বয়ে যাওয়া ডালিম রসের জলে ভরা সুমেশ্বরী ও কংসের মত রূপে গুণে অতুলনীয় অনেক স্রোতস্বিনী নদী। এ সব প্রাকৃতিক পরিবেশ শুধু দৃষ্টি নন্দন ও মনোরঞ্জনের জন্যই নয় এ সবের আর্থ-সামাজিক তাৎপর্যও অপরিসীম। এ সব প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার প্রাণী জগতের জীবিকা সরবরাহে এত বেশী অপরিহার্য যে সৃষ্টি জগতে এর কোন বিকল্প নেই। নেত্রকোণার এ প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার এর প্রাচুর্য ছোটবেলা থেকে অনাবিল আনন্দ নিয়ে দেখে এসেছি। স্বাধীনতাত্তোর বিশেষত আশি নব্বই দশকের পর থেকে এর দ্রুত অবক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। এ এলাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক অবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা তথা সার্বিক অবকাঠামোর যে পরিমান উন্নতি সাধিত হওয়ার কথা ছিল বাস্তবে তেমনটা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তবে নৈসর্গিক দৃশ্য, প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার ও পরিবেশ বিপর্যয় যে অতিদ্রুত হচ্ছে তা ভীষণভাবে লক্ষ্যণীয়, যার মূল্য দিতে হবে এদেশের ভবিষ্যত প্রজন্মকেই।

প্রচলিত গবেষণায় এ সব প্রাকৃতিক সম্পদ দারিদ্র বিমোচনে সরাসরি কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে এবং এ সম্পদের অবক্ষয় হলে মানবগোষ্ঠীর খাদ্রচক্র কিভাবে বিঘ্নিত হতে পারে এ সব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে অত্যন্ত সীমিতভাবে। উপর্যুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জীবন ও প্রকৃতির সরাসরি সর্ম্পক নিয়ে গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল গবেষণা এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ভান্ডার কিভাবে মানবগোষ্ঠীর জীবিকাকে প্রভাবিত করে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিষয়বস্তুটি অত্যন্ত নতুন বিধায় এ সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রকাশনা ছিল একেবারেই সীমিত, ফলে তথ্য ও এ সংক্রান্ত সাহিত্যের অভাবে নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে গ্রন্থটি রচনা করতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থটিতে তথ্য পরিবেশনায় দূর্বলতা থাকাই স্বাভাবিক। দ্রুত বর্ধিত জনসংখ্যার কর্মসংস্থান, অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের যোগান দিতে গিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে সর্বত্র। প্রাকৃতিক সম্পদের এ অবক্ষয় রোধ করতে না পারলে পরিবেশ হবে বিপন্ন, মানবগোষ্ঠী থাকবে নিরন্ন। এহেন পরিস্থিতিতে গনসচেতনতা সৃষ্টি ও তৃণমূল পর্যায়ে গণমানুষকে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্তকরণ, সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগকে সমন্বয় ও সংগঠিতকরণের প্রয়োজনীয়তার বিষয় এ গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের সার্বিক বিবেচনায় জাতিসংঘ ২০০০ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (Millennium Development Goals) ঘোষণা করেছে যা আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জন করতে হবে। এ গ্রন্থে বর্ণিত গবেষণা জরিপ এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত ছোট ছোট ব্যবসা বাণিজ্যের উপর জীবিকার্জনের জন্য নির্ভরশীল। জরিপ এলাকায় দরিদ্রের প্রকোপ অত্যন্ত তীব্র। এক্ষেত্রে ব্যাপক কৃষি উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের কৃষি ব্যবসা সম্প্রসারণ দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সহস্রাব্দ লক্ষ্যার্জনে কতিপয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। যেমন শিশু মৃত্যু হার, সার্বজনীন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ, জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ, নিরাপদ পানীয় সরবরাহ এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সরবরাহ। তদুপরি বাংলাদেশ

www.pathagar.com

অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে সার্বিক ব্যবস্থাপনার অভাবে। জরিপ এলাকার দুটি গ্রাম কেশবপুর ও বিপিনগঞ্জে কৃষি উৎপাদন তথা জাতীয় প্রবৃদ্ধি থেকে বহু পিছিয়ে রয়েছে। কৃষক স্থানীয় মহাজন ও ফরিয়াদের কাছে ঋণ নিতে এবং তাদের উৎপাদিত শস্য বিক্রি করার ক্ষেত্রেও জিম্মি বলা চলে। অভাবের সময় তারা চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করে, আবাদী মৌসুমে সস্তা দামে তাদের পন্য বিক্রি করে তাদের ঋণ পরিশোধ করে। সেখানে শিশু মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী। খাদ্য নিরপত্তা এখনো অনিশ্চিত। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এখনো অনিশ্চিত বিধায় গ্রামবাসীগন বয়স্ক শিক্ষা সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। গনসচেতনতার ফলে মাতৃ স্বাস্থ্য সেবার বেশ উন্নতি হয়েছে। তবে জনস্বাস্থ্যের তেমন অগ্রগতি হয়নি। বিশ্বব্যাপী ম্যালেরিয়া নিধন হলেও জরিপ এলাকায় এ রোগের বিস্তার রয়েছে ব্যাপক। সাধারণ মানুষ নয় বরং স্থানীয় সিন্ডিকেটরাই নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। জরিপ এলাকার বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী এখনো আর্সেনিক আক্রান্ত। সাধারণ জনগোষ্ঠীর জন্য পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা এখনো পশ্চাৎপদ। বেশী সংখ্যক মানুষ কাঁচা পায়খানা অথবা খোলা মাঠেই তাদের পয়:নিস্কাশন করে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর কাছে তথ্য প্রবাহ ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রবেশাধিকারও অত্যন্ত সীমিত। গ্রামে-গঞ্জে মোবাইল টেলিফোনের ব্যবহার সীমিত হলেও টেলিভিশন দেখার সুযোগ একেবারে নেই বললেই চলে।

জরিপ থেকে দেখা যায় যে, সহস্রাব্দ লক্ষ্যার্জনে দারিদ্র্য বিমোচনমূখী প্রবৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, জীববৈচিত্রের সংরক্ষণ, পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকারী কৌশল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগ ও সম্পৃক্ততা অপিরহার্য। এ জন্যে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের কর্মসূচীর আদলে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে সম্পদে রূপান্তরিতকরণ, সামাজিক মূলধন গঠন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ একান্ত অপরিহার্য। তাছাড়া পল্লী উন্নয়নে অঞ্চল ভিত্তিক বিনিয়োগ কৌশল ও সমন্বিত নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।

গ্রন্থটি দশ অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের সম্পর্ক নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশের দারিদ্র্য চিত্র ও দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

লেখকের নিজ জেলা পূর্ব ময়মনসিংহের হাওর এলাকা নেত্রকোণাকে গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করা নেয়া হয়েছে, এই এলাকার ভৌগলিক ও নৈসর্গিক বৈচিত্রের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার অপূর্ব নৈসর্গিক বৈচিত্রের লীলাভূমি দীর্ঘদিন ধরে তীব্রভাবে অবহেলিত তাই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর একটি ঐতিহাসিক বিবরণী দেয়া হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়ে নেত্রকোণা এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের নির্বিচারে আহরণ ও অব্যবস্থাপনার একটি বিবরণী দেয়া হয়েছে। বিশেষত: জীববৈচিত্র, বন, মৎস্য, হাওড় বাওড় ও ভূমি সম্পদের, ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলি এবং ইংরেজ আমল থেকে শাসন ও শোষণে ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে। স্বচ্ছ রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাবে স্বাধীনতাত্তোর ভূমি সংস্কারের বিভিন্ন ব্যর্থ প্রয়াসের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সে সাথে বন নিধন, মৎস্য ও পশু সম্পদের ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ ও ব্যর্থতার কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে দূর্গাপুরের প্রাকৃতিক সম্পদ সাদামাটি ও কালো পাথরের অপরিনামদর্শী ও অপিরকল্পিত আহরণের বিবরণী রয়েছে। পাশাপাশি দরিদ্র বিমোচনে এ সম্পদের সম্ভাবনা ও গুরুত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এ সম্পদ বিলুপ্ত হতে থাকলে ভবিষ্যত প্রজন্মের ভয়াবহ পরিনতির প্রতিও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রা ও আচার অনুষ্ঠানের কথা আলোচনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিপন্ন আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও জীবন

www.pathagar.com

ব্যবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভূমি ভিত্তিক সামাজিক বিবর্তন ও দীর্ঘদিনের শাসন ও শোষণের ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে, সে সাথে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিকার ও প্রতিরোধের বিবরণী ও দেয়া হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে উপজেলা ভিত্তিক নেত্রকোণার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় ও বিলুপ্তির বিবরণ দেয়া হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে এ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের বিবরণী দেয়া হয়েছে। সর্বোপরি একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে নেত্রকোণার কতিপয় খন্ড চিত্রের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে ঢাকা বিভাগের অন্যান্য জেলার সাথে নেত্রকোণার দারিদ্র চিত্রের একটি তুলনামূলক বিবরণী দেয়া হয়েছে। সর্বশেষে সহস্রাব্দ লক্ষ্যার্জনে নেত্রকোণা জেলার দূর্গাপুরের বিপিনগঞ্জ এবং কলমাকান্দা উপজেলার কেশবপুর গ্রামের জরিপের ফলাফল ও তৃণমূল পর্যায়ে সহস্রাব্দ লক্ষ্যার্জনে তাদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণাটি পরিচালনায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। জরিপ ফলাফল বিশ্লেষণে সহযোগিতার জন্য Institute of Policy Studies (IPSU) এর পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) বন্ধুবর ও সহকর্মী জনাব কামার মুনিরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। জরিপ কাজে গবেষণা সমন্বয়ক হিসেবে সহায়তার জন্য স্থানীয় সুসঙ্গ ডিগ্রি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান জনাব রফিকুল ইসলামকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। জরিপ কাজে সমীক্ষক হিসেবে সহায়তা করার জন্য জনাব মোতাহার, আলতাফ, শফিককে আন্তরিক ধন্যবাদ। সর্বোপরি কতিপয় অধ্যায় পাঠ ও পর্যালোচনা করে গঠনমূলক পরামর্শ দিয়ে গ্রন্থটি আরো সমৃদ্ধি করতে সহায়তা করার জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার সহধর্মিনী ডাঃ মালিহা পারভীন, ছোট বোন রুজিনা সুলতানা, সহকর্মী সর্বজনাব মাহবুবুর রহমান জোয়াদ্দার, মইদুর রহমান, তোসাদ্দেক হোসেন ও ইফতেখার হোসেন। SPSS এ ডাটা বিশ্লেষণে সহায়তা করার জন্য জনাব আঃ হাকিমকে আন্তরিক ধন্যবাদ। বইটি কম্পোজ করার ক্ষেত্রে জনাব নূরুল হকের অক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। প্রিয় সহকর্মী জনাব নাজমুল আহসানের সার্বিক সহায়তা যেমন প্রকাশনা, প্রুফ দেখা সার্বিক অঙ্গসজ্জা ছাড়া বইটি প্রকাশ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য কাজ ছিল। এজন্যে তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতাবদ্ধ। নেত্রকোণার সাবেক জেলা প্রশাসক জনাব হোসাইন জামিল (যুগ্ম সচিব) জেলা উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করে এবং বিভিন্ন গঠনমূলক পরামর্শ দিয়ে গবেষণা পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য তাঁর প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। জনাব মোঃ আবু ইউসুফ সাবেক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উপসচিব) এবং জনাব আবু আহসান রাজুকে ময়মনসিংহের সাহিত্য সংস্কৃতি ও ইতিহাস সংক্রান্ত তথ্যাদি ও প্রকাশনা সংগ্রহ করে সহায়তা করার জন্য তাঁদের প্রতি রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। গবেষণা কাজটি পরিচালনায় দূর্গাপুর, কলমাকান্দা উপজেলা প্রশাসন ও সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতার জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া গ্রন্থটি রচনা ও প্রকাশনায় বিভিন্নভাবে যারা আমাকে সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন তাদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটি রচনায় যে কোন অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী এবং তা ক্ষমা-সুন্দরভাবে দেখার প্রত্যাশী। গ্রন্থটির ভবিষ্যত সংস্করণে গঠনমূলক ও বিশ্লেষণধর্মী যে কোন পরামর্শ ও অভিমতকে স্বাগত জানাই।

ডঃ এ এইচ এম মোস্তাইন বিল্লাহ
৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৭

www.pathagar.com

জীবন ও প্রকৃতি

ড. এ এইচ এম. মোস্তাইন বিল্লাহ

প্রথম অধ্যায়

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচন ১

অসম দারিদ্র্য চিত্র ২

দারিদ্র্য ও পরিবেশ সম্পর্ক ৩

ভূমি অবক্ষয় ৪

নদী ভাঙ্গনজনিত দারিদ্র্য ৪

জলমহাল ব্যবস্থাপনা, বিপন্ন জীব বৈচিত্র ও দারিদ্র্য সংকট ৫

বৃক্ষ নিধন ও দারিদ্র্য ৫

প্রাকৃতিক দুর্যোগ (আবহাওয়া পরিবর্তন) ও দারিদ্র্য ৬

দরিদ্র ও দারিদ্র্যাবস্থাঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ ৬

প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ পদ্ধতিতে দারিদ্র্যের পরিমাপ ৭

মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতিতে দারিদ্র্য নিরূপন ৮

গ্রামীণ পারিবারিক আয়ের উৎস ১১

পারিবারিক ব্যয় ১২

মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণ ১৩

আঞ্চলিক দারিদ্র্য চিত্র ১৪

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের বৈশিষ্ট্য ১৪

ভূমির মালিকানা ভিত্তিক দারিদ্র্য ১৪

পেশাভিত্তিক দারিদ্র্যাবস্থা ১৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দারিদ্র্য ১৬

প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত দারিদ্র্য ১৭

দারিদ্র্য বিমোচনে কর্মকৌশল ১৮

দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক খাতে বিনিয়োগ ২০

দারিদ্র্য বিমোচনে অবকাঠামো উন্নয়ন ২০

বাংলাদেশের করণীয় ২১

উপসংহার ২২

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

নেত্রকোণার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য	২৫
নামকরণ ও সীমানা	২৫
নেত্রকোণার ভূ-প্রকৃতি	২৭
ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য	২৯
জলবায়ু	৩১
নদ-নদী ও হাওড়	৩৩
ময়মনসিংহের নদ-নদীঃ প্রাগৈতিহাসিক ব্রহ্মপুত্র	৩৩
নদ-নদী	৩৪
জলধার এলাকা	৩৬
নদী ব্যবস্থাপনা	৩৯
বিল ও হাওড়	৪০
উপসংহার	৪২

তৃতীয় অধ্যায়

আর্থ সামাজিক অবস্থা	৪৫
নেত্রকোণা	৪৫
জনসংখ্যা	৪৬
জনশক্তি	৪৭
লোকালয় ও মানবগোষ্ঠী	৪৯
আদিযুগে জনবসতি স্থাপন	৪৯
নেত্রকোণার আদি সমাজ ব্যবস্থা	৫১
ভৌত অবকাঠামো ঃ যাতায়াত ব্যবস্থা	৫৪
যাতায়াতের আদি অবস্থা	৫৬
সড়ক ও জনপথ	৫৭
রাজধানীর সংগে জেলা ও উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা	৫৮
রেলওয়ে যোগাযোগ	৫৯
গৃহ নির্মাণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও সংরক্ষণ	৬০
গৃহনির্মাণে প্রাকৃতিক সম্পদ, বাঁশ ও বেতের ব্যবহার	৬১
গৃহনির্মাণে প্রাকৃতিক পরিবেশ সচেতনতা	৬৪
গৃহ আঙ্গিনায় পুকুর, বৃক্ষ রোপন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	৬৫
প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও ঐতিহ্য	৬৬
জীবজন্তু ও প্রকৃতি প্রেম	৬৭

www.pathagar.com

শিক্ষা অবকাঠামো ঃ শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ৬৮
আদিযুগের শিক্ষা ব্যবস্থা ৭০
মধ্যযুগের শিক্ষা ব্যবস্থা ৭১
শিক্ষায় মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ৭৩
আধুনিক যুগের শিক্ষা ৭৫
শিক্ষায় শায়খ পীর আউলিয়াগণের অবদান ৭৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৭৯

শিক্ষা সম্প্রসারণ ঃ শিক্ষার হার ৮২
প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ৮২
বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ৮৩
স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ৮৪
পুরনো দিনের চিকিৎসা পদ্ধতি ৮৪
আয়ুর্বেদী চিকিৎসা ৮৬
নেত্রকোণার রোগবালাই ৮৭
স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও চিকিৎসালয় স্থাপন ৯১
স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থা ৯১
চিকিৎসা সুবিধা ৯২
ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা ৯৪

সাধারণ গ্রন্থাগার এবং স্থানীয় পত্রিকা ৯৬
তথ্যপ্রবাহ ও সংবাদপত্র ৯৬

জনস্বাস্থ্য ৯৭

দারিদ্র্যাবস্থা ৯৭
সনাতন কৃষি ব্যবস্থা ৯৮

কৃষি জমি ও খামারের আয়তন ঃ জাতীয় অবস্থা ১০০

বিভিন্ন ফসলের ফলন ঃ জাতীয় চিত্র ১০২

সার বিতরণ ও প্রাপ্তি ঃ জাতীয় চিত্র ১০২

সেচ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন ১০৩

কৃষি আধুনিক উপকরণ ১০৫
কীটনাশক ঔষধ ১০৫

ভূমি ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ১০৮
সেচকৃত এলাকা ১১২

www.pathagar.com

সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন ১১৭
সংরক্ষণ ও বাজারজাত করণ ব্যবস্থা উন্নয়ন ১১৭

উপসংহার

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ১১৯
জলাশয়ের বৈশিষ্ট্য ব্যবস্থাপনা ১১৯
হাওড় এলাকায় বিচিত্র ধান চাষ পদ্ধতি ১২২
গো-চারণের সুবিধা ও দই -দুধ ১২৩
জীববৈচিত্র্য, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা ১২৩
জীববৈচিত্র্য ঔষধী গাছ ও গুল্মলতা ১২৪

ভূমি ব্যবহার ১২৬
ভূমি : শোষণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী ১২৭
জেলার ভূমি উৎপত্তির রাজস্ব ইতিহাস ১২৮

ভূমিস্বত্বের ঐতিহাসিক বিবর্তন : প্রাচীন ও বর্তমান কাল ১২৯
ইংরেজ শাসন ১৩২
পাকিস্তান শাসন আমল ১৩৪
স্বাধীনতাত্তোর ভূমি সংস্কার ১৩৫
১৯৭৫-৮২ : বিএনপি শাসনামল ১৩৬
১৯৮১-৮৪ : জাতীয় পার্টি শাসনামল ১৩৬

ক্ষেত মজুরদের অধিকার সংরক্ষণ : বর্গাচাষীদের অধিকার সংরক্ষণ আইন ১৩৮

কৃষি মজুরদের সর্বনিম্ন মজুরীর : কৃষি শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের আইনগত প্রতিষ্ঠা ১৩৯
ভূমি-ব্যবস্থা শোষণ প্রসূত আন্দোলন ১৪০
বন সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা ১৪০

বন আইন সংশোধন ১৪২
জনগণকে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে বনায়নে সম্পৃক্তকরণ ১৪২
বৃক্ষরোপন তহবিল গঠন ১৪২
বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) ও ব্যক্তি উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করণ ১৪২
মহাপরিকল্পনা ও বন নীতি প্রণয়ন ১৪৩
পশু পাখি ১৪৬
ময়মনসিংহে বন ব্যবস্থাপনা আইন ১৪৮
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ১৪৮
গৃহপালিত পশু ১৫০

www.pathagar.com

মৎস্য সম্পদ ১৫২
বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ ১৫৬
মৎস্য উৎপাদনের উৎস ১৫৭
উৎস অনুযায়ী মৎস্য উৎপাদনশীলতা ১৫৯
গ্রামাঞ্চলে মৎস্য চাষ ও আহরণ এবং জেলেদের আর্থিক অবস্থা ১৬০
আভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ১৬১
মৎস্য সংরক্ষণ নীতিমালা ১৬২

নেত্রকোণায় মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার ১৬৪
পাইল ফিশারী স্থাপন ১৬৪
সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা (সিবিএফএম) ১৬৫
মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগ ১৬৬

মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ ১৬৭
প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা ১৬৭

প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ দুর্গাপুরের সাদা মাটি ১৬৯
সাদামাটি আহরণ ১৭১
বর্তমান ইজারা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ১৭১
রাজস্ব আয় ও উন্নয়ন সম্ভাবনা ১৭৩
সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ১৭৩

সাদামাটি আহরণ ও পরিবেশের ভারসাম্য ১৭৬
পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ১৭৭

উপসংহার ১৭৯

পঞ্চম অধ্যায়

সাধারণ জীবন যাত্রা ও আচার অনুষ্ঠান ১৮৫

পুষ্টি ও খাদ্যাভাস ১৮৫
মাছে ভাতে বাঙালী ১৮৭
সাজ পোশাক ১৮৯

সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও লোক সাহিত্য ১৯০
ছড়া গান ও সাহিত্য সংস্কৃতি ১৯৮

বাংলাদেশের বিপন্ন আদিবাসী ২০১
গারো ২০২
হাজং ২১১

www.pathagar.com

হাজংদের জীবন জীবিকা ২১২
হাজংদের আগমন ও পরিচয় ২১৩
গৃহপালিত পশুপালন ২১৪
খাদ্য ও পানীয় ২১৫
খাড়পানি ও লেবাহাক ২১৫
সমাজ ব্যবস্থা ২১৬
জীবিকা ২১৭
হাজংদের সমাজে ধর্ম ২১৮

উপসংহার ২২০

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক বিবর্তন, শাসন ও শোষণের ইতিহাস ২২১

ভূ -বিবর্তন ও সভ্যতার বিকাশ ২২২
বৌদ্ধযুগ ২২৪
হিন্দু শাসনামল ২২৭
পাঠান শাসনকাল ২৩০
মোঘল শাসনকাল ২৩১

বৃটিশ শাসনঃ ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ২৩২
বৃটিশ শাসন ও শোষনের ইতিবৃত্ত : ব্রিটিশ বিচার ও শাসন প্রতিষ্ঠা ২৩৫
বৃটিশ আমলে ময়মনসিংহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থা ২৩৭
শোষনের বিরুদ্ধে প্রতিকার ও প্রতিরোধ ২৪৪
ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ২৫০

উপসংহার ২৫৪

সপ্তম অধ্যায়

নেত্রকোণা ঃ উপজেলা ভিত্তিক পর্যালোচনা ২৫৫

নেত্রকোণা জেলা (ঢাকা বিভাগ) ২৫৬
নেত্রকোণা সদর ২৫৬
পূর্বধলা ২৫৬
মোহনগঞ্জ ২৫৮
মদন ২৫৯
বারহাট্টা ২৬০
খালিয়াজুরী ২৬২

www.pathagar.com

আটপাড়া ২৬৩
কেন্দুয়া ২৬৪

দুর্গাপুর উপজেলা ২৬৬
ভূমি ব্যবস্থাপনা ২৬৮
দুর্গাপুরের কৃষি ২৭১
উপজেলার কৃষি উৎপাদনের সমস্যা ২৭৩
উপজেলায় কৃষি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উপায় ২৭৩

কলমাকান্দা উপজেলা ২৭৪
সীমানা ও অবস্থান ২৭৪
ঐতিহাসিক স্থান ২৭৪
ভূ-প্রকৃতি ২৭৪
জলবায়ু ২৭৫
আয়তন ২৭৫
জনসংখ্যা অবস্থা ২৭৬
জনস্বাস্থ্য ২৭৬
জমির শ্রেণীবিভাগ ২৭৭
যোগাযোগ ব্যবস্থা ২৭৯
পুকুর ও জলমহাল ২৮০
পরিবার পরিকল্পনা ২৮০
দারিদ্র্যাবস্থা ২৮১
শিক্ষা ব্যবস্থা ২৮১

উপসংহার ২৮১

অষ্টম অধ্যায়

ইংরেজ শাসন ও শোষণ বিরোধী আন্দোলন ২৯৩

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ ২৯৪
নেত্রকোণার সামাজিক প্রেক্ষাপট ২৯৮
মুসলিম লীগ ৩০১
কমিউনিষ্ট পার্টি ৩০২
নেত্রকোণায় টংক আন্দোলন ৩০৩
তেভাগা আন্দোলন ৩০৫
বাহাম কৃষক আন্দোলন ৩০৬
সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি ৩০৬
সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলন ৩০৭

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ	৩০৭
চাকুরীজীবি শহীদ	৩০৮
জাগীরপাড়া গণ এ্যাকশন	৩০৯
মহাদেও ক্যাম্প	৩১০
রংড়া ক্যাম্প	৩১০
বাড়েংগাপাড়া ক্যাম্প	৩১০
সীমান্ত টহল ফৌজ	৩১১
এফ. এফ ক্যাম্প	৩১১
মুক্তির সংগ্রামে নেত্রকোণা	৩১২
মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ্য ও অর্জন : বিআইডিএস এর জরিপের ফলাফল	৩১৩
মানুষ ও উন্নয়ন	৩১৬
শোষণমুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা সাংবিধানিক অঙ্গীকার	৩১৭
কৃষকের সাংবিধানিক অধিকার	৩২০
উপসংহার	৩২১

নবম অধ্যায়

নেত্রকোণার দারিদ্র্য চিত্র	৩২৩
গড় পরিবারের সদস্য সংখ্যা	৩২৩
আবাসন	৩২৪
সুপেয় পানীয় জল	৩২২
জ্বালানীর উৎস	৩২৭
জ্বালানী নিরাপত্তা	৩২৭
পয়ঃ নিষ্কাশন সুবিধাদি	৩২৯
জেলার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড	৩৩০
স্থূল জন্মহার	৩৩২
প্রজনন অবস্থা	৩৩২
১৯৯৬ ও ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি জরিপের তুলনামূলক বিবরণী	৩৩৪
খাদ্য নিরাপত্তা ও শস্য নিবিড়তা	৩৩৫
শস্য আবাদ এলাকা	৩৩৫
বাংলাদেশে পশু সম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন উদ্যোগ	৩৩৬
গ্রামাঞ্চলে পশু-পাখির প্রতিপালন ও মালিকানা	৩৩৭
পারিবারিক পর্যায়ে প্রাণীজ খাদ্যের যোগান ও চাহিদা	৩৩৮
কৃষিক্ষেত্রে পশু-পাখির ব্যবহার : যোগান ও চাহিদা	৩৩৮
পারিবারিক পর্যায়ে পশু পাখী পালন ও কর্মসংস্থান	৩৩৯

www.pathagar.com

পশু-সম্পদের বাণিজ্যিক খামার স্থাপন : সরকারী উদ্যোগ ৩৩৯
হোল্ডিং এর আকারের ভিত্তিতে কৃষি ও কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্য ৩৪১
শস্য আবাদী এলাকা, নেত্রকোণা ৩৪৩
শস্য আবাদী এলাকা, দুর্গাপুর ৩৪৪
শস্য আবাদী এলাকা, কলমাকান্দা ৩৪৫

সার বিতরণ ব্যবস্থাপনা : জাতীয় অবস্থা ৩৪৭
সেচ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন : জাতীয় উদ্যোগ ৩৪৮
নেত্রকোণা জেলায় সেচ ব্যবস্থাপনা ৩৫০
দুর্গাপুর উপজেলায় সেচ ও সারের ব্যবহার ৩৫১
কলমাকান্দা উপজেলায় সেচ ও সারের ব্যবহার ৩৫১

জেলার ভূমিসত্ব : নেত্রকোণা ৩৫২

ভূমিসত্ব : দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা ৩৫৩
ভূমি মালিকানা : ইউনিয়ন ও মৌজা পর্যায়ে ৩৫৩
কুল্লাগড়া, দুর্গাপুর
চৌহাট্টা, কলমাকান্দা ৩৫৫
বিভিন্ন শস্য আবাদী এলাকা ৩৫৭
কৃষি শ্রমিক, কুটির শিল্প, কৃষি সরঞ্জাম ও গ্রামীণ যানবাহন ৩৫৮

উপসংহার ৩৫৯

দশম অধ্যায়

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যার্জনে জাতীয় অবস্থা ৩৯১

দারিদ্র্য মাত্রা : আঞ্চলিক তারতম্য ৩৯১
দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সূচকে তাদের অবস্থা ৩৯২

এমডিজি -২ : সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, জাতীয় অবস্থা ৩৯৩
এমডিজি -৩ : জেন্ডার ব্যালেন্স ও নারী ক্ষমতায়ন ৩৯৫
এমডিজি-৪ : শিশু মৃত্যুহার হ্রাস করণ ৩৯৭
এমডিজি-৫ : মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন ৩৯৮
এমডিজি-৬ : এইচআইভি যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ ৩৯৯
এমডিজি-৭ : পরিবেশ ও টেক্‌সই উন্নয়ন ৪০০

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যার্জনে দুটি গ্রাম : বিপিনগঞ্জ ও কেশবপুর ৪০০

লক্ষ্য -১ : দারিদ্র্য ৪০০
আয়ের উৎস ৪০১

www.pathagar.com

কৃষি বিপনন ব্যবস্থা	৪০৫
ঋণগ্রস্থ পরিবার	৪০৮
২০০৩ সালে ঋণ গ্রহণ করার কারণ ও উৎস	৪০৯
২০০৪ সালে ঋণ গ্রহণের উৎস ও কারণ	৪১০
২০০৫ সালে ঋণ গ্রহণ করার কারণ	৪১১
সঙ্কটময় সময়ে খাদ্য সংগ্রহ	৪১৩
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী (Social Safety-net Program)	৪১৪
জরিপ এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোন পথে?	৪১৫
পাঁচ বছর পূর্বের অর্থনৈতিক অবস্থা	৪১৫
লক্ষ্য -২ : প্রাথমিক শিক্ষা	৪১৬
স্কুলে না পাঠানোর কারণসমূহ	৪১৬
বয়স্ক শিক্ষা	৪১৭
লক্ষ্য -৩ ; জেন্ডার সমতাকরণ	৪১৭
এসএসসি পর্যায়ে ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান	৪১৭
লক্ষ্য ৪ : শিশু স্বাস্থ্য	৪১৮
মাতৃ মৃত্যুর হার	৪১৮
লক্ষ্য -৫ : মাতৃ স্বাস্থ্য	৪২০
গর্ভবতীদের স্বাস্থ্য সেবা	৪২০
স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা	৪২০
টিকাদান	৪২১
লক্ষ্য-৬ : এইচআইভি/এইডস ও অন্যান্য রোগ বালাই	৪২২
লক্ষ্য ৭ : পরিবেশ সংরক্ষণ	৪২৩
বাঁশের ব্যবহার ও উৎপাদন	৪২৩
নার্সারী	৪২৩
জ্বালানী কাঠ	৪২৪
মৎস্য চাষ	৪২৪
বন্য পশু ও উদ্ভিদ	৪২৪
সুমেশ্বরীর পাথর ও কয়লা	৪২৫
কূপের পানি সরবরাহ	৪২৬
পয়ঃনিষ্কাশন	৪২৮
জ্বালানী কাঠ	৪৩০
লক্ষ্য -৮ : উন্নয়নে বিশ্বজনীন সহযোগিতা	৪৩০

www.pathagar.com

সুপারিশ ৪৩২
ক্ষুধা ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ ৪৩৩
সার্বজনীন শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞান ৪৩৩
জেন্ডার ক্ষমতায়ন ও নারী ক্ষমতায়ন ৪৩৩
সাফল্য বহাল রাখা ৪৩৪
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষা ৪৩৪

প্রথম অধ্যায়

সারণী ১.১ ঃ বাংলাদেশে দরিদ্র এবং চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৮
সারণী ১.২ ঃ দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের মাথাপিছু মাসিক আয়ের সীমা ৮
সারণী ১.৩ ঃ মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় ও আঞ্চলিক দরিদ্র্যের সংখ্যা ১০
সারণী ১.৪ ঃ দারিদ্র্য প্রবণতা এবং বৈষম্যের মাত্রা ১১
সারণী ১.৫ ঃ নির্দিষ্ট তিনটি বছরে পারিবারিক মাসিক জাতীয়, গ্রাম ও শহরবাসীর আয় ১১
সারণী ১.৬ ঃ গ্রামীণ পারিবারিক আয়ের প্রধান উৎসসমূহ এবং বিগত দশকে বার্ষিক পরিবর্তন ১২
সারণী ১.৭ ঃ উৎস অনুযায়ী খাদ্যসহ ভোগ্য পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ ১৩
সারণী-১.৮ ঃ নির্দিষ্ট তিন বছর মাথাপিছু দৈনিক মোট খাদ্য ও আমিষ গ্রহণের পরিমাণ (গ্রাম) ১৪
সারণী ১.৯ ঃ গ্রামে জমির মালিকানা ভিত্তিতে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা (শতকরা হিসেবে) ১৫
সারণী ১.১০ ঃ গ্রামে প্রধান পেশা অনুযায়ী দারিদ্র্য প্রবণতা (১৯৮৩/৮৪ থেকে ১৯৯১/৯২) দরিদ্র জনসংখ্যা (শতকরা হিসেবে) ১৬
সারণী ১.১১ ঃ পেশাভিত্তিক বার্ষিক মোট কর্মদিন এবং দৈনিক উৎপাদনশীলতা (দৈনিক মার্কিন ডলার) ১৬
সারণী ১.১২ ঃ পরিবার প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী গ্রামে দারিদ্র্য প্রবণতা (শতকরা হিসেবে) ১৭
সারণী ১.১৩ ঃ প্রধান প্রধান দারিদ্র ও সামাজিক নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা (বেঞ্চমার্ক সালঃ ২০০০) ১৮
সারণী ১.১৪ ঃ ভৌত অবকাঠামো অনুযায়ী দরিদ্রের সংখ্যা ২১

দ্বিতীয় অধ্যায়

সারণী-২.১ ঃ নেত্রকোণায় মাসওয়ারী গড় সর্বোচ্চ ও গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস) ৩২
সারণী-২.২ ঃ নেত্রকোণা জেলার বিগত ৭ বৎসরের মাসিক বৃষ্টিপাত ৩২

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

সারণী-৩.১	ঃ	উপজেলা ভিত্তিক জনসংখ্যা বন্টন ও বর্ধন	৪৬
সারণী-৩.২	ঃ	বাংলাদেশে কর্মক্ষম জনশক্তি ও নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর অবস্থা (%)	৪৭
সারণী ৩.৩	ঃ	নেত্রকোণার কর্মক্ষম জনশক্তি ও নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর অবস্থা	৪৮
সারণী-৩.৪	ঃ	আন্তঃউপজেলা/জেলার যাতায়াত ব্যবস্থা	৫৮
সারণী ৩.৫	ঃ	নেত্রকোণা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিবরণ (উপজেলা ওয়ারী)	৮৪
সারণী ৩.৬	ঃ	নেত্রকোণার আধুনিক সদর হাসপাতালের চিকিৎসা- মাতৃ-শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম, জানুয়ারী, ২০০৫	৯৩
সারণী ৩.৭	ঃ	অপরাধ প্রবণতার ধরণ	৯৮
সারণী ৩.৮	ঃ	১৯৯৬ সালের কৃষিশুমারী অনুযায়ী কৃষক পরিবারের সংখ্যা এবং খামারের গড় আয়তন	১০১
সারণী ৩.৯	ঃ	বিভিন্ন সেচ যন্ত্রের জমির পরিমাণ এবং হেক্টর প্রতি বাড়তি উৎপাদন	১০৪
সারণী ৩.১০	ঃ	বিভিন্ন ফসলে কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার (ফসলের জমির শতকরা হার)	১০৬
সারণী ৩.১১	ঃ	বোরো ধান, নির্বাচিত সব্জী ও ফলের বাগানে কীট নাশক ঔষধের ব্যবহারের মাত্রা (প্রতি হেঃ)	১০৬
সারণী ৩.১২	ঃ	জেলার কৃষি জমির পরিমাণ	১০৮
সারণী ৩.১৩	ঃ	ভূমি বিতরণ অবস্থা	১০৯
সারণী ৩.১৪	ঃ	নেত্রকোণার ফসল ভিত্তিক মোট জমির পরিমাণ ও তার শতকরা হার	১১০
সারণী ৩.১৫	ঃ	নেত্রকোণা জেলার বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের শস্য বিন্যাসের বিবরণ	১১১
সারণী ৩.১৬	ঃ	১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৩-২০০৪ সন পর্যন্ত নেত্রকোণা জেলার খাদ্য পরিস্থিতি	১১২
সারণী ৩.১৭	ঃ	রবি মৌসুম/২০০৪-২০০৫ইং সনে নেত্রকোণা জেলায় বোরো ফসলের আবাদ	১১৩
সারণী ৩.১৮	ঃ	নেত্রকোণা জেলার রবি মৌসুমে/২০০৪-২০০৫ইং এর আওতায় বোরো ব্যতীত অন্যান্য ফসল আবাদের অগ্রগতি	১১৪
সারণী ৩.১৯	ঃ	নেত্রকোণা জেলার ২০০৪-২০০৫ইং সনের ইউরিয়া সারের চাহিদা ও প্রাপ্তি	১১৫
সারণী ৩.২০	ঃ	সারের বাজার দর প্রতি কেজি	১১৫
সারণী ৩.২১	ঃ	নেত্রকোণা জেলার বোরো মৌসুম/২০০৪-২০০৫ইং সনের ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রের পরিসংখ্যান	১১৬
সারণী ৩.২২	ঃ	অঞ্চল ভিত্তিক সেচ অবস্থার পরিবর্তন (২০০২/০৩-২০০৩/০৪)	১১৭

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

সারণী ৪.১	ঃ	নেত্রকোণা জেলাধীন ২০ একরের উর্ধ্বে জলমহালের তালিকা	১২১
সারণী ৪.২	ঃ	নেত্রকোণা জেলার উপজেলাওয়ারি হাওড় এলাকার পরিমান	১২২
সারণী ৪.৩	ঃ	অঞ্চল ভিত্তিক ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন (২০০২/০৩-২০০৩/০৪)	১২৬
সারণী ৪.৪	ঃ	ময়মনসিংহ বন বিভাগের অধীন নেত্রকোণার বনাঞ্চল সমূহের একটি উপজেলাওয়ারী বিবরণ	১৪৫
সারণী ৪.৫	ঃ	নির্ধারিত কয়েকটি বছর দুধ, ডিম ও মাছের মাথাপিছু দৈনিক ভোগের পরিমাণ	১৫৭
সারণী ৪.৬	ঃ	উৎস অনুযায়ী মাছের উৎপাদন ১৯৯২-২০০২	১৫৮
সারণী ৪.৭	ঃ	উৎস অনুযায়ী ১৯৯২-৯৪ এবং ২০০০-০২ (শতকরা হিসেবে)	১৫৯
সারণী ৪.৮	ঃ	প্রধান মৎস্য জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা	১৬০
সারণী ৪.৯	ঃ	খামারের আয়তন অনুযায়ী মৎস্য চাষী এবং মৎস্যজীবিদের সংখ্যা	১৬১
সারণী ৪.১০	ঃ	খামারের আয়তন অনুযায়ী মাছ ধরার উৎস সমূহ এবং আহরণকারীর সংখ্যা	১৬১
সারণী ৪.১১	ঃ	বিজয়পুরে চীনামাটি উৎপাদন	১৭১
সারণী ৪. ১২	ঃ	২০০২ ইং সনের রাজস্ব অবস্থা হিসাব (টাকায়)	১৭৩

সপ্তম অধ্যায়

সারণী ৭.১	ঃ	দূর্গাপুর উপজেলার জনসংখ্যা ও প্রান্তিক কৃষক	২৬৭
সারণী ৭.২	ঃ	ভূমি শ্রেণী সংক্রান্ত তথ্য	২৬৮
সারণী ৭.৩	ঃ	খাদ্য পরিস্থিতি	২৭২
সারণী ৭.৪	ঃ	কৃষি জমির পরিমান	২৭২
সারণী ৭.৫	ঃ	জনসংখ্যা ও এর বৃদ্ধি প্রবণতা	২৭৬
সারণী ৭.৬	ঃ	স্বাস্থ্যব্যবস্থা	২৭৭
সারণী ৭.৭	ঃ	ভূমির শ্রেনীভেদ	২৭৮
সারণী ৭.৮	ঃ	ভূমির মালিকানার ধরণ	২৭৮
সারণী ৭.৯	ঃ	বর্তমান সেচ অবস্থা	২৭৯
সারণী ৭.১০	ঃ	উপজেলা পরিষদ হতে ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের যোগাযোগ ব্যবস্থা	২৮০

সংলগ্নি ক : দূর্গাপুর উপজেলার বিভিন্ন তথ্যাদি

সারণী ৭ক.১	ঃ	সেচ যন্ত্র ও সেচ কৃত জমি (২০০২-২০০৩)	২৮২
সারণী ৭ক.২	ঃ	সেচ খরচ (২০০২-২০০৩)	২৮২
সারণী ৭ক.৩	ঃ	নদনদী ও নদী হতে সেচের বিবরণ	২৮৩

www.pathagar.com

সারণী ৭ক.৪ ঃ জলমহালের বিবরণ ২৮৩
সারণী ৭ক.৫ ঃ জমির বর্গা প্রথা/লিজ ২৮৩
সারণী ৭ক.৬ ঃ খাদ্যশস্যের জমির পরিমান ও উৎপাদন (চাউলে) ২৮৪
সারণী ৭ক.৭ ঃ অন্যান্য ফসলের জমির পরিমাণ ২৮৪
সারণী ৭ক.৮ ঃ জনপ্রিয় এবং উল্লেখযোগ্য স্থানীয় জাত ঃ২ ২৮৮
সারণী ৭ক.৯ ঃ সার ও বীজ ডিলার/উৎপাদনকারী ২৮৮
সারণী ৭ক.১০ ঃ কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ঃ ২৮৯
সারণী ৭ক.১১ ঃ প্রযুক্তি ভিত্তিক স্থাপিত প্রদর্শনীর সংখ্যা ২৮৯
সারণী ৭ক.১২ ঃ নার্সারী ও ফল বাগান ২৮৯
সারণী ৭ক.১৩ ঃ কৃষি যন্ত্রপাতি বিক্রয় ও মেরামত কারখানা ২৯০
সারণী ৭ক.১৪ ঃ কৃষি ভিত্তিক এনজিও এর তালিকা ২৯০
সারণী ৭ক.১৫ ঃ বৃক্ষ রোপন (২০০২-২০০৩) ২৯০
সারণী ৭ক.১৬ ঃ প্রধান প্রধান শস্য ও শস্য বিন্যাস ঃ ২৯১
সারণী ৭ক.১৭ ঃ প্রধান প্রধান ফসলের নাম, আবাদকৃত এলাকা, উৎপাদন, ফসলের নিবিড়তা, ফসলের মূল্য ২৯১
সারণী ৭ক.১৮ ঃ উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা ২৯২

নবম অধ্যায়

সারণী ৯.১ ঃ গড় পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩২৪
সারণী ৯.২ ঃ স্থুল জন্মহার প্রতি হাজার (Crude Birth Rate per 1000) ৩৩২
সারণী ৯.৩ ঃ বয়স ভিত্তিক প্রজনন হার (Age Specific Fertility Rate) প্রতি হাজার মহিলা (মোট জন্ম,Total Birth) : (TFR) ৩৩৩
সারণী ৯.৪ ঃ বয়স ভিত্তিক প্রজনন হার (Age Specific Fertility Rate) প্রতি হাজার মহিলাঃ (NRR) ৩৩৩
সারণী ৯.৫ ঃ নীট পুনঃপ্রজনন হার (Net Reproductive Rate) (১৯৯৭-২০০২) ৩৩৪
সারণী ৯.৬ ঃ খামারের আকার ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার, দূর্গাপুর ৩৫৪
সারণী ৯.৭ ঃ খামারের আকার ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার, কলমাকান্দা ৩৫৬
সারণী ৯.৮ ঃ খামারের আকার ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার : দূর্গাপুর ও কলমাকান্দা ৩৫৮
সারণী ৯.৯ ঃ দূর্গাপুর উপজেলার কুল্লাগড়া ইউনিয়নের আড়াপাড়া মৌজার দারিদ্র্য চিত্র ৩৬০
সারণী ৯.১০ ঃ কলমাকান্দা উপজেলার বড় কাপন ইউনিয়নের চৌহাট্টা মৌজার দারিদ্র চিত্র ৩৬১

www.pathagar.com

Annex A

Annex A	ঃ সারণী-৯.১ ঃ	আবাসনঃ গৃহ নির্মাণ সামগ্রী	৩৬২
Annex A	ঃ সারণী-৯.২ ঃ	সুপেয় পানীয় জলের উৎস	৩৬৩
Annex A	ঃ সারণী ৯.৩ ঃ	কেরোসিন ও বিদ্যুতের ব্যবহার	৩৬৩
Annex A	ঃ সারণী ৯.৪ ঃ	জ্বালানীর উৎস	৩৬৪
Annex A	ঃ সারণী ৯.৫ ঃ	পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাদি (টয়লেট)	৩৬৪
Annex A	ঃ সারণী ৯.৬ ঃ	অর্থনৈতিক কর্মকান্ড	৩৬৫
Annex A	ঃ সারণী ৯.৭ ঃ	নেত্রকোণা জেলার ১৯৯৬ ও ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি জরিপের তুলনামূলক বিবরণী	৩৬৬
Annex A	ঃ সারণী ৯.৮ ঃ	সারণী ঃ নেত্রকোণা জেলার ১৯৯৬ ও ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি জরিপের তুলনামূলক বিবরণী, (Holding এর আকার ভিত্তিতে কৃষি ও কৃষি যন্ত্রপাতি কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্যঃ)	৩৭১
Annex A	ঃ সারণী ৯.৯ ঃ	নেত্রকোণা জেলায় শস্য আবাদী (শস্য এলাকা খামারের সাইজ অনুসারে)	৩৭৪
Annex A	ঃ সারণী ৯.১০ ঃ	দুর্গাপুর উপজেলায় (শস্য এলাকা খামারের সাইজ অনুসারে)	৩৭৬
Annex A	ঃ সারণী ৯.১১ ঃ	কলমাকান্দা উপজেলায় (শস্য এলাকা খামারের সাইজ অনুসারে)	৩৭৮
Annex A	ঃ সারণী ৯.১২ ঃ	নেত্রকোণা জেলায় সেচ ও সারের ব্যবহার	৩৮০
Annex A	ঃ সারণী ৯.১৩ ঃ	দুর্গাপুর জেলায় সেচ ও সারের ব্যবহার	৩৮১
Annex A	ঃ সারণী ৯.১৪ ঃ	কলমাকান্দা উপজেলায় সেচ ও সারের ব্যবহার	৩৮২
Annex A	ঃ সারণী ৯.১৫ ঃ	নেত্রকোণা জেলায় ভূমি মালিকানার অবস্থা	৩৮৩
Annex A	ঃ সারণী ৯.১৬ ঃ	দূর্গাপুর জেলায় ভূমি মালিকানার ব্যবস্থা	৩৮৪
Annex A	ঃ সারণী ৯.১৭ ঃ	কলমাকান্দা উপজেলার ভূমি মালিকানার অবস্থা	৩৮৬
Annex A	ঃ সারণী ৯.১৮ ঃ	ভূমি মালিকানা প্রকার ও পরিবার প্রধান অনুসারে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড	৩৮৭
Annex A	ঃ সারণী ৯.১৯ ঃ	ভূমি মালিকানার প্রকার ও পরিবার প্রধান অনুসারে নির্বাচিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, উপজেলা দুর্গাপুর	৩৮৯
Annex A	ঃ সারণী ৯.২০ ঃ	ভূমি মালিকানা প্রকার ও পরিবার প্রধান অনুসারে নির্বাচিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, উপজেলা কলমাকান্দা	৩৯০

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

সারণী ১০.১	ঃ	বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্যের হার	৩৯২
সারণী ১০.২	ঃ	কৃষি শ্রমিকসহ দিন মজুরদের বিভিন্ন নির্দেশক তাদের অবস্থা	৩৯২
সারণী ১০.৩	ঃ	নারী পুরুষের শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণ	৩৯৬
সারণী ১০.৪	ঃ	শিশু মৃত্যুহারের অবস্থা	৩৯৮
সারণী ১০.৫	ঃ	বিক্রিত শস্যের শতকরা গড় (Income Poverty)	৪০২
সারণী ১০.৬	ঃ	কম মূল্যে বিক্রিত ফসল (শতকরা হারে)	৪০৪
সারণী ১০.৭	ঃ	কম মূল্যে শস্য বিক্রির কারণ	৪০৪
সারণী ১০.৮	ঃ	নিকটবর্তী বাজারের সাথে যাতায়াত সুবিধা	৪০৫
সারণী ১০.৯	ঃ	তিন মাসে উৎপাদিত শাকসব্জীর বিবরণ	৪০৭
সারণী ১০.১০	ঃ	খাদ্য ঘাটতির মূল কারণ	৪১২
সারণী ১০.১১	ঃ	পরিবারের সদস্যদের খাদ্য গ্রহণের তারতম্য	৪১৩
সারণী ১০.১২	ঃ	ওএমএস / ভিজিএফ/ভিজিডি কার্ডের মাধ্যমে খাদ্য বিতরণকৃত মাসসমূহ	৪১৪
সারণী ১০.১৩	ঃ	স্কুলে না পাঠানোর কারণ	৪১৬
সারণী ১০.১৪	ঃ	বিপিনগঞ্জ ও কেশবপুরের শিক্ষার স্তর	৪১৮
সারণী ১০.১৫	ঃ	সর্বশেষে যে সমস্ত রোগে ভুগেছে	৪১৯
সারণী ১০.১৬	ঃ	যার কাছ থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেছে	৪১৯
সারণী ১০.১৭	ঃ	গর্ভবতী মাকে পরীক্ষা করার অবস্থা	৪২০
সারণী ১০.১৮	ঃ	ক্লিনিক / হাসপাতালে না পাঠানোর কারণ	৪২১
সারণী ১০:১৯	ঃ	পানিবাহিত রোগবালাই (পানীয় জল দ্বারা)	৪২৬
সারণী ১০:২০	ঃ	টিউবওয়েল না থাকার কারণ	৪২৭
সারণী ১০:২১	ঃ	স্যানিটারী পায়খানা ব্যবহার না করার কারণ	৪২৮
সারণী ১০:২২	ঃ	পায়খানা ব্যবহারের পর হাত পরিস্কার করে	৪২৯
সারণী ১০.২৩	ঃ	ঔষধি গাছ রোপন	৪২৯
সারণী ১০:২৪	ঃ	বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপণ	৪৩০
সারণী ১০:২৫	ঃ	জ্বালানীর শ্রেণী	৪৩০
সারণী ১০:২৬	ঃ	টেলিভিশন অনুষ্ঠান ও জনগণের পছন্দ	৪৩২

প্রথম অধ্যায়

চিত্র ১.১	ঃ	পরিবেশ ও খাদ্য চক্র	৩
চিত্র ১.২	ঃ	দারিদ্র্য, অপুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্ক	৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

চিত্র ২.১	ঃ	নেত্রকোণা জেলার ম্যাপ	২৬

www.pathagar.com

চিত্র ২.২ ঃ Wetlands এর জলাধার, সিঙ্ক এবং পানিবিশুদ্ধকারী ভূমিকা ৩০
চিত্র ২.৩ ঃ Wetlands জীববৈচিত্রের সুপার মার্কেট ৩১
চিত্র ২.৪ ঃ বন্যা দুর্গতদের অসহায় অবস্থার খন্ড চিত্র ৩৭
চিত্র ২.৫ ঃ Eutrophic Lake or Nutrient সমৃদ্ধ জলাভূমি ৪১
চিত্র ২.৬ ঃ Oligotrophic Lake or Nutrient অভাবী জলাভূমি ৪১

চতুর্থ অধ্যায়

চিত্র ৪.১ ঃ বৃক্ষহীন বণাঞ্চল ১৪১
চিত্র ৪.২ ঃ বন্যপ্রাণী ও চামড়ার ব্যবসা ১৪৯
চিত্র ৪.৩ ঃ বাংলাদেশের সাদামাটি এলাকা ১৭০
চিত্র ৪.৪ ঃ দূর্গাপুর এলাকার ভূমিরূপ ও সাদামাটি টিলার অবস্থান ১৭০
চিত্র ৪.৫ ঃ বিজয়পুর এলাকার ভূগঠন ও সাদামাটি খনিজ ১৭২
চিত্র ৪.৬ ঃ কয়লা উত্তোলনে কর্মসংস্থান ১৭৫
চিত্র ৪.৭ ঃ কয়লা উত্তোলনে নিয়োজিত মহিলা ১৭৫
চিত্র ৪.৮ ঃ সাদামাটি আহরণকৃত পরিবেশ ভারসাম্যহীন পাহাড় ১৭৬
চিত্র ৪.৯ ঃ পরিবেশ ব্যবস্থাপনাহীন সাদা মাটির পাহাড় ১৭৭
চিত্র ৪.১০ ঃ অরক্ষিত পরিবেশে গো-চারণভূমি ১৭৭

সপ্তম অধ্যায়

চিত্র ৭.১ ঃ দূর্গাপুর উপজেলার মানচিত্র ২৬৬

নবম অধ্যায়

চিত্র ৯.১ ঃ আবাসনঃ গৃহ নির্মাণ, নেত্রকোণা ৩২৫
চিত্র ৯.২ ঃ গৃহ নির্মাণ সামগ্রী, ঢাকা বিভাগ ৩২৫
চিত্র ৯.৩ ঃ নেত্রকোণা জেলা, সুপেয় পানীয়জল ৩২৬
চিত্র ৯.৪ ঃ ঢাকা বিভাগ, সুপেয় পানীয় ৩২৭
চিত্র ৯.৫ ঃ নেত্রকোণা জেলা, কেরোসিন ও বিদ্যুতের ব্যবহার ৩২৮
চিত্র ৯.৬ ঃ ঢাকা বিভাগ, কেরোসিন ও বিদ্যুতের ব্যবহার ৩২৮
চিত্র ৯.৭ ঃ ঢাকা বিভাগ জ্বালানীর উৎস ৩২৯
চিত্র ৯.৮ ঃ নেত্রকোণা জেলা, জ্বালানীর উৎস ৩২৯
চিত্র ৯.৯ ঃ ঢাকা বিভাগ : পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাদি ৩৩০
চিত্র ৯.১০ ঃ নেত্রকোণা জেলা ; পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাদি ৩৩০
চিত্র ৯.১১ ঃ ঢাকা বিভাগ, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ৩৩১
চিত্র ৯.১২ ঃ নেত্রকোণা জেলা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ৩৩১
চিত্র ৯.১৩ ঃ নেত্রকোণা জেলার ফসলের নিবিড়তা ৩৪৩

www.pathagar.com

চিত্র ৯.১৪ : দুর্গাপুর উপজেলার শস্য নিবিড়তা ৩৪৪
চিত্র ৯.১৫ : কলমাকান্দা উপজেলায় শস্য নিবিড়তা ৩৮৭

দশম অধ্যায়

চিত্র ১০.১ : গত তিনমাসে শাকসবজি বিক্রির গড় আয় ৪০৮
চিত্র ১০.২ : ঋণগ্রস্থ পরিবার (শতকরা) ৪০৯
চিত্র ১০.৩ : ২০০৩ সালের ঋণের উৎস ৪০৯
চিত্র ১০.৪ : ২০০৪ সালে ঋণ গ্রহণের কারণ ৪১০
চিত্র ১০.৫ : ২০০৪ সালে ঋণের উৎস ৪১০
চিত্র ১০.৬ : ২০০৫ সালে ঋণের পরিমাণ এবং ঋণ পরিশোধ ৪১১
চিত্র ১০.৭ : ঋণ পরিশোধের ধরণ ৪১১
চিত্র ১০.৮ : দূর্যোগের সময় খাদ্য ব্যবস্থা ৪১৪
চিত্র ১০.৯ : গত পাঁচ বছরের তুলনায় জরিপকালে পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা ৪১৫
চিত্র ১০.১০ : বিভিন্ন টীকার লভ্যতা ৪২১
চিত্র ১০.১১ : শিশুদের বিভিন্ন টীকা প্রদান ৪২২
চিত্র ১০.১২ : যক্ষা রোগীর চিকিৎসার সুবিধা ৪২৩
চিত্র ১০.১৩ : খাবার পানির উৎস ৪২৭
চিত্র ১০.১৪ : টিউবওয়েল ক্রয়ের অর্থায়ন ৪২৭
চিত্র ১০.১৫ : পায়খানার শ্রেণী ৪২৮
চিত্র ১০.১৬ : ফোন কল করার অধিকার ৪৩১
চিত্র ১০.১৭ : মোবাইল ফোনের লভ্যতা ৪৩১

www.pathagar.com

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচন

দারিদ্র্য বলতে বহুমাত্রিক অতি জটিল সমস্যায় জর্জরিত একটি অবস্থাকে বুঝায় এবং এর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে নানাবিধ বঞ্চনা, চাহিদা ও প্রাপ্তির গ্যাপের সম্পর্ক। তাই এর গতি-প্রকৃতি এবং অনুসঙ্গ অতি সংক্ষেপে এক বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। হালে দরিদ্র সংক্রান্ত সূচক যেমন মাবন উন্নয়ন, দারিদ্র্য এবং জেন্ডার উন্নয়ন সূচক প্রণয়নে মাথা পিছু আয় ছাড়াও সামাজিক (জীবন প্রত্যাশা, শিক্ষার হার) স্বাস্থ্য মানবাধিকার ও সম্পদের সুষম বন্টন, ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়াদি বিবেচনায় আনা হয়ে থাকে (এডিবি ১৯৯৯)। মোট কথা কোন খন্ড বিষয় দিয়ে বা পার্শ্বচিত্র দেখে এক ঝলকে দারিদ্র্যকে বুঝার কোন উপায় নেই। দারিদ্র্যের কারণ যাই হোক না কেন দারিদ্র্য সাধারণত পরিবেশগত ভঙ্গুর প্রতিবেশ এলাকায় পুঞ্জীভূত থাকে। যেখানে দরিদ্র জনগোষ্ঠী হয় বিপন্ন পরিবেশে বাস করে অথবা দারিদ্র্য নিপীড়ন তাদেরকে পরিবেশ দুষণে বাধ্য করে।

এসকাপের ২০০১ সালের প্রতিবেদনে ভূমি ব্যবহার ও পরিবেশ দূষণের পরিপ্রেক্ষিতে চার ধরণের দারিদ্র্য পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

প্রথমত ঃ উর্বর কৃষি জমি এলাকায় দারিদ্র্য সৃষ্টি হয় দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সম্পদের সুষম ব্যবস্থাপনার অভাবে। কেননা সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে নিঃসন্দেহে মোট খাদ্যেৎপাদন বৃদ্ধি হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে যে প্রান্তিক চাষী ও বর্গাদারদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। কারণ হিসেবে দেখা যায় যে, বড় চাষীদের তুলনায় ছোট চাষীদের মূলধন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার অভাবে, বিনিয়োগ করতে পারেনা এবং নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারও সম্ভব হয়না। ফলে আধুনিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ দারিদ্র্যের অন্য কারণ প্রান্তিক ভূমি মালিকানা। এ ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও সুযোগ সুবিধার সৎ ব্যবহার সম্ভব না হওয়ায় জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সুযোগ সীমিত হয়ে যায়। এ জন্যে টেক্সই ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহারও সম্ভব হয় না। যার পরিণতি হিসেবে হয় ভূমি অবক্ষয় এবং বাড়ে দারিদ্র্য। উল্লেখ্য এসকাপ অঞ্চলের প্রায় ৬০ শতাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রান্তিক ভূমির মালিক বিধায় তারা দারিদ্র্যের শিকার ।

তৃতীয়তঃ দারিদ্র্য সৃষ্টি হয় উপকূলীয় এলাকায় যেখানে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব অথবা এ সম্পদের অপচয় ও অবক্ষয় বাড়ছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী ভাগ্যান্বেষণে উপকূলীয় এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে আকৃষ্ট হয়ে তাতে বেপরোয়া আত্মনিয়োগ করে। আর এ উন্নয়ন কর্মকান্ডের ধারা অনেক সময় উপকূলীয় সম্পদকে ধ্বংস/অবক্ষয় করে। যার ফলে উপকূলীয় প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নের চালিকা শক্তি হারিয়ে ফেলে।

www.pathagar.com

চতুর্থতঃ নগরের বস্তিবাসীরা দরিদ্র। যারা নগরে বাস করেও নগর জীবনের সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত যেমন, বিশুদ্ধ খাবার পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, জ্বালানী, শিক্ষা ও চিকিৎসা। সম্পদের ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও বন্টনের পরিপ্রেক্ষিতে দারিদ্র্যের প্রধানতঃ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দুইটি কারণ রয়েছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সম্পদের ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও বন্টনের দুর্বলতার জন্য পরিবেশের অবক্ষয় হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক যে সকল কারণে পরিবেশের অবক্ষয় হয় সেগুলো হচ্ছে, সম্পদে সীমিত অধিকার যেমন অসব ভূমি বন্টন, ঋণ সুবিধাদি, পানি ও জ্বালানী ব্যবহারের বৈষম্য। প্রাকৃতিক কারণে; পরিবেশ/ প্রতিবেশগত নাজুক এলাকায় আবাসস্থল যেমন উপকূলীয় এলাকায় বা পাহাড়ী এলাকায় আবাসস্থল। এছাড়া অধিক জনসংখ্যার চাপ এবং নগরায়ন সম্প্রসারণ শুধু পরিবেশ দুষণ করছে না অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবেশগত বিপর্যয়ের মুখে দেশও জাতিকে ঠেলে দেয়। আন্তর্জাতিক কারণের মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৈষম্য, শিক্ষা, শিল্প ও প্রযুক্তির বিকাশের ও প্রয়োগের বৈষম্য।

অসম দারিদ্র চিত্র

World Development Report, ২০০০-০১ এর তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে প্রায় ৬০০ কোটি মানুষ পৃথিবী জুড়ে বাস করছে। আর এ জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের (২৮০ কোটি) মাথা পিছু দৈনিক আয় ২ ডলারের নীচে। দৈনিক ১ ডলারের কম আয় নিয়ে জীবনযাপন করছে সারা দুনিয়ার এক-পঞ্চমাংশ মানুষ (প্রায় ১২০ কোটি)। আর এ হিসেবে শুধুমাত্র দক্ষিণ এশিয়াতেই ১ ডলারের নিচের আয় নিয়ে গোটা পৃথিবীর ৪৪ শতাংশ মানুষ বাস করছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) প্রকাশিত Household Expenditure Survey, ১৯৯৫/৯৬ অনুযায়ী দৈনিক মাথাপিছু ২১২২ কিলো ক্যালরী গ্রহণ পরিমাপে ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৪৭.১ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে এবং দৈনিক ১৮০৫ কিলো ক্যালরী গ্রহণ পরিমাপে ২৪.৬ শতাংশ জনগোষ্ঠী ছিল চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে। ১৯৮৩/৮৪ অর্থ বছরে গ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল ৬১.৯ শতাংশ এবং ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে তা নেমে আসে ৪৭.১ শতাংশ। ১৯৮৩/৮৪ এবং ১৯৯০/৯১ অর্থ বছরে গ্রাম অঞ্চলে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল যথাক্রমে ৩৬.৭ শতাংশ এবং ২৮.৩ শতাংশ। অপরদিকে ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে শহর অঞ্চলে ৪৯.৭ দরিদ্র এবং ২৭.৩ শতাংশ চরম দরিদ্র ছিল। যেখানে ১৯৮৩/৮৪ এবং ১৯৯১/৯২ অর্থ বছরে শহর অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬৭.৭ শতাংশ। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় দারিদ্র্য হার ধীরে হলেও কমছে। তবে মোট সংখ্যার দিক থেকে দরিদ্র মানুষের উপস্থিতি এখনও বিপুল।

তবে, একথা ঠিক চরম দারিদ্র্যের পরিমাপে বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বলা যায় যে, অনেকটা আশির দশকের তুলনায় নব্বই দশকে দারিদ্র্য পরিস্থিতির সার্বিক উন্নতি

www.pathagar.com

হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। দারিদ্র্য বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের ধারণা দারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা হালে চল্লিশ শতাংশের কাছাকাছি চলে এসেছে। ইউএনডিপি-বিআইডিএস প্রকাশিত Bangladesh Human Development Report ২০০০- এ গ্রাম ও শহর ভেদে দারিদ্র্যের অর্থাৎ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর এক হিসেবে দেখা যায় ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে শহরাঞ্চলে এ হার ছিল ৯.৬ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে তা ছিল প্রায় আড়াই গুন বেশি অর্থাৎ ২৩.৮ শতাংশ। ক্রমবর্ধমান এ সামাজিক অসমতা উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফসল দরিদ্র জনগোষ্ঠির কাছে পৌছানো মারাত্মক বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই দারিদ্র্যের আচরণ ও হয়ে উঠেছে পরিবেশ বিপন্নকারী।

দারিদ্র্য ও পরিবেশ সম্পর্ক

দারিদ্র্য পরিবেশকে মূলতঃ দুইভাবে প্রভাবিত করতে পারে। প্রথমত ঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চতুপার্শ্বের অবস্থান পরিবেশগতভাবে নাজুক ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে থাকে। কারণ এসব এলাকায় দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার সহজ যদিও স্বাস্থ্য ঝুঁকি অত্যন্ত বেশী ও ভয়াবহ। দ্বিতীয়তঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদের স্বল্পতা অথবা সম্পদের অংশীদারিত্বের সীমাবদ্ধতার ও বিকল্প জীবিকা নির্বাহের অভাবের ফলে সহজলভ্য সীমিত সম্পদ এমন তীব্রভাবে আহরণ করে, যার ফলে সম্পদের অবক্ষয় ও পরিবেশ বিপন্ন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশে পরিবেশ ও দারিদ্র্য পারস্পরিক একটি অপরটিকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। তাই উন্নয়ন চিন্তায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যাবশ্যকীয়ভাবে বিবেচনায় আনা জরুরী। চিত্র ১.১ এ পরিবেশ ও খাদ্যচক্র বিশ্লেষণে তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে।

চিত্র ১.১ : পরিবেশ ও খাদ্য চক্র

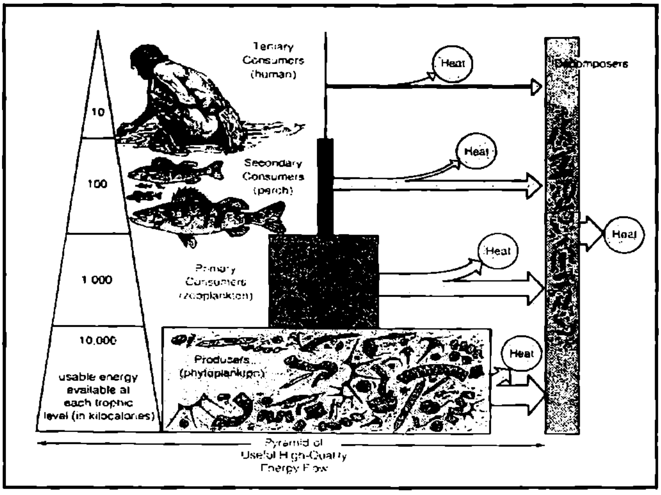

উৎস ঃ Miller, 1992

www.pathagar.com

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গ্রামীণ লোকজন তাদের জীবিকা আহরণের প্রধান এবং প্রত্যক্ষ উৎস হচ্ছে; ভূমি, পানি, বন, মৎস্য এবং অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদ। এসব সম্পদের পরিমান ও গুণ যেদিকেই হ্রাস বা অবক্ষয় হোক না কেন তাতে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী। প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, আহরণের তীব্রতা ও টেক্‌সই ব্যবস্থাপনায় সরকারী নীতির প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের সুফল ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সুষম বন্টনের ক্ষেত্রে সরকারী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রভাব রয়েছে। সুষম ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাবে দারিদ্র্য ও পরিবেশ কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে এ বিষয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হলো ঃ

ভূমি অবক্ষয়

ভূমি বাংলাদেশের কৃষি নির্ভরশীল বিশাল জনগোষ্ঠীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সম্পদ, সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকলেও একথা সত্য আমাদের দেশে দ্রুত ভূমি অবক্ষয় হচ্ছে। এর উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হচ্ছে, বন নিধন, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং অপরিকল্পিত চিংড়ি চাষের ফলে জমিতে লবণাক্ততা বেড়ে উপকূলীয় প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বন নিধনের ফলে পলি ও পাথর জমে নদীনালা ও জলাভূমি ভরাট হয়ে জলধার ও মৎস্য সম্পদ ও পশুপাখিসহ্ মানব সম্পদের খাদ্য চক্র বিপন্ন হয়ে পড়েছে। অপরিকল্পিত উন্নয়নের নামে কৃষি ক্ষেতে ইটের ভাটা করার ফলে মাটি দূষণসহ ছোট-খাটো জলাশয়গুলোর অস্তিত্ব আজ প্রায় বিপন্ন। যা ক্রমাগত কৃষি ভূমি মরুময়তার চেয়ে মারাত্মক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। সিরডাপের ১৯৯৪ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশের ১.২ মিলিয়ন হেক্টর ভূমির সাল্‌ফার ঘাটতি ১.৬ বিলিয়ন ভূমির জিঙ্ক ঘাট্‌তি দেখা দিয়েছে। তাছাড়া প্রায় ৬০ শতাংশ জমিতে ২ শতাংশেরও কম জৈব পদার্থ রয়েছে।

নদী ভাঙ্গনজনিত দারিদ্র

নদী মাতৃক দেশ বাংলাদেশ। বড় বড় নদীগুলোর দু'ধারের জনগোষ্ঠীর ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়ে আজ ছিন্নমূল। সচ্ছল পরিবারগুলো পূর্বের সঞ্চয় দিয়ে কোন মতে টিকে থাকতে পারলেও প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র ভূমির মালিকরা শহরে পাড়ি জমায় এবং বস্তি এলাকায় আশ্রয় নেয়। ১৯৯১ সালের টাস্ক ফোর্স রিপোর্টে দেখা যায় যে, নদী ভাঙ্গন এলাকা গুলোতেই দারিদ্র্য বেশী। ১৯৯২-৯৫ সালের দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, মোট ৭৬ ঘন্টার প্রাপ্ত তথ্যে পদ্মা নদীর শাখা এলাকাগুলোতে প্রায় ৪৫.৪ শতাংশ তিস্তা যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র এলাকায় ৪৩.৮ শতাংশ কৃষি জমি নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যায় (আতিউর ২০০২)।

www.pathagar.com

জলমহাল ব্যবস্থাপনা, বিপন্ন জীববৈচিত্র্য ও দারিদ্র্য সংকট

জলমহাল ব্যবস্থাপনা অতি প্রাচীন কাল থেকে জেলা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বৃটিশ আমল থেকেই এর উদ্দেশ্য সরকারের রাজস্ব আয় বাড়ানো। পূর্ববর্তী সরকারগণ জনকল্যাণের কথা বিবেচনা করে সমবায় সমিতির মাধ্যমে জলমহাল লিজ দেয়ার নীতি গ্রহণ করেছিল। দুর্ভাগ্য এ পদ্ধতি জাল যার জলা তার তা কার্যকরী করতে সম্ভব হয়নি। ফলে দুঃস্থ জেলেরা ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতে লাগল। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে খোলা দরপত্রের মাধ্যমে জলাভূমি ও খালবিলগুলোর লিজ দেয়ার পদ্ধতি চালু হয়। কিন্তু তাতে কি অবস্থার কোন উন্নতি হয়েছে? ১৯৯৭ বি আই ডি এস এর সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ৬৬.৭ শতাংশ জলমহাল সরকারী সমর্থকদের কাছে লিজ দেয়া হয়েছে। বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অসহায় জনপ্রশাসন ও নিজেদের অবস্থান সংহত রাখার জন্য দুঃস্থ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চেয়ে দলীয় নেতা কর্মীদের প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এহেন অবস্থাতে লিজ গ্রহিতাগণ নির্বিচারে মাছ ধরে জীববৈচিত্র্যকে বিপন্ন করে তুলেছে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় গরীব অধিবাসীদের মাছ ধরা তো দূরের কথা হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল পর্যন্ত প্রবেশ করা নিষেধ। এভাবে মাছ চাষের ফলে অদূর ভবিষ্যতে গ্রামীন মানুষের সহজলভ্য পুষ্টি হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা ও স্বাস্থ্য উভয়ই আজ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন।

বৃক্ষ নিধন ও দারিদ্র্য

বৃক্ষ নিধন নানাবিধভাবে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটায় এবং দারিদ্র্য সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে বন নিধন করে জমি চাষের আওতায় আনা হয়। এ ক্ষেত্রে তীব্র চাষাবাদের ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। এছাড়াও মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে জ্বালানী সরবরাহের ক্ষেত্রে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, এ দেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ লোক কাঠ ও চারকোল জ্বালানীর উপর নির্ভরশীল। তাই বৃক্ষ নিধন মানে জ্বালানী নিরাপত্তা সংকট সৃষ্টি। এফ এ ও'র ১৯৯৫ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, কাঠ জ্বালানীর পরিমাণ বাংলাদেশে ১৯৮২ সালে ৯.৫ শতাংশ থেকে ১৯৯২ সালে ১২.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে । কাঠ শুধু জ্বালানী ও টিম্বার ছাড়াও নানাবিধ সামাজিক এবং প্রতিবেশগত কার্যাদি করে থাকে। বন জীব বিচিত্রার আবাসস্থল ও জীবিকা সরবরাহের উৎস এবং বনবাসীদের সাংস্কৃতিক সংহতি রক্ষা করে। বাংলাদেশে ১৯৬২ সালে মোট ভূমির ২০ শতাংশ বণাঞ্চল ছিল। ১৯৮৬ সালের পরিসংখ্যানে তা কমে ১৫ শতাংশতে দাঁড়ায়। বাস্তবে গাছপালা রয়েছে এমন বনাঞ্চল এলাকা ৬-৭ শতাংশের বেশী হবে বলে মনে হয় না। তবে সাম্প্রতিককালে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বন সৃজন ও দারিদ্র্য মোচন হচ্ছে নিঃসন্দেহে ।

www.pathagar.com

প্রাকৃতিক দুর্যোগ (আবহাওয়া পরিবর্তন) ও দারিদ্র্য

বাংলাদেশ দারিদ্র পীড়িত ও দুর্যোগপূর্ণ দেশ বলে সর্বত্র পরিচিত। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, সাইক্লোন, খরা, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন এ দেশে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। হালে ভূমিকম্পও এ দেশের জনগোষ্ঠিকে আরো আতংকিত করে তুলেছে। ১৯৯১ সালের সাইক্লোনে ৩ লাখ লোক মারা যায়, ১৯৮৫ সালে ১৯ হাজার গৃহহারা এবং নিঃস্ব করে আরো লাখ লাখ মানুষকে। ১৯৮৭, ৮৮ সালের বন্যায় মৃত্যুর সংখ্যা কমহলেও ধ্বংস করে দেয় দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে না পেতেই ১৯৯৮ ও ২০০৪ সালের ন্যায় দীর্ঘ বন্যা দেশের অর্থনীতির ভিত্তিকে আবার কাঁপিয়ে দেয়। নিম্ন আয়ের মানুষকে সর্বহারা ও নিঃস্ব করে দেয় সে সাথে বিপন্ন করে দেয় দেশের সুন্দর পরিবেশকেও।

১৯৯৮ সালে বিইউপি এর সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ৬.৭ শতাংশ জনগোষ্ঠী ঢাকা শহরে এসেছে দুর্যোগপূর্ণ এলাকা থেকে। দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার অন্য দিকটি হলো আবহাওয়া পরিবর্তন, বাংলাদেশ মারাত্মকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ বলে চিহ্নিত। আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে এ দেশের জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি বাড়বে, সমুদ্র স্ফীত হয়ে লবণাক্ততা পানির অনুপ্রবেশ, প্রতিবেশগত পরিবর্তনের ফলে জীববৈচিত্র হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তার হুমকি সর্বোপরি বিপন্ন হয়ে যাবে টেক্‌সই উন্নয়ন কর্মকান্ড। এভাবে দারিদ্র ও বিপন্ন পরিবেশ অঙ্গাঅঙ্গিকভাবে সম্পৃক্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিক্রমায়।

দরিদ্র ও দারিদ্র্যাবস্থাঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

এক কথায় দরিদ্রের সংজ্ঞা না জানলেও আমরা দরিদ্রকে চিহ্নিত করতে পারি অতি সহজেই। দারিদ্র্যকে চিহ্নিত করতে প্রথমেই খাদ্যের অভাবকে ধরে নেয়া হয়। আমাদের দেশে সাধারণত যারা সারা বছর তিন বেলা পেট পুড়ে খেতে পায়না তাদেরকেই দরিদ্র বলা হয়ে থাকে। আবার কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখেও দরিদ্র অবস্থা বুঝা যায়। মানুষের জীবন ধারণের জন্য মৌলিক চাহিদা পুরণের জন্য যাদের প্রয়োজনীয় গরম কাপড় বা শীত বস্ত্র নেই তাদেরকে গরীব বলা হয়। গরীব অবস্থা আরও পরিস্কারভাবে প্রকাশ পায় বাড়ী ঘরের অবস্থা দেখেও যা অবশ্য জীবনের মৌলিক চাহিদার অন্যতম উপাদান, যেমন থাকার ঘর, পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ খাবার পানির সংস্থান ইত্যাদি। গ্রামে যারা মাটির ঘর বা কুঁড়ে ঘরে বাস করে তাতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার ব্যবস্থা নেই, সুপেয় পানি পান করার ব্যবস্থা নেই, তাদেরকেই গরীব বলা হয়ে থাকে ।

গ্রাম এলাকায় আর্থিক দুরবস্থার কারণ হলো পরিবারের উপার্জনের যে প্রধান অবলম্বন ভূমি তা তাদের অনেকের নেই বা থাকলেও তা অতিঅল্প যা দিয়ে মৌলিক চাহিদা মিটানো কিছুতেই সম্ভব নয়। এজন্যে আমাদের সমাজে ভূমিহীনদেরকে দরিদ্র বলা হয়ে থাকে। তাদের সাথে আরও যাদেরকে এ গ্রুপের অন্তর্ভূক্ত করা হয়, তারা হলো প্রান্তিক ভূমি মালিক (আধা একরের নীচে)। বাস্তবে স্বাভাবিক সংজ্ঞায় আধা একরের নিম্নে জমির মালিকদেরকে

www.pathagar.com

ভূমিহীন বলা হয়। সাধারণত দরিদ্র তারাই যাদের মোট জমি আধা একরের নীচে এবং যাদের আয়ের একটা বিরাট অংশ শ্রম-মজুরী। মোট কথা, ভূমি বা অন্যান্য উৎস থেকে আয়ের সংস্থান না থাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানসহ জীবন ধারণের মৌলিক চাহিদা পুরণের সংস্থান না থাকার আবস্থাকে দারিদ্র্য বলা হয়ে থাকে ।

দারিদ্র্য পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. কাশেম তাঁর গ্রন্থে এক বিশ্লেষণে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে সরকারী ভাবে গৃহীত 'দরিদ্র' সংজ্ঞা দু'ভাগে পরিমাপ করা হয়। একটি হলো পারিবারিক আয়ের সীমা এবং দ্বিতীয়টা হলো মাথাপিছু দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ। এর প্রতিটি ক্ষেত্রে আবার দুটো সীমারেখা নির্ধারিত করা হয়েছে। নিম্ন সীমারেখার নীচে যারা বাস করছে, তাদেরকে চরম দরিদ্র (Hard-core Poverty) এবং উর্ধ্ব রেখার নীচে যাদের অবস্থান তাদেরকে স্বাভাবিক দরিদ্র (General Poverty) বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। খাদ্য গ্রহণের মাত্রা দিয়ে দরিদ্র চিহ্নিত করতে গড়ে দৈনিক জন প্রতি ১৮০৫ কিলো ক্যালরী এবং স্বাভাবিক দরিদ্রের ক্ষেত্রে এ মাত্রা বৃদ্ধি করে ২১২২ কিলো ক্যালরী ধরা হয়ে থাকে। উল্লেখিত এ দুই মাত্রার খাদ্য শক্তি পূরণে যে খাদ্য ব্যয় হয় তা সহ মৌলিক চাহিদার অন্যান্য ব্যয় যোগ করে নিম্ম ও উচ্চ দারিদ্র্য আয় সীমারেখা নির্ধরিণ করা হয়। এ আয় রেখা দ্রব্যমূল্য ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণে উপকরণের মূল্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে নিয়মিত পরিবর্তন প্রয়োজন। পরিবর্তিত অবস্থায় কোন সময়কালের সঠিক প্রবণতা বুঝাতে সীমারেখার সংশোধন করাও প্রয়োজন।

তবে অনেকেই মনে করে যে, এরূপ পরিমাপ পদ্ধতি সঠিক নয় যেহেতু এ ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদে মানব সম্পদ উন্নয়ন যথা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং নারীর ক্ষমতায়নকে বিবেচনায় আনা হয়না। এ কারণে দারিদ্র্যকে সার্বিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে নানা রকমের Quality Index তৈরী করা হচ্ছে এবং সেভাবেই বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে তা ব্যখ্যা করার চেষ্টা করা হচেছ।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি প্রচলিত প্রথা অনুসারে দুই ভাবে দেখানো হয়ে থাকে। প্রথমটি প্রত্যক্ষ ক্যালোরী গ্রহণ পদ্ধতি অনুযায়ী এবং দ্বিতীয়টি মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে। দরিদ্রদের সংখ্যা এ দুয়ের মাপে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে এবং দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী দরিদ্র সংখ্যা কিছুটা বেশী হয়।

প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ পদ্ধতিতে দারিদ্র্যের পরিমাপ

বিবিএস এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে বিগত এক দশকে বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি হয়নি (সারণী ১.১)। যদিও ২০০০ সালে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে বলে দেখা যায়, তবে তা স্থায়ী কিনা বুঝতে আরও বিশ্লেষণ ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন পরিসংখ্যান ব্যুরোর আয় ব্যয় জরিপ (২০০৩) অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ লোক চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে। আর স্বাভাবিক পরিমাপে দরিদ্রের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪৪ শতাংশ। এ জরিপ অনুযায়ী

www.pathagar.com

পল্লীতে দরিদ্রের সংখ্যা কম। অপরদিকে দিকে দেখা যাচ্ছে যে, দেশে গড়ে খাদ্য শক্তি গ্রহণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি। শহরে দারিদ্র ২০০০ সালের দিকে সামান্য বৃদ্ধি পেলেও পল্লীতে বাড়েনি।

সারণী ১.১: বাংলাদেশে দরিদ্র এবং চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা (শতকরা হিসেবে)

সাল	পল্লী		শহর		বাংলাদেশ		মাথাপিছু গড়ে দৈনিক ক্যালরী গ্রহণের মাত্রা		
	দরিদ্র	চরম দরিদ্র	দরিদ্র	চরম দরিদ্র	দরিদ্র	চরম দরিদ্র	পল্লী	শহর	বাংলাদেশ
১৯৮৮-৮৯	৪৭.৭৭	২৮.৬৪	৪৭.৬৩	২৬.৩৮	৪৭.৭৫	২৮.৩৬	২২১৭	২১৮৩	২২১৫
১৯৯১-৯২	৪৭.৬৪	২৮.২৭	৪৬.৭০	২৬.২৫	৪৭.৫২	২৮.০০	২২৬৭	২২৫৮	২২৬৬
১৯৯৫-৯৬	৪৭.১১	২৪.৬২	৪৯.৬৭	২৭.২৭	৪৭.৫৩	২৫.০৬	২২.৬৩	২২০৮	২২৫৪
২০০০	৪২.২৮	১৮.৭২	৫২.৫০	২৫.০২	৪৪.৩৩	১৯.৯৮	২২৬৩	২২৫০	২২৪০

Source: BBS, ২০০৩ ও ড. কাশেম, ২০০৫

মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতিতে দারিদ্র্য নিরূপন

জীবন ধারণের মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতি অনুসরণে বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়েছে মাত্র ১৯৯৫/৯৬ এবং ২০০০ সালে। নিম্ন ব্যয় দারিদ্র্য রেখার ভিত্তিতে মাসিক জাতীয় আয় নিরূপন করলে নিম্ন রেখার আয় দাড়ায় ৪৯৫.১৯ টাকা এবং উর্ধ্ব রেখার আয় ৫৭৩.৭২ টাকা। তবে দ্রব্য মূল্যের পার্থক্যের কারণে অঞ্চলভেদে এ অংকে কিছুটা পার্থক্য হতে পারে। পর্যালোচনায় দেখা যায় পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্য রেখার আয় সীমা শহরের আয়ের তুলনায় কম (সারণী ১.২) এবং তা স্বাভাবিক কেননা শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশী (ড. কাশেম, ২০০৫)।

সারণী ১.২: দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের মাথাপিছু মাসিক আয়ের সীমা (মৌলিক চাহিদার ব্যয় অনুসারে) (টাকা)

এলাকা	নিম্ন আয় রেখা			উর্ধ্ব আয় রেখা		
	সারাদেশে	পল্লী	শহর	সারাদেশে	পল্লী	শহর
বরিশাল	৫৪৫.৩২	৫৩৯.৪২	৬৩৮.৭২	৫৮৩.০৭	৫৬৩.৬৫	৭৯৫.৯৫
চট্টগ্রাম	৫২২.৫৬	৪৯৭.৪৯	৬৫৭.৫৭	৬১৯.৩৯	৫৯৩.১৫	৭৬২.৩৭
ঢাকা	৪৭৫.৭৩	৪৬৭.৬৩	৫৩৩.৭৯	৫৪৯.৯৫	৫১৫.০৩	৬৮৪.৪২
খুলনা	৫৪৩.৪৬	৫৩২.৩৩	৬২৫.৯৪	৬৪১.০৭	৬২৫.৮৫	৭৩৪.৫০
রাজশাহী	৪৬৮.৮৯	৪৬৪.৫৫	৫১৪.৬০	৫২৬.৪৪	৫১৩.৯৫	৬৩৯.৯৪
সারাদেশ	৪৯৫.১৯	৪৬৪.৫৫	৫৭৭.৭৪	৫৭৩.৭২	৫৫০.৮২	৭০৫.৯৫

উৎসঃ বিবিএস, ২০০৩ ও ড.কাশেম, ২০০৫

www.pathagar.com

জীবন ধারণের মৌলিক চাহিদার ব্যয় অনুসারে নিম্ন দারিদ্র্য রেখার নীচে দেশের প্রায় ৩৪ শতাংশ জনগোষ্ঠী বাস করে। গ্রামাঞ্চলে শহরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য পীড়িত। উচ্চ দারিদ্র্য সীমা অনুসরণ করলে বাংলাদেশে অভাবী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ (সারণী ১.৩) এবং শহরের তুলনায় গ্রামে প্রায় দেড় গুণ। তবে সারাদেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা এক নয়। তবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সবচেয়ে অধিক দরিদ্রগ্রস্থ জনগোষ্ঠী বাস করে রাজশাহী বিভাগে এবং সর্বনিম্ন চট্টগ্রাম বিভাগে (নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী)। উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী সবচেয়ে কম জনগোষ্ঠী হলো বরিশাল বিভাগে। মৌলিক চাহিদা অনুযায়ী গ্রামের অধিকতর জনগোষ্ঠী অভাবগ্রস্থ (ড. কাশেম,২০০৫)। মোট কথা দারিদ্র্য অবস্থা গ্রামেই প্রকট। চিত্র ১.২ দারিদ্র্য, অপুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্কটি স্পষ্টতই দৃশ্যমান।

চিত্র ১.২ : দারিদ্র্য, অপুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্ক

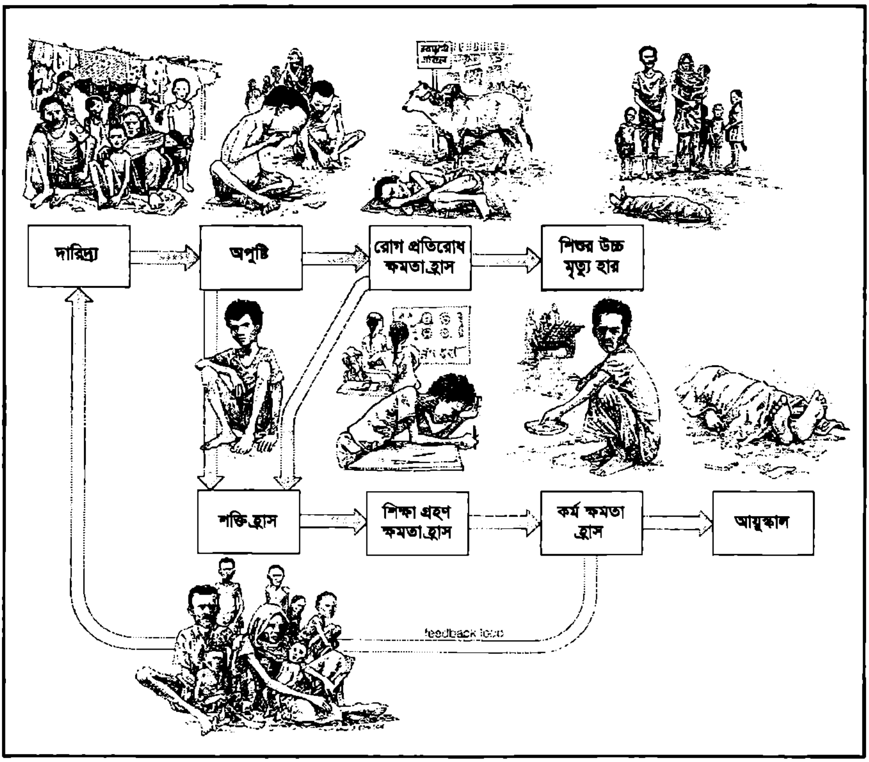

উৎস ঃ Miller, 1992

www.pathagar.com

সারণী ১.৩: মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় ও আঞ্চলিক দরিদ্রের সংখ্যা

(জনগোষ্ঠীর শতকরা হার)

বিভাগ	নিম্ন দারিদ্র্য সীমা রেখা অনুযায়ী			উচ্চ দারিদ্র্য সীমা রেখা অনুযায়ী		
	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর	মোট
বরিশাল	২৯.৬	১৯.৫	২৮.৮	৪০.০	৩৭.৯	৩৯.৮
চট্টগ্রাম	২৫.৩	২৩.৩	২৫.০	৪৮.৪	৪৪.০	৪৭.৭
ঢাকা	৪১.৭	১২.০	৩২.০	৫২.৯	২৮.	৪৪.৮
খুলনা	৩৬.৮	২৭.৫	৩৫.৪	৫২.২	৪৭.১	৫১.৪
রাজশাহী	৪৮.৮	৩২.৩	৪৬.৭	৬২.৮	৪৮.১	৬১.০
বাংলাদেশ	৩৭.৪	১৯.১	৩৩.৭	৫৩.১	৩৬.৬	৪৯.৮

উৎসঃ বিবিএস, ২০০৩।

উপরের সারণীর পরিমাপ থেকে দারিদ্র্যের সঠিক মাত্রা বুঝা কঠিন। দরিদ্র শ্রেণী কতটুকু দরিদ্র তা বুঝতে 'শ্রেণীভুক্ত দারিদ্র্য পরিমাপ' ব্যবহার করা হয় যা 'দারিদ্র্য সীমা থেকে দুরত্ব' (Poverty Gap) পরিমাপ হিসেবে সুপরিচিত। এ পরিমাপও দারিদ্র্যের গভীরতা বিশ্লেষণে যথেস্ট নয়। তার জন্য যে পরিমাপ ব্যবহার করা হয় তা হলো দারিদ্র্য সীমা থেকে দুরত্বের বর্গ, যাকে সাধারণত (Poverty Gap) পরিমাপ হিসেবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে (মুজেরী, ১৯৯৯)। কোন এলাকায় দারিদ্র্য সীমা থেকে দুরত্বের বর্গ পরিমাপের বৃদ্ধি অতি দরিদ্র শ্রেণীর অবস্থার ক্রমাবনতি নির্দেশ করে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০০০ সালের আয়-ব্যয়ের হিসেব অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে উচচ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে স্বাভাবিক দারিদ্র্য ব্যবধান হলো ১২.৯ (পল্লীতে ১৩.৮ এবং শহরে ৯.৫) এবং দারিদ্র্য গভীরতা হলো ৪.৬ (পল্লীতে ৪.৯ এবং শহরে ৩.৪) (অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০০৩)। বিগত এক দশকে দারিদ্র্যের মাত্রা হ্রাস পেয়েছে, তবে তার লক্ষমাত্রা অনুসারে সন্তোষজনক নয় বলে পরিলক্ষিত হয়, হ্রাসের গতি ১.৮% (সারণী ১.৪)। শহরের অগ্রগতি কিছুটা ভাল হলেও এখানে যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে দেশে দারিদ্র্য ব্যবধান কমেছে, তবে আয় বৈষম্য বেড়েছে অধিক।

www.pathagar.com

সারণী ১.৪: দারিদ্র্য প্রবণতা এবং বৈষম্যের মাত্রা

	১৯৯১/৯২	২০০০	পরিবর্তন(%)
(ক) দারিদ্র পীড়িত লোকের সংখ্যা			
জাতীয়	৫৮.৮	৪৯.৮	(-)১.৮
গ্রাম	৬১.২	৫৩.০	(-)১.৬
শহর	৪৪.৯	৩৬.৬	(-)২.২
(খ) দারিদ্র্য সীমা থেকে ব্যবধান (শতাংশ)			
জাতীয়	১৭.২	১২.৯	(-)২.৯
গ্রাম	১৮.১	১৩.৮	(-)২.৮
শহর	১২.০	৯.৫	(-)২.৫
(গ) চরম দারিদ্র্যের গভীরতা (FGT সূচক)			
জাতীয়	৬.৮	৪.৬	(-)৩.৮
গ্রাম	৭.২	৪.৯	(-)৩.৮
শহর	৪.৪	৩.৪	(-)২.৭
(ঘ) আয় বৈষম্য (গিনি ইনডেক্স)			
i) জাতীয়	০.২৫৯	০.৩০৬	২.১
ii) গ্রাম	০.২৪৩	০.২৭১	১.৪
iii) শহর	০.৩০৭	০.৩৬৮	২.৩

Source: Ministry of Finance, ২০০২ ও ড. কাশেম,২০০৫

গ্রামীণ পারিবারিক আয়ের উৎস

গ্রামে বসবাসকারী পরিবারের আয় অত্যন্ত সীমিত ও অপর্যাপ্ত। বড় জোতদারদের আয় কিছুটা বেশী হলেও তবে তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম। ইদানিং যে সমস্ত পরিবারের কোন সদস্য বিদেশে কর্মরত এবং দেশে নিয়মিত অর্থ প্রেরণের ফলে তাদের বার্ষিক আয় খানিকটা উন্নত হয়েছে। বিবিএস, ২০০১ এর হিসেব পারিবারিক মাসিক জাতীয় আয় ৫,৮৪২ টাকা এবং গ্রামের পরিমান ৪,৮১৬ টাকা। বিগত এক দশকে মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৪% হলেও গ্রামের ক্ষেত্রে কিছুটা কম (সারণী-১.৫)।

সারণী-১.৫ নির্দিষ্ট তিনটি বছরে পারিবারিক মাসিক জাতীয়, গ্রাম ও শহরবাসীর আয় (নমিনাল)

বছর	মাসিক আয় (টাকা)			১৯৯১/৯২এর তুলনায় বৃদ্ধির হার (%)		
	জাতীয়	গ্রাম	শহর	জাতীয়	গ্রাম	শহর
২০০০	৫৮৪২	৪৮১৬	৯৮৭৮	৩৩.৮	৩১.৬	২৩.৯
১৯৯৫-৯৬	৪৩৬৬	৩৬৫৮	৭৯৭৩	৩০.৭	১৭.৬	৬৫.০
১৯৯১-৯২	৩৩৪১	৩১০৯	৪৮৩২	-	-	-

উৎসঃ বিবিএস, ২০০১

www.pathagar.com

দারিদ্র্য বিশ্লেষণে তথ্য ও পদ্ধতিগত কারণে আয়ের হিসেবে অনেক পার্থক্য রয়েছে। হোসেন, ২০০২ এর ৬২ গ্রামের জরীপের তথ্যানুসারে ২০০০-২০০১ সালে গ্রামীণ পারিবারিক বার্ষিক আয় ছিল ৭৮,১৫৬ টাকা; পক্ষান্তরে বিবিএস এর হিসেব অনুসারে তা দাঁড়ায় ৫৭,৭৯২ টাকার।

বিভিন্ন আয়ের উৎস পর্যালোচনা করে ড. কাশেম তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, বার্ষিক আয়ের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে মোট কৃষির হিস্যা ৪৮.৩% (হোসেন, ২০০২) তার মধ্যে ফসল থেকে আয় হয় ১৩.৩%। অকৃষি খাতের মধ্যে চাকুরীতে আয় হয় ২২% (সারণী-১.৬)। হোসেন তাঁর প্রবন্ধে যে বিষয়টি অতি স্পষ্ট করেছেন তা হলো ২০০০-০১ সালে ফসল ও কৃষি শ্রম মজুরীর আয়ের অংশের অস্বাভাবিক হ্রাস এবং অন্যদিকে অকৃষির প্রতিটি উপখাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি (হোসেন-২০০২)। এ পরিবর্তন স্বাভাবিক যেহেতু কৃষি ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই বললেই চলে। কাজেই নতুন শ্রম শক্তির অধিকাংশকেই অকৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত হতে হচ্ছে। তাই কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্য আর কৃষি নির্ভরশীল না হয়ে অকৃষিখাতকে সম্প্রসারণ করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

সারণী-১.৬ গ্রামীণ পারিবারিক আয়ের প্রধান উৎসসমূহ এবং বিগত দশকে বার্ষিক পরিবর্তন (শতকরা হিসেবে)

খাত/উপখাত	১৯৮৭-৮৮	২০০০-০১	বার্ষিক বৃদ্ধি
কৃষি:	৬৪.৪	৬৪.৪	৪৮.৩
শস্য	৪৬.৪	৩১.০	০.৪
শস্য ব্যতীত অন্যান্য কৃষি	৭.৭	১৩.৩	৮.৩
শ্রম মজুরী	১০.৩	৪.০	(-)৩.৮
অকৃষি:	৩৫.৬	৫১.৭	৬.৮
ব্যবসা বাণিজ্য	১৪.৫	২১.৩	৭.০
চাকুরী	১৫.৯	২২.১	৬.৫
শ্রম মজুরী ও অন্যান্য	৫.২	৮.৩	৭.৫

Source: Hossain, Mahabub, ২০০২

পারিবারিক ব্যয়

ড. কাশেম তাঁর গ্রন্থে এক বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, সাধারণত: আয়ের উপর ব্যয় নির্বাহ করে। বিবিএস, ২০০১ এর তথ্যানুযায়ী গ্রামে বার্ষিক মোট পারিবারিক ব্যয় দাঁড়ায় ৫১,০৮৪ টাকা আর খাদ্যসহ ভোগ্য পণ্যে ব্যয়ের পরিমাণ পরিবার প্রতি ৪৬,৫৪৮ টাকা বা ৯১.১% যা মোট আয়ের ৮০.৫%। শহরে এ হার কম (৭২.১২%) যেহেতু তাদের আয় বেশী। গ্রামাঞ্চলে খাদ্য ব্যয়ের শেয়ার মোট ভোগ্য-পণ্যের ৬০% (সারণী-১.৭)। লতিফ,

www.pathagar.com

২০০২ এর প্রবন্ধে উক্ত খাত সমূহে তার জরিপ এলাকায় ব্যয়ের পরিমাণ পেয়েছেন ৭২% এবং অন্যান্য ভোগ্য পণ্যে ২৮%। আয়ের বাকী অংশ উদ্বৃত্ত যা থেকে সামাজিক ও মামলার ব্যয় মিটানো হয় এবং যত সামান্য বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। গ্রামীণ পরিবারের উদ্বৃত্ত এতই অপর্যাপ্ত যে, এ বিনিয়োগ করতে প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক/অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ নিতে হয় বা কোন কিছু বিক্রি করা হতে পারে।

সারণী-১.৭ উৎস অনুযায়ী খাদ্যসহ ভোগ্য পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ

ব্যয়ের খাত/উপখাত	লতিফ,২০০৩	বিবিএস, ২০০০ (গ্রামাঞ্চলে)
খাদ্য:	৭১.৮	৫৯.২৯
ক. দানাদার খাদ্য	৩৬.৯	-
খ. অন্যান্য খাদ্য	৩৪.৯	-
ভোগ্য পণ্যাদি	২৮.২	৪০.৭
ক. কাপড়- জুতা	৭.৭	৬.৫৩
খ. নিত্য ব্যবহার্য	১৩.৩	-
গ. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য	৫.৬	১৮.২৩
ঘ. যাতায়াত	১.৫	-
ঙ. অন্যান্য	-	১৫.৯৪
মোট ব্যয় (টাকা)	৫৭১০৩.০	৪৬৫৩৮.০

Source: Hossain, Mahabub, ২০০২

মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণ

ড. কাশেম তার গ্রন্থে মাথাপিছু দৈনিক মোট খাদ্য গ্রহণের পরিমাপের জাতীয় চিত্র বর্ণনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ প্রধানত: বয়স, লিঙ্গ এবং পেশার উপর নির্ভর করে। তবে গড়ে সারাদেশে দেনিক মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ প্রায় ৯০০ গ্রাম (সারণী-১.৮)। এ মাত্রা ১৯৯৫/৯৬ এর তুলনায় সামান্য কম তবে ১৯৯১/৯২ এর তুলনায় কিছুটা বেশী। এ খাদ্যে ২০০০ সালে চালের পরিমাণ ছিল ৪৫৮.৫৪ গ্রাম এবং গম হলো মাত্র ১৭.২৪ গ্রাম। মাছ ও দুধের পরিমাণ যথাক্রমে মাত্র ৩৮.৪৫ এবং ৩০.০ গ্রাম। তাপশক্তির মাপে খাদ্যের পরিমাণ ছিল ২২৬৩ কিলো ক্যালরি যা শরীরের স্বাভাবিক প্রয়োজন (২১১২ কি. ক্যালরি) মিটাতে পারে মাত্র। খাদ্যে আমিষের পরিমাণ মাত্র ৬২ গ্রাম। লতিফ, ২০০২ তার গবেষণায় খাদ্য শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করেছেন ২৩৫৮ কি. ক্যালরি যা পূর্বের হিসেবের তুলনায় মাত্র ১০০ কি. ক্যালরী বেশী। তাই খাদ্য গ্রহণ পরিমাপের এক কোন মানদন্ডে বিচার করা যথেস্ট নয়।

www.pathagar.com

সারণী-১.৮ নির্দিষ্ট তিন বছর মাথাপিছু দৈনিক মোট খাদ্য ও আমিষ গ্রহণের পরিমাণ (গ্রাম)

বছর	জাতীয়		গ্রাম		শহর	
	খাদ্য	আমিষ	খাদ্য	আমিষ	খাদ্য	আমিষ
২০০০	৮৯৩.১	৬২.৫	৮৯৮.৭	৬১.৯	৮৭০.৭	৬৫.০
১৯৯৫-৯৬	৯১৩.৮	৬৫.০	৯১০.৫	৬৪.৪	৯৩০.৮	৬৭.৫
১৯৯১-৯২	৮৮৬.২	৬২.৭	৮৭৮.১	৬২.৩	৯৩৮.৪	৬৫.৫

Source: BBS, ২০০১. ও ড. কাশেম, ২০০৫

আঞ্চলিক দারিদ্র চিত্র

বাংলাদেশের দারিদ্রচিত্র সর্বত্র একই মাত্রায় নয়। গ্রামে দারিদ্র্যের মাত্রা শহরে তুলনায় বেশী। দারিদ্রচিত্র বৈষম্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলভেদেও তারতম্য রয়েছে। ড. কাশেম তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে দেশের বিভিন্ন জেলার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণে অভাবী অঞ্চলগুলো হলো ফরিদপুর, রংপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ এবং পাবনা। পক্ষান্তরে মোটামুটি ভাল অবস্থানে রয়েছে যশোহর, পটুয়াখালী, ঢাকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও খুলনা (বিআইডিএস, ২০০৩)। সার্বিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পাঁচটি জেলার মধ্যে রয়েছে যশোহর, ঢাকা, পটুয়াখালী, দিনাজপুর ও কুষ্টিয়া। দেশের খারাপ আর্থিক অবস্থানের জেলাগুলো মোটামুটি ভাবে বৈরী কৃষি পরিবেশ অঞ্চলগুলোতে অবস্থিত। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য বেশী থাকার বিষয়ে পরিবেশগত আঞ্চলিক তারতম্যেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশে দারিদ্রের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে দারিদ্র্য শুধুমাত্র আয় ও পুষ্টির ঘাটতি ছাড়াও আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত রয়েছে। দারিদ্র্যের কারণ বহুমাত্রিক, উল্লেখযোগ্য কারণগুলির মধ্যে হচ্ছে সম্পত্তি ও ভুমির অসম বন্টন, বিভিন্ন সেক্টরে কর্মসংস্থানের অভাব, কৃষি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগে মন্থর গতি, স্বল্প উৎপাদনশীলতা ও মজুরী, নিম্ন প্রবৃদ্ধির হার, সামাজিক সুবিধাসমূহে অসম প্রবেশাধিকার যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী ক্ষমতায়ন ও সুশাসন এবং অপর্যাপ্ত অবকাঠামো যেমন ভৌত অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি। দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক দিকের কতিপয় গুরূত্বপূর্ন দিক নিম্নে আলোচনা করা হল।

ভূমির মালিকানা ভিত্তিক দারিদ্র্য

ভূমির মালিকানা বৃদ্ধির সাথে দারিদ্র্য প্রবণতার ঋণাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, স্বল্প ভূমি মালিক এবং ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে দারিদ্র্যের মাত্রা সবচেয়ে বেশী এবং তা খুবই স্বাভাবিক। কারণ গ্রামে আয় বৃদ্ধির প্রধান এবং একমাত্র উৎস হলো কৃষি জমি। গ্রামীণ অর্থনীতির অবস্থা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে (সারণী ১.৯) উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী

www.pathagar.com

ভূমিহীন ৭১ শতাংশ দরিদ্র এবং এক থেকে চার শতক ভূমি মালিকদের মধ্যে ৬৪ শতাংশ দরিদ্র। পক্ষান্তরে মধ্যম ও বড় ভূমি মালিকদের মাত্র ২৪ এবং ৮ শতাংশ দরিদ্র। তবে তাদের মধ্যে বিশেষ করে বড় ভূমিমালিকদের মধ্যে দরিদ্র থাকার কথা নয়। এ বিষয়ে বিশদ গবেষণার অভাব রয়েছে এ জন্য আরও গবেষণা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

সারণী ১.৯: গ্রামে জমির মালিকানা ভিত্তিতে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা (শতকরা হিসেবে)

ভূমি মালিকানা (একর)	নিম্ন দারিদ্র্য	নিম্ন দারিদ্র্য
ভূমিহীন	৫৭.১	৭০.৬
০.০১-০.০৪	৪৮.১	৬৪.২
০.০৫-০.৪৯	৩৯.৮	৫৯.১
০.৫০-১.৪৯	৩০.৬	৪৭.৬
১.৫০-২.৪৯	২২.২	৩৫.৭
২.৫০-৭.৪৯	১২.৫	২৪.৪
৭.৫ এবং অধিক	৪.১	৮.১
সকল পরিবার	৩৭.৪	৫৩.১

উৎসঃ বিবিএস, ২০০৩

পেশাভিত্তিক দারিদ্র্যাবস্থা

দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক দিক রয়েছে যা আরো বিশ্লেষণ ও বিন্যাসের প্রয়োজন রয়েছে। ভূমিভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ছাড়া ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির অন্যান্য পেশা রয়েছে। তাই পেশাভিত্তিক দারিদ্র্য চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৯১/৯২ সালে গ্রামে কৃষি শ্রমিক পরিবারের শতকরা ৭১ জন দরিদ্র এবং এর পরের স্থান দখল করেছে জেলেরা যার সংখ্যা ৬০ শতাংশ। সবচেয়ে ভাল অবস্থানে রয়েছে চাকুরীজীবি পরিবার, যাদের মাত্র ১৪শতাংশ পরিবার দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে (সারণী ১.১০)। গ্রামে অকৃষি শ্রমিকদেরও আর্থিক অবস্থাও ভাল নয়। উল্লেখিত সারণী থেকে আরও পরিস্কার বুঝা যায় যে, একই পেশায় নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন বছরে দারিদ্র্য পীড়িত লোকের সংখ্যা বেশ পরিবর্তন হয়েছে।

অবশ্য এ অবস্থা নির্ভর করে পেশার উৎপাদনশীলতা, কর্মদক্ষতা এবং জরিপকৃত এলাকায় বার্ষিক জলবায়ু, বিদ্যমান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর। মাহবুব হোসেন, ২০০২ তাঁর এক গ্রামীণ সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন পেশার লোকদের মধ্যে কৃষি শ্রমিকদের বার্ষিক মোট কর্ম দিনের সংখ্যা মাত্র ১৭৫ দিন এবং উৎপাদনশীলতা সর্বনিম্নে (১.০৯ মার্কিন ডলার)। কাজেই তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই অভাবীর সংখ্যা সর্বাধিক। পক্ষান্তরে বিভিন্ন ব্যবসায়ে নিয়োজিতদের মধ্যে বার্ষিক গড়ে কাজ করে ২৪৪ দিন এবং তাদের উৎপাদনশীলতা ও কর্মদক্ষতা সর্বোচচ (সারণী ১.১১) বিধায় তাদের মধ্যে দরিদ্রদের সংখ্যা সর্বনিম্ন।

www.pathagar.com

সারণী ১.১০: গ্রামে প্রধান পেশা অনুযায়ী দারিদ্র্য প্রবণতা (১৯৮৩/৮৪ থেকে ১৯৯১/৯২)

দরিদ্র জনসংখ্যা (শতকরা হিসেবে)

প্রধান পেশা	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৮/৮৯	১৯৯১/৯২
মালিক চাষী	২৫.২০	১৯.১৯	২৪.০৬
বর্গা চাষী	৫৩.২০	৩৬.৪৭	৩৭.৩৩
কৃষি শ্রমিক	৬২.৫০	৬৬.৮২	৭১.০৪
ব্যবসায়ী	৪৩.৭৩	৩৭.৬৩	৪১.৪৪
অকৃষি শ্রমিক	৫৮.৬৭	৪০.৭৩	৫০.৪২
চাকুরীজীবি	৩২.৫২	১৭.৬৩	১৩.৭৭
শিল্প শ্রমিক	৫২.৩৭	৪৭.৯৪	৪০.৪২
জেলে	৪৩.৩৬	৩৫.২৫	৬০.০৭
অন্যান্য	৫২.৯৫	৫৬.৮৬	৫১.৭৩

উৎসঃ সেন, বি-১৯৯৭ ও ড. কাশেম

সারণী ১.১১: পেশাভিত্তিক বার্ষিক মোট কর্মদিন এবং দৈনিক উৎপাদনশীলতা (দৈনিক মার্কিন ডলার)

পেশা	বার্ষিক কর্মদিন (২০০১ সাল)	উৎপাদনশীলতা (দৈনিক মার্কিন ডলার
কৃষি শ্রমিক	১৭৫	১.০৯
শিল্প শ্রমিক	২০৯	১.০৯
রিক্সাচালক	২৫৯	১.৪০
নির্মাণ শ্রমিক	৫০	১.৫১
দোকানদারি	৩৫১	১.৩২
ব্যবসায়ী	২৪৪	২.৬৯
চাকুরীজীবি	২৪২	২.১৭
মোট	২১৭	২.০৩

উৎস ঃ হোসেন, মাহবুব, ২০০২।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দারিদ্র্যাবস্থা

মানব সম্পদ উন্নয়নের পূর্ব শর্ত শিক্ষা। শিক্ষার মান বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়, দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ে, সে সাথে বৃদ্ধি পায় কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধনের সুযোগ। এইভাবে চক্রাকারে শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সাথে দরিদ্র্যের প্রবনতা হ্রাস পায়। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সংগ্রহীত তথ্যে বিশ্লেষণে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় যে, অশিক্ষিত পরিবারে দারিদ্র পীড়িত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অধিক (৬৪.১%) এবং শিক্ষার সময়কাল বৃদ্ধির সাথে

www.pathagar.com

গরীব মানুষের সংখ্যা কমে (সারণী ১.১২)। বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা বৈচিত্র্যের একটি ভিন্ন দিক রয়েছে যেমন শিক্ষিত পরিবারই সাধারণতঃ বেশী ভূমি মালিক এবং তাদের অধিকাংশের পেশা অকৃষি এবং তা অনেক ক্ষেত্রেই চাকুরী ও ব্যবসা। ফলে গ্রামের লোকদের ভূমি সম্পদের অধিকার সীমিত হয়ে যায়।

সারণী ১.১২: পরিবার প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী গ্রামে দারিদ্র্য প্রবণতা (শতকরা হিসেবে)

শিক্ষাগত যোগ্যতা	নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী	উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী
শিক্ষার অবস্থা অনুযায়ী		
অশিক্ষিত	৪৭.০	৬৪.১
শিক্ষিত	২২.০	৩৫.৪
শিক্ষার স্তর অনুযায়ী		
লেখাপড়া জানেনা	৪৬.৮	৬৩.৮
চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত	৩০.২	৪২.৮
পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত	২৫.৯	৪০.২
এস.এস.সি পাশ	৯.৬	২১.৪

Source: BBS, 2003 ও ড. কাশেম

স্বাস্থ্যগত অবস্থা ও দারিদ্র্য প্রসঙ্গটি তথ্যের দুস্প্রাপ্যতা হেতু আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। পুষ্টিহীনতা, নিম্নমানের খাদ্য, অস্বাস্থ্যকর আবাসন ব্যবস্থা, অস্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাসন সুবিধা এবং সুপেয় পানির অভাবে দেশের বিরাট জনগোষ্ঠী নানাবিধ রোগ বালাইতে ভুগছে। এক্ষেত্রে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়না এবং অসুস্থতার জন্য অনেক কর্ম দিবসে কাজ করতেও সক্ষম হয়না ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত দারিদ্র্য

নিম্ন আয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত জন ছাড়াও দারিদ্র্যের আরও নানাবিধ কারণ রয়েছে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেও অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে যায়। অসুস্থতা ও অতিরিক্ত চিকিৎসা ব্যয় মিটাতে গিয়ে জমি-জমা বিক্রি করে অনেকেই অভাবগ্রস্থ হয়ে যায়। এছাড়াও পরিবারে উপার্জনক্ষম সদস্যের তুলনায় নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা অধিক হলেও তারা দরিদ্র হতে পারে। এখানে অবশ্য জমির পরিমাণ বেশী হলে এমনটা হবার কথা নয়। উন্নত এলাকায় ভৌত অবকাঠামো উন্নত বলে অকৃষি কাজের সুযোগ বেশী থাকে, সেখানে দরিদ্র জনসংখ্যা কম। তাছাড়া এসব এলাকায় দৈনিক মজুরীও অনুন্নত এলাকার চেয়ে স্বভাবত বেশী হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

দারিদ্র্য বিমোচনে কর্মকৌশল (PRSP)

বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম অঙ্গিকার হল মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা; দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং স্বাধীন সমাজের আদর্শ ও মূল্যবোধ লালন করা। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসন কৌশল। এই দলিলটি প্রনয়নে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যার্জনের (MDGs) এবং এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশের স্বাক্ষরিত দারিদ্র্য নিরসনে অংশীদারিত্ব চুক্তি (PAPR) তে অন্তর্ভূক্ত সামাজিক লক্ষ্যসমূহ ও বিবেচনায় রাখা হয়েছে। আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমাত্রা অর্ধেক করার উদ্দেশ্যে নিম্নে বর্ণিত লক্ষ্য সমূহ অর্জনের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে ঃ

* ক্ষুধা, দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য অনিশ্চয়তা এবং চরম নিঃস্বতা দূরীকরণের মাধ্যমে দারিদ্রের 'কুৎসিত রুপ' দূর করা ;
* দারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসরত জনগণের সংখ্যা ৫০ শতাংশ হ্রাস করা ;
* প্রাথমিক শিক্ষা উপযোগী বয়সের সকল বালক-বালিকার সার্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিত করা;
* প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা;
* নবজাতক শিশু ও অনূর্ধ পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুমৃত্যুর হার ৬৫ শতাংশ হ্রাস করা এবং শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা;
* মাতৃমৃত্যুর হার ৭৫ শতাংশ হ্রাস করা;
* সবার জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত করা;
* দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বিশেষত মহিলা ও শিশুদের প্রতি সামাজিক হিংসাত্মক কার্যকলাপ পুরোপুরি দূর করা সম্ভব না হলেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা;
* সমন্বিত দূর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, টেকসই পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিতকরণ এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় এ বিষয়গুলো সম্পৃক্ত করা।

বর্ণিত লক্ষ্য সমূহকে নিয়ে প্রক্ষেপিত প্রধান নির্দেশকগুলোকে নিম্নে প্রদর্শন করা হলো ঃ

সারণী ১.১৩: প্রধান প্রধান দারিদ্র ও সামাজিক নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা (বেঞ্চমার্ক সালঃ ২০০০)

নির্দেশক	১৯৯০	২০০০ (বেঞ্চমার্ক)	২০০৪	২০০৬	২০১০	২০১৫	২০০০-১৫ সাল মেয়াদে পরিবর্তন
আয়-দারিদ্র	৫৯	৫০	৪৫	৪৩	৩৫	২৫	-৩.৩
চরম দারিদ্র	২৮	১৯	১৫	১৩	৯	৫	-৪.৯
বয়স্ক সাক্ষরতা	৩৫	৫৬	৬৪	৬৯	৭৯	৯০	৪.০
প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি	৫৬	৭৫	৮১	৮৪	৯২	১০০	২.২
মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি	২৮	৬৫	৭১	৮০	৮৫	৯৫	৩.১
শিশু মৃত্যুর হার (আইএমআর) (হাজারে)	৯৪	৬৬	৫৬	৪৮	৩৭	২২	-৪.৪
অনূর্ধ ৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (হাজারে)	১০৮	৯৪	৮০	৭০	৫২	৩১	-৪.৫

www.pathagar.com

নির্দেশক	১৯৯০	২০০০ (বেঞ্চমার্ক)	২০০৪	২০০৬	২০১০	২০১৫	২০০০-১৫ সাল মেয়াদে পরিবর্তন
মাতৃ মৃত্যুর হার (এমএমআর) (হাজারে)	৪৮০	৩২০	২৯৫	২৭৫	২৪০	১৪৭	-৩.৬
প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল (বছর)	৫৬	৬১	৬৪	৬৬	৬৯	৭৩	১.৩
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	২.১	১.৬	১.৫	১.৫	১.৪	১.৩	---
কম ওজন সম্পন্ন শিশু	৬৭	৫১	৪৮	৪২	৩৪	২৬	-৩.৩

উৎস ঃ পরিকল্পনা কমিশন (২০০৪)

আমাদের দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে দারিদ্র্য পীড়িত পরিবারের কোন জমি ও সম্পদ নেই। তারা লেখাপড়াও তেমন জানেনা। তাদের কোন কারিগরি জ্ঞান কিংবা দক্ষতাও নেই। তাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কোন পূর্ব প্রস্তুতির জ্ঞান বা সামর্থ নেই। এমনকি তাদের নিয়মিত খাবারও মিলেনা। ফলে সর্বক্ষণ তারা দূর্বল এবং অনেকেই অসুস্থ থাকেন। তাদের প্রধান সম্বল হলো শ্রম শক্তি, তাও সকল সময় ব্যবহারযোগ্য নয়। এই বিরাট জনশক্তিকে কাজে লাগাতে হলে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক উদ্যোগের প্রয়োজন ।

বর্তমানে বাংলাদেশের অর্জিত স্বাভাবিক কৃষি ও অকৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির গতি এ ব্যাপক দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট সক্ষম নয় (রহমান ও সাহাবুদ্দীন, ১৯৯১)। তার প্রধান কারণ হলো শস্য খাতের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কর্মসংস্থানের প্রসারতা স্বল্প, যেহেতু ব্যবহৃত সকল কৃষি প্রযুক্তি শ্রম নিবিড়। অশস্য কৃষিখাত এ ক্ষেত্রে অধিকতর সফল বলে মনে করা হয়ে থাকে। এজন্যে কৃষিকে বহুমূখী করা এবং বাণিজ্যিকভাবে কৃষি কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। ড. কাসেম, ২০০২ এক গ্রাম জরিপে দেখতে পেয়েছেন যে গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র পোল্ট্রি, দুগ্ধ ও মৎস্য খামার এবং নার্সারি স্থাপনে নতুন কর্ম সংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি দ্রুততর হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে প্রাণীজ খাদ্যের মূল্য স্থিতিশীল বা হ্রাস পেতে পারে। তার ফলে জনগণের পুষ্টি গ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি ও কর্মক্ষমতার উন্নয়ন হবে। এছাড়াও পশু সম্পদ খাতে মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ হবে, এর ফলে পারিবারিক আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

www.pathagar.com

দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক খাতে বিনিয়োগ

এদেশের বিরাট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সেবা (যেমন বাসস্থান, পুষ্টি) খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি সংস্কার ও সম্প্রসারণ একান্তভাবে আবশ্যক। বিভিন্ন সেবার মান বিশেষতঃ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মান অতি নিম্ন বিধায় গরীব মানুষ আশানুরূপ উপকার পাচ্ছে না। বাস্তব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন সামাজিক বিনিয়োগের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবার দারিদ্র্য বিমোচন প্রভাব সর্বাধিক (অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০০৩), যা আরো জোরদার করা প্রয়োজন। কর্মসংস্থান বিষয়টি শুধু দেশের ভিতর সীমিত রাখলে হবে না এজন্যে প্রয়োজন দেশের বাইরে সম্ভাব্য সকল সুযোগ সুবিধাগুলি কাজে লাগানো। এ ক্ষেত্রে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের মিশনগুলির কর্মতৎপরতার মূল্যায়নের মাপ কাঠি হবে কে কতটুকু কর্মসংস্থান এবং কি পরিমান বিদেশী বিনিয়োগ দেশে আকৃষ্ট করতে পারেন। সাফল্য ও ব্যর্থতার বিবেচনায় পদ সৃষ্টি এবং অপ্রয়োজনে পদ বিলুপ্তির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

দারিদ্র্য বিমোচনে অবকাঠামো উন্নয়ন

গ্রামে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, বিদ্যুতায়নের প্রসার এবং মার্কেট স্থাপন তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর হওয়ার স্বল্প মূল্যে বিভিন্ন উৎপাদন উপকরণ ক্রয় এবং অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা সম্ভব। মার্কেট স্থাপিত হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটে, গ্রামের মানুষ নানা কাজ পায় এবং মজুরীসহ পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পায় (লতিফ, ২০০২)। অন্যদিকে বিদ্যুতায়নের ফলে গ্রামে-গঞ্জে ছোট-খাট নানারকম শিল্প-কারখানা গড়ে উঠতে পারে। এর ফলে নতুন নতুন কর্মের সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায় যে, সড়ক ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিহীন এলাকায় চরম দরিদ্রের সংখ্যা ২৫ শতাংশ পক্ষান্তরে সড়ক ও বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে এমন গ্রামে মাত্র ১৮ শতাংশ (সারণী ১.১৪)। এরূপ পার্থক্য স্বাভাবিক গরীবের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। কাজেই সরকার গ্রামে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং ইতোমধ্যে ফিডার সড়কসহ সারাদেশে দু'লাখ কিলোমিটার রাস্তা নির্মিত হয়েছে। ভৌত অবকাঠামোর সাথে প্রাতিষ্ঠানিক যেমন ব্যাংক, ক্লিনিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলে গ্রামীণ উন্নয়ন দ্রুততর হবে এবং দরিদ্র জনগণের সংখ্যা হ্রাস পাবে (লতিফ, ২০০২)। এ বিনিয়োগ প্রচেষ্টায় সরকারকে বিভিন্ন ব্যবস্থায় প্রাইভেট সেক্টরকে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ২০০৪ সালে Private Sector Infrastructure Guidline প্রণীত হয়েছে।

www.pathagar.com

সারণী ১.১৪: ভৌত অবকাঠামো অনুযায়ী দরিদ্রের সংখ্যা

অবকাঠামোর ধরণ	দরিদ্রের সংখ্যা (%)	
	চরম দরিদ্র	স্বাভাবিক
সড়ক ও বিদ্যুৎ রয়েছে	১৭.৫	২৬.৬
সড়ক আছে কিন্তু বিদ্যুৎ নেই	২৪.২	২৬.৯
সড়ক ও বিদ্যুৎ কোনটাই নেই	২৪.৮	৩২.৪

Source: Sen and Begum, 1998 ও ড. কাশেম, ২০০৫

বাংলাদেশের করণীয়

সম্প্রতি বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা অভিযোগ তুলেছেন দলিলটি একপেশী করে তৈরী করা হয়েছে। দলিলটি শুধু দারিদ্র্য বিমোচনের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। দলিলটি দেশীয় পরামর্শকদের দ্বারা তৈরী করা হলেও দাতা সংস্থাদের প্রভাবমুক্ত নয়। এ ক্ষেত্রে বির্তকে না গিয়ে বিকল্প পথে চলাই শ্রেয়। তাই সম্প্রতি যোহেন্সবার্গ-এ টেক্সই উন্নয়নে ধরিত্রী সম্মেলন (WSSD) সম্মেলন গৃহীত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, তাতে ৫২০ সুপারিশমালা রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ২৭টি সুপারিশ বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য প্রাসঙ্গিক ও এগুলো বাস্তবায়ন অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন WSSD এর সুপারিশগুলো যেহেতু UN ম্যানডেট যুক্ত এগুলোকে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের সাথে সম্পৃক্ত করে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ফলে WSSD বাস্তবায়ন পদ্ধতিকে দারিদ্র বিমোচন কৌশলের সাথে সমন্বয় করার সুযোগ রয়েছে। যেমন দারিদ্র্য বিমোচনে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ কৌশলের সাথে টেক্সই নীতি অনুসরণ করলে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙ্গবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের এত সীমাবদ্ধতার মাঝে যেমন বাজেটের সীমাবদ্ধতা, দক্ষ মানব সম্পদ, প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা, উপযুক্ত নীতি ও সমম্বয়ের অভাব। এ পরিস্থিতিতে সমস্যা ও কৌশলগুলির অগ্রাধিকার নির্ণয় করতে হবে। এভাবে সুচিন্তিত, পরিকল্পিত ও সুকৌশলে এগুতে পারলেই অভিষ্ট্য লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হতে পারে। WSSD এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় উল্লেখ্যযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে, দারিদ্র্য বিমোচন, টেক্সই ভোগ ও উৎপাদন পদ্ধতি, প্রাকৃতিক সম্পদের টেক্সই ব্যবস্থাপনা, টেকসই উন্নয়ন ও বিশ্বায়ন, স্বাস্থ্য ও টেক্সই উন্নয়ন। প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন। স্বাধীনতাত্তোর থেকে আজ পর্যন্ত এহেন পরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণ করা হয়নি যেখানে দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল ছিল না। নিঃসন্দেহে আশানুরুপ না হলেও দারিদ্র বিমোচন হয়েছে। প্রশ্ন থেকে যায় কেন আশানুরুপ লক্ষ্য অর্জিত হয়নি এবং যতটুকু হয়েছে তা কি টেক্সই হবে কি? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতা,

www.pathagar.com

টেক্‌সই পরিকল্পনা ও সমন্বীত নীতির অভাব রয়েছে। এ সব ক'টি বাস্তবায়ন করতে হলে সময় ও অর্থের প্রয়োজন। আমাদের হাতে এতটুকু সময় অপেক্ষা করার কি সুযোগ আছে? মনে হয় না। তাহলে কালক্ষেপন না করে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা না করে বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে ক্ষমতায়ন করে দারিদ্র বিমোচন ও পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা কি সমীচিন নয়? এ জন্যে আন্তঃসংস্থা সমন্বয় করে বিষয়ভিত্তিক (thematic) সমন্বয় ও বাস্তবায়ন গঠন করা যেতে পারে যার নেটওয়ার্ক ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত থাকবে। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব অথবা প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিবের নেতৃত্বে জাতীয় কমিটি এসব কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং এর সার্বিক ও সাচিবিক সহায়তায় থাকবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। তৎপ্রেক্ষিতে নীতি পরিবর্তন প্রাতিষ্ঠানিক জোরদারকরণ ও অন্যান্য সংস্কার কার্যক্রম সময়ের চাহিদা অনুসারে করা সম্ভব হবে। তৃণমূল পর্যায়ে পরিবেশ ও দারিদ্র্য বিমোচন বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ কমিটিগুলো নিম্নরুপ হতে পারে : বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের সভাপতিত্বে বর্তমান বিভাগীয় কমিটি, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা সমন্বয় কমিটি, উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে উপজেলা সমন্বয় কমিটি নতুন কার্যপরিধির আলোকে দায়িত্ব পালন করতে পারে। ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদকে জোরদার করে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যেতে পারে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কার্যপরিধি তৈরী করে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত/পরামর্শ গ্রহণ করে প্রজ্ঞাপন জারী করতে পারে। কার্যপরিধিতে দারিদ্র বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সমন্বয়ের বিষয়টি গুরুত্ব পাবে। যা জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীর সাথে সঙ্গতি রেখে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে ।

উপসংহার

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অবস্থা অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক। দেশে দারিদ্র্য পীড়িত লোকের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক। ভূমিহীন এবং প্রায় ভূমিহীন পরিবারের তিন-চতুর্থাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে। চরম দরিদ্রের সংখ্যা ২৫ মিলিয়ন বা প্রায় ১৯ শতাংশ। আঞ্চলিক দারিদ্র চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে রাজশাহীতে দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা অধিক। অভাব তাদেরকে উন্নয়নমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করতে বাধা সৃষ্টি করে। আগামী দিনে তাদের সন্তানদেরকে অধিকতর দৈন্যের মধ্যে নিপতিত হবার সম্ভাবনা যদি দারিদ্র্য বিমোচনে বৈপ্লবিক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয়। এজন্যে উদ্যোগ নেয়ার এখনই উপযুক্ত সময়। পল্লী দারিদ্র্যের প্রধান কারণ এর মধ্যে রয়েছে, তাদের জমিও সম্পদের অভাব, বেকারত্ব, শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব। এমনকি কৃষি ছাড়া অন্যান্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ ও অত্যন্ত সীমিত ।

দারিদ্র্য বিমোচন করতে বর্তমান কৃষিকে আরও বহুমূখীকরণ এবং জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। এ জন্যে সনাতন কৃষি ব্যবস্থা পরিবর্তন করে আধুনিক উন্নত কৃষি ব্যবস্থা

www.pathagar.com

প্রবর্তনের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দ্রুত ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে পোল্ট্রি, ডেইরি খামার স্থাপন ও মৎস্য খাতে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা এবং তদানুযায়ী সরকারী রাজস্ব ও উন্নয়ন বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন। অবশ্যই এসব কর্মকান্ডকে টেক্‌সই করার জন্য শিক্ষা, প্রযুক্তি, মূলধন, প্রশিক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি, বাস্তবমূখি নীতিমালা, প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ভৌত এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিদ্যুতের সম্প্রসারণ অতীব জরুরী। দীর্ঘ মেয়াদে অবশ্যই তা লাভজনক হতে হবে। বিভিন্ন কৃষি ও অকৃষি এন্টারপ্রাইজের দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে অতি অল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং পরিশোধ সক্রিয় হবার দরকার। নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সকল কর্মকান্ডের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। দারিদ্র্য পীড়িত পরিবারের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নে এবং তা স্থায়ী করার লক্ষ্যে সামাজিক অবকাঠামো যথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবা খাতের ব্যাপক প্রসার এবং তাদের গুণগত মান উন্নয়নের প্রয়োজন। শুধু সরকারী উদ্যোগে এসব কর্মকান্ড সীমিত না রেখে ব্যক্তিগত বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে হবে। এজন্যে অবকাঠামোর উন্নয়ন সহ সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে।

সহায়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থপঞ্জী

Atiur Rahman and P Majumder (2002), Poverty Environment Linkage in Bangladesh Perspective: Need for Sustainable Development, Bangldesh Journal of Political Economy Vol. XVI, No 1 p:111-253.

আবুল কাশেম (২০০৫); বাংলাদেশের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি, পালক পাবলিশার্স

মুজেরী, মোস্তফা কামাল, ১৯৯৭; 'দারিদ্র্যের পরিমাপ পদ্ধতি ও বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রবণতা', রুশিদান ইসলাম রহমান সম্পাদিত, দারিদ্র্য ও উন্নয়নঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, বাংলাদেশের উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা ।

Bangladesh Bureau of Statistics, 2001; Preliminary Report of Household Income and Expenditure Survey-2000, Dhaka, Report of the Labour Force Survey Bangladesh 1999-2000, Government of Bangladesh, Dhaka.

Bangladesh Bureau of statistics, 2003; Report of the Household Income and Expenditure survey, 2000, Dhaka, BBS.

Bangladesh Institute of Development Studies, 2003; An Analysis of Poverty and Development Issues at the Local Level: Results from Four Villages, Focus Study No. 5, MIMAP Bangladesh, Dhaka.

www.pathagar.com

Hossain, Mahabub, 2002; Rural Non-farm Economy in Bangladesh: A View from Household Surveys, Centre for Policy Dialogue, Dhaka.

Ministry of Finance, 2003; Bangladesh Economy Review-2003, Dhaka.

Ministry of Finance, 2002; A National Strategy for Economic Growth and Poverty Reduction (Draft), Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

হোসেন, মাহবুব, ২০০৩, কৃষিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব: ১৯৯৮ সালের বন্যার উদাহরণ, মাহবুব হোসেন ও রুশিদান ইসলাম রহমান কর্তৃক সম্পাদিত বাংলাদেশের কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ।

Latif, Mahammad Abdul, 2002; "Income,Consumption and Poverty Impact of Infrastructure Development", BDS, Vol. XXVIII, No.3.

G. Tyler Meller, JR (1992), An introduction to environmental Science - Living in the environment, Seventh Edetion.

বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ (২০০৩) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ; দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় কৌশল, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা-২০০৩।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

নেত্রকোণার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য

সার সংক্ষেপ

এ অধ্যায়ের পূর্ব ময়মনসিংহের তথা নেত্রকোণা জেলার ভৌগোলিক অবস্থান সীমানা ও নামকরণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ব ময়মনসিংহের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট, ভূমি গঠন প্রক্রিয়া ও ঐতিহাসিক বিবর্তনে বিভিন্ন ঘটনার বর্ননা করা হয়েছে। অত্র অঞ্চলের জীবন ও সংস্কৃতিক বিকাশের ধারাবাহিকতার প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য থেকেই তাদের জীবনের স্বকীয়তার উৎপত্তি বলে তুলে ধরা হয়েছে। জেলার পাহাড়, হাওর, বাওর, খাল বিল, নদী নালার ভূমি রূপ সর্বোপরি প্রাকৃতিক বিভিন্ন অপরূপ দৃশ্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ জেলার জলবায়ু, ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথের বিকাশ ও বিস্তৃতি তুলে ধরা হয়েছে। সুমেশ্বরী নদীর গতিপথ ও বর্তমানে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কিভাবে এ নদীকে দখল করছে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে এর মূল্য কিভাবে দিতে হবে এ সব আশংকার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ভূগাই কংস, ধনুনদী, ধলাই নদী ঘোড়া আত্রাইসহ পূর্ব ময়মনসিংহের অন্যান্য নদী উপনদীগুলোর ভাঙ্গা গড়ার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে ।

নামকরণ ও সীমানা

নেত্রকোণার নাম করণের বিষয়ে কোন লিখিত রেকর্ড বা দলিল সন্ধান পাওয়া যায়নি। গোলাম এরশাদ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, নেত্রকোণা থানার নাটুরকোণা ছিল আদিকালের একটি পুলিশ ফাঁড়ি। এই পুলিশ ফাঁড়িটি টিপুর গ্রেফতারের সংবাদ শুনে বিদ্রোহীরা লুট করে নেয়. বলে জনশ্রুতি রয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে কালীগঞ্জ শহরে পুলিশ ক্যাম্পটি স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু কাগজ-কলমে ক্যাম্পটির নাম পরিবর্তন করা হয়নি যা দীর্ঘদিন নাটুরকোনা নামে পরিচিত হয়ে আসছে। ফলে নাটুরকোনার ইংরেজ সাহেবদের সাহেবী উচ্চারণ প্রক্রিয়া থেকে নেত্রকোণা নামের উৎপত্তি বলে ধারণা করা হয় ।

সীমানাঃ নেত্রকোণা জেলার পশ্চিমে ও দক্ষিণে ময়মনসিংহ জেলা, দক্ষিণ ও পূর্বে কিশোরগঞ্জ জেলা, পূর্বে সুনামগঞ্জ জেলা, উত্তরে গারো পাহাড় এবং উত্তর-পূর্বে ভারতের মেঘালয় অবস্থিত। এ জেলা ২৪° -৩৫´ উত্তর থেকে ২৫° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং ৯০° - ৩০´ পূর্ব থেকে ৯০° -১৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

ঢাকা বিভাগের অন্যতম বড় জেলা নেত্রকোণা যার আয়তন ২৮১০.৪০ বর্গ কিলোমিটার। বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩.৩০° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ১২০° সেলসিয়াস।বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২১৭৪ মিলিমিটার। ২০০১ সালের আদম শুমারী অনুসারে এ জেলার

www.pathagar.com

জনসংখ্যা ১৯,৭১,২৪০ যার ৫১.২২ শতাংশ পুরুষ ও ৪৮.৭৮ শতাংশ মহিলা। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটার ৩৯৫১ জন। শিক্ষার হার গড়ে ৫৪.২ শতাংশ (বিবিএস, ২০০১)।

চিত্র ২.১ : নেত্রকোণা জেলার ম্যাপ

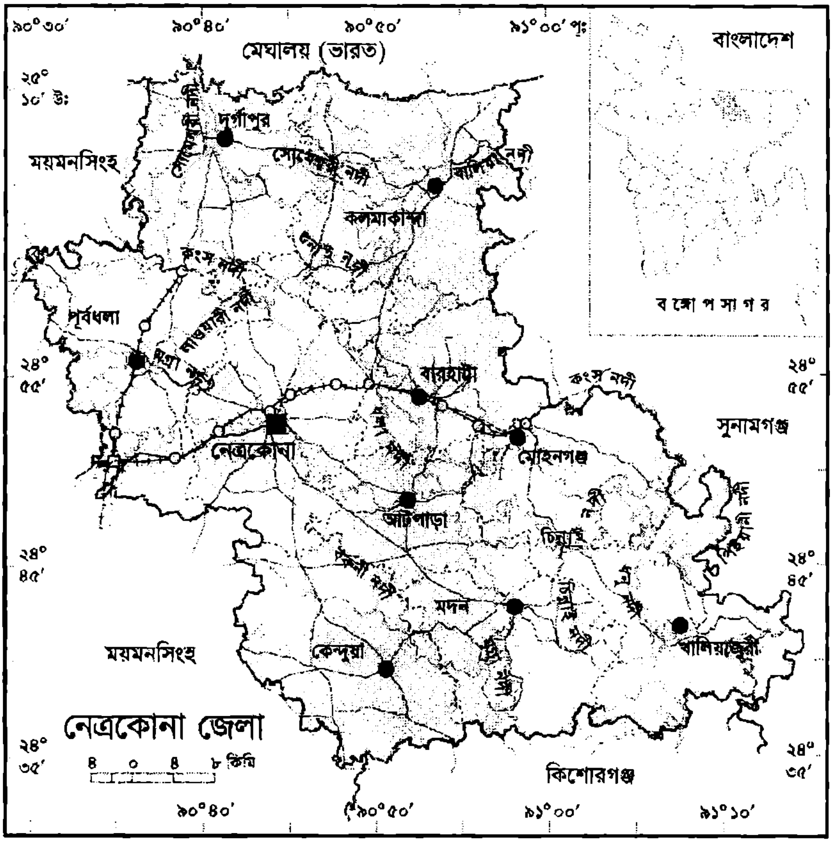

উৎসঃ বাংলাপেডিয়া, ২০০৬

প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নেত্রকোণা মহকুমা সৃষ্টি করা হয় ১৮৮২ সালে এবং মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয় ১৯৮৪ সালে। এ জেলায় মোট উপজেলা সংখ্যা ১০, পৌরসভা ৪, ওয়ার্ড ৩৬, মহল্লা ১০২, ইউনিয়ন ৮৫, এবং মোট গ্রাম ২২৮১টি। উপজেলাসমূহ: আটপাড়া, বারহাট্টা, দূর্গাপুর, খালিয়াজুরী, কলমাকান্দা, কেন্দুয়া, মদন, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা সদর ও পূর্বধলা। পৌরসভা রয়েছে: বারহাট্টা, দুর্গাপুর, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা সদর উপজেলায়।

www.pathagar.com

নেত্রকোণার ভূ-প্রকৃতি

নেত্রকোণা জেলার উত্তরে পাহাড়ী অঞ্চল, পাহাড়তলীর পলল ভূমি, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র পললভূমি এবং সুরমা, কুশিয়ারা পললভূমি– এ চারটি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এ চারটি অঞ্চল যথাক্রমে শতকরা প্রায় ২, ৭৬, ২ ও ২০ ভাগ এলাকায় বিস্তৃত। গারো পাহাড়ের পাদদেশে হাওড়-বাওড়, খাল-বিল, নদী-নালার সমন্বয়ে গঠিত জেলা নেত্রকোণা। এই নেত্রকোণা অঞ্চলে জনবসতি কখন কিভাবে শুরু হয়েছে তা সঠিক ভাবে নিরূপন করার কোন তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়। গ্রাম্য কিস্‌সা বা পুঁথির বন্দনা থেকে অনুমান করা হয় নেত্রকোণার প্রায় সমগ্র ভূ-ভাগটি এককালে ছিল কালিডর (কালিদহ) সাগর। সে-ক্ষেত্রে পদ্ম-পুরাণ বা মনসা মঙ্গলের বর্ণনা করা হয়েছে

আজ্ঞা দিলা গঙ্গা যবে ডাকুরা চলিলা তবে
নদী সব চলহ ত্বরিতে।
আজ্ঞা দিলা গঙ্গা মাও কালিডহ চলি যাও-
বাদুয়ার ডিঙা ডুবাইতে ॥
ব্রহ্মপুত্র যার আগে সংগে নিয়া পূর্ব ভাগে
ষোলশত নদ-নদীর সহিতে।
সত্ত্বর চলিয়া যায় ডুবাইতে চান্দের নায়
বাদ করে পদ্মার সনেতে।

মুক্তি সংগ্রামে নেত্রকোণা গ্রন্থে গোলাম এরশাদ নেত্রকোণা জেলার নদ-নদী অবস্থা বর্ননা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে এ জেলার প্রান্ত সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ধনু নদী। নেত্রকোণার গণ মানুষের কাছে যা বড় গাঙ বলে পরিচিত। বাস্তবে ধনু নদীই নেত্রকোণার জল ধারাকে সাগরে সাথে সংযুক্ত করেছে। এছাড়াও ধলাই নদী, কংশ নদী মূলতঃ ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে বেরিয়ে এসেছে। নেত্রকোণার ধলাই, কংশ, মগড়া, সুমেশ্বরী, ঘোড়াউত্রা, বিষ্ণাই, সলি সহ অধিকাংশ নদ-নদী পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে সাগর মূখী প্রবাহমান। ফলে মনসা মঙ্গলের ষোলশত নদ-নদীর বর্ণনা নেত্রাকোণার ভূ-প্রকৃতি বর্ননায় যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়। আজকের ভূ-প্রকৃতি দিয়ে সাত শত বছরের পূর্বের চিত্র শুধু অনুমান করা সম্ভব, কোন অবস্থাতেই বিশদ বিচার বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তাই মনসা মঙ্গলের ষোলশত নদ-নদীর কাহিনী অস্বীকার করা যায়না।

গোলাম এরশাদ তাঁর গ্রন্থে আরো উল্লেখ করেছেন যে, সেকালে বাংলা ১১৬৯ সন ইংরেজী ১৭৬২ সনের প্রচন্ড ভূমিকম্প, বাংলা ১২৯২ সনের ৩০ শে আষাঢ়ে তথা ইংরেজী ১৮৮৫ সনের রথ যাত্রা দিবসের ভূমিকম্প এবং বাংলা ১৩০৪ সনের ইংরেজী ১৮৯৭ সনের ১২ই জুনের বিকাল ৫.১১ মিনিটের প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প নেত্রকোণার ভূ-প্রকৃতির ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। ইংরেজী ১৯১৯ সন বাংলা ১৩২৬ সনের প্রলয়ংকরী ঝড়ের কাহিনী ও সর্বজন স্বীকৃত। আজো ১৩০৪ সনের বড় ভূমিকম্প এবং ১৩২৬ সনের ঝড় বা বান নেত্রকোণার

www.pathagar.com

বয়স্ক নিরক্ষর লোকদের বয়স গণনার মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। বয়স্ক লোকদের বয়স জানতে গেলে উত্তর আসে বড় ভূমিকম্প বা ঝড় বানের সময় তার বয়স কতো ছিল। এই ১৩০৪ সনের ঝড় বড় ভূমিকম্পে সুসংগের রাজা জগতকৃষ্ণ সিংহ পুত্রসহ দালান চাপা পড়ে প্রাণ হারায়। নির্ভুল তথ্য জানা না গেলেও বাংলা ১১৬৯ সনের পূর্বেও এ-অঞ্চলে আরো অনেক ভূমিকম্প ও বান হয়ে থাকতে পারে বলে অনেকের ধারনা। ভূ-প্রকৃতির ব্যাপক পরিবর্তনও অবিশ্বাস্য নয়। দীর্ঘ সময়ের আবর্তনের ফলে ষোলশত নদ-নদীর বিলুপ্তি ঘটলেও, এখনো নেত্রকোণা নদী-নালা প্রধান অঞ্চল। তাছাড়া নদী সমূহের পশ্চিম থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের জলধারা বুকে ধারণ করে পূর্ব দিকে ধনু নদীতে সংযুক্ত হওয়া মনসা মঙ্গলের কাহিনীর সত্যতাই প্রমান করছে। এইভাবে বহু উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে নেত্রকোণা অঞ্চলে জনবসতি শুরু হয়। অনেক স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের মতে বর্তমান পূর্বধলা থানার নারায়ণডহর স্থানটি উল্লেখ্য কালিডার সাগরের তীরবর্তী একটি আদি স্থলভাগ।

নেত্রকোণা অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি আদি কাল থেকেই প্রাকৃতিক দৃশ্য ও প্রাচুর্যে বৈচিত্রময় ছিল। পাহাড়, জঙ্গল, নদী-নালা, খাল-বিল, সমতল-কান্দা, ফাঁকে ফাঁকে কৃষিভূমি হাওড়ের কান্দায় হিজল করজ গাছের অভয়ারণ্য ছিল। নেত্রকোণার মোট গ্রামের প্রায় অর্ধেকের বেশীর নামের সংগে পুর যুক্ত। বহুল ব্যবহৃত পুর শব্দটি অর্য্যুরপুরী চেতনা থেকে আগত। আদিকাল থেকেই এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্থায়ী বসতি ও অস্থায়ী যাযাবর জীবিকার প্রবনতা লক্ষ্যনীয়। এ এলাকার স্থায়ী বসতি স্থাপনকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে একাংশ ছিল প্রকৃতি পূজারী বা প্রকৃতির বিরুদ্ধ পরিবেশে সহাবস্থানের নীতি মানায় আস্থাশীল। আর অপরাংশ লাড়াইয়ের মাধ্যমে প্রকৃতির বিরুদ্ধবাদী পরিবেশকে পরাভূত করে প্রকৃতিকে সহজ বাস উপযোগী করে গড়ে তোলায় হয়ে উঠে ছিল সক্রিয়ভাবে। তাই নেত্রকোণা অঞ্চলে মানুষের জীবন ও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতায় উপরোক্ত তিনটি ধারার সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যামান। প্রথমত, আদি কালে নেত্রকোণা অঞ্চলে কামরূপ শাসনের কোনোরূপ কঠোর অনুশাসন বলবৎ ছিল না। দ্বিতীয়ত, নেত্রকোণার জনগোষ্ঠী আদিকাল থেকেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছে। তৃতীয়ত, এ অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ছিল যেমন জল, জলাভূমি ও মৎস্য সম্পদ পাহাড়ী বনাঞ্চল।

পাহাড় পর্ব্বত: এ জেলার উত্তর সীমায় সুসঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় অবস্থিত। ইতোপূর্বে এ জেলার উত্তরে অবস্থিত গারো পর্ব্বতও সুসঙ্গ মহারাজদিগের অধীন ছিল। ১৮৬৯ সনে তা আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সুসঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দুর্গাপুর হতে দুই-তিন মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত। এ জেলায় ঐতিহাসিক স্থানের মধ্যে রয়েছে সুসঙ্গ, মদনপুর, রোয়াইলবাড়ী, গারো পাহাড় ইত্যাদি।

www.pathagar.com

ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

সার্বিকভাবে বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বিবেচনায় নেত্রকোণার ভূ-প্রকৃতির অধিক বৈচিত্র রয়েছে। এ জেলায় যেমন দেখা যায় পাহাড়, বন ও শস্য শ্যামল বিস্তীর্ণ সমতলভূমি, তেমনি নদ নদী খাল বিল এবং হাওর পরিবেষ্টিত অগাধ জলরাশি একে করে রেখেছে অধিক বৈচিত্রময়।

অধ্যাপক মুয়াজ্জাম হুসাইন তাঁর প্রবন্ধে ময়মনসিংহের ভূ-প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে ভূ-অবয়বের গঠন অনুযায়ী বৃহত্তর ময়মনসিংহকে মূলতঃ দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকেঃ- (১) পুরাতন পলল গঠিত চত্বর ভূমি এবং (২) পলল গঠিত সমভূমি। পলল গঠিত সমভূমিকে আবার দুভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ (ক) পাদদেশ সমভূমি এবং (খ) সর্পিল প্লাবন ভূমি।

মধুপুর গড় পুরাতন পলল ভূমির অন্তর্ভূক্ত। প্লাইষ্টোসিন যুগে এর আবির্ভাব হয়েছিল বলে ভূ-তাত্ত্বিকগণ বিশ্বাস করেন। এ জেলা অন্যান্য এলাকার তুলনামূলকভাবে নবীন পলল গঠিত সমভূমি। নেত্রকোণার উত্তরাঞ্চলে গারো পাহাড়ের পাদদেশের পললভূমিকে পাদদেশ সমভূমি আখ্যায়িত করা হয়। পাহাড় পর্বত থেকে সৃষ্টি অভিকর্ষিক ও পলিমাটির মিশ্রণে পাদদেশ সমভূমি গঠিত। সুসঙ্গ পাহাড়ের সন্নিকটে নালিতাবাড়ী, হালুয়াঘাট, কলমাকান্দা এবং দূর্গাপুর অঞ্চলের পাদদেশ সমভূমির সন্ধান পাওয়া যায়। জেলার নিম্নাঞ্চল সর্পিল প্লাবন ভূমির অন্তর্ভূক্ত।

ভূ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্য অনুযায়ী বৃহত্তর ময়মনসিংহের মাটিকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। বৈশিষ্ট্য অনুসারে ময়মনসিংহের মাটির বিবরণ নিম্নরূপঃ

পাহাড়ী অঞ্চলের মাটি - ময়মনসিংহের উত্তরাংশের পাহাড় সংলগ্ন কিছু অঞ্চলের মাটি এ শ্রেণীভূক্ত। এর সঠিক শ্রেণীবিন্যাস করা না হলেও মূলতঃ এ মাটির উপাদান বালি, পলি, এঁটেল এবং কংকর জাতীয় মাটির সংমিশ্রণে গঠিত।

লালমাটি - মধুপর গড়ের মাটি এ শ্রেণীভূক্ত। এ মাটি লৌহ এবং এলুমিনিয়াম সমৃদ্ধ। এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে চুনা রয়েছে, তবে নাইট্রোজেন এবং সিলিকার পরিমাণ কম। এ অঞ্চলের মাটিকে লাল কর্দম মাটি বলেও আখ্যায়িত করা হয়। শুষ্ক অবস্থায় মাটি খুবই শক্ত কিন্তু আর্দ্র অবস্থায় কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল।

পলিমাটি - ব্রহ্মপুত্র এবং যমুনা অববাহিকা অঞ্চলের মাটি এ শ্রেণীভূক্ত, বালি এবং কর্দম মিশ্রিত রয়েছে এ মাটিতে।

দো-আঁশ মাটি - ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা এবং পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকার মধ্যবর্তী অঞ্চলের মাটি প্রধানতঃ দো-আঁশ জাতীয়।

www.pathagar.com

মাইটাল মাটি - জেলার হাওড় এলাকার নিম্নভূমির মাটিকে মাইটাল বা এঁটেল বলা হয়। শুকনো অবস্থায় মাটি খুবই শক্ত, এর জলধারণ ক্ষমতাও বেশী। নেত্রকোণা অঞ্চলের মাটির এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে ।

কেদারনাথ মজুমদার তাঁর গ্রন্থ "ময়মনসিংহের বিবরণে" ময়মনসিংহের মাটিকে আট ভাগে বিভক্তির কথা বলেছেন । এগুলো হচ্ছে (১) বালুয়া, (২) দোয়াসিলা (৩) পৈল (বিল বা নদীর ধারের সারবান ভূমি) (৪) মাটিয়াল (এঁটেল টান জমির মাটি) (৫) কান্দা (উঁচু ভূমি) (৬) বাইদ (নামা, ডোবা বা প্যাঁকা জমির মাটি) (৭) করচা (জলার তটস্থ ভূমি) এবং (৮) নাঠা (অনুর্বরা)। তবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে সাধারণভাবে এসব জমি তিন নামে পরিচিত বালুয়া, ডুবা ও মাটিয়াল যা নেত্রকোণা অঞ্চলের মাটির বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও তিনি মধুপুরের লালমাটি ও লৌহচূর্ণ মিশ্রিত কঙ্কর মাটির উল্লেখ করেছেন, যার অস্তিত্ব সুমেশ্বরীর তীরেও ছিল।

খাল ঃ নেত্রকোণা জেলাটির অবস্থান গারো পাহাড় সংলগ্ন বিধায় অসংখ্য আঁকাবাকা খাল এ জেলাকে অপরূপ চিত্রে সাঁজিয়ে রেখেছে। উল্লেখযোগ্য যে খালের সংখ্যা ৮৬টি, যার আয়তন প্রায় ৪৪৮২.৯০ হেক্টর।

হাওড় :

খনার বচনে পূর্ব ময়মনসিংহের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা হতো "হাওর বাওর মইষের সিং এ তিনে ময়মনসিং"। হাওড় বাওরকে (Wetlands) ভূক্ষেত্রের (Landscape) এর কিড়নি (চিত্র-২.২) এবং Wetlands -কে জীববৈচিত্রের সুপার মার্কেট (Biological Supermarket) বলা হয় (চিত্র-২.৩)। পূর্ব ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলার হাওড় বাওড় এ জেলাদ্বয়কে অপরূপ সাঁজে সাঁজিয়ে রেখেছে। নেত্রকোণা জেলায় ছোট-বড় ৭০ টি হাওড় বাওড় রয়েছে, যার আয়তন প্রায় ৬১,৫৯৫.১৪ হেক্টর। জলাশয় (Wetlands) সম্পদের আর্থিক মূল্যবান হিসাব করা অত্যন্ত জটিল পদ্ধতির কারণ এর সকল সম্পদের বাজার মুল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। বাংলাদেশে এ ধরণের গবেষণা অত্যন্ত সীমিত।

চিত্র-২.২ : Wetlands এর জলাধার, সিঙ্ক এবং পানিবিশুদ্ধকারী ভূমিকা

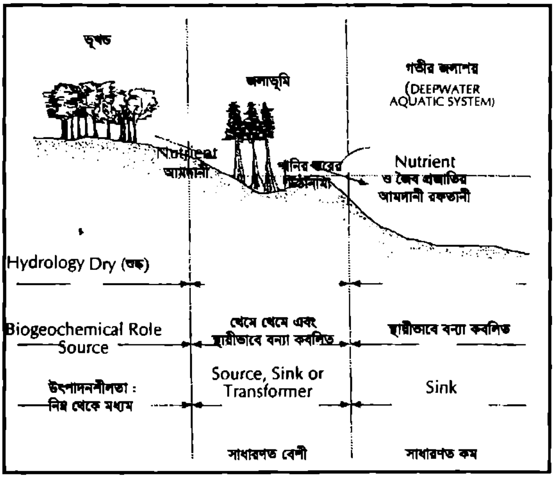

উৎস ঃ Mitch, 1993

www.pathagar.com

ট্যাংগুয়ার হাওড়ে শুধু দৃশ্যমান সম্পদের মূল্যমান হিসাব করে দেখা যায় যে, প্রায় ১৮৭.০০ মিলিয়ন টাকার সম্পদ আহরণ করা সম্ভব / আহরণ করা হয়ে থাকে। অথচ এ হাওড়টি অতীতে ৫০ হাজার টাকা বাৎসরিক লীজ দেয়া হত, অবশ্যি পরবর্তীতে সর্বশেষ ১ কোটি টাকা পর্যন্ত লীজ মানি নির্ধারণ করা হয়েছিল (বিল্লাহ, ২০০০) পৃ: ৩৩৯।

চিত্র-২.৩ : Wetlands জীববৈচিত্রের সুপার মার্কেট

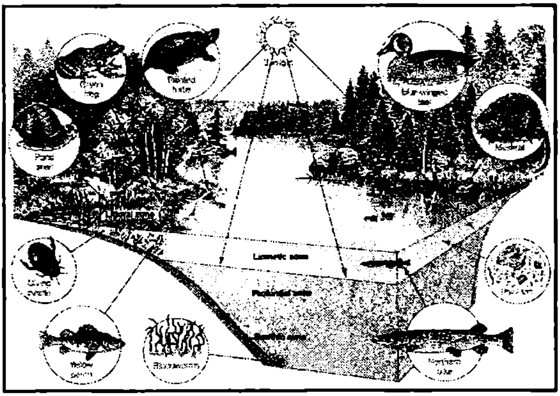

উৎস : Miller, 1992

জলবায়ু

বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মত এ জেলা ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। এখানে ষড়ঋতুর মধ্যে প্রধানত তিনটি মৌসুম জোড়ালোভাবে পরিলক্ষিত হয়। বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়, শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ বর্ষণ এ সময় হয়। শীত কাল আরম্ভ হয় নভেম্বরে এবং শেষ হয় ফেব্রুয়ারীতে। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল, কখনও কখনও সামান্য বৃষ্টি হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত হয় এবং বাতাশে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে একে "কাল বৈশাখী" বলা হয়। এ সময় কিছু শিলা বৃষ্টিও হয়ে থাকে। তাপমাত্রার উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এখানে নিম্নতম তাপমাত্রা ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে পরিলক্ষিত হয়, যার গড় তাপমাত্রা ১২.১ ডিগ্রী সেলসিয়াস (সারণী-২.১)।

বৃষ্টিপাতের উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শীতকালে গড় বৃষ্টিপাত ৬১ মিলিমিটার যা ঐ সময়ে জলীয় বাষ্পের পরিমানের চেয়ে অনেক কম। দীর্ঘ মেয়াদী পরিসংখ্যানে আরও দেখা যায় যে, বৎসরে শীত মৌসুমের ৪/৫ মাস প্রায় শুষ্ক থাকে। আবার বর্ষা মৌসুমে কোন কোন মাসে মাত্রাধিক বৃষ্টিপাত হয় (সারণী-২.২)। নভেম্বর হতে মার্চ পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের মাসিক হার ৭৫ মিলিমিটারের কম বলে এ মাসগুলোকে শুষ্ক মৌসুম বলা চলে। আবার সারা বৎসরের আবহাওয়ার অবস্থাকে তিনভাগে বিভক্ত করে, বিশ্লেষণে দেখা যায় যেমন রবি মৌসুমে (নভেম্বর -ফেব্রুয়ারী) বৃষ্টিপাতের পরিমান হয় গড়ে ৫৯ মিলিমিটার। প্রাক-খরিফ মৌসুমে (মার্চ-মে) এসময় বৃষ্টির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৬৫ মিলিমিটার এবং খরিফ মৌসুমে (জুন-অক্টোবর) সময় গড় বৃষ্টিপাত হয় ১৭৫১ মিলিমিটার। সারণী-২.২ এ মাসওয়ারী নেত্রকোণা জেলার গত সাত বৎসরের মাসিক বৃষ্টিপাতের অবস্থান দেখানো হল।

www.pathagar.com

সারণী-২.১: নেত্রকোণায় মাসওয়ারী গড় সর্বোচ্চ ও গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস)

গাল/ মাস	১৯৯৫		১৯৯৬		১৯৯৭		১৯৯৮		২০০৪	
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
জানুয়ারি	২৩.৯	১০.৭	২৪.৩	১২.০	২৪.৪	১০.৬	২২.৫	১১.৬	২৩.৬	১২.১
ফেব্রুয়ারি	২৬.২	১৪.৫	২৭.৫	১৪.৯	২৫.৮	১৩.৬	২৭.৩	১৫.২	২৭.২	১৪.৬
মার্চ	৩০.৪	১৭.৬	৩২.১	১৯.৯	৩১.৬	১৯.৫	২৮.৮	১৭.৫	৩১.০	২১.২
এপ্রিল	৩৩.৮	২২.৯	৩৩.৫	২২.৮	২৯.৪	২০.২	৩০.৯	২২.১	৩০.০	২১.৭
মে	৩৩.৫	২৫.১	৩২.৭	২৪.৪	৩২.১	২৩.৪	৩২.২	২৬.৬	৩৩.০	২৫.৩
জুন	৩১.৫	২৬.০	৩১.৬	২৫.২	৩১.৬	২৪.৯	৩২.৭	২৬.৬	৩১.৩	২৫.৪
জুলাই	৩০.৬	২৫.৮	৩১.৩	২৬.৩	৩০.৭	২৫.৩	৩০.৫	২৬.২	৩০.৭	২৫.৭
আগষ্ট	৩১.০	২৬.১	৩১.৬	২৬.২	৩১.৭	২৬.৪	৩০.৮	২৬.২	৩২.০	২৬.৩
সেপ্টেম্বর	৩১.৯	২৫.৯	৩২.৯	২৫.৯	৩০.৬	২৪.৭	৩১.৬	২৬.২	২৯.৯	২৫.২
অক্টোবর	৩২.২	২৩.৪	৩১.৭	২২.৮	৩১.৪	২১.৭	৩২.৪	২৫.৩	৩০.৩	২২.৪
নভেম্বর	২৯.০	১৯.৫	২৯.৬	১৮.৩	২৯.৬	১৮.১	৩০.৭	২০.২	২৯.০	১৬.৭
ডিসেম্বর	২৫.৭	১৩.৫	২৭.৫	১৩.৩	২৩.৯	১৩.৭	২৮.০	১৪.৫	২৬.২	১৩.৯

উৎস : বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা কম্পিউটার কেন্দ্র হতে সংগৃহীত (১৯৯৯ইং)। ময়মনসিংহ কেন্দ্রের তথ্য।

সারণী-২.২ : নেত্রকোণা জেলার বিগত ৭ বৎসরের মাসিক বৃষ্টিপাত

মাসের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিঃ মিঃ)						
	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫
জানুয়ারী	০০	০.১৮	০০	০৭	০০	০৬	০৩
ফেব্রুয়ারী	০০	১১.৩৪	১১	২.৫০	২৩.০০	০২	২৬.৬
মার্চ	০০	৯৫.০০	৫২.০০	১২.০০	১২৪.০০	৫০.০০	৭৮.০০
এপ্রিল	৯১.০০	৩৮৪.৮৭	৫৭.০০	৪৬৬.০০	১০৫.৫২	৩১১.০০	২৬.০০
মে	৩১৯.০০	৫৫৫.৪১	৩৯৮.৬৬	৫০৫.০০	২৬৭.১৪	১৪৫.০০	৬৪.০
জুন	৪৮৪.০০	৫২০.৬০	৩৯৬.৬৮	৫৭১.০০	৬৮৬.০০	৭১০.০০	২৫৫.০
জুলাই	৫৯১.০০	২৭০.০৬	২৯৮.০০	১০১৬.০০	৪৮২.০০	১০২.০০	৪৫০.০
আগষ্ট	৫৮৯.০০	৫৫৩.১১	৪৩৫.০০	৩৯৭.০০	৩৪৫.০০	৩৬৫.০০	৫১৪.০
সেপ্টেম্বর	৫২০.০৪	৪৪০.৮২	৪৭৭.০০	৪৫১.০০	২৯০.০০	৪৪৫.০০	৩৬৮.০
অক্টোবর	৪৩৮.০০	১২৫.০০	১৩০.০০	১২.০০	২৬২.০০	২৪০.০০	৪০১.০
নভেম্বর	০০	০০	১৪.০০	১১২.০০	০০	১০.০০	০০
ডিসেম্বর	০০	০০	০০	০০	১০	১৮	০০
মোট ঃ-	৩০৩২.০	২৯৫৬.৪	২২৬৯.৩	৩৫৫১.৫	২৫৯৪.৭	২৪০৪.০	২১৮৫.৬

উৎস: ময়মনসিংহ আবহাওয়া অফিস, ২০০৬

নদ-নদী ও হাওর

ময়মনসিংহের নদ-নদী: প্রাগৈতিহাসিক ব্রহ্মপুত্র

পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ও প্রাচীন নদী ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম নদীগুলির একটি। এমনকি গঙ্গার চেয়েও প্রাচীন। অনুমান করা হয় প্রায় আড়াই কোটি বৎসর আগে মধ্য মায়োসিন কালের প্রচন্ড গিরিজনির ফলে হিমালয়ের অভ্যুত্থান ঘটে। সে সময় সম্মুখ খাত এবং সীমানা চ্যুতির সৃষ্টির ফলে হিমালীয় নদী গঙ্গার সৃষ্টি হয়। হিমালয়ের উত্থানের বহু পূর্বেও ব্রহ্মপুত্র এ উপমহাদেশে প্রবাহমান ছিল। ইয়োসিন কালে হিমালীয় নদী ব্রহ্মপুত্র এবং তার শাখা প্রশাখা বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাংশে বিদ্যমান ছিল সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই (আহমদ সাইফ: ময়মনসিংহের পানি সম্পদ, ১৯৮৭)।

ব্রহ্মপুত্র নদ এবং মেঘনা ও যমুনা নদী এই বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার প্রাকৃতিক বিভাগ ও সীমানা রক্ষা করে থাকে। ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি ও গতি সম্বন্ধে দুইটি মত প্রচলিত রয়েছে। একদল মনে করেন ব্রহ্মপুত্র তিব্বতের অন্তর্গত মানস-সরোবর থেকে উৎপত্তি হয়ে হিমালয় প্রদক্ষিণপূর্বক বাংলার মধ্য দিয়ে সাগরে পতিত হয়েছে। আবার অনেকে মনে করেন, ব্রহ্মপুত্র আসাম-পর্বতমালা-মধ্যস্থিত ব্রহ্মকুণ্ড বা লৌহিত্য-সরোবর হতে উৎপন্ন হয়ে মানস-সরোবর-উদ্ভূত সেংপুর সাথে মিলিত হয়েছে। ব্রহ্মকুণ্ড স্বচক্ষে দেখে এসে ডাক্তার গ্রিফিথ এই পরবর্ত্তী মত প্রচার করেছেন। [১]পুরাণাদিতেও ব্রহ্মকুণ্ডের কথাই উল্লেখ রয়েছে। ব্রহ্মপুত্র আসাম প্রদেশ অতিক্রম করে চিলমারীর কাছে ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশ করে। [২]ব্রহ্মপুত্র সে স্থান থেকে পূর্বদক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে টোক পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলাকে দুইটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার সীমারূপে টোক হতে ভৈরববাজারের কিঞ্চিৎ উত্তর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে মেঘনায় পড়েছে। চিলমারী হতে ভৈরববাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র এই জেলার ১২০ মাইল স্থান অধিকার করে রেখেছে। এই সবই পৃথিবীতে মানুষ আবর্তিত হওয়ার অনেক আগের কথা। কিন্তু তারও কোটি কোটি বছর আগেকার ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি ও গতিপথের সম্পর্কে কারো নিশ্চিত কোন ধারণা নেই ।

এক সময় ব্রহ্মপুত্র এক সুবিশাল নদ ছিল। মুসলমান রাজত্ব সময়ে স্থানে স্থানে এর প্রশস্ততা প্রায় আট দশ মাইলেরও অধিক ছিল। মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজউদ্দিন লিখেছেন, তৎকালে (ত্রয়োদশ শতাব্দীতে) ব্রহ্মপুত্র গঙ্গার তিন গুণ ছিল। আইন-ই-আকবরিতে প্রকাশ, শেরপুর হতে জামালপুর পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র দশ মাইল প্রশস্ত ছিল।

---

[১] Journal of the Asiatic Society of Bengal এবং কেদার নাথ পৃ: ১৫০

[২] ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত বর্ত্তমান সময়ে আড়ালিয়া নামে পরিচিত। এই খাত মঠখলার নিকট হইতে ধলেশ্বরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা টোকের নিকট উৎপন্ন হইয়া "শীতল লক্ষ্মী" নামে নারায়ণগঞ্জ স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

www.pathagar.com

এই দশ মাইলের পারাপার জন্য দশ কাহন কড়ি নির্দ্দিষ্ট ছিল। শেরপুরও সেই কারণে "দশ কাহনিয়া শেরপুর" নামে পরিচিত ছিল। ময়মনসিংহের নিকট ব্রহ্মপুত্র বর্তমান নগর হতে বোকাইনগর পর্যন্ত ১২ মাইল প্রশস্ত ছিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে যখন এই নাসিরাবাদ নগর প্রতিষ্ঠিত হয়, তৎকালের ন্যায় ভীষণ নদীর তীরে এ জেলার সদর মহকুমা স্থাপন কোন মতেই সঙ্গত ছিলনা। বর্তমানে বেগুনবাড়ীর সেই কোম্পানীর কুঠি ব্রহ্মপুত্র তার সে বিশালত্ব হারিয়েছে; গ্রীষ্মকালে এর প্রশস্ততা কোন কোন স্থানে ৩০০ হাতেরও অধিক থাকে না। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে জেলার কালেক্টর H. J. Reynolds বলেছিলেন "দশ বৎসর পূর্বে আমি ব্রহ্মপুত্রের যে অবস্থা দেখেছিলাম, বর্তমান অবস্থা তা অপেক্ষা অনেক শোচনীয়। আমার বিশ্বাস এইরূপ অবস্থায় ২৫ বৎসর চললে বিশাল ব্রহ্মপুত্র নিশ্চয় একটি অদৃশ্য সূত্রের আকার ধারণ করবে।" তিনি আরোও বলেছিলেন "যদি উজানের বালির বাঁধ সরে গিয়ে যমুনার প্রবাহিত স্রোত ব্রহ্মপুত্রের খাতে প্রবাহিত হয়, তা হলে ব্রহ্মপুত্র পূর্ব বিশালত্ব প্রাপ্ত হতে পারে।" রেনল্ডসের উক্তি অক্ষরে অক্ষরে আজ ফলেছে। গ্রীষ্মকালে ব্রহ্মপুত্র অনেক স্থলে হেঁটেছে পার হওয়া যায়। পূর্ণ বর্ষায় তা পিয়ারপুর ও হুসেনপুরের নিকট দুই মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে থাকে। ১৮৭৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে সরকার একবার ইঞ্জিনিয়ার ও ওভারসিয়ার নিযুক্ত করে ব্রহ্মপুত্র সংস্কারের চেষ্টা করেছিল। এর পর নদবক্ষে স্থানে স্থানে বাঁধ দেয়া হয়েছিল, তাতে বিশেষ কোন লাভ হয়নি। অশোক অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র-তীর্থরাজ বলে আখ্যায়িত হয়। সে যুগে ব্রহ্মপুত্র স্নান হিন্দুদের একটি পরম পবিত্র কাজ ছিল। বহুদূর হতে হিন্দু নরনারী ব্রহ্মপুত্রে স্নানের জন্য সমাগত হতো; ব্রহ্মপুত্র-তীরবর্তী দেওয়ানগঞ্জ, বাহাদুরগঞ্জ, জামালপুর, পিয়ারপুর, বেগুনবাড়ী, নসিরাবাদ, হুসেনপুর, মাঠখলা প্রভৃতি স্থান স্নান ঘাট বলে পরিচিত। ১৮৫০ সনের সার্ভে নকশা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ব্রহ্মপুত্র নদ এই জেলার ১৩৩২০ একর জমি অধিকার করে রেখেছিল; এই ভূমির পরিমাণ ছিল ২০.৮১ বর্গমাইল।

নদ-নদী

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বৃহত্তর ময়মনসিংহেও সে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এখানকার সাহিত্য, সংগীত, কিংবদন্তী আর লৌকিক জীবনে নদীই প্রধান ভূমিকা পালন করে এসেছে। মৈমনসিংহ গীতিকায়', কবি নারায়ণ দেবের' মনসামঙ্গল' কাব্যে লোকসাহিত্যে বার বার নদ-নদীর প্রসঙ্গ এসেছে। চাঁদ সওদাগরের নদীপথে বাণিজ্যের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তাতে ময়মনসিংহের স্থানিক রূপ-বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত। লোকসাহিত্যে নৌ-বাণিজ্য কাহিনী বর্ণিত হতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাতে সাধু উপাধির যে চরিত্র দেখা যায় সে-তো নৌ-পথের বণিক। এদেশকে জানতে হলে এই নদ-নদীর পরিচয় সকলকে অবশ্যই জানা উচিত।

www.pathagar.com

নদীমাতৃক বাংলাদেশের এ বৈশিষ্ট্যের প্রধান ধারক বৃহত্তর ময়মনসিংহের পাহাড় সংলগ্ন নেত্রকোণা জেলা অন্যতম। নেত্রকোণা জেলায় উল্লেখযোগ্য ছয়টি প্রবাহমান নদী রয়েছে। এগুলি হচ্ছে, সুমেশ্বরী (১৮ কি. মি.), মগড়া/ধনু (১৭০ কি. মি.), ঘোড়াউৎরা (৩৬ কি . মি.), শিবগঞ্জ ধলাই (২২ কি . মি.), আপার সুমেশ্বরী (২৩ কি. মি.), ভুগাই/কংস (২২৭ কি. মি.)।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ তথা নেত্রকোণা মাকড়সার জালের মতো নদ-নদী দ্বারা আচছাদিত। ব্রক্ষপুত্র, ধলেশ্বরী, কংস মগরা, ধনু, সুমেশ্বরী, সুতিয়া, নিতাই, বংশী, ঝিনাই, বানার এবং আত্রাই প্রভৃতি নদ-নদী, উপনদী, শাখা নদীসমূহ নেত্রকোণা ও ময়মনসিংহের উপর দিয়ে প্রবাহিত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এই এলাকার অধিকাংশ ভূ-ভাগই নদ-নদীর প্রবাহ বাহিত পলিমাটির স্তরে স্তরে জমে সমুদ্র থেকে জেগে উঠেছে। উত্তরে হিমালয়ের কোল থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার নল পূঁতে দেখা গেছে, দু'-তিন হাজার ফুট গভীরতা পর্যন্ত শুধুই স্তরে স্তরে বালুকা আর নানা শ্রেণীর মৃত্তিকা। তাছাড়া ও রয়েছে বিভিন্ন জাতের পাথর যা হিমালয় থেকে আসা। এ সব পাথর বালু কণা জমে কোন কোন নদী ক্রমশঃ মজে আসছে আর নতুন ভূ-খন্ড গড়ে উঠেছে। স্তরগুলোর বালি আর মাটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমীক্ষা করে বলা যায়, কোন নদ বা নদী কোথা থেকে এই বালি আর মাটি বহন করে নিয়ে এসেছে। এভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আজকের দিনের নদী পূর্বকালে কোন পথে প্রবাহিত হতো তাও বলা যায়। এসব নদীর গতিপথ নিয়ে মরফোলোজিক্যাল সমীক্ষার অনেক প্রয়েজনীয়তা থাকলেও বাস্তবে এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ নেই বললেই চলে।

সুমেশ্বরীঃ ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পাহাড় থেকে ঝরণার ধারা বয়ে এনে আরো কয়েকটি স্রোতধারার সঙ্গে মিলিত হয়েই সুমেশ্বরী নদীর উৎপত্তি। ভারতের উপজাতীয় এলাকায় সুমেশ্বরী নদীটি ' সিমসাং' নামে পরিচিত। সিমসাং নদীর পশ্চিম দিক হতে 'রমফা' এসে সিমসাং নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই মিলিত স্রোত ভারতের বাঘমারা শহরের পূর্বদিক দিয়ে এসে রানীকং নামক স্থানে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশে এ-নদীর প্রবেশ পথে পশ্চিম তীরে রাণীকং ও বিজয়পুর এবং পূর্বতীরে ভবানীপুরের মধ্যবর্তী স্থানে 'বিষ্ণুরীছিড়া' নামীয় ক্ষীণ স্রোতধারা সিমসাং নদীতে পড়েছে। অর্ধমাইল দূরবর্তী মেঘালয় পাহাড় থেকে রাংগাছড়া স্রোতধারা সিমসাং নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এভাবেই সোমেশ্বরী নদীর পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে। পরে এই নদী বিজয়পুর, বড়ইকান্দি ইত্যাদি গ্রামের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দুর্গাপুরের নিকট এসে দুর্গাপুরের তৎকালীন জমিদার সোমেশ্বর পাঠকের নামানুসারে সুমেশ্বরী নামপ্রাপ্ত হয়। অতীতে সুমেশ্বরী সুসঙ্গ বা দুর্গাপুরের পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হতো। তার নমুনা এখনও আছে। সুমেশ্বরীর প্রধান ধারার সঙ্গে দুর্গাপুরের

www.pathagar.com

পশ্চিমে দুর্গাপুর ও বিরিশিরির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ধারাটি সংযুক্ত ছিল। ১৯৬১ সালের পর থেকে এ ধারাটি লুপ্ত প্রায়। শুধু মাত্র বর্ষাকালে এই ধারা দিয়ে স্রোত প্রবাহিত হয়। বর্তমানে প্রধান ধারাটি প্রবাহিত হয়েছে বিরিশিরির পশ্চিম দিকে। 'শিবগঞ্জবাজার ডালা' নামে এটি পরিচিত। শিবগঞ্জে একটি বড় বাজার রয়েছে। সুমেশ্বরী নদীর ভাঙ্গনে তা নদীগর্ভে বিলীন প্রায়। সুমেশ্বরী নদীর বর্তমান প্রধান স্রোতটি জারিয়ার কিছু উত্তর-পশ্চিমে চিতলির হাওর হয়ে জারিয়ার নিকট ভূগাই-কংস নদীতে মিলিত হয়। আর পুরাতন ধারাটি কুমুদগঞ্জ, বড়ইউন্দ, সিধুলী, কলমাকান্দা ও মধ্যনগর হয়ে ধনু নদীতে পড়েছে। সুমেশ্বরীর দৈর্ঘ্য আনুমানিক প্রায় ৪০ মাইল। দুর্গাপুরে এর প্রস্থ ১০৫০ ফুট ও গভীরতা ৭-৮ ফুট। দুর্গাপুরে এর উচ্চতা সর্বাধিক ৪৯.৭০ ফুট (১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০) এবং সর্বনিম্ন ৩২ ফুট (জুন, ১৯৭৯); সর্বোচ্চ প্রবাহ ৩০,৫০০ কিউসেক (জুলাই, ১৯৬৭) এবং সর্বনিম্ন ১০০ কিউসেক (মে-১৯৭৩) (আহমদ সাইফ; ময়মনসিংহের পানি সম্পদ, ১৯৮৭)। সুমেশ্বরী নদীর তীরে দূর্গাপুর, কলমাকান্দা উপজেলা সদর অবস্থিত এবং অববাহিকার প্রথম অংশ পার্বত্য, মধ্য অংশ মোটামুটি সমতল ও উর্বর এবং দক্ষিণ অংশ নীচু এলাকা।

জলধার এলাকা (Catchment Areas)

রানীকং থেকে নেমে এসে সুমেশ্বরী নদী দুর্গাপুর, বিরিশিরি ও শিবগঞ্জের মাঝে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে একটি অংশ চিত্‌লির হাওর হয়ে কংস নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। অন্য শাখাটি দূর্গাপুরের দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে কেরণখোলার দিকে প্রবাহিত হয়। দুর্গাপুর, বিরিশিরির দ্বিধাবিভক্তি স্থলে একটি বিরাট চর সৃষ্টি হয়েছে। পাহাড়ী ঢল এসে এই চরটিতে বাঁধা প্রাপ্ত হয়ে পানি প্রবাহ দুর্গাপুর বাজারের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় যাকে "ফ্লাশ ফ্লাড" বলে। বিশাল পরিমান পাহাড়ী ঢল সুমেশ্বরী নদীর স্বাভাবিক গতি ধারায় প্রবাহিত না হতে পেরে উপজেলা কমপ্লেক্সের পিছনে আত্রাই নদী দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে এই নদীর মারাত্মক গভীরতা এবং স্রোত সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুমেশ্বরী নদীর গতি প্রকৃতি সরে-জমিনে দেখার জন্য এপ্রিল, ২০০৬ সালে সুমেশ্বরী নদীর পূর্ব পারে দুর্গাপুর শহর রক্ষার জন্য কোটি কোটি টাকার সরকারী অর্থ ব্যয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পরিদর্শন করে জানা যায় যে, শহরকে রক্ষার লক্ষ্যে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য বিরাট অংকের সরকারী অর্থ ব্যয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ বাঁধটির দুইটি তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমত, এই বাধ দিয়ে দুর্গাপুরের পেছনে সুমেশ্বরী নদীর উত্তাল তরঙ্গ থেকে শহরবাসীকে রক্ষা এবং আপাত দৃষ্টিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা। কিন্তু এর দীর্ঘ মেয়াদি পরিণাম কি কেউ ভেবেছে, ভীষণ খরস্রোতা হয়েছে আত্রাই, যার ফলে দুর্গাপুর শহরসহ উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সর্বদাই মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। এ বাঁধ থাকা সত্ত্বেও প্রতি বৎসর পাহাড়ী ঢলে শহরবাসীকে "ফ্লাশ ফ্লাডে" আক্রান্ত হতে হয়। শত কোটি টাকা খরচ করে আত্রাই নদীতে এলজিইডি যে ব্রীজটি করেছে তাও পরিদর্শন করে দেখা গেল, ব্রীজটির প্রশস্ততা ও

www.pathagar.com

উচ্চতা এতো অপর্যাপ্ত যে, এই ব্রীজটি পাহাড়ী বন্যার ধাক্কায় পাঁচ বৎসর টিকবে কিনা জনমনে ভীষণ সন্দেহ রয়েছে। ব্রীজটির এপ্রোচগুলির বাহু খুবই ছোট এবং বালু দিয়ে ভর্তি করে স্থানীয় সংসদ সদস্য ২০০৬ সালের শেষে মেয়াদোত্তীর্ণের এবং আগামী নির্বাচনের আগেই উদ্বোধন করেন। স্থানীয় জনগণকে উন্নয়ন কর্মকান্ড দেখাবেন বলে তড়িঘড়ি করে শেষ করানো হয়েছে বলে স্থানীয় জনগণ ও সংশ্লিষ্টরা অভিমত প্রকাশ করেন। দীর্ঘ স্থায়িত্ব বা টেকসই এর বিষয়টি জনপ্রতিনিধি পানি উন্নয়ন বোর্ড ও এলজিইডি এর বিচার্য বিষয় নয়।

চিত্র ২.৪ : বন্যা দুর্গতদের অসহায় অবস্থার খন্ড চিত্র

উৎস ঃ Miller, 1992

দ্বিতীয় তাৎপর্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুর্গাপুর-বিরিশিরির মাঝখানে যে চরটি জেগে উঠেছে তা খোদাই করে দিলে সুমেশ্বরী নদীটি তার দু'দিকের প্রবাহ ফিরে পেতো। একটি পূর্বমূখী কেরণখোলার দিকে, অন্যটি চিতলি হাওর হয়ে জারিয়া-ঝাঞ্জাইলমূখী। বাস্তবে এ চরটি স্থানীয় জন প্রতিনিধির বংশধরগণ দখল করে (২০০৬ সালে) সেখানে প্রমোদ ভবন নির্মাণ করেছেন। যার ফলে ক্যাচমেন্ট এরিয়ার (Catchment Area) মোহনাটির দক্ষিণ পার ভরাট করার এবং জমি বাড়ানোর জন্য অঘোষিত সম্প্রসারণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয় প্রতিবাদ বা আপত্তি করলে পরিনতি অত্যন্ত ভয়াবহ হতে পারে, একথা সবারই জানা। সুমেশ্বরী নদীর উত্তর পার্শ্বের অবস্থা ও সরেজমিনে ঘুরে দেখা হল, তাতে ও সেই রাঘব বোয়ালদের খেলা। গত কয়েক দশক ধরে সুমেশ্বরী নদীর উপর ব্রীজ করার জন্য নদীর ভিতর প্রায় আধা মাইল ব্যাপি সরকারী গম দিয়ে বাঁধ নির্মাণ করা হয়। গমের কাজ মানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের লাভজনক ব্যবসা। বাঁধের দু'পাশে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বাস স্ট্যান্ড, শিশুপার্ক ইত্যাদি নানা উন্নয়ন কর্মকান্ডের নামে পিলার দিয়ে সীমানা চিহ্নিত করে রেখেছেন। সীমানা পরিবর্তন হয়না, সরকার এবং স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি পরিবর্তন হলে শুধু দখল পরিবর্তন হয়। এসবের উজানে ও ভাটিতে চলে সুমেশ্বরী নদী দখলের প্রতিযোগিতা। স্থানীয় প্রতিনিধিদের সুপারিশের ভিত্তিতে চলছে এসব

www.pathagar.com

দখলী ভাগবাটোয়ারা কর্মকান্ড। এসব কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই লাভ জনক ব্যবসা। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন অসহায়ের মত নীরব সাক্ষ্য বহন করছে। এই বিষয়ে জেলা প্রশাসনের অভিমত জানতে গেলে বলা হল, উন্নয়ন ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিনিধির অভিমত ও অভিরুচি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ, নদীপ্রবাহ সংরক্ষণ ও টেক্‌সই উন্নয়ন পরবর্তী বিবেচ্য বিষয়। প্রশ্ন হল, সুমেশ্বরী নদীর প্রবাহ হারানোর ফলে দুর্গাপুর থেকে কলমাকান্দা হয়ে ধনু নদী পর্যন্ত যে জলপ্রবাহ হারিয়েছে, এর ফলে কৃষি সেচের পানি, বিশাল মৎস্য সম্পদ বিলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে। এই যে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে, তার মূল্য দিতে হবে ভবিষ্যত প্রজন্মকে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধির বংশধরগণ এদেশে থাকলে তারাও রেহাই পাবেন না।[৩] সুমেশ্বরী নদীর অন্য ধারাটি কংস নদীর সাথে মিলিত হয়ে বড়াইল হয়ে নেত্রকোণার উপর দিয়ে মেঘনা নদীতে মিলিত হয়েছে। চির প্রবাহমান নদীর সকল পানির উৎসই কৈলাস পর্বত এবং গারো পাহাড়। স্থানীয় জনপ্রতিনিধির বংশধরদের প্রমোদন ভবন সংরক্ষণ করতে গিয়ে সুমেশ্বরী ভায়া কংস নদীর প্রবাহ হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে সারা নেত্রকোণার সেচ ব্যবস্থা, মৎস্য সম্পদসহ এ অঞ্চলের অমূল্য জীববৈচিত্র। যার উপর এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠিকে জীবিকা আহরণের জন্য আজীবন নির্ভরশীল থাকতে হবে। ভবিষ্যত প্রজন্মের এসব ক্ষয়ক্ষতির নিরূপণ ও বিশ্লেষণ করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করা এখনই প্রয়োজন। এখানে অনেক ছোট ছোট Catchment area রয়েছে, যেগুলোর পরিসংখ্যান বা উপাত্ত আমাদের হাতে নেই। সুমেশ্বরী নদী বিলীন হয়ে গেলে এর অমূল্য বালু ও পাথরের উপর আবহমান কাল থেকে বিরাট শ্রমজীবি জনগোষ্ঠীর কোথা থেকে কর্মসংস্থান হবে এ বিষয়ে কেউ চিন্তা ভাবনা করেছেন কি?

ভুগাই কংস ঃ ভুগাই নদী ভারতের শিলং মালভূমির 'তুরা' পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে হাতিভাঙ্গা বাংলাদেশ রাইফেলস ক্যাম্পের নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করে নালিতাবাড়ী ও হালুয়াঘাট উপজেলার সীমানা বরাবর দক্ষিণদিকে ১০ মাইল প্রবাহিত হয়ে নালিতাবাড়ী উপজেলা সদরের নিকট ভুগাই নামে অবিহিত হয়েছে। তৎপর নালিতাবাড়ীতে ২৩ মাইল, হালুয়াঘাটে ৩.৫ মাইল, ফুলপুরে ৩৭ মইল, পূর্বধলায় ৯ মাইল, দুর্গাপুর ও পূর্বধলার সীমানা দিয়ে ২০ মাইল, নেত্রকোণায় ৬ মাইল, নেত্রকোণা ও বারহাট্টার সীমানা দিয়ে ৭ মাইল, বারহাট্টায় ১১ মাইল, বারহাট্টা ও মোহনগঞ্জ সীমানা দিয়ে ৬ মাইল এবং মোহনগঞ্জ ধর্মপাশার সীমানা দিয়ে ১৯ মাইল, সর্বমোট ১৬২ মাইল দীর্ঘ পথ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

মারিসি, দিংঘানা, মালিঝি, ছেল্লাখালী, দেওদিয়া উপনদী সমূহের মিলিত প্রবাহ নালিতাবাড়ীর ৫ মাইল ভাটিতে কংসে পতিত হয়েছে। সেনেরচরের নিকট পুরাতন ব্রহ্মপুত্র

---

[৩] ২০০৬ সালে সংসদ বিলুপ্তির পর ক্ষমতাসীন দল ত্যাগ করার ফলে সাবেক সংসদ সদস্য তাঁর নিজ এলাকায় যেতে পারছেন না বলে স্থানীয় লোকজন টেলিফোনে জানিয়েছেন।

www.pathagar.com

নদ হতে খরিয়া নদী উৎপন্ন হয়ে ফুলপুর উপজেলা সদরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সরচাপুরের ৫ মাইল পূর্বে কংস নদীতে পতিত হয়েছে। খরিয়া নদীতে বর্ষাকালে নৌ-চলাচল করে। জারিয়ার ৯ মাইল উজানে ফুটকাইয়ের নিকট উত্তর পশ্চিম দিক হতে দরশা-রামখালী, ৪ মাইল উজানে উত্তর দিক থেকে নিতাই নদী এবং ঝাঞ্জাইলের পশ্চিমে সুমেশ্বরী-শিবগঞ্জের একটি ডালা শিকলাই বিলের মধ্যে দিয়ে (একটি ধারা) কংস নদীতে পতিত হয়েছে। জারিয়ার অদূরে কংসের একটি শাখা 'অন্দানদী' উৎপন্ন হযেছে। অতঃপর বিল অঞ্চলে প্রবেশ করে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে একশাখা নেত্রকোণা শহরের উজান দিয়ে এবং অপর শাখা মগরা নদীতে পতিত হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে এই নদীতে কোন প্রবাহ থাকে না। ঠাকুরাকোণা বাজারের নিকট কংস নদী হতে ধলাই নদী বের হয়ে ঠাকুরাকোণা রেলওয়ে ষ্টেশনের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আটপাড়া থানার নিকট মগরা নদীতে মিলিত হয়েছে। বর্ষা ঋতুতে কংস নদীর প্রায় অর্ধেক প্রবাহ এই ধলাই নদী পথে ধাবিত হয়।

এই নদীর তীরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নগর বা বন্দর নেই, তবে নালিতাবাড়ী উপজেলা শহর ও মোহনগঞ্জ, সরচাপুর, জারিয়া ইত্যাদি নদী বন্দর রয়েছে। এ নদী জারিয়া পর্যন্ত সারা বছরই নাব্য। উজানে বর্ষাকলে উচ্চ পানির পৃষ্ঠের খরস্রোতের জন্য নৌ-চলাচলের বিঘ্ন ঘটে। বাংলাদেশে প্রবেশের পর এ নদীর উজান অববাহিকা মোটামুটি সমতল এবং উর্বর; ভাটি এলাকা নীচু। এ নদীর পানি পাওয়ার পাম্পের সাহায্যে কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়। ফলে নেত্রকোনার ব্যাপক এলাকা জুড়ে সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ।

বাংলাদেশে ভুগাই কংস নদীর দৈর্ঘ্য আনুমানিক ১৪২ মাইল, প্রস্থ গড়ে ৫০০ ফুট এবং গভীরতা গড়ে ১৫/১৬ ফুট। নাকুয়াগাঁওতে পানির উচ্চতা সর্বোচ্চ ৮২.৪০ ফুট (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩) ও সর্বনিম্ন ৬৫.০২ (এপ্রিল, ১৯৬৮)। নদীটির পানি নিষ্কাশন সর্বোচ্চ ১২,২৬০ কিউসেক এবং সর্ব নিম্ন ৩৩ কিউসেক। নাকুয়াগাঁওতে বাৎসরিক সর্বোচ্চ পানিপৃষ্ঠ ৭৭.৯০ ফুট থেকে ৮২.৪০ ফুট পর্যন্ত জুন, ১৯৬১ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ পর্যন্ত উঠানামা করেছে। কংসের জারিয়ার নিকট পানির উচ্চতা সর্বোচ্চ ৫৭.৬০ ফুট (জুলাই, ১৯৭৯) এবং সর্বনিম্ন ১১.৪৫ ফুট (মে, ১৯৬০)। পানি নিষ্কাশন সর্বোচ্চ ৪৩,৮০০ কিউসেক (জুন, ১৯৫৬) এবং ১০০০ কিউসেক (ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩) (পানি বিজ্ঞান তথ্য: সুরূজ মিয়া ও ময়মনসিংহের পানি সম্পদ: আহমদ সাইফ, ১৯৮৭)।

নদী ব্যবস্থাপনা

আধুনিক বহুমুখী পরিকল্পনা তৈরী করতে হলে নদীর পানির প্রবাহ, পানিপৃষ্ঠ, নদী গর্ভ এবং নদীর গভীরতার মাপ জানা প্রয়োজন। এ জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ময়মনসিংহ উপ-বিভাগে পানি বিজ্ঞান বিভাগের একজন প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে ময়মনসিংহের বিভিন্ন নদীতে উপরে উল্লেখিত পরিমাপগুলো গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। কেবল টাঙ্গাইল জেলাটি ঢাকা উপ-বিভাগের অধীনে ন্যস্ত রয়েছে।

www.pathagar.com

এছাড়াও ব্রহ্মপুত্র জরিপ বিভাগ-২ নামে একটি অফিস একজন নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে কাজ করছে। এই অফিসটি অদ্যাবধি বাংলাদেশে নদী জরিপের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। নদী জরিপের নদী কখন কোথা দিয়ে প্রবাহিত হচেছ এবং কতবার খাত পরিবর্তন করছে, ভাঙ্গনের ফলে নদী গর্ভ কোন দিকে ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জানা যায়। নদীর পানি প্রবাহ বা পানি নিষ্কাশন মাপার জন্য প্রকৌশলীরা নদীর একটা সরল অংশ বেছে নেয় এবং সে অংশে নদী কিছুদূর পর্যন্ত সমানভাবে চওড়া। নদী তো আর জেলার সীমানা মেনে চলে না, তার গতি হলো প্রবাহমান, নেত্রকোণার উপর দিয়ে প্রবাহমান নদীগুলির বিবরণী নিম্নে দেয়া হ'ল। এতে বিভিন্ন নদীতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের নদীর পানি প্রবাহ, পানি পৃষ্ঠ ইত্যাদি মাপার সে ব্যবস্থা রয়েছে।

নদ-নদীর নাম নং	গেজ ষ্টেশন, নং, স্থান	উপনদীর নাম	শাখা নদী
১	২	৩	৪
১৭. ভূগাই-কংশ	৩৪ নকুয়াগাঁও	ভূগাই	মারিসি -দিংঘান
নালিতাবাড়ী	৩৫ সরচাপুর রাংমা-ঘুমরা-রামখালী	আন্ধা ধলাই (মগরাতে ৩৮	মালিজ্জি পতিত)
৩১. ধনু -বউলাই	৩৬ জারিয়া	নালিতাবাড়ী গুণাই (সুমেশ্বরীতে	রাংমা-ঘুমরা-
৭২ খালিয়াজুরি	৩৬.১ মোহনগঞ্জ	পতিত)	রামখালী
(গোড়া উতরা)	৭২ খালিয়াজুরি (গোরা উতরা)	শিবগঞ্জের ডালা (সোমেশ্বরী হতে)	সুমেশ্বরীতে
১১৯. মগরা	৯৯. সোমেশ্বরী	খরিয়া (পুরাতন ব্রহ্মপুত্র হতে)	পতিত
	২৬১ কলমাকান্দা	খরপাই শিবগঞ্জেরডালা (বিজয়পুর)	
	২৬২ বাঘমারা খরপাই	(দুর্গাপুর হতে জারিয়ায় কংসতে	
	শিবগঞ্জেরডালা (বিজয়পুর) (দুর্গাপুর	পতিত)	
	হতে জারিয়ায় কংসতে পতিত)	রাংশা, সাপরং	
	৩১০ নেত্রকোণা, গুণাই	দামাখালী, সোয়াই	
	৩১১ আটপাড়া	সাইডুলী, ধলই, আন্ধা	
	৩১৪ ঘোষগাঁও		

উৎসঃ পানি বিজ্ঞান তথ্যঃ সুরুজ মিয়া ও ময়মনসিংহের পানি সম্পদঃ আহমদ সাইফ, ১৯৮৭।

বিল ও হাওর

সমগ্র বাংলাদেশের ন্যায় নেত্রকোণার অনুপম ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব এর নদ-নদীসমূহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অসংখ্য নদী পরিত্যক্ত খাত, ক্ষীয়মান নদ-নদীর প্রক্রিয়া ইত্যাদি এখানকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। বিল, হাওর ও জলাভূমি এই এলাকার স্থায়ী চিত্র। বর্তমানে অনেক নিচু জায়গায় জলাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। এক সময়ের এই সমস্ত নিচু জলাশয় ও বিল পলিদ্বারা ক্রমাগত ভরাট হয়ে যাওয়ায় সেগুলোর আকৃতি সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং চতুর্পাশে কৃষি আবাদের অধীনে আনা হচ্ছে। তথাপি বিলের কেন্দ্রে কিছুটা গভীরতা থেকে যাচেছ। নদীসমূহ খাত পরিবর্তনের ফলে পরিত্যক্ত ও বিলুপ্ত খাতসমূহের স্থানে স্থানে ভরাট হয়ে গেলেও কিছু জলাভূমি রয়ে গেছে এবং সেগুলো বিল, ঝিল, হাওর

www.pathagar.com

নামে পরিচিত। হাওর অপেক্ষাকৃত বড় জলাভূমিকে বলা হয়। হাওর শব্দটি লৌকিক উচ্চারণে সাগর>সায়র>হাওর হয়েছে। নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ জেলার বিরাট বিরাট হাওর এলাকা রয়েছে। ১৯৭৮ সালে হাওর উন্নয়ন বোর্ডও করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন পরিকল্পনা গ্রহণ না করায় সেটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে অনেক প্রাচীন বিলের গর্ত ভরাট হয়ে বৃক্ষ লতাদি ও নল-খাগড়া জঙ্গলে পরিনত হওয়ায় এখন আর সেগুলোকে বিল বলা যায় না। নেত্রকোণার জলাশয়, বিল ও ঝিলসমূহ এক সময় আকৃতি ও গভীরতার জন্য উল্লেখযোগ্য ছিল। কিন্তু ক্রমাগত পলি জমে ঐ সমস্ত বিল-ঝিল অগভীর জলাশয়ে পরিণত হয়েছে এবং সেখানে এখন ইরি ও বোরো ধানের আবাদ করা হয়। এ সব বিলের দেশের তথা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষত দারিদ্র বিমোচনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

সহজলভ্য, সুলভ মাছের সাথে রয়েছে পুষ্টি ও প্রোটিনের যোগান, দারিদ্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান, নৌযোগাযোগ স্থাপন, সর্বোপরি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জীবিকা আহরণ। প্রতি বছর বর্ষাকালে বিল সন্নিহিত এলাকাগুলো প্লাবিত হয় ও নীচু জলাভূমিতে পানি আটকে থাকে এবং শীতকালে তা ফসলের মাঠে পানি সেচ কার্যে ব্যবহৃত হয়। এই বাড়তি পানি বিল-ঝিল সন্নিহিত শস্যক্ষেত্র সবুজে পরিপূর্ণ করে। চিত্র ২.৫ ও ২.৬ এ বিল ও হাওরের অর্থনৈতিক তাৎপর্য অনুমেয়।

চিত্র-২.৫ : Eutrophic Lake or Nutrient সমৃদ্ধ জলাভূমি

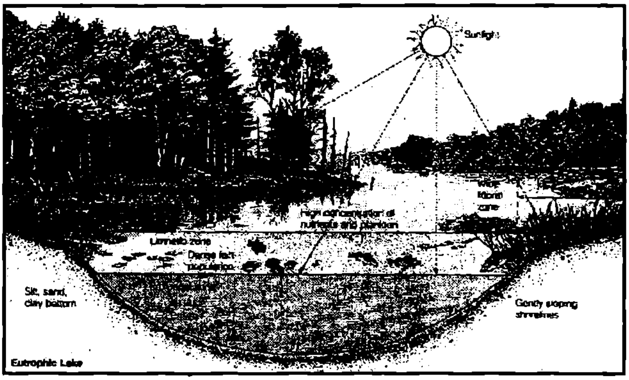

উৎস : Miller, 1993

চিত্র-২.৬ : Oligotrophic Lake or Nutrient অভাবী জলাভূমি

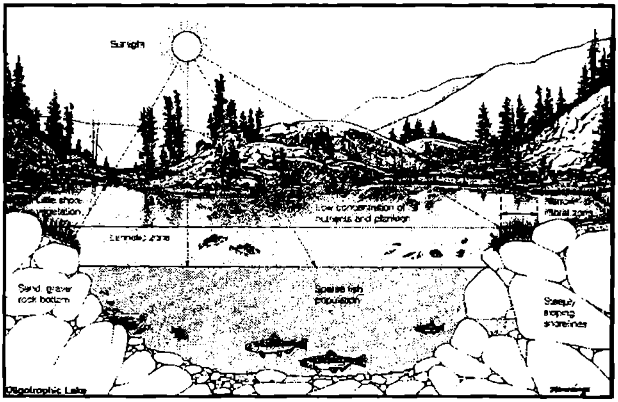

উৎস : Miller, 1993

www.pathagar.com

প্লাবনভূমি ঃ সমতল ভূমির দেশ বাংলদেশ, তার অপরূপ প্রকাশ পায় বর্ষাকালে, যখন সমগ্র এলাকা নীল পানিতে থৈ থৈ করতে থাকে। প্রকৃতি প্রেমিক মানুষেরা তখন ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসে এর অপূর্ব মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে। এ বিষয়ে নিয়মিত কোন জরিপ না থাকলেও জেলা প্রশাসনের তথ্যানুসারে প্লাবনভূমির মোট পরিমান প্রায় ৭৫,৫৪৪.৭১৫ হেক্টর যেখানে বছরে ৩-৪ মাস পানি থাকে।

নেত্রকোণা জেলার হাওড়, খাল, বিল, নদী এবং প্লাবনভূমিতে অতীতে পর্যাপ্ত মাছ পাওয়া যেত। কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ও পর্যাপ্ত পরিমানে বিকল্প কর্ম সংস্থানের অভাবে এবং হাওড়, খাল, বিল, নদী ব্যবস্থাপনায় যথাযথ সরকারী নীতিমালা ও কৌশল না থাকায় এ জেলায় সম্পদ নির্বিচারে মৎস্য ও পাখি আহরণ করা হচ্ছে। প্রজননের চেয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ বেশী আহরণের ফলে এ সমস্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন আশংকাজনক পর্যায়ে নেমে এসেছে। নেত্রকোণা জেলার জলাশয় গুলিতে আশংকাজনকভাবে মাছের উৎপাদন কমার উল্লেখযোগ্য প্রধান কারণ হল: অপরিকল্পিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ; কৃষিকাজে কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার; শীতকালে/বোরো মৌসুমের খাল, বিল ও নদী থেকে কৃষি ফসলী জমিতে মাত্রাতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন; ডিমওয়ালা ও পোনা মাছ নিধন, মাছের বংশ বিনাশকারী বিভিন্ন জালের ব্যবহার; অপরিকল্পিত নির্বিচারে মৎস্য আহরণ; ইজারা প্রথার মাধ্যমে রাজস্বভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় মাছের বংশ বিনাশ; বিভিন্ন জলাশয় ভরাট হয়ে মাছের আবাসস্থল বিনষ্ট হওয়া এবং সর্বোপরি পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা। অনতিবিলম্বে এ বিপর্যয় ঠেকাতে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে হবে, নইলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম "মাছ-ভাতে বাঙালী" এ প্রবাদের বাস্তবতা অসার বলে প্রমানিত হবে।

উপসংহার ঃ

দেশের অন্যান্য জেলার চেয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহের নেত্রকোণার বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। কারণ-পাহাড়, নদীনালা, হাওড়, বাওর, সবকিছুর এক অপূর্ব সমাহার এ জেলার। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাবে এ সম্পদ ভান্ডার হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে বিলুপ্ত ও নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ। মানুষ তথা জীববৈচিত্র্যের জীবনধারণের উপকরণ। সমাজের প্রতিনিধিদের অনৈতিক কর্মকান্ড বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষের জন্য বেশী দায়ী বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এ জন্যে সচেতন হতে হবে সাধারণ জনগোষ্ঠীকেই। তাই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের মালিকানা ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জী

আহমদ সাইফ (১৯৮৭) ময়মনসিংহের পানি সম্পদ ময়মনসিংহ জেলা দ্বিশত বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ১৯৯১-২০০৪

গোলাম এরশাদুর রহমান ১৯৯৫, মুক্তি সংগ্রামে নেত্রকোণা

বাংলা পিডিয়া, ২০০৬ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

Mitch (1993) Wetland Science and Scientists ; p 17

G. Tyler, Miller (1992) An introduction to environmental science leving in environment, seventh eddition

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

আর্থসামাজিক অবস্থা

সংক্ষিপ্ত সার

আর্থ সামাজিক অবস্থা সমাজের সার্বিক উন্নয়নের মাপকাঠি। এ অধ্যায়ে উন্নয়নে মধ্যমনি ক্রমবর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠীর অবস্থা এবং আদিযুগের তাঁদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার পূর্বশর্ত। এসব বিষয়ে অতীত ও বর্তমান অবস্থাসহ শিক্ষা সম্প্রসারণের অগ্রগতি ও প্রতিবন্ধকতা বিশ্লেষণ ও বিন্যাস করা হয়েছে। সর্বজন স্বীকৃত, জীবন ধারণের অন্যতম মৌলিক উপাদান হল বাসস্থান। এ শান্তির নীড় নির্মাণের কলাকৌশল ও শৈল্পিক দিক পর্যালোচনাসহ এসব নির্মাণে এ অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা ও সর্বক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহারের দিক তুলে ধরা হয়েছে। যা এ অঞ্চলে আজ বিপন্ন ও বিলুপ্ত প্রায়। গৃহ নির্মাণ কৌশলে অত্রাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর পরিবেশ সচেতনতা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রকৃতি প্রেমের অতীত সংস্কৃতি ছিল অভূতপূর্ব। বর্তমান প্রজন্মের কাছে এ মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। তাছাড়া জনস্বাস্থ্য, পুরানো দিনের চিকিৎসা পদ্ধতি, এ অঞ্চলের বিভিন্ন রোগবালাই, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসঙ্গটিও তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি দারিদ্র চিত্র, কৃষি ব্যবস্থা, ভূমি ব্যবহার, কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা, খাদ্য পরিস্থিতি সেচ ব্যবস্থা, কৃষি উপকরণ ব্যবস্থাপনার সমস্যা ও সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে।

নেত্রকোণা

নেত্রকোনা বৃহত্তর ময়মনসিংহের ছয়টি জেলার মধ্যে অন্যতম বৃহত্তর একটি জেলা, যার আয়তন হলো ২,৮১০ বর্গ কিলোমিটার। জেলার মোট জনসংখ্যা ১৯,৭১,২৪০ জন (২০০১ সনের আদম শুমারী অনুযায়ী)। প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র হিসেবে দেশের বড় জেলাগুলির অন্যতম নেত্রকোণা জেলা। এ জেলায় ১০টি উপজেলা রয়েছে। পৌরসভার সংখ্যা ০৫টি এবং ইউনিয়নের সংখ্য ৮৬টি। তাছাড়াও ০৮টি সীমান্ত ফাঁড়িসহ মোট ২,২৯৯ টি গ্রাম রয়েছে।

www.pathagar.com

জনসংখ্যা

সারণী-৩.১ উপজেলা ভিত্তিক জনসংখ্যা বন্টন ও বর্ধন

উপজেলা	পুরুষ ১৯৯১	মহিলা ১৯৯১	মোট ১৯৯১	পুরুষ ২০০১	মহিলা ২০০১	মোট ২০০১	এক দশকের+
দূর্গাপুর	৮৫,৩৯৫	৮৩,৭৪০	১৬৯,১৩৫	১০০৮০০	৯৭৪৬০	১৯৮২৬০	২৯,১২৫
কলমাকান্দা	১০৬,৭৫৩	১০২,৬০৭	২০৯,৩৬০	১১৮০২০	১১৬২২০	২৩৪২৪০	২৪,৮৮০
পূর্বধলা	১১৯,৭০৮	১১৫,৯৬৭	২৩৫,৬৭৫	১৭০০৬০	১৫৯৪৮০	২৮০৪৬০	৪৪,৭৮৫
বারহাট্টা	৭৩,০৯৯	৬৯,০৭৫	১৪২,১৭৪	৮২২৮০	৭৫৩৮০	১৫৭৬৬০	১৫,৪৮৬
মদন	৫৭,৬৪৩	৫৯,৯৭০	১১৭,৬১৩	৭১৮৪০	৬৯৩২০	১৪১১৬০	২৩,৫৪৭
খালিয়াজুড়ি	৩৯,৬৪৮	৩৬,১৫৩	৭৫,৮০১	৪০৪৬০	৩৮৭৬০	৭৯২২০	৩,৪১৯
আটপাড়া	৬১,৬৩৫	৫৮,৮৫৬	১২০,৪৯৯	৬৬৭৬০	৬৫৬৮০	১৩২৪৪০	১১,৯৪১
কেন্দুয়া	১৩৪,৩৬৫	১৩১,২৬৩	২৬৫,৬২৮	১৪২৯৮০	১৩০১৮০	২৭৩১৬০	৭,৫৩২
মোহনগঞ্জ	৬৬,৫২৫	৬২,৮৯০	১২৯,৪১৫	৭৪৮৮০	৭০২২০	১৪৫১০০	১৫,৬৮৫
নেত্রকোনা সদর	১৩৬,৪৩৭	১২৯,২০৬	২৬৫,৬৪৩	১৭০০৬০	১৫৯৪৮০	৩২৯৫৪০	৬৩,৮৯৭
সর্ব মোট ১০ টি উপজেলা	৮৮৩,১৯৯	৮৫১,৭১৮	১৭৩২৯৩৪	১০১০৭০০	৯৬০৫৪০	১৯৭১২৪০	২৩৮,৩০৬

উৎস: বিবিএস: আদম শুমারি, ১৯৯১ ও ২০০১

নেত্রকোণা জেলার গত এক দশকের উপজেলা ভিত্তিক জনসংখ্যা বন্টন ও বর্ধন সারণী ৩.১ দেখানো হল। গত এক দশকে মোট জনসংখ্যায় যোগ হয়েছে প্রায় দুই লক্ষ আটত্রিশ হাজার নতুন সদস্য। স্বাভাবিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এ বিরাট জনগোষ্ঠীর পঞ্চাশ শতাংশের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে এবং বাকী পঞ্চাশ শতাংশের বেশীর ভাগ ১-১৮ বছর বয়সের যাদের জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষার, যাদের একান্তভাবে প্রয়োজন রয়েছে উৎপাদনমূখী কারিগরি শিক্ষা দেয়ার এবং জীবন ও মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়ার, যে মূল্যবোধ তাদের জীবন, সংসার ও সমাজ সম্পর্কে পর্যালোচনা ও অনুশীলনের উপকরণ থাকবে। এ বিষয়ে অনেকেই একমত হবেন যে বর্তমানে আমাদের সমাজে প্রয়োজনীয় এসব মূল্যবোধের বড়ই অভাব রয়েছে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ন বিবেচ্য বিষয় হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি যা একটি চলমান প্রক্রিয়া, কম হারে হলেও এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবেই ভবিষ্যতে। তাদের খাদ্য নিরাপত্তা, জ্বালানী নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, বাসস্থান ইত্যাদির জন্য নেত্রকোণা জেলায় যে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত কিনা তা বিচার বিশ্লেষণের এখনই সময়। দেশের তথা নেত্রকোণা জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের ভারসাম্য রক্ষায় এ জনসংখ্যার পরিমাণ কি হওয়া উচিত এবং এ প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার কি ভাবে করা উচিত তা পর্যালোচনা করতে হবে। মোট কথা, এ বর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠীর টেক্সই জীবিকা সংস্থান নিশ্চিত করার জন্য ভূমি, পানি, মৎস্য সম্পদ, বন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের টেক্সই ব্যবহারের জন্য জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

www.pathagar.com

কৌশল থাকা প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন সময়োপযোগী সরকারী নীতি, রাজনৈতিক ঐক্যমত্য অঙ্গীকার এবং তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করণ।

জনশক্তি

সারণী-৩.২: বাংলাদেশে কর্মক্ষম জনশক্তি ও নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর অবস্থা (%)

	আদম শুমারি ২০০১, বয়স, লিঙ্গ			আদম শুমারি ১৯৯১, বয়স, লিঙ্গ			আদম শুমারি ১৯৮১, বয়স, লিঙ্গ		
বয়স গ্রুপ	উভয় লিঙ্গ	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	উভয় লিঙ্গ	পুরুষ	মহিলা	উভয় লিঙ্গ
সকল বয়স %	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
০০-০৪	১৩.০	১৩.১	১২.৯	১৬.১	১৬.৮	১৬.৫	১৬.৬	১৭.৪	১৭.০
০৫-০৯	১৩.৬	১৩.৮	১৩.৩	১৬.৬	১৬.৫	১৬.৬	১৬.০	১৬.৫	১৬.৩
১০-১৪	১২.৮	১৩.২	১২.৪	১২.৬	১১.৭	১২.২	১৩.৯	১২.৯	১৩.৪
১৫-১৯	৯.৭	৯.৯	৯.৫	৮.৩	৮.৫	৮.৪	৯.২	৯.৫	৯.৪
যুবক বয়সী নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী (%)	**৪৯.১**	**৫০.০**	**৪৮.১**	**৫৩.৬**	**৫৩.৫**	**৫৩.৭**	**৫৫.৭**	**৫৬.৩**	**৫৬.১**
২০-২৪	৮.৮	৭.৬	১০.১	৭.৫	৯.২	৮.৩	৭.২	৮.৪	৭.৮
২৫-২৯	৮.৭	৭.৭	৯.৮	৭.৯	৯.২	৮.৫	৭.২	৭.৫	৭.৪
৩০-৩৪	৭.১	৬.৮	৭.৪	৬.২	৬.৩	৬.২	৫.৫	৫.৯	৫.৭
৩৫-৩৯	৬.৫	৬.৬	৬.৩	৬.০	৫.৩	৫.৬	৫.৩	৪.৯	৫.১
৪০-৪৪	৫.০	৫.৪	৪.৬	৪.৫	৪.২	৪.৩	৪.৩	৪.২	৪.২
৪৫-৪৯	৩.৭	৪.১	৩.৩	৩.৫	৩.১	৩.৪	৩.৫	৩.০	৩.৩
৫০-৫৪	৩.২	৩.৪	৩.১	৩.০	২.৮	২.৯	৩.২	৩.০	৩.১
৫৫-৫৯	১.৯	২.১	১.৮	২.০	১.৭	১.৮	২.১	১.৭	১.৯
কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী (%)	**৪৪.৯**	**৪৩.৭**	**৪৬.৪**	**৪০.৬**	**৪১.৮**	**৪১.০**	**৩৮.৩**	**৩৮.৬**	**৩৮.৫**
৬০-৬৪	২.৩	২.৪	২.২	২.২	২.০	২.১	২.৩	২.১	২.২
৬৫-৬৯	১.২	১.৩	১.১	১.২	০.৯	১.০	১.২	০.৯	১.০
৭০+	২.৭	২.৯	২.৪	২.৫	১.৯	২.২	২.৬	২.১	২.৪
বৃদ্ধ বয়সী নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী ৬০+ (%)	৬.২	৬.৬	৫.৭	৫.৯	৪.৮	৫.৩	৬.১	৫.১	৫.৬
মোট নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী (%)	**৫৫.৩**	**৫৬.৬**	**৫৩.৮**	**৫৯.৫**	**৫৮.৩**	**৫৯.০**	**৬১.৮**	**৬১.৪**	**৬১.৭**

উৎস: বিবিএস: আদম শুমারি, ১৯৯১ ও ২০০১ (লেখকের নিজস্ব হিসেবে)

www.pathagar.com

সারণী ৩.৩ : নেত্রকোণার কর্মক্ষম জনশক্তি ও নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর অবস্থা

এক দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি	আদম শুমারি ১৯৯১, বয়স, লিঙ্গ			আদম শুমারি ২০০১, বয়স, লিঙ্গ			এক দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি		
	পুরুষ	মহিলা	উভয় লিঙ্গ	পুরুষ	মহিলা	উভয় লিঙ্গ	পুরুষ	মহিলা	উভয় লিঙ্গ
সকল বয়স গ্রুপ	৮৮৩,৫৩৫	৮৪৭,৪০০	১,৭৩০,৯৩৫	১০১৬৯৯১	৯৭১১৯৭	১৯৮৮১৮৮	১৩৩,৪৫৬	১২৩,৭৯৭	১,৭৩০,৯৩৫
০০-০৪	১৫১,০২৫	১৫০,৬৬৮	৩০১,৬৯৩	১৬০৮২৬	১৫১৮৮৯	৩১২৭১৫	৯,৮০১	১,২২১	৩০১,৬৯৩
০৫-০৯	১৪৭,০৭৬	১৪২,৪৫৫	২৮৯,৫৩১	১৫২৯৩৬	১৪০৫৫০	২৯৩৪৮৬	৫,৮৬০	(১,৯০৫)	২৮৯,৫৩১
১০-১৪	১০৫,৮৮২	৯২,৪২৩	১৯৮,৩০৫	১২৫৩৮২	১১১৪২৪	২৩৬৮০৬	১৯,৫০০	১৯,০০১	১৯৮,৩০৫
১৫-১৯	৪২,৭৯২	৩৩,৮৮০	৭৬,৬৭২	৮৯১২০	৭৩৯৭৯	১৬৩০৯৯	৪৬,৩২৮	৪০,০৯৯	৭৬,৬৭২
নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী মোট (বয়স; ০০-১৭)	৪৪৬,৭৭৫	৪১৯,৪২৬	৮৬৬,২০১	৫২৮২৬৪	৪৭৭৮৪২	১০০৬১০৬	৮১,৪৮৯	৫৮,৪১৬	৮৬৬,২০১
নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী (%)	৫০.৫৭	৪৯.৫০	৫০.০৪	৫১.৯৪	৪৯.২০	৫০.৬০			
২০-৩৪	২০৮,৭৩৫	২৩০,৪৯৩	৪৩৯,২২৮	১৯৭১৯৯	২৪৬৩৯৭	৪৪৩৫৯৬	১১,৫৩৬	১৫,৯০৪	৪৩৯,২২৮
৩৫-৫৯	১৬৯,৯১৬	১৫০,৭০৩	৩২০,৬১৯	২১৮৪৭০	১৮৩০০৫	৪০১৪৭৫	৪৮,৫৫৪	৩২,৩০২	৩২০,৬১৯
মোট কর্মক্ষম জনশক্তি (বয়স; ২০-৫৯)	৩৭৮,৬৫১	৩৮১,১৯৬	৭৫৯,৮৪৭	৪১৫৬৬৯	৪২৯৪০২	৮৪৫০৭১	৩৭,০১৮	৪৮,২০৬	৭৫৯,৮৪৭
কর্মক্ষম জনশক্তি (%)	৪২.৮৬	৪৪.৯৮	৪৩.৯০	৪০.৮৭	৪৪.২১	৪২.৫০			
মোট নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী (বয়স; ৬০ এর উপরে)	৫৮,১০৯	৪৬,৭৭৮	১০৪,৮৮৭	৭৩০৫৮	৬৩৬৫৩	১৩৬৭১১	১৪,৯৪৯	১৬,৮৭৫	৩১,৮২৪
নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী (%)	৬.৫৮	৫.৫২	৬.০৬	৭.১৮	৬.৫৫	৬.৮৮			
মোট নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী	৫০৪,৮৮৪	৪৬৬,২০৪	৯৭১,০৮৮	৬০১৩২২	৫৪১৪৯৫	১১৪২৮১৭	৯৬,৪৩৮	৭৫,২৯১	১৭১,৭২৯
মোট নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী (%)	৫৭.১৪	৫৫.০২	৫৬.১০	৫৯.১৩	৫৫.৭৬	৫৭.৪৮			

উৎসঃ বিবিএসঃ আদম শুমারি, ১৯৯১ ও ২০০১, জেলা সিরিজ, নেত্রকোণা

সারণী ৩.২ বাংলাদেশে তিনটি আদমশুমারীতে কি হারে কর্মক্ষম ও নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী বাড়ছে তা তুলে ধরা হয়েছে। যে জনসংখ্যার বয়স ০০-১৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী ১৯৮১ সালে ৫৬ শতাংশ, ১৯৯১ এ ৫৪ শতাংশ ২০০১ তা কমে দাঁড়িয়েছে ৪৯ শতাংশ। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের ফলে এবং শিক্ষার হার বাড়ার ফলে বিশেষত নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে নির্ভরশীল জনসংখ্যা বৃদ্ধির অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর হার বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালে ৪৩ শতাংশ হয়েছে, যা ১৯৯১ সালেও ৪৩ শতাংশ এবং ১৯৮১ সালে ৩৬ শতাংশ ছিল। এ বিরাট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান না হলে দেশের টেক্সই উন্নতি কথা কল্পনাতেই থেকে যাবে। ষাটোর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর অথাৎ বৃদ্ধ বয়সী নির্ভরশীলদের হার বৃদ্ধি পেয়ে ৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, ১৯৯১ সালে এ সংখ্যা ছিল ৬.০৬ শতাংশ ।

www.pathagar.com

সারনী ৩.৩ তে নেত্রকোণার জনগোষ্ঠী বয়স গ্রুপ অনুসারে নির্ভরশীল এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যার চিত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। ২০০১ সালে আদম শুমারী অনুযায়ী ০০-১৯ বয়সের নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী ৫০.৬০ শতাংশ যা জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক বেশী। ১৯৯১ সালে এর পরিমাণ ছিল ৫০.০৪ শতাংশ। এর তাৎপর্য হ'ল, পূর্ব ময়মনসিংহে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি যা জাতীয় অবস্থার চেয়ে অনেক বেশী। উল্লেখ্য, গত এক দশকে নেত্রকোনায় জনসংখ্যা বেড়েছে ৮৬৬,২০১ জন। নেত্রকোণার কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ২০০১ সালে এর পরিমাণ মোট জনসংখ্যার ৪২.৫ শতাংশ, যা জাতীয় সংখ্যার চেয়ে বেশ কম ৪৬% শতাংশ। ৬০ উর্ধ্বে জনগোষ্ঠীর সংখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০১ সালে এর পরিমাণ ছিল মোট জনসংখ্যার ৬.৮৮ শতাংশ যা ১৯৯১ সালের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.০৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। নেত্রকোণা জেলার এ চিত্র জাতীয় সংখ্যার চেয়েও বেশী। এখানে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষণীয়, প্রথমত, জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বেশী এজন্যে সচেতনতা ও শিক্ষার অভাব রয়েছে। দ্বিতীয়ত, খাদ্যোভাব ও রোগ বালাই কম বলে জনগণের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে। নেত্রকোণায় ৬০ উর্ধ্বে জনসংখ্যা জাতীয় জনসংখ্যার চেয়ে বেশী। ফলে বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার চাপ এ জেলায় থেকেই যাচ্ছে।

লোকালয় ও মানবগোষ্ঠী

অধ্যক্ষ আবদুশ শাকুর তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে নেত্রকোণার পাহাড়ী অঞ্চলসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহের কোন কোন অঞ্চলে জনবসতি শুরু হয়, এবং কয়েকশত বছর ধরে নতুন নতুন আবাস ও আবাদযোগ্য অঞ্চলে লোকালয় গড়ে ওঠে। তখন উত্তর ভারত ও উত্তর চীনের সভ্যতার বয়স অনুমান করা হয় প্রায় দেড় হাজার বছর। গারো পাহাড়ের উত্তরাঞ্চল থেকে এসে যে মানবগোষ্ঠী নেত্রকোণার সুসং ও মধুপুর এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। মূল ভূখন্ড থেকে বিতারিত অথরা অভাবের তাড়নায় বহিরাগত জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি জীবনধারা ছিল ভিন্ন ধরণের এবং অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ। তাদের সঙ্গে আর্য অথবা চৈনিক সভ্যতার কোন যোগাযোগ ছিলনা ।

আদিযুগে জনবসতি স্থাপন

সাগর গর্ভ থেকে উত্থিত ময়মনসিংহ অঞ্চল কখন প্রথম বাসযোগ্য হয়েছে, তার কোন সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। তবে একথা নিশ্চিত যে প্রথম দিকে এ জনপদের মাত্র এক চতুর্থাংশ এলাকায় বাসোপযোগী হয়, এবং পরে ধীরে ধীরে কয়েকশত বৎসর ধরে অন্যান্য অঞ্চলে জনবসতি স্থাপিত হতে থাকে। 'শেরপুরের ইতিকথা' রচয়িতা অধ্যাপক দেলওয়ার হোসেন বলেন, বৌদ্ধযুগে বিভিন্ন সূত্র হতে প্রথম বারের মত বাংলাদেশের এই অঞ্চলের খোঁজ পাওয়া যায়। সূত্রগুলির মধ্যে মেগাস্থিনিসের বিবরণ, সমুদ্র গুপ্তের খোদিত লিপি এবং ইউয়েন সাঙের ভ্রমণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

৩০৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে গ্রীক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজ সভায় কিছুকাল অবস্থান করেন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। পরে তিনি ইন্ডিকা নামে একটি তথ্যবহুল ভ্রমণ কাহিনী রচনা করেন। সে পুস্তকে সন্নিবেশিত মানচিত্রে তিনি সমগ্র পূর্ববঙ্গ, মিথিলা ও মগধকে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত অঞ্চল বলে চিহ্নিত করেন। মেগাস্থিনিসের এই মানচিত্র থেকে পূর্ববঙ্গের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা গেলেও ময়মনসিংহ অঞ্চলটি সে সময় বাসযোগ্য ছিল কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত জানা যায়নি।

জনাব আবদুল্লাহ অনুমান করেন হিউয়েন সাঙ্গের বিবরণীতে এ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। ৭ম শতাব্দীর শেষার্ধে এই পরিব্রাজক কিছুকাল কামরূপ-রাজ ভাস্কর বর্মার রাজধানী প্রাগ-জ্যোতিষপুরে অবস্থান করেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে তিনি গারো পাহাড়ের দক্ষিণাঞ্চলকে নিম্ন ও আর্দ্র (Low and moist) বলে উল্লেখ করেন।

এ মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে 'মোমেনশাহীর নতুন ইতিহাস' প্রণেতা খানসাহেব এম. আব্দুল্লাহ বলেন, "এরূপাবস্থায় এই এলাকা সাকুল্যভাবে প্রকৃতরূপে জাগরিত হতে আরও প্রায় দুই তিনশত বৎসর সময়ের প্রয়োজন হওয়া কোন অস্বাভাবিক কথা নহে।" জনাব আবদুল্লাহর এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত। তবে সেই সঙ্গে পরে আরও কিছু অনুমান প্রসূত ইতিহাস সৃষ্টি হয়।

নিম্ন ও আর্দ্র অঞ্চল স্বাস্থ্যকর ও সুখপ্রদ না হলেও জনবসতির অযোগ্য নয়। তাই সে সমস্ত নিম্নাঞ্চলে কিছু কিছু জনপদের অস্তিত্ব ছিল, এ অনুমান অসঙ্গত নয়। তাছাড়া 'নিম্ন ও আর্দ্র' বলে কথিত বিস্তীর্ণ এলাকার কোন কোন অংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি ছিল, একথাও সঙ্গতভাবে অনুমান করা চলে।

জনাব আবদুল্লাহ আরো মন্তব্য করেন তাই হিউয়েন সাঙ্গ-এর বিবরণীর উপর ভিত্তি করে একথা বলা চলে যে সপ্তম শতাব্দীর কয়েকশ বছর আগে ময়মনসিংহ অঞ্চলেও লোকবসতি শুরু হয় এবং সমস্ত জেলায় বসতি স্থাপন সম্পূর্ণ হয় সপ্তম শতাব্দীর ও পরে। অধ্যক্ষ আবদুশ শাকুর উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক বিবরণী পর্যালোচনা করে বলেন যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীকে ময়মনসিংহে লোকবসতির সূচনা কাল বলে যে উল্লেখ করা হয়েছে, তা আনুমানিক। হিউয়েন সাঙ্গ এর সময় থেকে কয়েকশত বৎসর পিছিয়ে এসে ঐ সময় কাল নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে বহু বছর আগের এই অজ্ঞাত সময়কালটি দু'এক শো বছর আগে অথবা পরেও হতে পারে।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন তিব্বতী-বারমান গোষ্ঠীর একটি মিশ্রদল ময়মনসিংহ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। অনুমান করা হয় এদের পূর্বপুরুষেরা নব্যপ্রস্তর যুগে হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব গিরিপথ দিয়ে প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ্যে অবতরণ করে এবং কালক্রমে তারা দক্ষিণে সরে

www.pathagar.com

এসে ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়। পীত বর্ণবিশিষ্ট এই জনসমষ্টির অন্তর্ভূক্ত ছিল নেপালী, ভুটিয়া, নাগ্রা, কুকি, শান, অহম, কোচ, গারো ইত্যাদি।

'মোমেনশাহীর নতুন ইতিহাস' রচয়িতা খান সাহেব এম আবদুল্লা বলেন 'প্রথম আগমনে তারা সাধারণ গৃহস্থালীর উপযোগী ধাতব অস্ত্রাদির ব্যবহার জানত এবং শস্যাদি সাধারণভাবে উৎপাদন করত। তারা কিছু কিছু বস্ত্রাদি ব্যবহার করতেও শিখিয়েছিল। (নুরুল ইসলাম, ১৯৭৮) তাদের মধ্যে দেবতায় বিশ্বাসীরা প্রায় পাহাড়-পর্বতেই দেরতার আশ্রয় বলিয়া মনে করিত। (খান সাহেব এম আবদুল্লাহ, ১৯৭১) এদের সম্পর্কে আর কোন লিখিত বিবরণী না থাকলেও এদের প্রকৃতি ও আচরণ সম্পর্কে কিছু কিছু অনুমান করা চলে।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও সমাজ বিবর্তনের ধারা থেকে জানা যায় যে শুধুমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণেই এরা পূর্বপূরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে জঙ্গলাকীর্ণ ও নদীনালা বেষ্টিত নিম্নাঞ্চলে নেমে এসেছিল, একথা সত্য নাও হতে পারে। সামাজিক অথবা রাজনৈতিক নিপীড়নের ফলে অথবা তার আশংকায় তাদের অনেকে দেশ ত্যাগ করে আসতে পারে। কেউ কেউ হয়ত স্বদেশে ব্যর্থ হয়ে ভাগ্যোন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিকূল পরিবেশে ও এ এলাকায় ঘর বেঁধেছিল। কারণ যাই হোক না কেন, প্রথমদিকে উপনিবিষ্ট বহিরাগতদের বেশীর ভাগই ছিল বঞ্চিত ও বিত্তহীন। কায়কেশে এরা জীবন যাপন করতো, এবং সুখ ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য ছিল এদের কল্পনাতীত। এদের উচ্চাশা ছিল সীমিত, উদ্যম বাধাগ্রস্থ; তাই জীবনযাত্রার মান ছিল অত্যন্ত অনুন্নত। শতসহস্রাব্দকাল পেরিয়েও এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী কি উন্নয়ন ও আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েছে এ প্রশ্ন আজ সকলের!

নেত্রকোণার আদি সমাজ ব্যবস্থা

এই অঞ্চলের মানব সভ্যতার ঐতিহাসিক বিবর্তন পর্যালোচনান্তে অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব নিশ্চিহ্ন হবার পূর্বে এবং বল্লালী উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজ বংশের আগমনের সংগে সংগে পূর্ব ময়মনসিংহ তথা নেত্রকোণা অঞ্চলে একাদশ শতাব্দীতে আসেন হযরত শাহ্ সুলতান কমর উদ্দিন রুমী (রঃ)। আর্য সমাজের বল্লালী কৌলিন্য, বর্ণভেদ প্রথা এই অঞ্চলে তেমন প্রভাব বিস্তারের সক্ষম হয়নি। তাছাড়া ইসলামের শরীয়ত প্রথাও তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। পূর্বেকার বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, সনাতন কোনটাই নেত্রকোণার লোক সমাজে একক প্রভাব বিস্তারে সফল হয়নি। ইসলাম ধর্মের শরীয়ত প্রথা অপেক্ষা সূফীবাদের প্রভাব ছিল এই অঞ্চলে প্রকট। ফলে দেখা যায় নেত্রকোণা অঞ্চলে কোন ধর্মমতই এ এলাকার গণমানুষের চেতনাকে পরাভূত করতে পারেনি। তারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর লোকজ চেতনার সংগে নিজেদের অজান্তে আপোষ রফায় উপনীত হয়েছেন। প্রত্যেক ধর্ম প্রচারক নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে এখানে আগমন করে হাওড়ের উদার

www.pathagar.com

প্রকৃতি ও বৈচিত্রময় প্রাকৃতিক শোভায় হারিয়ে ফেলেন নিজেকে এবং গড়ে তুলেন এক নতুন সামাজিক বৈশিষ্ট্য। এই নতুন সামাজিক বৈশিষ্ট্য ছিল পান্ডব বর্জিত নেত্রকোণার সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের উৎস।

মদনপুরের কোচ রাজবংশ বা সুসংগের বৈশ্য গারো কোনটাই যুদ্ধ বিগ্রহে পরাজিত বা বিতাড়িত অনুমান করা সম্ভব নয়। বরং মদনপুরে হযরত শাহ্ সুলতান কমর উদ্দিন রুমী (রঃ)'র আগমন এবং সুসংগে সুমেশ্বর সিংহের বা মতান্তরে সুমেশ্বর পাঠকের আগমনের ফলে বৈশিষ্ট্য পূর্ণ নতুন সামাজিক যুগের সূচনাকাল অনুমান যথার্থ মনে করা হয়। আর এই নতুন যুগের সূচনাকে আদি জনগোষ্ঠী বা লোক সমাজের বিরুদ্ধবাদী প্রকৃতিকে পরাভূত করার লড়াইয়ে নিয়োজিত অংশের বিজয়ও বলা যেতে পারে। উপরোক্ত তথ্যাবলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে নেত্রকোণা জেলা মুলতঃ সামন্ত রাজ্য মদনপুর, সুসংগ ও খালিয়াজুরীর আধুনিক অবস্থার ঐক্যবদ্ধ রূপ। তবে সেকালের কোনো সময়েই নেত্রকোণা অঞ্চলের গ্রামীন পঞ্চায়েত ভিত্তিক স্ব-শাসনে আঘাত হানা হয়নি। ধর্মকর্ম ও মানবতার রসসিক্ত ছিল নেত্রকোণার লোক সমাজ। বাংলার বার ভূঁইয়ার শক্তিমান নেতা ঈশা খাঁ সুসংএর মহারাজা রাজ কৃষ্ণসিংহ বা চতুর্দশ শতাব্দির ভাটীরাজ্য খালিয়াজুরীর ত্রিয় সন্ন্যাসী লম্বোদর শাসনামলেও খাজনা প্রদান ব্যতীত গ্রামগুলো ছিল স্ব-শাসিত। আর অনাদিকাল থেকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কৃষি, পশুপালন, মৎস্য ও পাখী শিকার ছিল জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়। তাছাড়া প্রাকৃতিক ফলমুল ছিল পর্যাপ্ত। ফলে নিজস্ব কর্মকান্ডের মাধ্যমে অনেকটা স্বাধীনভাবে নেত্রকোণার লোক সমাজে গড়ে উঠে গ্রাম সভ্যতা। আর এই সামাজিক ভিতকে দৃঢ় করে তোলে লোকজ খেলাধূলা ও লোক সংস্কৃতি। পরবর্তী কালে মোঘল, পাঠান, সৈয়দ, শেখ কারো আগমনেই লোক সমাজ তার মৌলিক চরিত্র হারায়নি। ফলে এই লোকজ মূল্যবোধের চেতনা অনাগত কাল থেকে জাগ্রত ।

ব্রাহ্মণ নেতৃত্বঃ ষোড়শ শতাব্দীতে এ জেলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবল প্রভাবের ফলে সাধারণ জনগোষ্ঠী জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়। হিন্দু ও মুসলমান সমাজকে কিছুদিন অসহায় অবস্থায় থাকতে হয়েছিল। বৈষ্ণব মতের আবির্ভাব হিন্দু সমাজকেই অধিক পরিমাণে দুর্বল করে দিয়েছিল। এ সংঘর্ষ কিছু দিন চলছিল। ইতিমধ্যে সাম্য নীতির দোহাই দিয়ে বহু অধস্তন জাতি এসে বৈষ্ণব সমাজের কলেবর বৃদ্ধি করে দেয়। বহু হীন প্রকৃতির সম্মিলনে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে জাতিভেদ প্রথা স্থাপিত হয়। জাতিভেদ প্রথা রক্ষা করেও বৈষ্ণব সমাজের ব্রাহ্মণ নেতাগণ তাঁদের মতাদর্শ বহাল রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। তা বর্তমান সময় পর্যন্ত হিন্দু সমাজে এ ধারা অব্যাহতভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে বলে কেদার নাথ মজুমদার তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

পূর্ব ময়মনসিংহের সমাজপতিঃ ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে পূর্ব ময়মনসিংহের বল্লালী কৌলিন্য প্রবেশ করতে পারেনি। এ সমাজের উপর মুসলমানের প্রভাব অতিশয় অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। জঙ্গল বাড়ীর দেওয়ান, তাঁদের বংশধর ও পারিষদগণের প্রভাবে পূর্ব ময়মনসিংহের হিন্দু সমাজ গঠিত ও পরিচালিত হতো। দেওয়ানদিগের অধীনে যাঁরা প্রধান কার্যকারকের পদে কাজ করতেন তাঁরা রায় ও যারা নায়েবের কাজ করতেন, তাঁরা চৌধুরী উপাধি পেতেন। এরূপ বিভিন্ন কাজের জন্য মজুমদার, খাশনবিশ, কারকুন, শিকদার, তহবিলদার, খাঁ প্রভৃতি উপাধি প্রদান করা হতো। সমাজে এ উপাধির প্রচুর সম্মান ছিল এবং তা বংশানুক্রমে আবর্তিত। উপাধি অনুসারে এ সম্মানিত ব্যক্তিগণই সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন।

আদিকালের সামাজিক সম্প্রীতিঃ ইংরেজ শাসনামলে নেত্রকোণার বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট বড় অসংখ্য জমিদারী, তালুকদারী শাসনের গোড়া পত্তন হয়। সামাজিক সম্প্রীতির সাথে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মজুমদার, তালুকদার, চৌধুরী, ভূঁইয়া, ঠাকুর, সরকার পদবী নিয়ে চালিয়ে যায় সমাজ শাসন। নেত্রকোণার কিছু অংশ তখন করটিয়ার জমিদারদের করায়ত্ত ছিল। সম্রাট আকবর ও নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর আমল থেকে নেত্রকোণার বৃহৎ অংশ সুসং, গৌরীপুর, মুক্তাগাছা জমিদারীর অধীনে শাসিত হয়। এসময়ে সুসং রাজবংশের সমসাময়িক হয়রত নগর জমিদারির অধীনেও বর্তমানে নেত্রকোণার কিছু অংশ ছিল। তবে এইসব শাসন গ্রাম শাসনে তেমন কোন বিশেষ পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হয়নি। গ্রামগুলো তখনও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। ১৮৮১ সনের তথ্য বিবরণী থেকে জানা যায় নেত্রকোণা অঞ্চলে তখন হিন্দু ২,০৬,৬১৪ জন, মুসলমান ৩,৫৮,০৩২ জন, প্রেতোপাসক ৯,৫০৪ জন এবং খ্রীষ্টান ৬১৭ জন বসবাস করত। অসংখ্য বর্ণ-গোত্রের লোক বসতি নেত্রকোণায় ছিল। এ অঞ্চলের সামাজিক সম্প্রীতি গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বলে বেড়াত

"নবজাতে বসতি
গ্রামে আনে শান্তি।"

বিভিন্ন জাতি, বর্ণের ও গোত্রে লোকজনের সমন্বয়ে গঠিত নেত্রকোণার সমাজ কাঠামোতে কোনো বিচ্ছৃংখলার ও অশান্তির সৃষ্টি হয়নি। ফলে গড়ে উঠে সম্প্রীতির বৈচিত্র্যময় জগত যা অপূর্ব সম্প্রীতির ঐতিহ্য বহন করে গোলাম এরশাদ তাঁর গ্রন্থে নেত্রকোণার আদি সমাজের বিকাশ এভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের জীবন জীবিকার কর্মকান্ড থেকে আমোদ প্রমোদ, খেলাধূলা সবকিছুতে ছিল সকলের সম অংশীদারিত্ব ও বিরল স্বতঃস্ফূর্ততা। প্রতি পাড়া গ্রামেই গড়ে উঠতো অঞ্চল ভিত্তিক খেলার দল। প্রায় প্রতি গ্রামেই খেলার মাঠ ছিল যেখানে প্রতিদিন বিকেলে খেলা হতো। হাট বাজারের দিন বিভিন্ন গ্রাম বা পাড়ার দলের মধ্যে ম্যাচ খেলা হতো। উল্লেখ যোগ্য খেলার মধ্যে ছিল ফুটবল, দাড়িয়াবান্দা, হাডুডু ইত্যাদি যা বর্তমানে বিলুপ্ত প্রায় সে সাথে হাঁরিয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার বছরের লালিত এ

www.pathagar.com

অঞ্চলের সামাজিক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতাবোধ। পরিনামে দেখা দিয়েছে সর্বস্তরে সামাজিক অবক্ষয় ও অস্থিরতা ।

ভৌত অবকাঠামোঃ যাতায়াত ব্যবস্থা

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানুষের জীবনযাপনকে টেক্‌সই ও আরামদায়ক করার পূর্ব শর্ত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। প্রাচীন সকল উন্নত সভ্যতাই কোন না কোন নদীকে ভিত্তি করে তার প্রাণশক্তির সক্রিয় বিকাশ সাধন করেছিল। মিশরীয়, ভারতীয়, ব্যাবিলনীয়, অ্যাসিরীয়, চৈনিক প্রভৃতি সভ্যতা বিকাশের মুলে নদীর দান সর্বাধিক। পরবর্তীকালে গ্রীক রোমান সভ্যতা সমুদ্রনির্ভর। ভারতীয় সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রেও সমুদ্রের দান যথেষ্ট। সমুদ্র যাত্রার মাধ্যমেও ভারতীয়রা দেশ দেশান্তরে পণ্যের পাশাপাশি সভ্যতা সংস্কৃতির আদান-প্রদান করেছিল। পায়ে চলার ভালো পথ থাকলেও সভ্যতা সংস্কৃতি বিকাশে তা তুলনামূলকভাবে কম গুরূত্ব বহন করেছে। অবশ্য ভারতের উপর পশ্চিম সীমান্তে খাইবার বোলান ইত্যাদি গিরিপথগুলির মাধ্যমে এই উপমহাদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকেই অভিযাত্রী দলের মহা আগমন সূচিত হয়েছে। কখনও তা হয়েছে মঙ্গলের বার্তাবহ, আবার কখনও অমঙ্গলের মৃত্যুদূত।

পূর্ব ময়মনসিংহ বিশেষত নেত্রকোণায় যে এক সময়ে সাগর গর্ভে নিমজ্জিত ছিল, তার প্রমাণ স্বরূপ এর অধিকাংশ অঞ্চল এখনও বছরের কমপক্ষে পাঁচ মাস জলগর্ভে থাকে। এ সময়ে ঐ সমস্ত এলাকার নৌযান ছাড়া যাতায়াত অসম্ভব ছিল প্রায়। আবার কিছুটা সময় না নৌকা না পায়ে হাঁটা, এক অদ্ভুত বিড়ম্বিত অবস্থা।

ভূতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বৃহত্তর ময়মনসিংহকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাবে। (ক) হাওর, বাওর বিলঝিলে পরিপূর্ণ পূর্ব ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা। এ অঞ্চলের অধিকাংশ পাঁচ মাস পানির নীচে থাকে। জনবসতি খুব ঘন নয়। বর্ষাকালে নৌযান ছাড়া চলাচল অসম্ভব। (খ) জঙ্গল ও গড়ে পরিপূর্ণ মধ্য-দক্ষিণ অঞ্চল। এখানেও জনবসতি বিরল। কিছুটা অংশে গারো অধিবাসীদের বসতি, বিশেষত গারো পাহাড় ও মধুপুর অঞ্চল নদীনালাও বিরল। চলাচলের রাস্তাও তুলনামূলকভাবে কম। (গ) জেলায় বাকী অংশ ঘন জনবসতিপূর্ণ সমতল ভূমি। এখানে বেশ কিছু নদী-নালা বিল-ঝিলও আছে। তবু অন্যান্য জেলার তুলনায় এ জেলায় রাস্তাঘাটের প্রাচুর্য বর্তমানেও অনেক কম ।

www.pathagar.com

প্রথমতঃ উত্তরের গারো পাহাড় এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এ অঞ্চলের নদীগুলি খুবই খরস্রোতা, যার ফলে বড় নৌকা বা অন্য কোন জলযান এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিলনা। আদি কাল থেকেই এ অঞ্চলের মানুষ নদী পারাপারের ক্ষেত্রে তারা তাল গাছের ডোঙ্গা অথবা পাহাড় থেকে ভেসে আসা আস্ত বড় গাছগুলির কান্ড ভিতর দিয়ে গর্ত করে 'কুন্দা' জাতীয় নৌযান তৈরী করে পারাপারের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করেছে, কোন কোন দুর্গম এলাকায় এখনও এই জাতীয় নৌযান রয়েছে। এ যানগুলির বিশেষত্ব হলো গাছটির কান্ডটিকে শুধু গভীর ভাবে কুপিয়ে কাঠ কেটে তার মধ্যে মানুষ বা পণ্য সামগ্রী পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়। এই জাতীয় জলযান জেলার উত্তরাঞ্চলেই শুধু দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও ক্ষুদ্র জলাশয় বা ছোট নদী খাল পার হতে মানুষ কলা গাছের ভূরা (ভেলা) তৈরী করে তা দিয়ে চলাচল করে থাকে। কলা গাছের 'ভূরা' সারা বাংলাদেশের মত নেত্রকোনার অত্যন্ত জনপ্রিয় বাহন। অধ্যাপক আনোয়ারুল হাকিম খান তাঁর প্রবন্ধে এ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উপরোক্ত ভাবেই বর্ণনা করেছেন।

অতীতে যখন মানুষ ব্যবসা বাণিজ্যে যেত, তখন বিভিন্ন নামের অপূর্ব, সুন্দর নৌকার প্রচলন যে এদেশে ছিল, তা আমরা সুকবি নারায়ণ দেব ও পন্ডিত জানকীনাথ বিরচিত পদ্ম পুরাণে পূর্ব ময়মনসিংহের নৌকা গঠনের বর্ণনা থেকেই দেখা যায়, এখানে তার সামান্য উদ্বৃতি দেয়া হল ঃ

পাট বর্ম করি সারা, সুতায় বেড়িয়া দাঁড়া
জানাইল চান্দের গোচর।
দেখে দিন শুভক্ষণ, করিতে নৌকা গঠন,
আদেশ করিলা সদাগর।।
চন্ডীকার শ্রীচরণ, করিয়া কিরে বন্ধন,
গঠন করিলা ডিঙ্গা দাঁড় ... ...
সেই দাঁড়াল ৬ বার ; মিলে যত সূত্রধর ;
লাগাইল সিন্দুরের ফোটা।
দুপাশে লাগায় বাট, দিয়া মন পবনের কাঠ
ডিঙ্গা নায়ে নাই টোটাফাটা ... ...
পাট কর্ম হইল সারা, লাগাইল বাঁকা গোড়া,
সোনা-রূপা লাগায় পাথর।
গাব কষ দিয়া নায়, নামাইতে সাধু কয়
আসিয়া মিলিল প্রজাগণে।। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অধ্যাপক আনোয়ারুল হাকিম খান তাঁর প্রবন্ধে আরো উল্লেখ করেছেন যে মানুষ ও মাল চলাচলের ক্ষেত্রে আরেক শ্রেণীর নৌকার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। আদিকালে

www.pathagar.com

পূর্ব ময়মনসিংহের ঠাকুরাকোণা থেকে মদন পর্যন্ত নদীপথে ঢাকা থেকে আগত গহনার নৌকা মানুষ ও মালামাল পরিবহন করতো। এ নৌকাগুলি বেশ প্রশস্ত ও লম্বা ছিল। প্রচুর লোকজন এগুলিতে চলাচল করতে পারতো।

এ যোগাযোগের পথ ও নিরাপদ ছিল না, কারণ এ দীর্ঘ রাস্তায় চোর ডাকাতের উপদ্রব ও ছিল মারাত্মকভাবে। স্থল পথের মত জলপথেও চোর ডাকাতের আক্রমণ বহু প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছে। রাত্রিকালে নৌকা বা লঞ্চ চালানো অত্যন্ত বিপদজনক ছিলো। ময়মনসিংহ জেলা স্থাপিত হলে পরে নৌকায় যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। মদন নামে জনৈক ডাকাত নদীপথে ডাকাতি করতো। এক পর্যায়ে সে সুবেদারের ভ্রাতুস্পুত্রকে হত্যা করে। কালেক্টার তাকে ধরিয়ে দেবার জন্য ৩০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। পরবর্তিতে আলাপসিংহের জমিদারের সাহায্যে মদন ডাকাতকে ধরে ফাঁসিতে ঝুলান। তার নামে যে ছড়া প্রচলিত ছিল তা নিম্নরূপ ঃ

"মদন ডাকাতের ডরে
জ্ঞান থাকেনা ধড়ে
বাঁশের চুঙ্গায় খায় জল
সুবেদারের ভাইস্তা মইল
বৈকুণ্ঠ বাড়ী বেয়ার রইল
কে আর কি করব বল।"

যাতায়াতের আদি অবস্থা

অধ্যাপক আনোয়ারুল হাকিম খান তাঁর প্রবন্ধে পূর্ব ময়মনসিংহের আদি যানবাহনের বর্ণনা করে বলেন নদীনালা, হাওড় বিল, পাহাড়, উচচমালভূমি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ভূ-অবস্থানের জন্য জনসাধারণ বিভিন্ন প্রকার যানের আশ্রয় গ্রহণ করতো। সবচেয়ে সহজ যে যানটি ছিল তা হলো দু'পা। পায়ে হেঁটে একস্থান থেকে অন্য স্থানে গমনাগমন সবচেয়ে বেশী প্রচলিত ছিল। যার ফলে কোন কাজে যেতে বা সংবাদ প্রেরণ করতে হলে প্রচুর সময় ব্যয় হতো, আগেকার দিনে মানুষের কাছে সময় ছিল অফুরন্ত, তবে বর্তমানে সে অবস্থা সম্পূর্ন ভিন্ন এখন সময়ের মূল্যই সবচেয়ে বেশী। নদীনালা যেহেতু এ জেলায় সবচেয়ে বেশী তাই এখানকার লোকেরা ব্যাপক হারে নৌকার ব্যবহার করতো। বিভিন্ন প্রকারের নৌকা লোক ও মাল বহনের জন্য অতীতকালেও যেমন ব্যবহার হতো, বর্তমানেও তেমন হয়, তবে তা ইঞ্জিন চালিত। বড় লোকেরা বিশেষ করে সভ্রান্ত বংশীয় নারীরা পাল্কী চড়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমনাগমন করতেন। দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঝি-বউরা, গরু কিংবা মহিষের গাড়িতে করে তাদের 'নাইওর' যাওয়ার কাজ চালাতো অতি প্রাচীন থেকে হাতী এদেশে ব্যবহৃত হতো।

দূর্গাপুরের মহারাজাদের নিজেদের হাতী ধরার খেদা ছিল। জমিদার শ্রেণীর লোকেরা অবস্থাপন্ন অন্যান্য পেশার লোকেরা অভিজাত্য প্রদর্শনের জন্য বিবাহ-শাদী বা অন্য

www.pathagar.com

কোনস্থানে গমনাগমনের জন্য হাতী ব্যবহার করতেন। বড় লোকেরা ঘোড়ায় বা টাট্টুতে চড়ে চলতে ভাল বাসতেন। এ সমস্ত ঘোড়া সাধারণতঃ পশ্চিম দেশসমূহ হতে সংগৃহীত হতো। ঘোড়ার গাড়ীও জেলার বড় বড় শহরগুলিতে ব্যবহৃত হতো যাকে টমটম বলে। প্রথম শ্রেণীর গাড়ী থেকে তৃতীয় শ্রেণীর সকল প্রকার গাড়ী এ জেলায় উনবিংশ শতক এমন কি বিংশ শতক পর্যন্ত ব্যবহৃত হতো। এক ঘোড়ার গাড়ী অর্থাৎ টমটম নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ব্যবহার করতো। ধান, পাট ও অন্যান্য মাল বহনের জন্য গরুর গাড়ী সময় বিশেষে মহিষের গাড়ীও ব্যবহার করা হতো। নেত্রকোণার উত্তরাঞ্চলে ফকিরের বাজার ও জারিয়া ঝাঞ্জাইল বিরাট বিরাট ধানের ও পাটের আরদ ছিল যেখানে গরুর গাড়ি ও মহিষের গাড়ি ধান, পাট ও মালামাল পরিবহণ করা হতো। এখনও গ্রামাঞ্চলে গরুর গাড়ীর প্রচলন কম নয়। নেত্রকোণা নিম্নাঞ্চল বলে যাতায়াত ও মাল পরিবহনের জন্য এ জেলায় নৌকার ব্যবহার অত্যন্ত বেশী।

সড়ক ও জনপথ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালের দিকে প্রথম এজেলায় পেট্রোল চালিত বাস ও ট্রাক চলতে দেখা যায়। তারপর ধীরে ধীরে বাস ও ট্রাকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজরা যখন এদেশ ছেড়ে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তখন বাস ও ট্রাকের চলাচলের ক্ষেত্রে এক বিরাট অগ্রগতি ঘটে। স্থানীয় কিছু সংখ্যক ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এ বাস কিনে তা জেলার মধ্যে নিয়মিত চালাবার ব্যবস্থা করেন।

১৯৪৬ সালে এ জেলায় সর্ব প্রথম জনাব এলাহী নেওয়াজ বেগ বাস-ট্রাকের ব্যবসা শুরু করেন। এরপরই আসেন Tangail General Trading & Transport Company (T.G. & T.Co.)। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ঃ ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ-হালুয়াঘাট, জামালপুর-শেরপুর, ময়মনসিংহ-ঢাকা, (টাঙ্গাইল হয়ে) প্রভৃতি বাসপথগুলি প্রচলন লাভ করে। এরপর থেকে ক্রমে ক্রমে জেলার অন্যান্য পথ সমূহে বাস চলাচল শুরু হয়। ১৯৫৮ সালে এ জেলায় প্রথম ডিজেল চালিত বাস পরিবহন শুরু হয়। ১৯৬৪ সালে উন্নত মানের সুপিরিয়র কোচ চালু হয় এবং ১৯৮০ সালের দিকে আসে মিনি বাস বা কোস্টার।

নেত্রকোণা ময়মনসিংহ সদর (২৫ মাইল) ও কিশোরগঞ্জ (৪১ মাইল) এর সাথে বাঁধানো রাস্তার দ্বারা যুক্ত ছিল এবং এ পথ দিয়ে সারা বছর চলাচল করা যেতো। নেত্রকোনা থেকে দূর্গাপুর পর্যন্ত রাস্তাটি কংসের তীরে জারিয়া পর্যন্ত মোটামুটি চলার উপযোগী ছিল। বরানগর রাস্তা খুবই ভাঙ্গা ছিল এবং সুমেশ্বরী নদীটি শীতকালে এত অগভীর হয়ে যেতো যে এর উপর দিয়ে নিয়মিত ফেরীর ব্যবস্থা করা যেতো না। বালুচরটা ছিল খুবই বিপদজনক, যার ফলে পথপ্রদর্শক ভিন্ন পারাপার অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ছিল নেত্রকোণা থেকে একটি ভাল রাস্তা পূর্বধলা পর্যন্ত গিয়েছিল, যা ইসলামপুরের কাছে শম্ভুগঞ্জ দুর্গাপুরের রাস্তাকে স্পর্শ করেছিল। দেওখোলা হয়ে দূর্গাপুরগামী রাস্তাটি তখনো গরুর গাড়ী চলার উপযোগী

ছিলনা। ইদানিংকালে কিছু উন্নতি হলেও রাস্তাঘাট সময়ের চাহিদা মিটানোর মত উপযোগী নয়।

নেত্রকোণা থেকে পূর্বদিকে বারহাট্টা হয়ে মোহনগঞ্জ পর্যন্ত (১৬ মাইল) ও তেলিগাতী (১০ মাইল) রাস্তা ছিল। এ স্থানটি ময়মনসিংহ গৌরীপুর হয়ে কেন্দুয়া থানা পর্যন্ত চমৎকার সাইকেলে চলাচলের উপযোগী রাস্তার মধ্যবর্তী স্থান ছিল। ময়মনসিংহ থেকে ঈশ্বরগঞ্জ সান্দিকোনা থেকে কেন্দুয়া (৩৪ মাইল) গামী রাস্তাটির সব স্থানে প্রয়োজনীয় সেতু ছিল এবং এটি দু'মাইল পূর্বে হাওর ও বোরো জমির সীমান্তবর্তী গোগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হাওর এলাকায় ধরতে গেলে দক্ষিণ দিকে খুবই অপ্রশস্ত, করিমগঞ্জ-বাদলা রাস্তা এবং মোহনগঞ্জ বারহাট্টা রাস্তা ছাড়া কোন পথই ছিল না। দূর্গাপুর, নাজিরগঞ্জ থেকে তেলিগাতি গোগলাবাজার ও নীলগঞ্জ হয়ে ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ কটিয়াদি পর্যন্ত এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে চলাচল করতে গেলে ছোট ঘোড়া ছাড়া চলার কোন ব্যবস্থা ছিল না। বর্ষাকালে হাওর এলাকায় নৌকায় চলাচল করা যায় বটে, সারা বৎসর ব্যাপী নৌপথ বলতে গেলে নেই। কেবল মাত্র ধনু নদীই একমাত্র নদীপথ। নেত্রকোণার পূর্বাঞ্চল যাতায়াতের দিক থেকে আজো অত্যন্ত অনুন্নত।

রাজধানীর সঙ্গে জেলা ও উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা

রেল ও সড়ক যোগাযোগ : সড়ক পথে বা রেল যোগে ঢাকা থেকে নেত্রকোণা যেতে ৪ থেকে ৬ ঘন্টা সময় লাগে। সড়ক পথে মহাখালী বাসস্ট্যান্ড হতে ১৬২ কি.মি. ঢাকা-নেত্রকোনা সরাসরি বাস যোগাযোগ রয়েছে। আন্তঃ উপজেলা এবং জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার বিবরণী ৩.৪ এ দেখানো হলো।

সারণী-৩.৪ আন্তঃউপজেলা/জেলার যাতায়াত ব্যবস্থা

উপজেলার নাম	জেলা সদর হতে দূরত্ব	যোগাযোগের বিবরণ	রাস্তার ধরণ/ প্রকৃতি
দূর্গাপুর	৪৫ কি.মি.	বাস, ট্রেন, লঞ্চ	পাকা, রেল ও নদী পথ
কলমাকান্দা	৩৩ কি.মি.	বাস, ট্রলার	পাকা, নদীপথ
পূর্বধলা	২০ কি.মি.	বাস, ট্রেন	পাকা, রেলপথ
মদন	৩০ কি.মি.	বাস, ট্রলার	পাকা, নদীপথ
মোহনগঞ্জ	৩০ কি.মি.	বাস, ট্রেন, ট্রলার	পাকা,নদীপথ, রেলপথ
খালিয়াজুড়ি	৫৫ কি.মি.	বাস, ট্রলার	পাকা, নদীপথ
আটপাড়া	১৯ কি.মি.	বাস, ট্রলার	পাকা, নদীপথ
বারহাট্টা	১৬ কি.মি.	বাস	পাকা
কেন্দুয়া	২৭ কি.মি.	বাস	পাকা

উৎস ঃ জেলা প্রশাসন, ২০০৫

www.pathagar.com

জেলার খালিয়াজুরী উপজেলাটি এখনও বিচ্ছিন্ন দ্বীপাঞ্চল। জেলা সদরের সাথে খালিয়াজুরী উপজেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনো গড়ে উঠেনি। তবে বর্ষাকালে নৌপথে এ উপজেলায় যোগাযোগ অত্যন্ত সুবিধাজনক ।

রেলওয়ে যোগাযোগ

ট্রেন যোগাযোগ ঢাকা কমলাপুর রেলস্টেশন হতে আন্তঃনগর তিস্তা, একতা, অগ্নিবীণা বা যমুনা এক্সপ্রেসে ময়মনসিংহ রেলওয়ে জংশন পর্যন্ত গিয়ে, ময়মনসিংহ থেকে মোহনগঞ্জ লোকাল ট্রেনে এবং ভৈরব থেকে গৌরিপুর জংশন পৌঁছে মোহনগঞ্জ ট্রেনে নেত্রকোনা যাওয়া যায়। এই লাইনটি ১৯২৯ সালে খোলা হয়। নেত্রকোণা মহকুমার সাথে যোগাযোগের এটিই প্রধান রেলপথ। এ জেলায় রেল পথের মোট দূরত্ব ১৮৩ কিলোমিটার যা ময়মনসিংহ থেকে একটি লাইন নেত্রকোনা হয়ে মোহনগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়া অন্য লাইনটি ময়মনসিংহ থেকে গৌরীপুর, শ্যামগঞ্জ হয়ে জারিয়া ঝাঞ্জাইল পর্যন্ত গিয়েছে।

এই রেল লাইনগুলি ছাড়াও দু'একটি রেললাইন খোলার পরিকল্পনা প্রাচীন দলিল ও নক্সায় দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, জারিয়া থেকে কংস ও সুমেশ্বরী নদী পেরিয়ে গারো পাহাড়ের পাদদেশে দূর্গাপুর স্পর্শ করে গারো পাহাড় অতিক্রম করে জানকারাই নামক স্থান পর্যন্ত রেললাইন স্থাপন করা। প্রাথমিকভাবে মাটি, কাটার কাজ পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে কোন অজ্ঞাত কারণে এ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। অপর একটি রেল লাইনের নক্শাও দেখতে পাওয়া যায়, গৌরীপুর থেকে উত্তর পশ্চিম কোণে ফুলপুর আমতৈল, নালিতাবাড়ী অতিক্রম করে ময়মনসিংহ জেলার একেবারে গারো পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত রেল লাইন স্থাপন। তৃতীয় যে লাইনটির নক্শা পরিলক্ষিত হয়েছে, তা হলো ময়মনসিংহ ভৈরব বাজার লাইনের বাজিতপুর ষ্টেশন থেকে একটি শাখা লাইন কিছুটা উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে হোসেনপুরকে স্পর্শ করে আঠারোবাড়ী ষ্টেশনকে ছেদ করে কেন্দুয়া হয়ে তিয়শীর পাশ দিয়ে মদন থানার ফতেপুর পর্যন্ত একটি রেললাইন স্থাপন। কিন্তু, কাগজে কলমে থাকলেও এ সমস্ত পরিকল্পনা অবশেষে পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

সত্যিকার অর্থে যদি এই সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতো, ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর ও পূর্বদিকে যাতায়াতের ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থা বর্তমানে বিরাজ করছে, তা অনেকাংশে দুরীভূত হতো। বিশেষ করে উত্তর দিকে সুসঙ্গ-দুর্গাপুর, নালিতাবাড়ীতে যাতায়াতে যেমন দুরূহ, রেললাইন স্থাপন করলে তা এত দুরূহ থাকতো না। ফতেপুর পর্যন্ত রেললাইন স্থাপিত হলে নেত্রকোণায় ভাটি অঞ্চলের মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রে যে দুর্ভোগ বিদ্যমান রয়েছে তার কিছুটা উপশম হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ সমস্ত পরিকল্পনা হিমাগারেই পড়ে রয়েছে। আঞ্চলিক শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ব্যতিত বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন দু:সাধ্য ব্যাপার। শ্যামল ছায়া অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সজ্জিত, নেত্রকোণার

www.pathagar.com

পাহাড়ি অঞ্চলের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার আজ ভীষণভাবে অর্থলিপ্সুদের হাতে নির্বিবাদে লুন্ঠিত। এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য সোচ্চার হতে হবে তৃণমূল পর্যায়ে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকেই। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সুদৃষ্টি পেলে এ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা সম্ভব হতো, এখানকার সিরামিক ও পর্যটন শিল্পের বিরাট সম্ভাবনাকে ও কাজে লাগানো যেতো। এ সব উন্নয়ন কর্মকান্ড হাতে নিলে সৃস্টি হবে কর্মসংস্থানের, এ অঞ্চলের অবহেলিত জনগোষ্ঠী মুক্তি পাবে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে ।

সর্বোপরি ঢাকা বিভাগের অন্যান্য জেলার তুলনায় নেত্রকোণা জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব উন্নত নয়। এ জেলা নিচু এলাকা বলে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত নয়। কাঁচা সড়ক রয়েছে ১৬৬০ কিঃ মিঃ এবং পাকা সড়ক রয়েছে মাত্র ৫৬৬ কিঃ মিঃ যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। নদীর সংখ্যা অনেক থাকলেও দেশের অন্যান্য নদী মত এ জেলার নদীগুলি ও নব্যতা হারিয়েছে। ফলে বর্তমানে নদী পথ রয়েছে প্রায় ২০০ মাইল। অথচ বর্ষাকালে অনেক উপজেলার একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম হলো নৌপথ। ঘন-ঘন নদী থাকায় জেলা বা উপজেলা সদর দপ্তর থেকে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুরূহ।

গৃহ নির্মাণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও সংরক্ষণ

গৃহ নির্মাণের বৈচিত্র্য

অধ্যাপক শরফুদ্দিন তাঁর প্রবন্ধে এ অঞ্চলের পরিবেশ সম্মত গৃহ ও গৃহ আঙ্গিনা সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন যে মানুষ গুহাবাসী হলেও সময়ের চাহিদা অনুসারে ক্রমান্বয়ে তাদের জীবন সংগ্রামের চেতনা থেকে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার বিকাশ ঘটেছে। এভাবে ধীরে ধীরে গৃহ নির্মাণ কৌশল উদ্ভাবন থেকে শুরু করে এক সময়ে গৃহবাসী হয়ে ওঠে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ু আবহাওয়া কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ইত্যাদির কারণে গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রেও দেখা যায় নানা বৈচিত্র্য। তাই বরফের দেশে এস্কিমোদের যে বাসগৃহ, তার সঙ্গে মরু এলাকার বেদুইনদের বাসগৃহের রয়েছে বিরাট পার্থক্য। অনুরূপভাবে সমতল ভূমির গৃহগুলোর আকার আকৃতি ও গঠনের সঙ্গে পাহাড়ী এলাকার গৃহগুলোর নানা দিক থেকেও বহু পার্থক্য রয়েছে। কালের আবর্তে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আঙ্গিকে গৃহ নির্মাণ, গৃহসজ্জা এবং গৃহ পরিচর্যায় এসেছে ব্যাপক বৈচিত্র্য।

এই অঞ্চলের রাজনৈতিক এই উত্থান পতনের পথ ধরেই এ অঞ্চলে বিভিন্ন বৈদেশিক প্রভাব ভাষা সংস্কৃতি শিল্প সাহিত্য ইত্যাদিকে প্রভাবিত করেছে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে বাসগৃহ নির্মান ও সজ্জিত করণেও বিদেশীদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অনার্যদের শাসন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই গৃহ নির্মান কলা-কৌশল ও সাজ-সজ্জার ক্ষেত্রে অন্যান্য অঞ্চলের মতো এ অঞ্চলেও গৃহ নির্মাণ

www.pathagar.com

ও সজ্জার ক্ষেত্রেও রয়েছে বহু বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য। তাছাড়া এই অঞ্চলের ভু-প্রকৃতি ও ভৌগোলিক পরিবেশের কারণেও এ অঞ্চলের ঘর-বাড়ীগুলি নির্মানে যথেষ্ট স্বকীয়তা এনেছে। প্রায় সব স্থানে মানুষের বসবাস থাকলেও তাদের জীবন ধারণ ও জীবিকা আহরণে পদ্ধতি রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন। তাই পাহাড় বা বনাঞ্চলের মানুষের জীবন যাত্রার সঙ্গে নিম্নাঞ্চল বা ভাটি অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন যাত্রার অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তেমনি গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার সঙ্গে উচ্চবিত্ত আধুনিক নাগরিক জীবনের জীবন যাত্রার বৈপরীত্য ও রয়েছে ব্যাপক। বসবাস বা অন্যান্য প্রয়োজনে নির্মিত ঘর বাড়ীর মধ্যেও অঞ্চল ভেদে পার্থক্য দেখা যায়।

গৃহনির্মাণে প্রাকৃতিক সম্পদ, বাঁশ ও বেঁতের ব্যবহার

জেলার ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, মধ্যযুগে মুসলমান অঞ্চলে অর্থাৎ পাঠান ও মোগল শাসনামলে বহু মন্দির মঠ মসজিদ যে ইট কাঠ ও পাথর দিয়ে তৈরী হয়েছিলো এখনও কিশোরগঞ্জ-নেত্রকোণায় প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তার স্বাক্ষর রয়েছে। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে মুসলমান আমলে তৈরী মসজিদ এখনও বর্তমান। তবে গৃহনির্মাণ ক্ষেত্রে অনার্য কাল থেকে মধ্যযুগের মুসলমান আমল পর্যন্ত যে ইটের ব্যবহার হয়েছে তার আকৃতি ও প্রকৃতি ছিলো ভিন্ন রূপ। বর্তমান কালের ইটের চেয়ে সেগুলো ছিলো দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ছোট আকৃতির। আর শক্ত ছিলো পাথরের মতো। চুন, সুরকি কাঁদামাটি দিয়ে সেগুলো গাঁথা হতো। কদাচিৎ দরজা জানালায় পাথর ব্যবহার করা হত। বিশেষ করে মুসলমান আমলেই ইটের ও কাঠের পাশাপাশি পাথর ব্যবহৃত হয়। মসজিদের গম্বুজে, খিলানে, স্মৃতিসৌধে সমাধিতে এই পাথর ব্যবহার করা হোত। মূলতঃ এই ইট, কাঠ ও পাথরের ব্যবহার জমিদার, সামন্ত, রাজা-বাদশাহ্ ও তাদের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের ঘর বাড়ীতেই ছিলো। কারণ এই সমস্ত নিয়ে ঘর বাড়ী নির্মাণ করতে যে অর্থ ব্যয় হত, সে সামর্থ সকলের ছিলো না। সারা দেশে ব্যাপক উন্নয়ন সত্ত্বেও কয়েক শতাব্দী পরও এ অঞ্চলের সামাজিক বৈষম্যের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। এ বিষয়ে সমীক্ষা করা হলে আরো খারাপ চিত্রই পাওয়া যাবে।

এ অঞ্চলের অতীতের অনেক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত না থাকায় অধ্যাপক শরফুদ্দিন তাঁর প্রবন্ধে সাহিত্য উপকরণ দিয়ে অনেক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ননা করেছেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বর্ণনা করেন যে ময়মনসিংহ গীতিকার বহু পালাতেও এহেন জীর্ণ ঘরের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। শুধু ময়মনসিংহের নয়-সমগ্র বাংলাদেশের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর আত্মকথন অংশে নিজের পরিচয় প্রদানে এই চিত্র বাস্তবতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। নিজের দরিদ্রতম অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন।

www.pathagar.com

"ঘরে নাই ধানচাল চালে নাই ছানি,
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি।"

কবি চন্দ্রাবতীর মতই এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর অবস্থা ছিলো খুবই করুণ। ক্ষণস্থায়ী ঘরগুলোতে কোন রকমে মাথা গুঁজে তারা কালাতিপাত করতো। তাদের কথাতেই তাদের ঘর বাড়ির অবস্থা কেমন ছিলো তার আভাস পাওয়া যায়। কচু পাতার ছানি আর ভেরনের ঠুনি।' অর্থাৎ কচুর পাতা দিয়ে তাদের গৃহের ছানি দেয়া, আর ভেরেন্ডা গাছ নিয়ে দেওয়া হয়েছে খুঁটি। একটু ঝড়বৃষ্টিতেই তা উড়ে যেতো এবং বিনষ্ট হতো।

একটু উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ বা জমির মালিক যে সমস্ত ঘরে বাস করতো তা-ও তৈরী হোত বড়জোর বাঁশ, বেত, ছন, বন, নলখাগড়া, পাটশলা ইত্যাদি সাধারণ উপকরণ দিয়ে। বর্তমানে আধুনিক কলা-কৌশলে ও শৈল্পিক নৈপূণ্যের ফলে এসব প্রাকৃতিক ঘরের মূল্য ও তাৎপর্যই আলাদা। বিশ্বের সর্বত্র সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী কালে গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে আরো সুষ্ঠু চিন্তা ভাবনা প্রসার হয়। পরিকল্পিত উপায়ে গৃহগুলো শৈল্পিক নৈপূণ্য তৈরী হতে থাকে। গৃহের পরিবেশ সুন্দর ও মনোরম করার প্রায়াস দেখা যায়। গৃহসজ্জাতেও আসে কলানৈপুন্য। তাই বর্তমান কালে তৈরী ঘর বাড়ীগুলো যে সেই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চিন্তা চেতনারই পরিবর্তিত ও উন্নত সংস্করণ রূপ, তার সত্যতা নির্ণয় করতে গিয়ে ডঃ নীহার রঞ্জন রায় বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্বে বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে- 'সাম্প্রতিক বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে আজও বাঁশ বা কাঠের খুঁটির উপর চতুষ্কোণ নকশার ভিত্তিতে মাটিতে দেয়াল বা বাঁশের চাচারীর বেড়ায় যে ধরণের ধনুকাকৃতির দো-চালা, চৌচালা, আট-চালা ঘর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ধরণের বাংলা ঘর রচনাই ছিল প্রাচীন রীতি নামে খ্যাত। তাই পরবর্তীকালে মধ্য যুগীয় ভারতীয় স্থাপত্যের বাংলার দান বলিয়া গৃহীত ও স্বীকৃত হয়েছিল। এই গঠন ও আকৃতিই অষ্টাদশ উনবিংশ শতকে "বাংলা বাড়ী" নামে ইঙ্গভারতীয় সমাজে পরিচিতি লাভ করে। এই ধরনের গৌরীয় রীতির আবাস গৃহই গরীবের কুটির হতে আরম্ভ করে ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃত ছিল। পার্থক্য যাহা ছিল তাহা শুধু সমৃদ্ধি ও অলংকরণে। দ্বিতল, ত্রিতল গৃহও এই রীতিতেই নির্মিত হতো; উপরের চাল বিন্যস্ত হত ক্রম.হ্রাসমান ধনুকাকৃতি রেখায়।'

নির্মাণ কৌশল ও বৈশিষ্ট্যের দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায় যে সাধারণতঃ এই গৃহগুলোর ছাউনি দেয়া হতো এই অঞ্চলে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপরকণ দিয়ে। ময়মনসিংহ গীতিকায় চন্দ্রাবতীর গৃহের বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ রয়েছে যে, ঘরের ছাউনি হিসেবে তালপাতার ব্যবহার করা হত।

www.pathagar.com

"ভট্টাচার্য ঘরে বসে অঞ্জনা ঘরণী,
বাঁশের পাল্লায় তাল-পাতার ছাউনী।"

বৃহত্তর ময়মনসিংহ তথা নেত্রকোণা এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ও এসবের ব্যবহার নিয়ে অনেক সাহিত্য রচনা হয়েছে। এমনকি গৃহ-নির্মাণের কাজও বাদ যায়নি। এ অঞ্চলের লোক সাহিত্যের অন্তর্গত ধাঁধা থেকে প্রামাণ পাওয়া যায় ঘরের ছাউনী দেয়া হতো ছন দিয়ে। এক দশক আগে ও লেখকের নিজ এলাকায় ছন দিয়ে ঘর ছাওনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এ ছন চিকন ছিল বলে, ছাওনি দীর্ঘ স্থায়ী ও টেকসই হতো। তাছাড়া অতি সহজে সুন্দর ডিজাইন করা যেত। ফলে শৈল্পিক ও অর্থনৈতিক কারণে এর চাহিদা ও জনপ্রিয়তা ছিল। এই মূল্যবান ছন আজ বিপন্ন প্রায়। বর্তমানে বিকল্প হিসেবে এ এলাকার জনগোষ্ঠি খড় দিয়ে ঘরের ছাওনি দেয়, ফলে সংকোচিত হয়ে আসছে খড়ের বহুবিধ ব্যবহার যেমন জ্বালানী, গো-খাদ্য, কৃষি খামারের জৈব সার হিসেবে। এ সব ছনের ছাওনি নিয়ে কবিতা ও রয়েছে অনেক ।

"এক বাড়ীতে দেখ্যা আইছি
উলু ছনের ছানি,
আরেক বাড়ীতে দেখ্যা আইছি
গাছের আগায় পানি।"

বর্তমানে টিনের এবং পাকা বাড়ীর ব্যাপক ছড়াছড়ি। অতীতে মানুষ সকল কিছুর জন্যই সরাসরি অপরিপাক (unprocess) প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিল। তারা ঘরের চতুর্দিকের বেড়া বা ঘের দিতো পাটশুলা, ছন এবং নল খাগড়া দিয়ে। মহুয়া পালায় এ বিষয়ে উল্লেখ আছে– 'নল খাগড়ের বেড়া আছে দক্ষিণ দোয়ারিয়া ঘর। তৎকালীন মানুষের নির্মাণ কৌশল, শৈপ্লিক মননশীলতার ও কোন কমতি ছিলনা। চৌচালা এবং আটচালা ঘর তৈরীতেও ঘরামিরা অত্যন্ত পারদর্শী ছিলো। এই ঘরগুলোর চাল নির্মাণে বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল লক্ষ্যণীয়। চৌচালা ঘরের থাকে চারটি চাল এবং আটচালায় আটটি। সুখে-শান্তিতে, আরামে-আয়াসে গৃহে বসবাস করার জন্যই এই জাতীয় আটচালা ঘর তৈরী হত তাই,
"নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা বানলো চৌকারী।"

(মহুয়া ময়মনসিংহ গীতিকা)

অথবা–"আটচালা চৌচালা ঘর বান্ধিয়া সুন্দর
ভালা কইরা বান্ধে বিনোদ বার দুয়াইয়্যা ঘর।"
অথবাঃ–"চৌচালা আটচালা তার ঘর যতখানি
সুদ্ধি বেতে বান্ধা ঘর উলু ছনের ছানি।"

ঘরের বেড়া ও চাল কোথাও কোথাও দড়ি দিয়ে বাঁধা হলেও, পূর্ব ময়মনসিহের তথা নেত্রকোনা এলাকায় বেঁতের ব্যবহার ছিল ব্যপক। কেননা নেত্রকোনা ও সিলেট এলাকায় ভেজা মাটিতে প্রাকৃতিকভাবে বহু বেতের ঝাড় গড়ে উঠতো।

www.pathagar.com

গৃহনির্মাণে প্রাকৃতিক পরিবেশ সচেতনতা

গৃহ নির্মানে শুধু কলা কৌশলের দিকে নেত্রকোণার জনগোষ্ঠি পারদর্শী ছিল তা নয়। আলো, বাতাস ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সুযোগ সুবিধাগুলো যে স্বাস্থ্য সম্মত হতে হবে এ বিষয়ে তারা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন আদিকাল থেকেই। এজন্য বৃহত্তর ময়মনসিংহ তথা নেত্রকোণার সর্বত্র বিশেষভাবে প্রচলিত একটি খনার বচন ও একটি প্রচলিত প্রবচন উল্লেখযোগ্য বলে অধ্যাপক শরফুদ্দিনের প্রবন্ধে উল্লেখ রয়েছে। কারণ এই বচনগুলো প্রতি বিশ্বাস এবং এসব জ্ঞানের কথায় বিশ্বাস করেই এ অঞ্চলের জনসাধারণ তাদের গৃহনির্মাণে তৎপর ছিল। এই অঞ্চলের প্রচলিত খনার বচনে উল্লেখ রয়েছে;

'পূর্বে হাঁস, উত্তরে বাঁশ
পশ্চিম ঘিরে, দক্ষিণ ছেড়ে
বাড়ি কর'গা ভেড়ের ভেড়ে।'

আর ও প্রচলিত বচনটিতে বলা হয়েছে:

"দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা,
পূর্ব দুয়ারী তার প্রজা,
পশ্চিম দুয়ারীর মুখে ছাই
উত্তর দুয়ারীর খাজনা নাই।"

এ-দুটো বচন থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে একটি পরিবেশ সম্মত সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন বাড়িতে দক্ষিণ দিক উম্মুক্ত রেখে অর্থাৎ দক্ষিণমুখী গৃহনির্মাণ করতে হবে। দক্ষিণ ছাড়া অন্যান্য যে কোন দিকে মুখ করে ঘর তৈরী করলে গৃহস্থের বসবাসের জন্য তা সুবিধার হয় না। পূর্বমুখী ঘর তবু মন্দের ভালো। পশ্চিমমূখী ঘর যা-তা! আর উত্তরমুখী ঘর এতই খারাপ যে তার জন্য কোন খাজনা লাগেনা।

গৃহ নির্মাণের শিল্পকলা নৈপূণ্যের সমীক্ষার তথ্য না থাকলেও সাহিত্য কর্মের মধ্যে এ অঞ্চলের মানুষের পরিবেশগত মূল্যবোধ ফুটে উঠে। এই অঞ্চলে নির্মিত 'জুইতের' ঘরগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই জুইতের ঘরের উল্লেখ রয়েছে ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া পালায়;

"নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা বানলো জুইতের ঘর,
লীলুয়া বয়ারে কন্যার গায়ে উঠল জ্বর।"

এই জুঁইতের ঘর প্রসঙ্গে ময়মনসিংহ গীতিকার পাদটীকার সংকলক দীনেশ চন্দ্র সেন শাব্দিক অর্থ ধরে বলেছেন, জুইতের ঘর মানে পাছন্দসই ঘর। এ ঘরে প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ, নির্মল আলো বাতাস আবার বাড়ির আঙ্গিনায় নানা রঙের ফলফলাদির বাগান সর্বোপরি সানবান্ধা ঘাটের পুকুর ও পুকুর ভরা মাছ।

www.pathagar.com

গৃহ আঙ্গিনায় পুকুর, বৃক্ষ রোপনও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

ময়মনসিংহ তথা নেত্রকোণা জেলায় প্রথাগতভাবে প্রতিটি বাড়ির পূর্ব দিকে সাধারণতঃ পুকুর থাকে। প্রায় বাড়িতেই ছোট হোক বড় হোক কমপক্ষে একটি পুকুর বা জলাশয় থাকতো। অনেক সময় কয়েকটা বাড়ির মালিকেরা মিলে অংশীদারের ভিত্তিতে এই পুকুর কাটাতো। এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই তাদের জমির কিছু অংশ ছেড়ে দিতো। এই জলাশয়গুলো যেমনঃ একদিকে বাড়ির শোভা বর্ধনে সহায়তা করতো, অন্যদিকে তেমনি গোসল বা স্নান, বাসনকোসন মাজা, কাপড়-চোপড় ধোয়া, মাছের চাষ এবং খাবার পানির প্রয়োজন মিটাতো। যারা একটু সম্ভ্রান্ত এবং অবস্থা সম্পন্ন পরিবার, তাদের বাড়ির পুকুরগুলির পাড়-বাঁধা হত সুন্দর করে এবং পুকুর পাড়ে বিভিন্ন ধরণের গাছ লাগানো হত। পুকুরের এক দিকে থাকতো সান-বাধানো ঘাট। ঘাটের সিঁড়িগুলিও হত পাকা বা বাঁধানো।

পুকুরগুলি সাধারণতঃ চতুষ্কোণা হত। এই অঞ্চলের লোক সাহিত্য ও পালা গানে এ পুকুর ও ঘাটের বহু বর্ণনা রয়েছে। যেমন ঃ
যেমন "সানবান্ধা চারিকোণা পুষ্কুরনি।" [মহুয়া]
অথবা "সামনে আছে পুষ্কুনি সানেবান্ধা ঘাট"
"পূর্বমূখী বাড়িখানি আয়নার কপাট" [মহুয়া]
অথবা "বাড়ির সামনে পুষ্কুনি জলে টলমল।[মহুয়া]
অথবা "বাড়ির পাছে বান্ধা ঘাট আছে পুষ্কুনি।" [লোক সাহিত্য]

উত্তরে থাকবে বাঁশ ঝাড়। পশ্চিমে থাকবে গাছ-গাছালি, ফলমূলের গাছ পরিপূর্ণ ঘেরা জায়গা এবং দক্ষিণ দিক রাখতে হবে সম্পূর্ণ খোলা যেন প্রচুর পরিমানে মুক্ত আলো বাতাস আসতে পারে। বৃহত্তর ময়মনসিংহের এই বিরাট অঞ্চলে ছোট হোক, বড় হোক প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতে থাকতো কমপক্ষে একটি খোলা আঙ্গিনা, ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষায় বলে উডান। এই উডানের আশে-পাশে থাকতো বিচিত্র্য বর্ণের দেশী ফুলের গাছ। দেওয়ান ভাবনা ও দস্যু কেনারাম পালায় উল্লেখ আছেঃ

"বাড়ীর আগে ফুল বাগিচা লাল আর নীলা,
ফুল তুইল্যা দিবাম কন্যা তুমি গাইথ্যো মালা।"

'বাইর বাড়ীতে' যেমন উডান থাকতো, তেমনি ভেতর বাড়িতেও কোন কোন গৃহস্থ উডানের ব্যবস্থা করতো। সেখানে মেয়েরা ধান শুকানোসহ তাদের মেয়েলি কাজকর্ম করতো। অবসর সময়ে পিড়ি বা পাটি পেতে পাড়া পরশীদের সঙ্গে পল্প গুজব করতো, চুল বাঁধতো, উকুঁন বাছতো। এই আঙ্গিনার একধারে ফুলের গাছ, ফলের গাছ যেমন, ডালিম, পেয়ারা, লিচু, তুলসি গাছ ইত্যাদি রোপন করা হত। মহুয়ার পালাতেও উল্লেখ রয়েছে-'অন্দর ময়ালে

www.pathagar.com

আমার ফুলের বাগান।' কোন কোন ঘরের সামনে বারান্দা থাকতো। ঘরের ভিটির চেয়ে সামান্য নীচু হত এই বারান্দা। যাতে এই অঞ্চলে উসারা বলা হয়ে থাকে। তার তিন দিক থাকতো খোলা।

পূর্ব ময়মনসিংহে জনগোষ্ঠীর বাড়ি আঙ্গিনায় গাছ ও ফলফলাদির বাগান করার বহু পুরানো অভ্যাস আজ প্রায় বিলিন হয়ে গিয়াছে। যেমন, আম, জাম, নারিকেল, কাঁঠাল, ডালিম, লিচু ইত্যাদি নানান ফল বাড়ির সীমানার মধ্যে ঘরের আশেপাশে সযত্নে লাগাতো তারা। শান্ত ও সুশীল পরিবেশে তারা বসবাস করতো বলে তারা পরিবেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতে হত না। নিজের অজান্তেই তারা নির্মল পরিবেশ সংরক্ষণ করে নিজেদের আরাম আয়েশ ও স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি করতো। ঘরগুলোকে ঠান্ডা রাখার জন্য, বাতাস দোষণমুক্ত করার জন্য, ফলমুল উৎপাদনের জন্য এবং সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য মূলতঃ এগুলো রোপন করা হত। লোক গীতিতে উল্লেখ রয়েছে। যেমনঃ

"বাড়ীর শোভা বাগ বাগিছা ঘরের শোভা বেড়া,
কুলের শোভা বউ, শাশুড়ীর বুক জোড়া।"
'চাইর দিকে কলাগাছ-মান্দার গাছের বেড়া।"
অন্য "আগে-পাছে বাগবাগিচা আছে সারিসারি।"

ভিতর বাড়িতেও কোন কোন ক্ষেত্রে বাগান করা হত। বাড়ির এক কোণায় বিশেষ করে হিন্দু বাড়িতে তুলসী গাছ রোপন করা হত। সন্ধায় হিন্দু নারীরা সেখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে গৃহের সকলের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করতো। আর সর্দি-কাশিতে এ গাছের পাতার রস ছেলেমেয়ে এবং বৃদ্ধদের খাওয়ানো হত। কঙ্ক ও লীলা পালাতে বাড়ীর পাশে নিম গাছ রোপনের কথাও উল্লেখ আছে। নিমডাল দাঁতন হিসেবে এবং নিমপাতা বাটাও তার রস ঔষধ হিসাবে ব্যবহার সেকালেও ছিল, বর্তমানে এর ব্যবহার ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও ঐতিহ্য

এই ময়মনসিংহ অঞ্চলের আর একটি শিল্প প্রতিভার উজ্জলতম নিদর্শন বার বাংলার ঘর। এই ঘরগুলোর নির্মাণ কৌশলে ঘরামি বা ছাপরবনদের শিল্প নৈপূন্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সৌখিন ও অভিজাত এই ঘরগুলো তৈরী করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হত। এক সময়ে বিশেষ করে মধ্যযুগে এই ঘরগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ময়মনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালা গানে ও লোক সাহিত্যে এই বারবাংলা ঘরের বর্ণনা রয়েছে। তা থেকে এই ঘরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।

এই জাতীয় ঘরগুলোকে পূর্ব ময়মনসিংহে বাংলা ঘর, বারবাংলার ঘর, বারদুয়াইরা ঘর বলে উল্লেখ করা হয়। মহুয়া পালা, রূপবতীর কাহিনী ও কমলার গীতিকার মধ্যে এই বারদুয়ারী

www.pathagar.com

ঘরের বর্ণনা রয়েছে। যেমন ঃ

"সেই পন্থ ধইরা তুমি মেলা না সে কর,
এই পন্থে যাইতে দেখবা বার দুয়াইরা ঘর।"

[মহুয়া]

কোন কোন পুকুরের উপর জলটুঙ্গির ঘর তৈরী করা হতো।

জীবজন্তু ও প্রকৃতি প্রেম

আগের দিনে মানুষকে বাড়তি আয়ের কথা আজকালের মতো এতোটা ভাবতে হতো না তবে তারা প্রকৃতির সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে ভালোবাসত। তাদের বাড়িতে পালন করা হতো গৃহপালিত সম্পদ জীবজন্তু, যেমন- গরু, ছাগল, মহিষ, হাঁস এর মত গৃহ পালিত জীব। পাখ-পাখালি পালনের ব্যবহার ছিল ব্যাপক। হাঁস, মুরগী থেকে শুরু করে কবুতর, ময়না, টিয়া, কুড়া পাখি পোষ্য তোতারা। মহুয়ার পালায় বকুড়া পাখির উল্লেখ রয়েছে। কুড়া পাখি শিকারের জন্য ও দুতালীর জন্য ব্যবহার করা হোত। বাঘা কুকুর পোষারও উল্লেখ রয়েছে লোক-সাহিত্যে। বিড়াল তো আজো অত্র এলাকার ঘরে ঘরে দেখা যায়।

সময়ের আবর্তে পরবর্তীতে তারা দরজা জানালায় বাঁশের বেড়ার পরিবর্তে কাঠের ব্যবহার শুরু করে, এর ফলে বনজ সম্পদের আহরণের হিড়িক পড়ে যায়। দরজা ও জানালার পাল্লাতেও সুতারেরা নিজেদের শিল্প কৌশল প্রদর্শন করেছে। এই সব কাঠের মিস্ত্রীরা ফুল, পাতা, পাঁখি, হাঁস, হরিণ, কাঠের উপর খোদাই করে সুন্দর ও রুচিশীল শিল্প সৃষ্টি করতো। দেওয়াল পরিচর্যার জন্য কখনও কখনও হরিণের সিং সমেত মাথা, মহিষের মাথার খুলি দেওয়ালে টাঙ্গানোর রীতিও পরবর্তীতে পরিলক্ষিত হয়।

প্রকৃতি সম্পদ ব্যবহারে মাধ্যমে জীবনযাপনের স্বাচছন্দবোধ ও আভিজাত্যের প্রসারের এখানেই শেষ নয়, যেমনঃ গৃহের আসবাব পত্র হিসেবে আরো রয়েছে কাঠের তৈরী পিড়ি খক্কা বারকোষা, হাতা প্রদীপের গাছা বা পিলসুজ, কাঠের তৈরী পেটারা, তারা চইয়্যা থালা, ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতির বইটা, সিন্দুক, পাদুকা। সিন্দুকের আকৃতি ছোট বড় মাঝারি নানা ধরনের। সাধারণতঃ মূল্যবান জিনিসপত্র যেমনঃ দলিল, টাকাকড়ি মানুষ এই সিন্দুকে রাখতো। বৃহত্তর ময়মনসিংহের প্রায় সর্বত্র এই সিন্দুকের ব্যবহার ছিল। শক্ত এবং মজবুত কাঠেই এই সিন্দুক তৈরী করা হয়ে থাকে। পরবর্তী সময়ে লোহার সিন্দুকের প্রচলন ঘটে। সেরপুরের কাঠের তৈরী পাদুকা ময়মনসিংহের বাইরেও জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়। 'বইল তোলা খড়ম বা পাদুকা এই অঞ্চলের ব্যতিক্রমধর্মী শিল্প। কাঠের তৈরী আলমারীর ব্যবহার এসেছে অনেক পরে অষ্টাদশ শতকেরও পর। যা আজো গ্রামীণ অভিজাত পরিবারে দেখা যায় অহরহ ।

www.pathagar.com

প্রকৃতি তার অবারিত ভান্ডারের সম্পদ দিয়ে ও দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে তুষ্ট রেখে ছিল। মানুষের সীমাহীন লোভ প্রকৃতিকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। পরিনামে বিনষ্ট করেছে প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার, হারিয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সবকিছু হারিয়ে ভিক্ষুকের মত ছুটে বেড়াচ্ছে বিদেশী সাজ-সজ্জা ও সভ্যতার পিছনে। সোনার হরিণ না পেয়ে ভিখারী হয়ে ঘুরছে দ্বারে দ্বারে। জাতি হিসেবে দাতা গোষ্টির কাছে, ব্যক্তি হিসেবে এনজি ও অথবা শোষক সেবক গোষ্ঠীর পাছে।

সভ্যতার অগ্রগতির ফলে যেমন দিনে দিনে ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী তেমনি একান্নবর্তী বাসগৃহ ও খন্ড বিখন্ড করে দিয়েছে পারিবারিক বন্ধন। 'বড় বাড়ি বড় ঘর থেকে আমাদের জীবনও আধুনিক এই যান্ত্রিকযুগে গন্ডিবদ্ধ এবং সীমিত হয়ে যাচেছ শহরে নির্মিত ফ্লাটের সংকীর্ণতার মধ্যে।

সর্বোপরি অতীতের মত শিল্প নৈপূণ্য দিয়ে নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বিরাট জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থাপনসমূহ সময়ের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে উন্নয়ন কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে হবে। এজন্য প্রয়োজন স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ও কর্ম কৌশল। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সব চেয়ে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা।

শিক্ষা অবকাঠামোঃ শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রম বিকাশ

পৃথিবী সৃষ্টি লগ্ন থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রসারের ধারাবাহিক ইতিহাস কারো জানা নেই। প্রাকৃতিকভাবেই সময়ের চাহিদামত ভাষা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ ও প্রসার ঘটেছে। সম্ভবতঃ দুনিয়ার সর্বত্রই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার রেওয়াজ চালু হওয়ার অনেক আগেই একশ্রেণীর শিক্ষকের উদ্ভব ঘটেছিল, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নয়; বরং অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে, ধর্মীয় আচার-আচরণ শিক্ষাদাতা পুরোহিত ও যাজক হিসেবে এ সব কার্মকান্ড শুরু হয়েছিল।

Encylopedia of Britenica এ উল্লেখ রয়েছে যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার কখন এবং কিভাবে, তা সঠিকভাবে জানা না থাকলেও জ্ঞান বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন, স্থানে যথাঃ মিশর, গ্রীস, ভারত ও চীনে বিক্ষিপ্তভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল। (শাকুর,১৯৯৭)।

পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জটিলতা যখন আরো বেড়ে গেল এবং ব্যবহারিক প্রয়োজন ছাড়াও নৈতিক, আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক ও আবেগিক বিকাশের তাগিদে মানুষ যখন নানা ধরনের জ্ঞানানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করলো,

www.pathagar.com

তখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব বহুগুণে বেড়ে যায়। সময়ের চাহিদা ও পরিস্থিতির তাগিদে শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ নির্ধারণ, শিক্ষার স্তর বিভাগ ও বিদ্যালয়ের শ্রেণী বিভাগ এবং শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনা, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার উদ্ভব ঘটে। যুগে যুগে বহিরাক্রমন ও বৈদেশিক আক্রমন ও আধিপত্যের ফলে এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও সংমিশ্রণের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থা কখনও সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও এর বিকাশ ও প্রসার ঘটেছে ব্যাপকভাবে।

বিগত দু'হাজার বছরে বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহ, বৈবাহিক সম্পর্ক, বহিরাগমন ও বহির্গমনের ফলে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের ধর্মীয় এবং গোষ্ঠীগত পরিবর্তন এসেছে। অন্যদিকে বহিরাগত বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব ও প্রসারের ফলে ঐ সমন্বয়ে এ অঞ্চলবাসীর মন-মানসিকতা ও জীবন ধারার পরিবর্তন ও বিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের ফলে শিক্ষাব্যবস্থাও উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটেছে।

নেত্রকোণার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারের ইতিহাস ও প্রামাণ্য সুনির্দিষ্ট দলিলাদি নেই। বৃহত্তর ময়মনসিংহের শিক্ষা প্রসারের ঐতিহাসিক পর্যালোচনার দূর্বলতা সম্পর্কে অধ্যক্ষ আবদুশ শাকুর ৩টি কারণ বর্ননা করেন তা 'হল; প্রথমতঃ জনবসতি স্থাপনের প্রারম্ভিক যুগ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ জনপদে কি ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, সে সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য দলিল, শিলালিপি অথবা বিবরণী আজ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ হিন্দু, বৌদ্ধ অথবা মুসলিম যুগে এ অঞ্চলে তেমন কোন প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়নি। তৃতীয়তঃ উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ করার জন্যে যেসব এলাকা বেছে নেয়া হয়েছিল, ময়মনসিংহ জেলা তাদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। প্রামাণ্য তথ্যের অপর্যাপ্ততার কারণে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা অংকন করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞদের প্রধানতঃ বিরাজমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার এবং ও সাহিত্যোকরণের উপর ভিত্তি করে সঙ্গত অনুমান করতে হয়েছে। এভাবেই বহু অতীত কাল থেকেই ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণার ঐতিহ্য ও উন্নয়নের ধারা অবহেলিত ও গতিহীন ছিল। এ অবহেলিত জনগোষ্টির ভাগ্যোন্নয়নে সমাজকে সংগঠিত ও সমন্বিত করে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সর্বোপরি সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরে তথা জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গতিশীল গণমুখী ও ত্যাগী নেতৃত্বের।

তথ্যের অপ্রতুলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্বেও অধ্যক্ষ আবদুশ শাকুর তার প্রবন্ধে ময়মনসিংহের শিক্ষার ঐতিহাসিক পরিক্রমাকে বিশ্লেষণ করে তিনটি যুগে ভাগ করেছেন। সে গুলি হ'ল ; আদিযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ।

আদিযুগের যুগের ব্যাপ্তি আনুমানিক ১ম খৃষ্টাব্দ থেকে ১৩০০ খৃষ্টাব্দ। হিন্দু ও বৌদ্ধ আমল এযুগের অন্তর্ভূক্ত। সমগ্র উপমহাদেশের শিক্ষার ইতিহাস প্রণেতারা যদিও হিন্দুযুগ থেকে

www.pathagar.com

বৌদ্ধযুগকে পৃথক করেছেন, ময়মনসিংহের বেলায় তা নিষ্প্রয়োজন; কারণ এ-অঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থার উপর কোন বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। মধ্যযুগঃ প্রকৃতপক্ষে ছিল মুসলিম যুগ। এর ব্যাপ্তি ১৩০১ থেকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ। ১৩০১ খৃষ্টাব্দে শাসসুদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলে ময়মনসিংহ জেলায় মুসলিম শাসনের সূচনা এবং ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতনে এর পরিসমাপ্তি। আধুনিক যুগঃ কোম্পানীর শাসন ও বৃটিশ আমল এবং পাকিস্তান আমল ও স্বাধীনতা উত্তরকাল এযুগের অন্তর্ভূক্ত।

আদিযুগের শিক্ষা ব্যবস্থা

অধ্যক্ষ আবদুশ শাকুর তাঁর প্রবন্ধে ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি করে ময়মনসিংহের আদিযুগের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার প্রসার ও প্রবর্তনের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন তাহলো ঃ
বহিরাগত যে জনগোষ্ঠি ও অঞ্চলে প্রথম বসবাস স্থাপন করে, তাদের শিক্ষা ছিল স্মৃতি ও শ্রুতি নির্ভর। পিতামাতা, গুরুজন ও গোত্রপতিদের দেখে এবং তাদের কাছে শুনে শিশু-কিশোরেরা পারিবারিক ও সামাজিক আচার-আচরণ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতো।

পরবর্তীতে জীবন জীবিকার জন্য বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব পেশানুযায়ী শিশু-কিশোরদের শিক্ষা দান করতো। এ সবকিছুই ছিল অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। তখনকার শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে ছিল কৃষিকাজ, সামাজিক আচার আচরণ ও পশুপাখী পালন; মৎস্য শিকার ও শিকারের উপকরণ নির্মাণ; 'বস্ত্র, তৈজসপত্র ও গৃহসরঞ্জাম নির্মাণ; নৌকা চালনা ও নৌকা নির্মাণ, সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও তোরতি এবং লাঠি খেলা, শিকারের জন্য তীর চালনা ও বর্শা নিক্ষেপ। আদিকালের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি ছিল অত্যন্ত তীব্র। তারা বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করতো। তাছাড়া পাহাড়, বন-জঙ্গল, সুবিশাল নদী ও হাওড়, প্লাবন ও ঝড়-বৃষ্টি এবং হিংস্র পশু ও বিষধর সাপ তাদের মনে বিভিন্নভাবে উপদেবতা ও নানাভাবে তাদের মধ্যে ভয়ভীতির উদ্রেক করতো। সেজন্য তন্ত্র মন্ত্র শিক্ষা সম্ভবতঃ সে যুগে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। যা তারা শুনে শুনে ঠোঁটে ঠোঁটে মুখস্ত করতো এবং মনে রাখতে পারতো। এজন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বা পাঠ্যাভ্যাসের প্রয়োজন হতো না।

তাই সমাজে যাজক ও পুরোহিতদের উল্লেখযোগ্য প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। পূজা অর্চনা ছাড়াও তারা মন্ত্র ও ঝাড়-ফুঁক শিক্ষাদাতার ভূমিকা পালন করতো। তাদের আদেশ উপদেশগুলো সমাজে ভীষণ মূল্য দেয়া হতো। নেত্রকোণা অঞ্চলে ঝাড়-ফুক, ইমাম মৌলানা পুরোহিতদের প্রভাব বর্তমানেও যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

নেত্রকোণা অঞ্চলে যোগাযোগ, সংগঠিত ও সমন্বয়হীনতা তাছাড়া ও বহুবিদ কারণে এ অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলন বিলম্বিত হয়েছে। প্রথমতঃ এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল

www.pathagar.com

বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে আবাদ ও আবাসযোগ্য হয়েছে বলে আদিম অধিবাসীরা সম্ভবতঃ যাযাবরের মত একস্থান ছেড়ে অন্যস্থানে বসতি স্থাপন করেছে। এ কারণে স্থায়ী শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ প্রাথমিক যুগে এ অঞ্চলের সভ্যতা সংস্কৃতি ছিল নিম্নমানের। জনগণের জীবনধারা ছিল গতানুগতিক ও বৈচিত্র্যহীন এবং বৌদ্ধ ধর্ম বিকাশের গতি ছিল শ্লথ ও বিলম্বিত। সে কারণে শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিমান এবং বৈচিত্র্যও ছিল কম। সেজন্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে এসবের প্রসার ও সম্প্রসারণের তাগিদ সে সময় ততটা তীব্রভাবে অনুভূত হয়নি।

উত্তর ভারতীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষবর্ধনের আমলে আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ময়মনসিংহ সহ কামরূপ অঞ্চলের জীবনধারায় ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। সামাজিক বিবর্তনের ফলে এ অঞ্চলের সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ঘটে এবং কালক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুচনা হয়। হিন্দু সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনকামী ও কৌলীণ্য প্রথার প্রবর্তনকারী বিদ্যোৎসাহী সেন রাজাদের আমলে এ অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার ঘটে এবং নানা স্থানে টোল, পাঠশালা ও চতুস্পাটী স্থাপিত হয়।

মূলত মধ্যযুগ অর্থাৎ মুসলিম যুগে বৃহত্তর ময়মনসিংহ তথা নেত্রকোণার শিক্ষা প্রসার ঘটে। এ যুগের সুচনা হয়েছিল তেরশত শতাব্দীরও বহু যুগ আগে। সমাজে মুসলিম ভাবধারার প্রবর্তন ও প্রাসারে যারা বিশেষ অবদান রেখেছিলেন, সে সব সাধকেরা এ অঞ্চলে পদার্পণ করেছিলেন একাদশ শতাব্দীতে। তাই এ অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারে মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস প্রাচীন ও অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ।

মধ্য যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা

আদি যুগের মত মধ্যযুগেও ময়মনসিংহে কি ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য কিছু জানা যায় না। তবে হেষ্টিংসের আমলে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার উপর পরিচালিত তিনটি জরিপ (১৮৩৫-৩৮) পর্যালোচনা করলে এ অঞ্চলের মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কতিপয় বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয় বলে অধ্যক্ষ আবদুশ শাকুর তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দু'ধরণের বিদ্যালয় ছিল। ধর্মনিরপেক্ষ পাঠশালা ও মক্তব। ধর্মনিরপেক্ষ পাঠশালা গুলিতে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই ভর্তি হতে পারতো। পাঠ্যসূচীর মধ্যে ছিল মাতৃভাষা শিখন ও পঠন এবং গণিত। এসব মক্তবগুলিতে শুধুমাত্র মুসলিম ছাত্রেরা পড়াশুনা করতো। সেখানে মাতৃভাষা ও গণিত শিক্ষা ছাড়াও কোরান পাঠ ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সেকালে প্রায় সর্বত্রই মসজিদ সংলগ্ন মক্তব ছিল। সেখানে কোরান পাঠ ছাড়াও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। মধ্যযুগে মুসলিম ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ছিল মাদ্রাসা। সেখানে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও জাগতিক বিষয়াদি যথা গণিত, বীজ

www.pathagar.com

গণিত, ইতিহাস, দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। হিন্দু ছাত্রেরা উচচ শিক্ষার জন্য গ্রহণ করতো টোল অথবা চতুষ্পাঠীতে। সেখানে শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। পাঠক্রমের অন্তর্ভূক্ত বিষয়াদির মধ্যে ছিল সাহিত্য, কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন, চিকিৎসা, ন্যায় ও জ্যোতিষ শাস্ত্র। বিত্তশালী ও অভিজাত পরিবারের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য এক ধরণের পারিবারিক বিদ্যালয় ছিল। পরিবারের শিশুরা ছাড়াও সেখানে আশেপাশের অসচছল পরিবারের শিশুরা পড়াশুনা করতে পারতো। রাষ্ট্রীয় কাজে অফিস আদালতের ভাষা ছিল ফারসী, শাসনকার্য ও সংস্কৃতির ভাষা হিসেবে পারসীর বিশেষ মর্যাদা ছিল বলে সকলেই সে ভাষা শিখতে বিশেষভাবে উদগ্রীব ছিল। সে জন্য এক ধরণের বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছিল, যাকে এডাম বলেছেন, পার্সিয়ান স্কুল। সেখানে বেশীর ভাগ পার্সী ভাষায় লেখা বই পড়ান হতো। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রেরাই এসব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতো। শাসকশ্রেণী, জমিদার ও বিত্তশালী লোকেরা বিদ্যালয় প্রতিষ্টায় সাহায্য সহায়তা করতেন। কোন কোন সম্ভ্রান্ত অথবা বিত্তশালী ব্যক্তির গৃহের একাংশ বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতো। অনেকক্ষেত্রে শিক্ষকেরা বেতনের পরিবর্তে পারিতোষিক গ্রহণ করতেন। মক্তব ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের সম্পর্কে শেরপুরের ইতিকথা প্রণেতা বলেন, এই শিক্ষকেরা কোন নির্দিষ্ট হারে বেতন গ্রহণ করতেন না। তবে ছাত্রদের প্রত্যেকে মৌলভী সাহেবকে ৪/৫ আনা করিয়া চাঁদা দিতে হতো। ক্ষেতের লাউ, পুকুরের মাছ, যখন যা ইচ্ছা পাওয়া যেত। আবার কেহ তাহার জন্য কলাটি, মুলাটি ও পান বা তামাক আনিতে ভুলিত না। শিক্ষককে প্রধান নিয়োগকারীর বাড়ীতে বিনা পয়সায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন। (দেলোয়ার, ১৯৬৯) (বারি, ১৯৭২) সংস্কৃত শিক্ষার টোলগুলি সাধারণতঃ শিক্ষকের বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত হতো। বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্রেরা গুরুগৃহে আসতো এবং বিনা বেতনে পড়াশুনা করতো। তারা পারিবারভুক্ত ব্যক্তির মতই গুরুগৃহে থাকতো, বিনা মুল্যে আহার গ্রহণ করতো এবং পরিবারের অন্যান্যদের মত সাংসারিক কাজ কর্মে শিক্ষককে সাহায্য সহায়তা করতো। "কঙ্ক ও লীলা" শীর্ষক গীতিকায় ব্রাক্ষণ পন্ডিতবর্গের গৃহ-পরিবেশের বর্ণনায় সেকালের গুরু-গৃহেরই একটি মনোজ্ঞ চিত্র উদ্ভাসিত ঃ

"বড় বুদ্ধিমন্ত কঙ্ক বাখানি তাহারে।
মুখে মুখে শিলূক কত শিখিল অন্তরে।।
দেখিয়া গর্গের মনে ইচ্ছা হৈল ভারি।
দশ না বছরের কালে হাতে দিলা খরি।।
আদরে যতনে কঙ্কের সুখে দিন যায়।
লেখাপড়া করে আর ধেনু যে চড়ায়।।"(ময়মনসিংহ গীতিকা,১৯৫৮ প":১৩০)

আদিযুগের মত পরিবার ও গোষ্ঠী ভিত্তিক বৃত্তিমূলক অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তখনও চালু ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কাজকর্মের পরিমাণ ও চাকুরীর সুযোগ-

www.pathagar.com

সুবিধা বেড়ে যাওয়ায় এ যুগে বিভিন্ন পেশার জন্য শিক্ষানবিশী ও চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। উপর্যুক্ত বৈশিষ্টগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বিভিন্নভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবহারের প্রসার ঘটেছিল। বহুকাল আগে থেকেই সময়ের প্রয়োজনেই দ্রুত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশমান পৃথিবীর সাথে সঙ্গতি রেখে আমাদের শিক্ষার ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে, সে পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যোগান মূখ আস্থা থুবড়ে পরে আছে। এখন আমাদের প্রয়োজন গণসচেতনতা ও টেক্‌সই পরিকল্পনা তা বাস্তবায়নে দ্রুত বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা। এ জন্যে এগিয়ে আসতে হবে, সর্বস্তরের নেতৃত্বকে থাকতে হবে রাজনৈতিক অঙ্গিকারাবদ্ধও দ্রুত বাস্তবায়ন কৌশল ।

এ অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারে মুসলমানদের আবাসকে দু'ভাগে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ পীর দরবেশগণের মাধ্যমে ইসলামী ভাবধারা ও শিক্ষার প্রসার; দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক্ষেত্রে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা।

শিক্ষায় মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা

ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১২০২ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের সময় থেকে এদেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হলেও বৃহত্তর ময়মনসিংহে এ সর্ব প্রথম মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলে (১৩০১-১৩২২)।

পরবর্তী সাড়ে চারশো বছর এ জেলাটি কখনও আংশিকভাবে এবং কখনও সম্পূর্ণরূপে কোন না কোন মুসলিম শাসকের শাসনাধীন ছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ে এ অঞ্চলে নিরবচিছন্ন ও ধারাবাহিক শাসন ব্যবস্থা ছিল না। কারণ, সুলতানদের পারিবারিক কলহ, ময়মনসিহের উত্তরাঞ্চলের কোচ রাজাদের সঙ্গে মুসলিম শাসকদের সংঘর্ষ, হিন্দু রাজা গণেশের অভ্যুত্থান এবং স্বাধীনতাকামী সুলতান ও ভূঞাদের সঙ্গে মোগল সেনাধ্যক্ষ ও সুবাদারদের যুদ্ধ বিগ্রহ এসবের ফলে এ জেলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে অশান্তি, বিচ্ছৃংখলা ও লোকক্ষয় ঘটেছে। ফলে এ দীর্ঘ সময় শিক্ষা শান্তি সম্প্রসারণ সম্ভব হয় নি।

তবে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ও নুসরত শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫৩২) এবং মোগল সুবাদারদের শাসনামলে (১৬১১-১৭৩৭) এ অঞ্চলে শান্তি ও শৃংখলা বিরাজমান ছিল। এ সময় মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এক দিকে সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল, আর অন্য দিকে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছিল। শিক্ষা বিস্তারের জন্য মুসলিম শাসকদের উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়টির উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা হলো; প্রথমতঃ তারা তাদের ছিল নৈতিক দায়িত্ব পালন করছিল; দ্বিতীয়তঃ দিল্লীর সুলতানদের অনুকরণে সমাজ সংস্কারেও তারা উদ্যোগ নিয়েছিল; এবং তৃতীয়তঃ তারা কিছুটা নিজেদের জনপ্রিয়তা ও গৌরব বৃদ্ধির প্রয়াস ও প্রচেষ্টা নেয়।

www.pathagar.com

প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি ঃ প্রতিটি শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতি সভ্যতা বিকাশের শুভলক্ষণ। এ প্রসঙ্গে কেদার নাথ মজুমদার ময়মনসিংহের ইতিহাস গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে সেকালে শিক্ষাদানের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত প্রকৃতির কোন স্কুল কলেজ ছিল না। শিক্ষাদান করে অর্থ নেবার প্রথাও প্রচলিত ছিল না। পল্লীর কোন ভদ্রলোকের গৃহে একটি ছাত্র থাকলে সে ছাত্রের অভিভাবকই তাকে পড়াশোনা করাতেন। তার সঙ্গে একে একে গ্রামের বহু ছাত্র এসে শিক্ষিত হতো।

টোল ঃ পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্ত হলে টোলে ব্যাকরণ শিক্ষা আরম্ভ হতো। সেখানেও হস্ত লিখিত গ্রন্থ পাঠ গ্রহণ করতে হতো। টোলের ছাত্ররা 'পড়ুয়া' ও গুরু 'মহাশয়' নামে অভিহিত হতেন। টোলের ছাত্রেরা গুরুকে পিতা অপেক্ষা অধিক ভক্তি করত। বহু স্থানের লোক এসে গুরুর গৃহে থেকে পাঠ গ্রহণ করত। গুরুগৃহের যাবতীয় কাজ পড়ুয়াদের কর্তব্য কার্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। প্রাচীন গুরুগৃহের চিত্র স্বর্গীয় চিত্র বলে গন্য করা হতো।

মুদ্রিত গ্রন্থ ঃ কিছুকাল পরে ছাপার পুস্তক প্রকাশিত হয়। "শিশুবোধক'ই বোধ হয় প্রথম শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। বয়স্কগণের জন্য ইতোপূর্বে বত্রিশসিংহাসনের পুঁথি বিলাত হতে মুদ্রিত হয়ে এসেছিল। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে কাঠের অক্ষরে লণ্ডন নগরে এই বাঙ্গালা গ্রন্থ মুদ্রিত হয়।

কেদার নাথ তৎকালীন পাঠশালা সম্পর্কে বলেন ইংরেজ শাসনে শিক্ষা বিস্তারের জন্য পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেছিল। গ্রামের কোন এক ব্যক্তি গুরু মহাশয়ের বা এলেমির পদ গ্রহণ করে গ্রামের ধনী গৃহের আটচালা ঘরে পাঠশালা বা মক্তব খুলে বসতেন। গুরু মহাশয়দের পাণ্ডিত্যের বিশেষ কোন প্রয়োজন হতো না। বেত্রহস্তে যিনি যত অধিক আস্ফালন করতেন ও দুষ্ট ছাত্রকে দমনে রাখতে পারতেন তিনিই উপযুক্ত গুরু মহাশয় বলে খ্যাতিলাভ করতেন।

আদিকালের শিক্ষাপোকরণ ঃ অতি প্রাচীন কালে ভূর্জ্জপত্রে কঞ্চির লেখনী দ্বারা সবাইকে লেখতে হতো। চাল পুড়ে পাতিলের কালী দিয়ে কালী প্রস্তুত করা হতো। বৃদ্ধরা তা ব্যবহার করতেন। বালকেরা নিজেরা লাউ পাতায় হাঁড়ির কালী মেখে জলে চিপিয়া সহজ প্রণালীতে কালি প্রস্তুত করে নিত। বালকেরা ভূর্জ্জপত্রে বা তালপত্রে পার্শী ও বাঙ্গালা আর লেখত ও অঙ্ক করত। পাঠ শেষ হলে দোয়াত কলম ও লেখা একত্র রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্বক "জয় জয় দেবী চরাচর সার" ইত্যাদি স্ত্রোত্র পাঠ করতঃ ভক্তি ভাবে শেষ প্রণাম করে উঠে গুরুকে প্রণাম করত। এরূপ সকাল ও বিকেল দু'বেলা লেখবার প্রথা ছিল। তখন বালকদের পড়বার মুদ্রিত কোন পুস্তক ছিল না। বৃদ্ধেরা দ্বিপ্রহরে হস্ত লিখিত রামায়ণ, মহাভারত, পদ্মাপুরাণ, দুর্গাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করতেন। স্নান না করে ঐ সব গ্রন্থ পাঠ করা যেতো না। এ সময় বালকেরা কলার পাতে লেখত। পড়বার পুস্তক তখনও মুদ্রিত হয় নি।

www.pathagar.com

ছাত্রদিগকে বসবার জন্য নিজ নিজ গৃহ হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাটি নিয়ে আসতে হতো। গুরু মহাশয় মধ্যগৃহে জলচৌকিতে উপনিবেশ করতেন। তাঁর পায়ে কাষ্টপাদুকা ও গলদেশে দ্বিতীয় বস্ত্র থাকতো। বালকদের স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, কাঠাকালি, ইত্যাদি ছিল লেখার বিষয় ।

আধুনিক যুগের শিক্ষা

১৭৫৭ সালে বাংলাদেশে কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠা হলেও বাস্তবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ দেশের প্রচলিত শিক্ষার ধারাটিকে পরিবর্তিত অথবা প্রভাবিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্ঠা ও উদ্যোগের পর ১৮৩৫ সালে ঘোষিত ইংরেজীর মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞান প্রসারের বিষয় সরকারী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ফলে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মৌলিক ও সুদূর প্রসারী পরিবর্তন দেখা দেয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নেত্রকোণা, ময়মনসিংহের তথা বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের সুচনা কাল বলা যেতে পারে। তখন থেকে শুরু হয় কাঠামোগত শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। পরিদর্শন ও অনুদান মঞ্জুরীর মাধ্যমে বিদ্যালয়ের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার উচ্চতর প্রতিষ্ঠান হিসেবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হতে শুরু করে।

এই আধুনিকায়ন প্রচেষ্টা এদেশের ধর্মভিত্তিক তাত্ত্বিক শিক্ষার প্রাচ্য ধারাটিকে সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারেনি। কারণ, মুসলিম সমাজ তথাকথিত বিজাতীয় ভাবধারা থেকে সরে থাকার জন্য বহুকাল পর্যন্ত প্রাচ্য ধারাটির প্রতি আকৃষ্ট ছিল। তবে একদিকে সরকারী সাহায্য সহায়তার ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, অন্যদিকে জীবিকার্জনের উপযোগী ও সময়োপযোগী শিক্ষাদানে ব্যর্থতার কারণে এ পুরানো শিক্ষাব্যবস্থা চাহিদা ধীরে ধীরে কমে যায়। সরকারী সহায়তায় শহরে, গ্রামগঞ্জে আধুনিক শিক্ষা প্রসারে সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

শিক্ষায় শায়খ পীর আউলিয়াগণের অবদান

খৃষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথমদিক থেকেই বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং এর পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে মুসলিম ওলি দরবেশগণের আগমন ও ধর্ম প্রচার শুরু হয়। এদের মধ্যে হযরত শাহ্ সুলতান মোজার্রদ রুমী তাঁর পীর সৈয়দ শাহ্ সুরখল আম্বিয়া এবং চল্লিশ জন অনুচর নিয়ে নেত্রকোনার মদনপুর ও তার আশেপাশে ইসলাম প্রচারে রত ছিলেন। একই উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহের মুখী অঞ্চলে এসেছিলেন হযরত মিসকিন শাহ্। এছাড়া বোকাইনগরেও দরবেশের খানকা ছিল বলে জানা যায়।

www.pathagar.com

এ সব মুসলিম সাধকগণের নির্মল চরিত্র এবং ইসলামের সাম্যবাদী ও উদার আদর্শ এতদ্ অঞ্চলে অধিবাসীদের বিশেষতঃ সমাজের অবহেলিত ও নিগৃহীতদেরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। তারা সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল।

তাছাড়াও মুসলিম ধর্ম সাধকরা ধর্ম প্রচার, সামাজিক বৈষম্য, অনাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন এবং তাদের মধ্যে অনেকে অত্যাচারী অমুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। এসব সংঘর্ষে কেউ কেউ মৃত্যুবরণও করেছেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যাচারী শাসকেরা পরাজিত হয়ে ইসলাম কবুল করেছেন। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট পীর আওলিয়াগণের নানা ভাবে ইসলামের সাম্য ধর্ম প্রচারে সাহায্য সহায়তা করেন। উভয়ক্ষেত্রেই এ সব সংঘাত ও সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে নানা রকম কিংবদন্তীও সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে আউলিয়া দরবেশগণ এ অঞ্চলের শিক্ষা প্রসারে আত্মত্যাগী, অসমসাহসী ভূমিকা রেখেছেন।

এই পীর দরবেশগণ পর্যটক হিসেবেই এ অঞ্চলে আগমণ করেন নি। তাদের অনেকেই স্থানীয় জনগণের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে নিজ নিজ কর্মস্থলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। এর ফলে একদিকে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে, অন্যদিকে দরবেশগণের খানকা ও এবাদত খানার আশেপাশে এবং তাদের প্রভাবিত অঞ্চলে মক্তব মাদ্রাসা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।

এভাবে এ অঞ্চলের সমাজে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। জনজীবনের এই নবজাগরণ অমুসলিমদেরও প্রভাবিত করেছিল এবং শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অধিকতর উদ্যোগী হতে তাদের উৎসাহিত করেছিল। অধ্যক্ষ আবদুস শাকুর উপর্যুক্তভাবে এ অঞ্চলের শিক্ষা প্রসারেও পীর-আউলিয়াদের অবদানের কথা মূল্যায়ন করেছেন ।

কেদার নাথ তৎকালীন ছাত্র বেতন পর্যালোচনায় বলেন সেকালে গুরু মহাশয় ছাত্র বেতন বাবদ নগদ টাকা গ্রহণ করতেন না। নির্দিষ্ট হারে ধান পেতেন। এ ছাড়াও পূজা পার্বণে কলাটা, মূলাটা, তরি তরকারি ইত্যাদি পাওনাও ছিল। গুরু মহাশয়ের বাড়ীর হাট বাজার বালকেরাই করে দিত। গৃহ-প্রাঙ্গণের ক্ষেত্র কর্ষণ, তরকারী ইত্যাদির গাছ রোপণ তাদের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল। গ্রামে গুরু মহাশয়গণের অদ্বিতীয় ক্ষমতা ও সম্মান ছিল। এ সময়ের ছাত্র শাসন প্রথা অত্যন্ত ভয়ানক ছিল। ১৮৩৪ সালে মিঃ এডাম এতদ্দেশীয় শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শন জন্য জেলায় জেলায় গমন করেন। তাঁর প্রদত্ত বিবরণীতে চতুর্দ্দশ প্রকারের

www.pathagar.com

শাস্তির কথা লিখেছেন। এ সকল শাস্তি-ত্রিভঙ্গী, লাড়ু গোপাল, সূর্য্যমুখী, প্রভৃতি নামে অভিহিত হতো। পাঠশালার এ শিক্ষা কোন প্রকারে নিজ নাম দস্তখত শিক্ষা ও জমিদারী মহাজনী কার্যের উপযোগী হলেই চলত।

শিক্ষার প্রতি সমাজের মনোভাব : জেলায় ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হলে দেশে যাঁরা শিক্ষিত ও বড়লোক বলে পরিচিত ছিলেন তাঁরাই কেবল তাঁদের ছেলেদেরকে ইংরেজি স্কুলে পড়তে দিলেন। অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু ইংরেজি স্কুলকে ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। এতে নগরে ও মফস্বলে দু'দলের সৃষ্টি হলো। এক দল বলত "বণিক ফিরিঙ্গিরা ইংরেজি পড়ায়ে জাত নষ্ট করতে এসেছে, নতুবা নিজ ব্যয়ে এরূপ স্কুল দেয়ার প্রয়োজন কি? অন্য দল প্রতিবাদ করে বলত "আমাদেরকে শিক্ষিত করে কার্যকারী করবার জন্য গভর্ণমেন্ট এইরূপ অনুষ্ঠান করেছেন।" বহু দিন এ দু মতের বিরোধ চলছিল। তখন যাঁরা কার্যোপলক্ষে ময়মনসিংহ থাকতেন তাঁদের অতি নিকট আত্মীয়, পুত্র, ভ্রাতুস্পুত্র, ভাগিনেয় ব্যতীত অন্য কোন ছাত্র ইংরেজি বিদ্যালয়ে যাতো না। এবং এর মধ্যেও ৩/৪ ছাত্র ভিন্ন জেলাবাসী ছিল। অতঃপর ধর্ম বিরোধে এ উভয় মত আরও দৃঢ় হয়ে যায়।

ময়মনসিংহে স্ত্রী-শিক্ষাঃ কেদার নাথ তাঁর ময়মনসিংহের বিবরণীতে অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার জন্য এই নগরে বহুপূর্বে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা-সমিতি নামে একটি সমিতি ছিল বলে উল্লেখ করেন; কালে তাহা উঠে যায়। অতঃপর কলিকাতা-প্রবাসী ময়মনসিংহবাসিগণের যত্নে "ময়মনসিংহ সম্মিলনী সভা" নামে একটি সভা কলিকাতায় স্থাপিত হয়। সম্মিলনীর চেষ্টায় অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির জন্য জেলাবোর্ড প্রতি বৎসর সম্মিলনীকে ২৫০ টাকা অর্থ সাহায্য করে থাকে।

কেদার নাথ আরো উল্লেখ করেন যে অবসর বুঝে একদল প্রগতিশীল যুবক স্ত্রী-শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। শহরের তারকনাথ সেন, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুবনেশ্বর সিংহ, পার্বতীচরণ রায় ও হরকিশোর রায় প্রভৃতির চেষ্টায় কালীচরণ ঘোষের বাড়ীতে এক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো।

শিক্ষা বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের নাম সর্বত্র সুপরিচিত। এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু সর্ব প্রথম কেম্ব্রিজ বিশ্বব্যিালয়ের সর্বোচচ গণিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বাঘিলের কুমদিনী মিত্র এই জেলার মহিলাদিগের মধ্যে প্রথম বি,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

ইংরেজি শিক্ষিতের কদর : তখন ইংরেজি শিক্ষা জনসাধারণের নিকট ঘৃণায় বিষয় হলেও, দেশে ইংরেজি শিক্ষিতের প্রভূত আদর ছিল। জেলা কালেক্টরের হেড্ কেরাণী কালী বাবুকে দেখবার জন্য তাঁর বাসায় লোক দলে দলে দেখতে আসতো। কালী কেরাণী বিকেল বেলায় নদীর পাড়ে বেড়াতে বের হলে তাহার পেছনে বহু লোক ছুটে আসতো। বর্তমানে সরকারী দলের বড় কর্মকর্তাদের পেছনে এমন ভীড় দেখা যায়। তবে ক্ষমতায় না থাকলে সেই ব্যাক্তিটিই বড় একা হয়ে যান। এমনকি অবস্থা ভেদে, চাকরী দেয়ার জন্য বেশী লেনদেন করে থাকলে অনেকে নিজ এলাকায়ও যেতে পারেন না।

তখনকার যুগে ইংরেজী শিক্ষিত লোকের মুখে ইংরেজি মতে কাশি, ইংরেজি হাঁটা, ইংরেজি কায়দা, সবকিছুই তখনকার উন্নতিশীল যুবকগণের অনুকরণের বিষয় হয়েছিল। বি, এ, এম, এ, পাশ তখনও এ জেলায় প্রবেশ করেনি। ১৮৬৬ সনে কিশোরগঞ্জ মহকুমার কালীনাথ ধর ও টাঙ্গাইল মহকুমার প্যারীমোহন বিশ্বাস প্রথম বি, এ, পাশ করে আসেন। তারা দু'জনই বৃহত্তর ময়মনসিংহের প্রথম বি, এ। ১৮৬৭ সনে প্যারীমোহন বিশ্বাস এম, এ ও ১৮৬৮ সনে আনন্দমোহন বসু এম, এ, পাশ করেন। তাদেরকে দেখবার জন্য লোকে লোকারণ্য হয়ে যেতো। বহু দূরবর্তী গ্রামের লোকও ইংরেজির বি, এ, এম, এ পাশ দেখে মনে তৃপ্তি সাধন করতো। এরূপ ইংরেজি পাস ছেলে দেখবার সাধ থাকলেও, দেশে ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তনের ইচ্ছা অধিকাংশেরই ছিল না। সুতরাং প্রথম ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের পর বহু দিন পর্যন্ত এ বিস্তৃত জেলার জন্য একটি ইংরেজি বিদ্যালয়ই প্রচুর ছিল বলে মনে হয়। অপর পক্ষে বঙ্গ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৮৬৭ সন পর্যন্ত পূর্ব ময়মনসিংহে ৭০টি ও পশ্চিম ময়মনসিংহে ৩৮টি হয়েছিল। পূর্ব ময়মনসিংহে ৭০টির মধ্যে ১৭টিতে ও পশ্চিম ময়মনসিংহের ৩৮টির মধ্যে ৯টিতে অল্প অল্প ইংরাজী পড়ানো হতো। প্রথম ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপনের সতের বছর পরে ১৮৭০ সনে টাঙ্গাইল জাহ্নবী স্কুল স্থাপিত হয় এবং এর ১২ বছরের মধ্যে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় দশটি নতুন এন্ট্রেন্স স্কুল ও দুটি কলেজ স্থাপিত হয়। ফলে জেলায় শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ সম্প্রসারিত হতে শুরু করে।

এক সময় ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তন নিয়ে গ্রাম্যসমাজে প্রতিবাদের ধ্বনি বেজে ওঠে। প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান কায়স্ত বৈদ্যগণ ইংরাজি শিক্ষার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ক্রমে গবর্নমেন্টের ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হলে লোকের মনে সন্দেহের ছায়া পড়ল– তাঁরা বলতে লাগলেন– "ফিরিঙ্গীরা দেশ খ্রীষ্টান করে ফেলবে।" যাঁরা বাঙ্গালা পড়াবার জন্য নসিরাবাদে ছেলে রেখেছিলেন তাঁরা ছেলেকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে পাঠশালায় রাখলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গৃহে টোলের সংখ্যা বেড়ে গেল। হিন্দু সমাজে বিপ্লব আরম্ভ হলো। পরবতীর্তে ১৮৫৩ সনের ৩রা নভেম্বর ময়মনসিংহ নগরে গবর্ণমেন্টের ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। এভাবে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে শিক্ষা এবং ইংরেজী স্কুলের সম্প্রসারণ ঘটে।

www.pathagar.com

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

অতি প্রাচীনকাল হতে এ জেলায় সংস্কৃত ও বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনা হয়ে আসলে ও বাস্তবে এ জেলার শিক্ষার প্রসার ঘটেনি তেমন। দেশ বিভাগ পূর্বকালে নেত্রকোণায় ছিল মাত্র ২৫টি হাই স্কুল। তৎকালীন মহকুমায় কোন কলেজ ছিলনা। ফলে নেত্রকোণার রাজনীতি ছিল অনেকাংশে কৃষক আন্দোলন নির্ভর। স্বাদেশিকতার উন্মেষ হলেও, জাতীয়তাবোধের সামগ্রিক বিকাশ ঘটতে পারেনি। কারণ কলিকাতা কেন্দ্রিক বাঙালী জাতীয় চেতনা, ১৯৪৬ সনের দাঙ্গার মাধ্যমে প্রশমিত করা হয়। তাই বাংলাদেশের কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর কলিকাতার শিল্প সমৃদ্ধিতে বিকশিত জাতীয়তাবোধ থেকে স্বদেশী চেতনার উম্মেষ শিক্ষাক্ষেত্রে বিকশিত হতে কিছুকাল সময় অপেক্ষা করতে হলো। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সুদূর অতীতের দিল্লীর মোঘল শাসকদের লূন্ঠন ও ইংরেজদের লূন্ঠন যন্ত্রণা বুকে নিয়েই গড়ে তুলতে হয়েছিল কলিকাতা শিল্পনগরী। ১৯৪৭ সনের পর করাচী, পিন্ডি, ইসলামাবাদের উন্নয়নে ও বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা ছিল শীর্ষে। তাই সীমাহীন শোষণের প্রক্রিয়ার ফলে যুগ যুগ ধরে শোষিত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ছিল অবহেলিত। এই শোষণ ও বঞ্চনার ফলে পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন কোনটাই সম্ভব হয় নাই। তবে ১৯৪২ সনের বেঙ্গল প্যাক্টের আশীর্বাদ এবং হক-সোহ্‌রাওয়ার্দী-ভাসানীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দেশের তথা নেত্রকোনা জেলায় মানব সম্পদ উন্নয়নে এসব প্রতিষ্ঠানের অবদান ছিল অনন্য। ১৯৪৭ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় নেত্রকোণা কলেজ। নেত্রকোনায় শিক্ষা প্রসারের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে নিম্নে ১৯৪৭ সনের দেশ বিভাগ উত্তর হাইস্কুল সমুহের প্রতিষ্ঠার বিবরণ তুলে ধরা হলো।

কেন্দুয়া

গগডা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৯ ইং
মজলিশ পুর উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৩ ইং
জনতা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৫ ইং
গন্ডা দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৮ ইং
রওশন ইজদানী একাডেমী	১৯৬৬ ইং

নেত্রকোণা সদর

আব্বাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬০ ইং
লীগঞ্জ বালি অনন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৩ ইং
মোক্তাল হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়, চল্লিশা	১৯৬৩ ইং
ঠাকুরকোণা রহিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৩ ইং
দেওপুর উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৩ ইং

www.pathagar.com

জাহানারা স্মৃতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৩ ইং
নেত্রকোণা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৩ ইং
মদনপুর শাহ্ সুলতান উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৩ ইং
মারাদীঘি গোলাম হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৫ ইং

পূর্ব ধলা

গোয়াতলা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৫১ ইং
খলিশ্যপুর উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬২ ইং
সাধুপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, হোগলা	১৯৬৫ ইং
হিরণপুর উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৮ ইং
বাইঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়, বৈরাটী	১৯৬৮ ইং
ধলামূল গাঁও উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৮ ইং
জালশুকা কুমুদগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৯ ইং

মোহনগঞ্জ

মোহনগঞ্জ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়	১৯৫২ ইং
খুরশিমুল উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৫ ইং
শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়, সুয়াইর ইউ,পি	১৯৬৬ ইং
শ্যামপুর ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৯ ইং

দূর্গাপুর

চন্ডীগড় উচ্চবিদ্যালয়	১৯৬৫ ইং
রানী খং উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৮ ইং
দূর্গাপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৯ ইং
দূর্গাপুর এম কে সি এম স্কুল	১৯১৮ ইং
অমুসলিম ও বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	
গুজিরকোনা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৫৯ ইং

খৃষ্টান মিশন ও ওয়াই, এম, সি, এ,ঃ

নেত্রকোণার বিরিশিরিতে অবস্থিত খৃষ্টান মিশনের উদ্যোগে একটি হাইস্কুল ও একটি পি,টি, আই পরিচালিত হয়েছে। ময়মনসিংহ শহরের ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যান্ট মিশন একটি করে উন্নতমানের প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা করছে। বিরিশিরির ইয়ংম্যান্‌স খৃশ্চিয়ান এসোসিয়েশন (১৯৭৪) স্বাক্ষরতা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কর্মসূচী এবং একটি পাঠাগার পরিচালনা করছে।

www.pathagar.com

কারিতাস, বাংলাদেশ

নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা, দূর্গাপুর ও ধুবাউরা এবং টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরে এদের শাখা রয়েছে। এদের কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে নির্বাচিত এলাকায় প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা এবং যুবক ও বয়স্কদের স্বাক্ষরতা ও কর্মদক্ষতা অর্জনে উদ্বুদ্ধকরণ।

কলমাকান্দা	
রংছাতি উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৫১ ইং
নাজিরপুর পল্লী জাগরণ উচ্চবিদ্যালয়	১৯৫৬ ইং
নলচাপড়া উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬১ ইং
সিধুলী পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬২ ইং
আটপাড়া	
দূর্গাশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৭ ইং
খিলা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৮ ইং
মদন	
বালালী বাঘমারা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৪ ইং
খাগুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৫ ইং
ফতেহপুর এস ও সি উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৮ ইং
বারহাট্টা	
হাফিজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় (ফকিরের বাজার)	১৯৬০ ইং
নিশ্চিন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৬ ইং
খালিয়াজুরী	
শালদিঘা জি, জি উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৫৪ ইং
কুতুবপুর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৪ ইং
খালিয়াজুরী উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৭ ইং
কৃষ্ণপুর এ,এ,পি উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৯ ইং
সাতগাঁও এম,বি,পি উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৯ ইং

উৎস: গোলাম এরশাদ, ১৯৯৫ ২০০১

www.pathagar.com

শিক্ষা সম্প্রসারণঃ শিক্ষার হার

অধ্যক্ষ আবদুশ শাকুর তাঁর প্রবন্ধে জেলা গেজেটিয়ার এর তথ্য বিশ্লেষণ করে অভিমত ব্যক্ত করেন যে শতাধিক বৎসর আগে থেকেই ময়মনসিংহ অঞ্চল শিক্ষায় পশ্চাৎপদ। এর প্রধান কারণ-এ জেলার সংখ্যা গরিষ্ট মুসলিম সমাজে শিক্ষার প্রসার ছিল অত্যন্ত কম। হান্টারের বিবরণী থেকে আরো জানা যায়, ১৮৭০-৭১ সালে এ জেলার মোট জনসংখ্যার ৬৪.৭ শতাংশ ছিল মুসলিম; অথচ সে সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত মোট ছাত্র সংখ্যার মধ্যে মুসলিম ছাত্র ছিল মাত্র ১৫ শতাংশ। এর পঞ্চাশ বছর পর ১৯২১ সালেও হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমগণ শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিল।

বিভিন্ন জরিপ ও গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, স্বাক্ষরতা হারের দিক থেকে ১৯১১ ও '২১ সালে এ জেলার স্থান ছিল সর্বনিম্নে, তার মধ্যে নেত্রকোণার অবস্থা ছিল আরো খারাপ। তখন স্বাক্ষরতার হার ছিল যথাক্রমে ৪.৬ ও ৫.১১ শতাংশ। ১৯১১ সালে এ জেলার বিশেষ পশ্চাৎপদ এলাকা ছিল বর্তমান ময়মনসিংহের ফুলপুর (৩.২), ফুলবাড়িয়া (৩.১) ও গফরগাঁও; নেত্রকোণার খালিয়াজুড়ি এবং জামালপুরের নালিতাবাড়ী (৩.০) শতাংশ।

১৯২১ সালে জামালপুর-শেরপুর অঞ্চলের শিক্ষার হার ছিল নিম্নতম (৪.০)। সে সময়ের অন্যান্য পশ্চাৎপদ এলাকাগুলি ছিল জামালপুরের নালিতাবাড়ি (২.৯)। টাঙ্গাইলের বাঁশাইল, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, ফুলবাড়িয়া ও ফুলপুর, কিশোরগঞ্জের ইটনা, নিকলী ও অষ্টগ্রাম এবং নেত্রকোণার মদন ও কলমাকান্দা। অপেক্ষাকৃত অগ্রগামী এলাকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ময়মনসিংহের কোতুয়ালী (১০.২), কিশোরগঞ্জ (৮.৪) টাঙ্গাইল (৭.৪৫), নেত্রকোণা সদর (৭.৩), টাঙ্গাইল সদর, কিশোরগঞ্জ সদর (৫.৭৫) ও বাজিতপুর।

স্বাক্ষরতার দিক থেকে ১৯৩১ ও '৪১ এ এ জেলার স্থান ছিল যথাক্রমে ১২ ও ১৪ শতাংশ। ১৯৬১ তে এ জেলার স্বাক্ষরতার হার ছিল ১২.৫৬ এবং ১৯৭৪ এ ১৪.৭৯। স্বাক্ষরতার দিক থেকে এ দুই সময়ে এ জেলার স্থান ছিল যথাক্রমে ১৬ ও ১৮ শতাংশ। এ জেলায় পুরুষের তুলনায় নারী স্বাক্ষরতার হার এখনও অনেক কম। ১৯৫১ সালের শুমারী অনুযায়ী পুরুষ ও নারীদের শিক্ষার হার ছিল যথাক্রমে ২৩.৩ ও ১১.৩ এবং ১৯৬১ সালে ২০.৫৬ ও ৭.১৮ শতাংশ।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

অধ্যক্ষ আবদুশ শাকুর তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, এডামের রিপোর্ট থেকে অনুমান করা যায়, উনিশ শতকের প্রথম দিকে ময়মনসিংহ অঞ্চলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও শিক্ষকের গৃহে, মসজিদে ও মন্দিরে এবং কচিৎ নিজস্ব স্কুল গৃহে বহু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় এ গড়ে উঠেছিল। নেত্রকোণা তথা বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকার অধিকাংশ বিদ্যালয় ছিল এক

www.pathagar.com

শিক্ষক পরিচালিত। সেগুলোতে ছাত্র সংখ্যা ছিল কম, শিক্ষা সরঞ্জাম অত্যন্ত সীমিত এবং শিক্ষাদান ছিল নিম্নমানের। মক্তবের শিক্ষার নিম্নমান সম্পর্কে আর, এ স্যাক্সে (Sachse) বলেছেন, "half lettered maulvis of Noakhali and chittagong were employed in these institutions."

১৮৩৫ থেকে ১৯৮৬ এই দেড়শো বছরে এদেশের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে, নেত্রকোণা ও ময়মনসিংহ জেলাও এসব উদ্যোগের আওতাধীন ছিল। তাছাড়া এদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা বিদ্যমান ছিল, বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা এর ব্যতিক্রম ছিলনা।

১৮৩৫ সালে এ জেলায় প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা কত ছিল তা জানা যায় নি, তবে উইলিয়াম হান্টারের বিবরণীতে দেখা যায় ১৮৭৩ সালের মার্চ মাসে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় প্রাথমিক স্কুল ও স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৭১ ও ৪৮০০। অন্যদিকে ১৯৮৫ সালের মে মাসে স্কুল ও স্কুলগামী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৯৩৬ ও ৯৯০,৫০৫। এ থেকে দেখা যায়, ১১২ বছরে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ২৯ গুণ, আর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২০৬ গুণ। মধ্যবর্তী সময়ের দিকে তাকালে দেখা যায়, স্কুলের সংখ্যা ১৯১৪ থেকে '৪৭ পর্যন্ত বেড়েছে ৮৮টি এবং ১৯৬৫ থেকে '৮৫ সালের মধ্যে বেড়েছে ১৮৯৫টি।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা

বর্তমানে নেত্রকোনা জেলার সাধারণ শিক্ষার হার ৩৬.৫৬ শতাংশ যা অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেক কম। অন্যান্য উন্নত জেলার তুলনায় এ জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পর্যাপ্ত নয়। এ জেলায় মহাবিদ্যালয় রয়েছে ২৮টি তম্মধ্যে ২টি সরকারী, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় রয়েছে ০১টি। উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে ১২১টি তন্মধ্যে ৬টি সরকারী, জুনিয়র স্কুল রয়েছে ৪৭টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬২৫টি, বে-সরকারী রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় ৪৫৮টি, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৪৪টি, ইংরেজী মাধ্যম প্রাথমিক বিদ্যালয় ০১টি, কারিগরী প্রতিষ্ঠান ০২টি তন্মধ্যে সরকারী ১টি, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মাদ্রাসা রয়েছে ২৫৭ টি; তন্মধ্যে কামিল-০১টি, ফাযিল-৯টি, আলিম-১৪টি, দাখিল ৫৯টি এবং এবতেদায়ী-১৮৪টি, সরকারী শিশু পরিবার (বালক) ০১টি, এতিমখানা ০৫টি, উপজাতীয় কালচালার একাডেমী ০১টি, পাবলিক লাইব্রেরী-কম-অডিটরিয়াম ০৬টি। উপজেলাওয়ারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য বিবরণী সারণী ৩.৫ এ দেখানো হলো।

www.pathagar.com

সারণী ৩.৫: নেত্রকোণা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিবরণ (উপজেলা ওয়ারী) ঃ

	নেত্রকোণা সদর	পূর্বধলা	কেন্দুয়া	কলমা কান্দা	দূর্গাপুর	বারহাট্টা	আটপাড়া	মোহন গঞ্জ	মদন	খলিয়া পুর
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (মোট ৬২৫ টি)	৯৪	৭৫	৮৭	৭৫	৫৮	৫৬	৫৫	৫০	৪৪	৩১
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় (মোট ৪৬১ টি)	৮৫	৭২	৭৪	৪০	৪২	৩২	৪১	৩২	২৮	১৫
কমিউনিটি বিদ্যালয় (মোট ৬৮ টি)	১৪	১০	১০	১৫	০৫	০৩	০১	-	০৭	০৩

উৎস ঃ জেলা প্রশাসন, নেত্রকোণা ২০০৫

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

পুরানো দিনের চিকিৎসা পদ্ধতি

বহু বছর পরে, ১০৬১ সনের দিকে বল্লাল সেনের শাসনামলে সোনার গাঁ থেকে শ্রীঅনন্ত দত্ত তাঁর গুরু ও পরিবার পরিজন সহ পালিয়ে এসে কিশোরগঞ্জের বর্তমান উপজেলা অষ্টগ্রামের 'কান্তল দ্বীপে' বসতি স্থাপন করেন। এ গ্রামের চারপাশে বর্তমানেও যে বিপুল বিস্তারী হাওর, তা দেখে মনে হয় তখনও এখানে জনবসতি ছিল নগণ্য। রাজা টোডরমল্ল, সম্রাট আকবরের সময় যখন ভূমি জরিপ করেন, তখনও অধুনা গফরগাঁও অঞ্চলের 'লাকাইন' ('লা-মকান')-এ জনবসতি যে ছিল না গ্রামের নামটি থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

অধ্যাপক আবদুর কাদির খান তাঁর প্রবন্ধে এ জেলায় চিকিৎসা সংক্রান্ত মানুষের বিশ্বাস ও কুসংস্কার বিষয়ে উল্লেখ করেন, বৃহত্তর ময়মনসিংহ তথা নেত্রকোণা জেলায় আদিকালে চিকিৎসকগণ ছিলেন দৈবী গুণসম্পন্ন মানুষ আর অসুখ-বিসুখ রোগ বালাই তো দৈবী ব্যাপার এমন ধারণা থেকেই চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগে তৎপর লোকজন অবশ্যই সক্রিয় ছিলেন। দেবতার ক্রোধ, কোপদৃষ্টি, অসন্তুষ্টি ইত্যাদিই রোগের মূল কারণ এ বিশ্বাস থেকেই রোগগ্রস্থগণ শরণাপন্ন হতেন ঐ চিকিৎসক শ্রেণীর মানুষের। তারা দেবতাকে তুষ্ট সাধন করতে তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা চালাতেন, ভোগ দিতেন, বলি উৎসর্গ, মানত, সিন্নি সালাত দিয়ে রোগ নিরাময়ে তাদের তৎপরতা প্রদর্শন করতেন। অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের কাছে এঁরা ছিলেন দেবতার প্রতিনিধি। এই দৈব-প্রতিনিধিত্বকারীগণ তাদের চিকিৎসা নামক ব্যাপারটা চালিয়ে অজ্ঞ মানুষের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

www.pathagar.com

বয়স্ক ব্যক্তিদের শুল বেদনায় আক্রান্ত ব্যক্তি একরকম সাদা গুড়া ঔষধ খেতেন। সাময়িক উপশম বোধ হতো। পঞ্চাশ-এর দশকের গোড়ার দিকে দেখা গিয়েছে বয়স্ক, বৃদ্ধচাষী ক্ষেতে হাল চাষ করছেন, হঠাৎ পেটে হাত চেপে ধরে বসে পড়লেন ক্ষেতের আলে, কোমড়ে গুঁজা পুরিন্দা বের হলো, দু চিমটি মুখে দিয়ে পাঁচ দশ মিনিট বসে থাকলেন আবার উঠে হাল চাষ করতে লাগলেন। পরে জানা গিয়েছে এই ঔষধ সাময়িক বেদনা নাশক (সোডিয়াম বাই কার্বনেট) খাওয়ার সোডা। দীর্ঘ স্থায়ী এর ব্যবহারের ফলে রোগী শেষ পর্যন্ত অন্তগ্রন্থি ছিন্ন-ছিদ্র হয়ে মারা যেতেন। প্রতিক্রিয়া জানতেন না বলে তার তাৎক্ষনিক উপশমকে চিকিৎসা বলে মনে করতো।

'বাত' আমাদের দেশের ন্যায় নেত্রকোণা জেলায়ও এক মারাত্মক ব্যাধি। এতে পঙ্গু হয়ে যাওয়া মানুষের এক রকম চিকিৎসা এখনও করা হয় গ্রামদেশে। একে বলে 'শুল' দেয়া। পায়ের গোড়ালী থেকে ৪/৫ ইঞ্চি উপরে (বিশেষতঃ বাম পায়ে) মাংসপেশী বা পায়ের গোছার এক পাশে যাঁতি বা সরতার ডাটা পুড়ে লাল গনগনে করে ঠেসে ধরে পুড়িয়ে গর্ত করে হলুদ বা নিম গাছের ডালের ছোট গুটি বসিয়ে তা বেঁধে দেয়া। ক্রমে তাতে দগদগে ঘা হয়ে পুঁজ, রস ঝরতে থাকে অবিরত। ছয় মাস থেকে বছর পর্যন্ত এটা চলে। বাতে শয্যাশায়ী রোগী যিনি লাঠি দিয়ে ভর করেও দাঁড়াতে পারতেন না, অথবা অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে যিনি পা তুলতে ফেলতে অক্ষম- তিনিও এ চিকিৎসায় হাঁটতে পারেন স্বাভাবিক ভাবেই। এটা বেশী দিনের কথা নয়, সত্তর, আশির দশকের আগ পর্যন্ত গ্রামগঞ্জে এ ছিল মামুলী ব্যাপার। বাতের এ চিকিৎসা ছাড়া, হাত, পা, ঝেড়ে ক্রমে এক জায়গায় বেঁধে কাকিয়া মাছের কাঁটা দিয়ে আঘাত করে রক্ত ঝরানো এতেও কিছু উপকার পাওয়া যায় বলে রোগীরা মনে করতেন।

ব্যক্তিগত শত্রুতার ফলে শত্রুকে 'বানমারা' নামক এক ব্যাধিতে আক্রান্ত করার ব্যবস্থা ছিল। এতে আক্রান্ত ব্যক্তি নানা উপসর্গে ভোগতো। এর জন্য গুণীন বা ফকির তাবিজ কবজ, পানি পড়া দিতেন যাকে অঞ্চল বিশেষে উতার পানি বলা হতো। এতে আক্রান্ত ব্যক্তি গুণীন দ্বারা তার শত্রুদেরকেও পাল্টা বান মারতে পারতেন। এর ফল নাকি হতো ভয়াবহ। দু'দশক আগেও এসব ঝাড়, ফুক, তাবিজ-কবজ অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল গ্রামগঞ্জের মানুষের কাছে।

সর্প দংশিত বা কীট-পতঙ্গে দংশনজাত ব্যাপারে ওঝা রোগীকে ঝাড়তেন। মা-মনসার দোহাই ছাড়াও অন্য কি কি মন্ত্র বিড় বিড় করে আওড়াতেন এবং আক্রান্ত বা দংশিত ব্যক্তির মাথা থেকে পা পর্যন্ত ক্রমাগত হাতের সাহায্যে জোরে জোরে আঘাত করে চলতেন। এভাবে সর্পদংশনের চিকিৎসা চব্বিশ ঘন্টা থেকে বাহাত্তর ঘন্টা চলতো। 'বেহুলা, লক্ষীন্দরের' কাহিনী ছিল ঐ ওঝাদের মন্ত্র, তা বুঝা যেত তাদের কিছু কিছু আবৃত্তি আওড়ানো বুলি থেকে।

www.pathagar.com

রোগী দীর্ঘদিন অসুখে শয্যাশায়ী থেকে যাচ্ছে ঔষধে ধরছেনা- আরোগ্য বা মৃত্যু কিছুই হচ্ছে না এমন ক্ষেত্রে মুসলমান ধর্মসম্প্রদায়ভূক্তগণ 'খতমে শাফা' 'খতমে খাজেগান' এবং সনাতন ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্তগণ 'প্রায়শ্চিত্ত' নামক এক ব্যাপার করেন প্রাচীন কাল থেকেই। এ সমস্ত অনুষ্ঠিত হলে রোগী হয় আরোগ্য লাভ করবে নতুবা তার মৃত্যু হবে। এটাও এক প্রকার চিকিৎসা বিধান যা এখনও গ্রামগঞ্জে কোথাও কোথাও চালু আছে।

মোটামুটিভাবে এই ছিল এ অঞ্চলের চিকিৎসা বিধান ও স্বাস্থ্য জ্ঞান। এ ছাড়া অন্যান্য অসুখ-বিসুখে গাছ গাছড়ার ঔষধ ব্যবহৃত হতো। যেমনঃ সর্দি কাশিতে তুলসী পাতা বা বসাক পাতার রস ও মধু, খোস পাঁচড়ার আক্রমণে হলুদ, নিমপাতা, খাওয়া বা তাদের রস, আখের রস, ব্যবহার করা হয়। কৃমির ঔষধ আনারস পাতার গোড়ার সাদা অংশের রস, চুনের জল। আমাশয়ে আম গাছের বাকল-এর রস ঔষধ হিসেবে এখনও ব্যবহৃত হচেছ। গ্রামীণ জীবনে এ সমস্তই এখন পর্যন্ত ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত চিকিৎসা পদ্ধতি ও ঔষধ।

প্রাচীনকাল থেকেই এমন বিশ্বাস ও চিকিৎসা পদ্ধতি এ জেলায় প্রচলিত ছিল, যার অবশেষ এখনও অনেক এলাকায় রয়ে গেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির বহুল প্রসার হওয়া সত্ত্বেও পুরানো চিকিৎসা পদ্ধতি এখনও কি গ্রামে, কি শহরে বহাল তরিয়তে বর্তমানে চালু রয়েছে। কারণ, দরিদ্র মানুষের নাগালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপকরণ এখনও সহজলভ্য নয়।

আয়ুর্বেদী চিকিৎসা

পাল ও সেন রাজাদের আমলে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির আগমন ঘটে যা এখানে কবিরাজী চিকিৎসা নামে পরিচিত। রাজদরবারে বৈদ্যরা থাকতেন, কিন্তু উচ্চবর্গ ছাড়া সাধারণ মানুষ এঁদের চিকিৎসা লাভ করতে পারতেন না। রাজ বৈদ্যদের শিষ্যগণ ক্রমে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি সাধারণের কাছে পৌঁছানো দায়িত্ব পালন করেন। এভাবে বৈদ্যদের একটি পেশাজীবী শ্রেণী এখানে গড়ে উঠে। বংশগত বা শিষ্য পরম্পরায় তারা চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতি সাধনও করতে থাকে। বৈদ্যিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত চরক, সুশ্রুত গ্রন্থাদি থেকে রোগ নিরাময়, ঔষধ প্রস্তুতকরণ, ব্যবসার বিধি, অনুপান ইত্যাদি সকল রকম চিকিৎসা সম্পর্কীয় বিষয়াদি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে সমর্থ ছিলেন। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় বহু খ্যাতিমান আয়ুর্বেদশাস্ত্রী চিকিৎসক এক সময় ছিলেন। এঁদের শিষ্যরাই এখনও ঐ পদ্ধতির মাধ্যমে লোক চিকিৎসায় নিয়োজিত রয়েছেন। ফলে ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণাসহ বিভিন্ন ছোট বড় শহরে অনেক আয়ুর্বেদী চিকিৎসা ও ঔষধের দোকান গড়ে উঠে।

www.pathagar.com

ইউনানী ও হাকিমী চিকিৎসা

পরবর্তীকালে মোগল এবং সুলতানী আমলে ইউনানী বা হাকিমী চিকিৎসা পদ্ধতিও এখানে প্রবর্তিত হয় আয়ুর্বেদ বা ইউনানী মূলতঃ প্রায় একই রকম চিকিৎসা পদ্ধতির ভিন্ন দু'টি নাম। সামান্য প্রভেদ ছাড়া এঁদের মাঝে প্রায় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। পাল ও সেন রাজাদের শাসনামলে রাজ বৈদ্যদের পুস্তক ছিল সাংস্কৃত ভাষায় মোগল-পাঠান আমলে তা এসে দাঁড়ায় আরবী ফার্সী ও তুর্কী ভাষায়। ইউনানী বা আয়ুর্বেদিক উভয়েই চিকিৎসা ক্ষেত্রে ঔষধ প্রণালী ও উপকরণে, গাছ-গাছড়া (Herbal plants) কন্দমূল, ফুল, ফল পাতার রস, নির্যাস ব্যবহার করে থাকেন। উভয় পদ্ধতিতে মধু একটি সাধারণ ব্যবহার্য উপাদান। হাকিমী চিকিৎসায় রোগের আক্রমণে বংশ পরম্পরা গতিধারা নির্ণয়েরও একটা বিশেষ দিগের ইংগিত লক্ষ্য করা যায়।

হোমিও চিকিৎসা পদ্ধতি

ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার পরে আরও একটি চিকিৎসা পদ্ধতি ইংরেজ শাসনামলে এদেশে বিস্তার লাভ করে। তা হোমিওপ্যাথি। ইউরোপীয় বিশেষ করে পর্তগীজ ও জার্মান এবং আর্মেনীয় ব্যবসায়ী ও ধর্ম প্রচারকগণ তা এদেশে প্রবর্তন করেন। সুক্ষ্মমাত্রার ঔষধ ব্যবহারে রোগের লক্ষণসমূহ বিদূরিত করে রোগীকে সুস্থ করাই এর বিধান। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বহু জটিল ব্যাধি নিরাময় করে চিকিৎসকগণ এ পদ্ধতিকে বহুল প্রসারের সুযোগ করে দেন। এ জেলায় অতীতে বঙ্গ-কৃতবিদ্যা হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ছিলেন, যাঁরা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা করে জনগণের কাছে প্রশংসিত হয়েছিলেন।

বর্তমানে ময়মনসিংহে একটি হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে বহু হোমিও পাশ ডাক্তার নেত্রকোণাসহ বিভিন্ন জেলার পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসা করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর রোগ নিরাময়ে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করে যাচেছন। নেত্রকোণা জেলা শহরে ও উপজেলা শহরগুলি বহু হোমিও ডাক্তারের চেম্বার ও ডিস্পেন্সারী রয়েছে।

নেত্রকোণার রোগ বালাই

অধ্যাপক আবদুর কাদির খান তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে ১৯৭৪ সনের জেলা সিভিল সার্জনের এক প্রতিবেদনে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার তথা নেত্রকোণা বৃহত্তর ঘাতক ব্যাধি সম্পর্কে জানা যায়। এসব রোগের আক্রমণ সারা জেলায় সর্বব্যাপী নয় বরং বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয়ভাবে এর ব্যাপক আক্রমণ ঘটতো। এসব রোগ দীর্ঘস্থায়ী না হলেও মৃত্যুর হার খুব বেশী। সারা বছর ব্যাপিই এসব রোগের এখানে সেখানে উপস্থিতি দেখা গেলেও নভেম্বর ডিসেম্বর মাসেই এর আক্রমণ ব্যাপকতা ও তীব্রতা লাভ করতো। প্রসারের প্রধান কারণ ছিলঃ (ক) নতুন আমন চাউলের ভাত খাওয়া, (খ) পরবর্তী সময়ে ব্যবহারের জন্য শুটকী মাছ গোলাজাত করে রাখার ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের উদ্ভব (গ) এবং পাট পঁচানোর

www.pathagar.com

ফলে নদী নালা জলাশয়ের পানি কমে আসায় এসব দূষিত পানি জনসাধারণ পানীয়রূপে ব্যবহার করার ফলে বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিত।"(সিএস রিপোর্ট, ১৯২০)

এরপর দ্বিতীয় ঘাতক ব্যাধি ছিল গুটি বসন্ত। এ ব্যাধির মারাত্মক প্রাদুর্ভাব ছিল এ জেলায়। এ জন্য দায়ী ছিলেন 'শীতলা দেবী'। সনাতন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ এ রোগকে 'মায়ের দয়া' বলতেন এখনো অনেকেই বলেন। এর জন্যও কবিরাজ বা গুণীন ফকির আসতেন চিকিৎসক হিসাবে। গুটি বসন্তে আক্রান্ত ব্যক্তির গায়ে ঝাড়ফুঁক চলতো, কখনো খুব এটেল মাটির একটা পাতলা প্রলেপ দেয়া হতো। রোগীর গায়ে কোনো কোনো অঞ্চলে এ মাটিকে 'শীতলার মাটি বা চিকনা মাটি' বলা হতো। এতে কখনো কিছু কিছু ফল পাওয়া যেত বলা হলেও হয়েতো আক্রমণের ব্যাপকতা না থাকায় কেউ কেউ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যেতো। কিন্তু আক্রান্ত ব্যক্তি শরীরে গর্ত ভর্তি অবস্থায় আরোগ্য লাভ করতেন হয়তো আয়ুর জোরেই। এ রোগ নিরসন-নিবারণের জন্য শীতলাদেবীর পূঁজা দিতে হতো। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে গুণীন বা ফকির এ পূজার ব্যবস্থা করতেন। শীতলাদেবীর দয়ায় গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। এ রোগের আক্রমণ হতো ফাল্গুন থেকে বৈশাখ পর্যন্ত মাসগুলিতে ব্যাপকভাবে। বছরের অন্যান্য মাসেও কমবেশী এর প্রকোপ পরিলক্ষিত হতো। গুটি বসন্তের আক্রমণ মহামারী আকারে এ জেলায় প্রাণহানি ছিল উদ্বেগজনক। বর্তমানে গুটি বসন্ত নির্মূল হয়েছে পৃথিবী থেকে বাংলাদেশও এখন মুক্ত এ রোগ থেকে। ম্যালেরিয়া, গুটি বসন্ত নির্মূল বর্তমানে সহস্রাব্দে লক্ষ্যর্জনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

কালা জ্বর নেত্রকোণা এবং এর পাহাড়ী এলাকায় মোটামুটি একটি ব্যাপক রোগ হিসাবে দীর্ঘদিন ব্যাপি ছিল। ১৯৭২ সনে শেরপুর থেকে এ রোগের ব্যাপক আক্রমণের খবর পাওয়া যায়। এ রোগে থেমে থেমে জ্বর আসতো, রোগীর শরীর শীর্ণতর হতে থেকে রেহাই পাওয়া যেতনা। এ রোগ সংক্রামক না হলেও খুবই মারাত্মক ছিল। এর জন্য আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি সহজলভ্য ও ফলপ্রসূ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গ্রাম্য গুণীন ব্যক্তিগণ সে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন তা হলো ঃ আক্রান্ত ব্যক্তির প্লীহার জন্য ফুলে উঠা পেটের উপর একটা লেবু রেখে কিছু মন্ত্র পড়ে ফুঁদিয়ে লেবুটিতে ছোট আকারের ছুরির সাহায্যে আঁচড় দিয়ে দিয়ে লেবুটিকে ফালাফালা করা হোত। পরে ঐ লেবুর রস রোগীকে পান করানো হতো। এ চিকিৎসা ক্রমাগত তিন, পাঁচ, সাত, শনি বা মঙ্গলবার ব্যাপি চলতো। রোগী আরোগ্য লাভ করতো কিনা তা জানা যায়নি। (কাদির খান,১৯৮৭) একেবারে অতি সম্প্রতি না হলেও ১৯৫৩ সনে সারা জেলায় ৭০৪০ জন কালাজ্বরের রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে বহির্বিভাগে আসে বলে জানা যায়। এদের মধ্যে ২৩জন মারা যায়, বাকীরা আরোগ্য লাভ করে। ১৯৬৩ সালে ৯৮জন কালাজ্বরে আক্রান্ত রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে মারা যায় বলে একটি তথ্য বিবরণী থেকে জানা যায়। (জেলা হেলথ রিপোর্ট, ১৯৬৩)।

www.pathagar.com

১৮৭৫ সনে মিঃ হান্টার তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউন্টস অব বেংগল" এ লেখেন ঃ 'ম্যালেরিয়া জ্বরই এ জেলার প্রধান ও মারাত্মক জনস্বাস্থ্য-ব্যাধি। ইদানীং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছেড়ে ছেড়ে আসে এমন এক প্রকার জ্বরও এখানে দেখা দিয়েছে। উদরাময় বাত রোগও এ জেলায় ব্যাপকভাবে বর্তমান। এর অন্যতম কারণ এ জেলায় আর্দ্র জলবায়ু বা আবহাওয়া। ব্রংকাইটিসও একই কারণে এ জেলায় ব্যাপক ব্যাধি। কিন্তু যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাশ জেলায় এতটা মারাত্মক ছিল না। একমাত্র জেলখানাগুলিতে অধিক লোকের স্বল্প পরিসব জায়গায় বসবাস জনিত কারণে রোগ দুটির প্রাদুর্ভাব বেশ প্রবল ছিল। মাঝে মাঝে কলেরা রোগের আক্রমণ সারা বছরই এ জেলায় লক্ষ্যণীয়। কখনো কখনো মহামারী আকারেও কলেরা রোগ এ জেলায় দেখা দেয়। বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব এ জেলার অন্যতম মহামারী রোগ।"

ম্যালেরিয়া রোগ এ জেলায় ব্যাপকভাবে বহুকাল থেকেই এই পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত তার প্রচন্ড প্রভাব বলয় এ জেলায় বিস্তার করে রেখেছিল টাংগাইল মহকুমাকে বলা হতো 'ম্যালেরিয়ার ডিপো'। ইংরেজ আমলের প্রথম দিক থেকেই ম্যালেরিয়া সহ অন্যান্য রোগের আক্রমণে এখানে আগত বিদেশী জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ খুবই বিব্রত বোধ করতেন। ফলে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি, বিস্তার ও প্রতিকার-প্রতিরোধের জন্য তাঁরা অবস্থা, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে এক প্রকার পতংগ দ্বারাই এই রোগ বিস্তার লাভ করে বলে ধারণা পোষণ করতে থাকেন। তখন রাজকীয় ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের দু'জন গবেষক, ডাঃ রোনাল্ড রস ও ডাঃ ব্যাসিস্টা গ্রাসী আসামে ও বাংলাদেশে গবেষণা চালিয়ে 'এনোফিলিস' নামক মশক দ্বারা এ রোগ এক দেহ থেকে অন্য দেহে বাহিত হয়ে এর বিস্তার ঘটায় বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হন। ঔষধও আবিস্কৃত হয়। কুইনিন নামক এক প্রকার বড়ি ছিল ম্যালেরিয়ার প্রধান ঔষধ। তৎকালীন সরকার ১৯৪০ সনে ডাকঘরের মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার ঔষধ কুইনিন বিতরণ করে এ রোগ উপশমে দেশবাসীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নেয়। পরবর্তীকালে 'মশক নিধন ও ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ কর্মসূচী' নামে জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এক প্রকারের কীটনাশক ঔষধ ছিটিয়ে মশক দমন করে ম্যালেরিয়া দমনে সমর্থ হয়। পাকিস্তান আমলে প্রতিটি ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ার ঔষধ ছিটানো, প্রতিটি বাড়ির নম্বর সম্বলিত ধূসর রং এর একটি কার্ড দেয়া হতো। এ কার্ডে ঔষধ ছিটানোর তারিখ, ঔষধের বিবরণ ইত্যাদি লেখা থাকতো। এসব কর্মসূচী নেয়ার ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের আগেই ম্যালেরিয়া নির্মূল হয়েছে বলে মনে করা হতো। বর্তমানে আবারো কিছু কিছু ম্যালেরিয়া জ্বর বিভিন্ন স্থানে ধরা পড়েছে। মশক কুলের বংশ ব্যাপক বিস্তারের ফলে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় এ রোগ ছড়াচ্ছে বলে ধারণা করা হয়েছে। তবে এর প্রকোপ এখনো ব্যাপক ও তীব্র হয়ে ওঠেনি। সারা বিশ্বে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল থেকে ম্যালেরিয়া দূরীকরণের জন্য জাতিসংঘ সহস্রাব্দে লক্ষার্জনের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ লক্ষ্যার্জনে বাংলাদেশ সরকারও দেশ ব্যাপি ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

www.pathagar.com

এ জেলায় শিশু মৃত্যুর হার ব্যাপক। এ জেলায় শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। গ্রাম্য অশিক্ষিত দাই বা ধাত্রীদের হাতে সন্তান প্রসব করানো সহ সকল প্রকার প্রসূতি পরিচর্যা ন্যস্ত থাকায় প্রসূতি কল্যাণ কর্ম এখানে অনুপস্থিত ছিল। অতীতে কোনো রকম প্রাথমিক জরিপ বা প্রতিবেদন না থাকায় যথাযথ সংখ্যা উল্লেখ করা দুঃসাধ্য। তবু ১৯২৩-১৯৩২ সনে ময়মনসিংহ শিশু মৃত্যুর হার হাজারে ১৭৭ বলে একটি প্রতিবেদনে জানা গেছে। ১৯৮০ সনের একটি প্রতিবেদনে এ সংখ্যা হাজারে ১৮৪ বলে উল্লেখিত হয়েছে। বর্তমানে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্জন হয়েছে। যার ফলে স্বাস্থ্যখাতে সহস্রাব্দ লক্ষ্যার্জনে বাংলাদেশ বহু এগিয়ে রয়েছে।

এ জেলায় কুষ্ঠ ব্যাধির প্রকোপ নগণ্য এ রোগে ১৯৫১-৫৩ সনে বিভিন্ন হাসপাতালে বর্হিবিভাগে ১৯৭ জনকে চিকিৎসা করা হয় বলে জানা যায়। ১৯৬০ সনে এ রোগে সারা জেলায় ৫৮ জন মারা যায় বলে জানা যায়। সামাজিক অজ্ঞতার কারণে এ রোগের খবরও জানাজানি হতে পারেনি। পারিবারিক সম্মান ক্ষুন্ন হবার ভয়ে এ রোগে আক্রান্তদের লোক দুর আড়ালেই থাকতে হয়। গ্রামে এ রোগকে 'বড় বেমার' বা 'আজারী রোগ' বলে খুবই ভীতির চোখে দেখা হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ বা সংশ্রব স্বযত্নে এড়িয়ে চলতে এমন কি আক্রান্ত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ ও নিকটাত্মীয়রাও দ্বিধা করেন না। এ জেলায় আলাদা কুষ্ঠ হাসপাতাল নেই। কিন্তু টাংগাইল জেলায় মধুপুরের 'জলসত্র' নামক জায়গায় 'কর্পাস ক্রিষ্টি' নামে একটি কুষ্ঠ চিকিৎসা হাসপাতাল একটি বিদেশী সাহায্য ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান দ্বারা দীর্ঘদিন যাবৎ পরিচালিত হয়ে আসছে। এঁদের বিভিন্ন স্থানে, উপকেন্দ্রে কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসা এখন জোরদার পদ্ধতিতে চলছে। (অথচ১৯৭৮ এ প্রকাশিত ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারে এর উল্লেখ পর্যন্ত নেই।) এটিই বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার একমাত্র 'লেপার এসাইলাম' বা কুষ্ঠাশ্রম। ইদানিংকালে ময়মনসিংহের শম্ভুগঞ্জে কুষ্ঠব্যাধির হাসপাতাল রয়েছে।

বেরী রোগ এ জেলায় কখনো দেখা যায়নি। তবে ১৯১০ সনে ২০টির বেশী রোগীর খবর মোহনগঞ্জ বাজারের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু তদন্তে দেখা গেল এগুলি বেরী নয় epidemic dropsy এবং তা সহজেই নিবারণ করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও চিকিৎসালয় স্থাপন

অধ্যাপক আবদুর কাদির খান তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, ১৭৯১ সনে জেলা প্রশাসক মিঃ স্টিফেন বেয়ার্ড গভর্ণমেন্টকে একজন সিভিল সার্জন নিয়োগ করার জন্য অনুরোধ জানালে, সম্ভবতঃ ১৭৯৩ সনে প্রথম সার্জন এখানে আগমন করেন। জেলায় আধুনিক পাশ্চাত্য ধারার চিকিৎসার সূত্রপাত হয়। "অতঃপর সদরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। ১৮৬৫ সনে গৌরীপুরের ভূমিধিকারিণী শ্রীযুক্তা বিশ্বেশ্বরী দেবী চিকিৎসালয়ের জন্য গবর্ণমেন্টের হস্তে অর্থ দান করেন। বর্তমান সময়ে এ অর্থ সহ এই চিকিৎসালয়ের জন্য ১৫০০০/- টাকা গভর্ণমেন্টে গচ্ছিত আছে। এই টাকার সুদ জেলা বোর্ডের সাহায্য ও সাধারণের চাঁদা দ্বারা চিকিৎসালয়টি পরিচালিত হয়েছে। এই চিকিৎসালয়ের সংগে মহারাজ সূর্য্যকান্তের প্রতিষ্ঠিত "মেকেঞ্জী আই-ওয়ার্ড" নামে একটি চিকিৎসালয়ও রয়েছে। এতদ্ব্যতীত সদরে একটি মহিলা চিকিৎসালয়ও স্থাপিত হয়েছিল। এই মহিলা চিকিৎসালয়টি মুক্তাগাছার বিদ্যাময়ী দেবীর অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।"(কেদার নাথ, ১৯০৭)

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থা

১৯২৪ সনে ময়মনসিংহে লিটন মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। প্রথম বর্ষে এতে ৫০ জন হিন্দু ও ২৫ জন মুসলমান ছাত্র ভর্তি করা হয়। চার বছর মেয়াদী শিক্ষাসূচী শেষ করে যারা পাশ করে বের হন তাদের ডিপ্লোমা হয় এল, এম, এফ। আগে ছিল এল, এম, পি। এল,এম, পি কোর্স কেবল মাত্র তৎকালে কলিকাতার চিকিৎসা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চালু ছিল। এর মেয়াদ ছিল দুই বছরের কিছু বেশী। কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিক্যাল ফেকাল্টি যুক্ত হয় এবং এই ব্যবস্থাধীনে ময়মনসিংহ লিটন মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। পাশ করা ছাত্রগণ 'লাইসেন্সিয়েট অব মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি' সংক্ষেপে এল,এম,এফ, ডিপ্লোমা লাভ করেন। এঁরাই তখন থেকে জেলায় সংখ্যা গরিষ্ঠ চিকিৎসক শ্রেণীর লোক ছিলেন।

এরপর ১৯৬১ সনে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। এখানে এর সংগে পাঁচ'শ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল বিদ্যমান। এ হাসপাতালে এখন জেলার এবং বাইরের রোগীদের চিকিৎসা হচ্ছে। পূর্বতন সূর্য্যকান্ত হাসপাতাল বর্তমানে সংক্রামক ব্যাধি চিকিৎসা হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে যক্ষা, হাম, ডিপথেরিয়া, কলেরা ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসা করা হয়।

১৭৭৬ সালের মে মাসে জেলা পরিষদের উদ্যোগে নেত্রকোণায় ১৮ শয্যা বিশিষ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়টি স্থাপিত হয়। রোগ ব্যাধির মধ্যে মারাত্বক ছিল ম্যালেরিয়া, বাত, কালাজ্বর, খোস পাচরা ও কলেরা ইত্যাদি। দৈনিক রোগীর গড় উপস্থিতি ছিল ৭০.৭৫ জন। বছরে গড়ে দৈনিক শয্যাশায়ী রোগী ছিল ৮.৪৯ জন। হাসপাতালে ৯ জন কর্মচারী নিয়োজিত ছিল। তম্মধ্যে ৩ জন ডাক্তার ২ কম্পাউন্ডার এবং ১ ড্রেসার ।

www.pathagar.com

১৮৯৩ সনে সুসং-এর মহারাজা শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ রায় বি, এ, দুর্গাপুর দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে। ১৯১৭ সনে ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ এর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অকালে পরলোকগত মহারাজার দেয় ব্যাংকে স্থায়ী জমা ৫০০০/- টাকা থেকেই এর সার্বিক ব্যয় নির্বাহ হতো। এখানে ২ শর্য্যাবিশিষ্ট অসহায়দের জন্য হাসপাতাল সুবিধা বর্তমান ছিল। ব্যাপক ব্যাধি ছিল ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর। গড়ে দৈনিক রোগীর উপস্থিতি ছিল ৬৫.৫৫ জন। তৎকালীন সময়ে ডাক্তারদের বেতন ও ছিল কম, নিজের দায়িত্বে ছিলেন অত্যন্ত নিবেদিত, ১৯১৫ সন থেকে ১৯২২ পর্যন্ত ডাঃ উমেশচন্দ্র দত্ত ৭৫/- মাসিক বেতনে এখানে কর্মরত ছিলেন।

১৮১৪ সনের ১লা এপ্রিল কেন্দুয়া 'ফিলিপ দাতব্য চিকিৎসালয়' জেলা পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত হয়। এর অধীনে কয়েক মাইল দূরে চিয়াং বাজারে সাপ্তাহিক হাট-চিকিৎসা কেন্দ্র ছিল একটি। ডাক্তার সপ্তাহে একদিন এখানে বসতেন। এর জন্য কুলী খরচ সহ বেতনের অতিরিক্ত ১৩/- টাকা মাসিক বেতন পেতেন কেন্দুয়া চিকিৎসালয়ের ডাক্তার। প্রধান রোগ ছিল ম্যালেরিয়া। বছরে এ চিকিৎসালয়ের জন্য ব্যয় হতো ১৮০০/- টাকা। এক শয্যা বিশিষ্ট পোপার (Pouper) হাসপাতাল ছিল। দৈনিক রোগীর গড় উপস্থিতি ছিল ৩৭.৮৪ জন।

১৯১৩ সনের ১৯শে সেপ্টেম্বর 'খালিয়াজুড়ি কারমাইকেল দাতব্য চিকিৎসালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগের বছর তৎকালীন বাংলা প্রদেশের ছোটলাট লর্ড কারমাইকেল খালিয়াজুড়ি হাওর এলাকায় হাঁস শিকারে গেলে স্থানীয় জনগণ এখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য তাঁর কাছে আবেদন করেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে তাৎক্ষণিক ১৩০০/- টাকা দান করেন। তখনকার ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মিঃ এইচ, ই, স্প্রাই, আই সি এস এর বিশেষ উদ্যোগে এটি স্থাপিত হয়। পরে জেলা পরিষদ এর পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। প্রধান রোগ ছিল কলেরা ও ম্যালেরিয়া এ হাসপাতালে শুধু বহির্বিভাগ ছিল।

চিকিৎসা সুবিধাদি

নেত্রকোণা জেলায় কোন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নেই। ভালো চিকিৎসা অথবা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাতে হলে ময়মনসিংহ শহরে আসতে হয়। জেলার বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে ০১টি আধুনিক হাসপাতাল, বিভিন্ন উপজেলায় ১০টি হেলথ্ কমপ্লেক্স, বিভিন্ন ইউনিয়ন পর্যায়ে ৬২ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ০১টি মাতৃসদন ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র। এসব হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণ ডাক্তার, ঔষধ এবং বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যবস্থা আছে কিনা তা নিয়ে জরিপের মাধ্যমে তা সংগ্রহ করে এসব ব্যবস্থাপনায় দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

www.pathagar.com

সারণী ৩.৬: নেত্রকোণার আধুনিক সদর হাসপাতালের চিকিৎসা- মাতৃ-শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম, জানুয়ারী, ২০০৫

জেলা হাসপাতালের প্রসবের তথ্য				গর্ভকালীন পরিচর্যা		ঝুকিপূর্ণ গর্ভবতী	মৃত মায়ের বৃত্তান্ত				নবজাতক শিশুর বৃত্তান্ত			গর্ভপাত জনিত মায়ের চিকিৎসা	
সাধারণ সংখ্যা	জটিল সংখ্যা	জটিলতার কারণ সংখ্যা	সিজারিয়ান সেকশন সংখ্যা	সাধারণ সংখ্যা	ঝুকিপূর্ণ সংখ্যা	মায়ের প্রেরণ সংখ্যা	প্রসব পূর্ব সংখ্যা	প্রসব কালীন সংখ্যা	প্রসবের পর সংখ্যা	মৃত্যুর কারণ সংখ্যা	জীবিত প্রসব সংখ্যা	মৃত প্রসব সংখ্যা	২৪ ঘন্টায় মৃত্যু বরণ সংখ্যা	সেপটিক সংখ্যা	নন সেপটিক সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১১৯	১৮	উ.চ.ঝু-৫ চ.অ.ঐ-৫	-	৫৩	১০	১৮	-	-	০১	P.P.H 01	৫৫৩ PTS. Twoin	১৩	০১	০৬	০৪

প্রতিষেধক টিকা							অনূর্ধ ৫ বৎস-রের শিশুর চিকিৎসা সংখ্যা	জেলা মাতৃ শিশু স্বাস্থ্য সমন্বয় সভার তথ্য সংখ্যা	ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টার কর্মরত এর সংখ্যা	শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টার কর্মরত এর সংখ্যা	মন্তব্য
মায়ের টিটি			ডিপিটি পোলিও প্রদান								
১ম ডোজ সংখ্যা	২য় ডোজ সংখ্যা	১ম ডোজ সংখ্যা	২য় ডোজ সংখ্যা	৩য় ডোজ সংখ্যা	বিসিজি প্রদান সংখ্যা	হামের টিকা প্রদান সংখ্যা					
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
১৮	১৯	২৩	২৮	২৩	২৩	২৩	৬৭৪	-	নাই	নাই	-

উৎসঃ জেলা সদর হাসপাতাল, নেত্রকোণা (ডাঃ সাদিক), ২০০৫

স্বাস্থ্য খাতে নেত্রকোণার অবস্থা জানার জন্য তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। প্রথমত: তথ্য সংগ্রহ করা যাবে কিনা তা অনুসন্ধানের বিষয়, দ্বিতীয়ত: যে তথ্য সংগ্রহ করা হলেও তা কতটুকু নির্ভরযোগ্য তাও বিবেচ্য। যাহোক, সরকারীভাবে যে তথ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সরবরাহ করা হয় তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নেত্রকোণা আধুনিক সদর হাসপাতালে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমে যে সমস্ত বিষয়গুলি দেখা শুনা করা হয় তাহলো প্রসব সংক্রান্ত তথ্যাবলী যেমন এ বিষয়ে জটিল সমস্যা, সিজারিয়ান সেকশন এসব বেশীর সংখ্যা জানুয়ারী/০৫ এ মাত্র ১৮ জন। গর্ভকালীন পরিচর্যা সাধারণ রোগীর সংখ্যা মাত্র ৫৩ জন যার মধ্যে ঝুকিপূর্ণ ১০ জন। মায়ের মৃত্যুর সংখ্যা জানুয়ারী, ২০০৫ মাসে মাত্র একটি। নবজাতক শিশুর সংখ্যা ৫৫৩ টি, এর মধ্যে মৃত প্রসবের সংখ্যা ১৩ টি, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু বরনের সংখ্যা ০১ টি। সরকারী হিসাব অনুসারে এ বিরাট জনবহুল জেলার স্বাস্থ্য সেবা যে অপর্যাপ্ত তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা সরবরাহ ও গুনগত মানের বিষয়ে সমীক্ষা করে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী আঞ্চলিক স্বাস্থ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন। মায়ের স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিশেষত গর্ভবতীকালে দেখা যায় জানুয়ারী মাসে এর

www.pathagar.com

সংখ্যা হল মাত্র ৩৭ জন। অনুর্ধ্ব ৫ বৎসর শিশুদের চিকিৎসার সংখ্যা ৬৭৪ জন। চাহিদার তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা খুব উল্লেখ্য যোগ্য নয়। তদুপরি জিজ্ঞাসান্তে জানায় যে, ধাত্রীবিদ্যায় ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের পদে একজন করে ডাক্তার রয়েছেন। এক্ষেত্রে তারা কতটুকু সেবাদান করতে পারে তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। ঔষধ সরবরাহ ও সেবার গুনাবলীর বিষয়গুলির সম্বন্ধে কোন তথ্য সরবরাহ করা গেলনা বলে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি।

সাধারণ চিকিৎসার ক্ষেত্রে জরুরী বিভাগের জানুয়ারী/০৫ তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এখানে মোট ২৪ প্রকার বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। তথ্য পর্যালোচনায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, বর্ণিত রোগগুলির বেশীরভাগ চিকিৎসার জন্য পুরুষ রোগীরা বেশী এসে থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থা আর্থিক অসচ্ছলতা ও সামাজিক রক্ষণশীলতার কারনে হয়তো গ্রামীণ মহিলাদের সব সময় চিকিৎসার জন্য জেলা সদর হাসপাতাল পর্যন্ত আসা সম্ভব হয় না। তাছাড়া বিরাট জনসংখ্যা রোগ বালাইর বহু মাত্রিতা বিবেচনা করলে চিকিৎসা সেবা অত্যন্ত অপ্রতুল বলা চলে। আলোচনান্তে যে প্রধান প্রধান সমস্যাগুলোর কথা জানা যায় তাহলো হাসপাতালে বেডের স্বল্পতা, ডাক্তারের অভাব বিশেষত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের, রাস্তাঘাটের দুরাবস্থা এবং রোগীদের যাতায়াতের অসুবিধা এবং ঔষধ সরবরাহ ও বিতরণের আনুষঙ্গিক সংকট ইত্যাদি।

আন্তঃবিভাগ ছাড়া বহিঃবিভাগে ৩৮ প্রকার রোগ বালাইর চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। জানুয়ারী, ২০০৫ মাসের রোগীর সংখ্যা থেকে প্রতীয়মান হয় রোগ বালাই প্রচুর থাকলে ও চিকিৎসা সেবার সুযোগ একেবারেই সীমিত। বিরাট জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় উপার্জন বৃদ্ধি, শিক্ষা সম্প্রসারণ করাসহ বেসরকারীখাতে চিকিৎসা সুযোগ সম্প্রসারণের ব্যবসায়ী, সুশীল সমাজ ও পেশাজীবি ডাক্তার ও অন্যান্যদের এগিয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে । এজন্যে প্রয়োজন সুস্থ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল।

ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থ্যা

১৭৯১ সালে ১৫ই জুলাই ঢাকা ও ময়মনসিংহের পথে ৯টি ডাকঘর স্থাপনের আদেশ হয়। এই জেলার মধ্যে নিম্নলিখিত ডাকঘরগুলি স্থাপিত হয়। (১) সেহরা বা নাসিরাবাদ, (২) কালিগঞ্জ, (৩) চরপাড়া, (৪) কুরমির, (৫) টোক, (৬) টেঙ্গির, ও (৭) বর্রদিপুরা এই নিয়মে চিঠি, সংবাদপত্র, বান্ডিল পুলিন্দা, পার্সেল প্রভৃতি পাবার জন্য সর্বদাই গোলযোগ, অসুবিধা ও কালবিলম্ব ঘটতো। তখনও বেয়ারিং ও রেজিষ্টারী চিঠি থানায় ডাকে নিবার নিয়ম ছিলনা। জামালপুর সেনানিবাস স্থাপিত হলে ১৮২৬ সালে সেখানে ডাকঘর খোলা হয়। ক্রমে থানা, চৌকি ও মহকুমা স্থাপিত হলে এই সকল স্থানে ডাকঘর স্থাপিত হয়। ১৮৬২ সনে সদর কালেক্টরীতে মনি অর্ডারের প্রথা প্রবর্তিত হয়। অতঃপর ১৮৬৬ সনে কিশোরগঞ্জ ও ১৮৮৭

www.pathagar.com

সনে জামালপুরে ডেপুটি কালেক্টর অফিসে মানি-অর্ডারের কাজ আরম্ভ হয়। ১৮৮০ সনে মানি-অর্ডার বিভাগ পোস্ট অফিসের অধীনে আনা হয়। ১৮৭৮-৮০ সন পর্যন্ত এ জেলায় ৫৪টি ডাকঘর ছিল। ১৯০৪ সালে এ জেলায় ৩টি প্রধান ডাকঘর, ৪৬টি সাব অফিস ও ১৪৭টি ব্রাঞ্চ অফিস ছিল।

টেলিগ্রাফ

চিঠির চাইতে দ্রুত খবর পৌঁছানোর তাগিদেই মানুষের মনে টেলিগ্রাফের ভাবনা আসে। প্রাচীন উপজাতীয়দের মধ্যে সাংকেতিক ধ্বনির মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণ করার রীতি প্রচলিত ছিল এবং যা আজও আছে। ঢাকের শব্দের মাধ্যমে দ্রুত খবর পাঠাবার পদ্ধতি আজও আফ্রিকার মানুষদের মধ্যে বিদ্যমান। আমাদের দেশেও গারো প্রভৃতি উপজাতীয়দের মধ্যেও মৃত্যুর খবর অনেক সময় ঢাকের মাধ্যমে লোকজনদের জানানো হয়। সংকেতের নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে সংবাদ পৌঁছানোর চিন্তা ইউরোপ/আমেরিকায় অনেক লোকের মনে আসে এবং তার ফলশ্রুতিতে মোর্স সাহেবের আবিস্কৃত কোড (যা অধুনা মোর্স কোড নামে অভিহিত) দ্বারা একস্থান থেকে টরে টক্কা পদ্ধতির মাধ্যমে তারের দ্বারা নির্ধারিত স্থানে সংবাদ প্রেরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতির ইদানিং উন্নতি ঘটেছে। এখন বিদ্যুতের দ্বারাই অনেক সময় সংবাদ টেলিগ্রাফের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। এ জেলায়ও এভাবেই টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চলে আসছে।

এ জেলায় রেল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই টেলিগ্রাফ অফিসের সৃষ্টি হয়। কেদারনাথ মজুমদারের দেয়া তথ্য অনুসারে জানা যায় যে ১৯০৭ সালে ৩২টি ডাকঘরে টেলিগ্রাফের কাজ চলতো। তখন ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ অফিস এক ছিল। নেত্রকোণার টেলিগ্রাফ অফিস সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দূর্গাপুর-সুসঙ্গ, নেত্রকোণা।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল আবিস্কৃত টেলিফোন পদ্ধতি উনবিংশ শতকের শেষ ভাগেই ভারতবর্ষে চালু হয়। ময়মনসিংহ জেলাতেও সম্ভবতঃ বিশ শতকের শুরুতেই টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়।

১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে ৫০ লাইন বিশিষ্ট টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বর্তমান জেলা টেলিগ্রাফ অফিসে স্থাপন করা হয়। উক্ত এক্সচেঞ্জ থেকেই যে লাইনগুলির সংযোগ দেয়া হয় তা হল; জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সার্কিট হাউজ, পুলিশ সুপারের কার্যালয় ও জেলখানা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও বিস্তৃত করা হয় এবং ১৯৪৫ সালে একটি নতুন পদ এই জেলায় স্থাপন করা হয়। বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে একজন ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার টেলিযোগাযোগের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকতেন এবং ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলাগুলোর এক্সচেঞ্জ পরিচালিত হত একজন ফোন ইন্সপেকটর দ্বারা। ১৯৫৮ সালে এ জেলার ফোন যোগাযোগে বিরাট অগ্রগতি হয়। ৩০০ লাইন বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যাটারী পদ্ধতিতে চালিত একটি বড় এক্সচেঞ্জ জেলা শহরে স্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

সাধারণ গ্রন্থাগার এবং স্থানীয় পত্রিকা

নেত্রকোণা সাহিত্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান হলো "নেত্রকোণা সাধারণ গ্রন্থাগার" জনাব আলী ওসমান সিদ্দিকী সাহেবকে সম্পাদক করে ১৯৫৭ সনে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে নেত্রকোনার সাহিত্যাঙ্গনের তৎকালীন মধ্যমণি জনাব খালেকদাদ চৌধুরী প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আলী ওসমান সিদ্দিকী সাহেবের "সিদ্দিক প্রেস" থেকে প্রকাশিত হয় উত্তর আকাশ পত্রিকা। খালেকদাদ চৌধুরী সাহেব ছিলেন উত্তর আকাশের সম্পাদক। নেত্রকোণা সাহিত্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনে উত্তর আকাশ ও সিদ্দিক প্রেস দু'টি স্মরণীয় নাম। জনাব খালেকদাদ চৌধুরী, সিরাজ উদ্দিন কাশিমপুরী, রওশন ইয়াজদানী, খুরশেদ আলী তালুকদার (পাগড়ীঅলা মাষ্টার সাহেব), বাউল জালাল খাঁ প্রমুখ ব্যক্তিত্বের পাক শাসনামলে প্রধান আড্ডাস্থল ছিল সিদ্দিক প্রেস। (গোলাম এরশাদ, ১৯৯৫)।

তথ্যপ্রবাহ ও সংবাদ পত্র

নেত্রকোণা জেলায় প্রকাশনা শিল্প মোটেই সমৃদ্ধ নয়। জেলায় মাত্র ২২টি প্রেস, ০১ টি মাল্টি পারপাস ইন্ডাস্ট্রিজ রয়েছে। ১০টি টেলিফোন অফিস রয়েছে। বর্তমানে স্থানীয় সংবাদপত্রের মধ্যে রয়েছে দৈনিক বাংলার দর্পন, সাময়িকীর মধ্যে রয়েছে আষাঢ়, চেতনা, স্পন্দন, স্মৃতি ৭১, বিজয়, সৃজনী, মতির সুবাস ও জরিনা। বিলুপ্ত আর্জপ্রদীপ (১৮৭৫), কোমাদি (১৮৭৫), মহৎ উদ্দেশ্য (১৯৩০), প্রান্তবাসী, জুলফিকর (১৯৫০), আরেয়া প্রদীপ (খৃ.পূ ১২৮৭), উত্তর আকাশ (খৃ.পূ ১৩৬৮)। বর্তমানে এ জেলায় মাত্র ২টি সাধারণ পাঠাগার রয়েছে।

জনস্বাস্থ্য

নেত্রকোণা জেলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী প্রতি বর্গ কিলোমিটারে-৭৯২ জন। পরিবারের সদস্য সংখ্যা (গড়) ৪.৭৯ জন (বিবিএস, ২০০৪)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৮ %। স্থূল জন্ম হার মোট ২৫.৪১ প্রতি হাজারে, যা গ্রামাঞ্চলে ২৬.০৮ এবং শহর এলাকায় ১৪.৯০জন। নেত্রকোণা জেলায় TFR মহিলা প্রতি হাজারে ৩.৭৫ জন। এ জেলায় মোট প্রজনন হার প্রতি হাজার মহিলা (Net Reproductive Rate, NNR) ২০০২ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে ১.৫৯ জন। নেত্রকোণা জেলার স্থূল মৃত্যুর হার ১৯৯১ সালে প্রতি হাজারে ৮.৮৬ থেকে কমে ২০০১ সালে ৪.৯৬ এ দাঁড়ায়, ২০০২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৫৬ দাঁড়ায়। এতে প্রতিয়মান হয় যে, নেত্রকোণার জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবনতি ঘটেছে। নেত্রকোণা জেলার শিশু মৃত্যুর হার ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে ৯.০৭ থেকে কমে ৫.৪৩ হয়েছে যেখানে ছেলেদের সংখ্যা (১-৪ বছরের মধ্যে) ৪.৫৩ এবং মেয়েদের সংখ্যা ছিল ৭.৪৯ জন।

www.pathagar.com

দারিদ্র্যাবস্থা

পাকা বাড়ি বা দালানে বাস করে এমন সদস্যের সংখ্যা বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও ঢাকা বিভাগের মধ্যে সর্ব নিম্নে রয়েছে নেত্রকোণা জেলায় যা ০.৫৪ শতাংশ মাত্র। নেত্রকোণা জেলার নিম্ন গ্রামীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ৫৮ শতাংশ লোক টিন ও কাঠের ঘরে বসবাস করে। এ জেলার সাধারণ ৩৬ শতাংশ জনগোষ্ঠী বাঁশের নির্মিত ঘরে বাস করে যা, বৃহত্তর ময়মনসিংহে সর্বোচ্চ। টিউবয়েলের পানি পান করে এর সংখ্যা নেত্রকোণা জেলায় ৯৯.২৮ শতাংশ। টিউবয়েলের পানি হলেও কোন অবস্থাতেই সমগ্র জেলার জন্য নিরাপদ নয়। কোথাও কোথাও আর্সেনিক ইতোমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনো আর্সেনিক মুক্ত টিউবয়েলগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। যে সমস্ত এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত টিউবয়েলগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, সে সব স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করণ করে জরুরী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

নেত্রকোণা জেলার প্রধান দানা খাদ্য শস্য (Staple food) ধান ও গম। ধানের প্রধান প্রধান শ্রেণীগুলো হল আউশ, আমন ও বোরো। শস্য খামারের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ছোট আকারের খামারগুলি ০.০৫ থেকে ২.০০ একর পর্যন্ত, এসব খামারগুলির শস্য তীব্রতা ১৭৫-১৭৯ পর্যন্ত যা অত্যন্ত বেশী। বড় খামারগুলি যার আকার ২.০০ একর এর চেয়ে বড় এর শস্য তীব্রতা ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। বিবিএস ২০০৪ সালের তথ্যানুসারে নেত্রকোণা জেলার স্থায়ী অসচ্ছল জনসংখ্যা ১৯.৫২ শতাংশ, অস্থায়ী অসচ্ছল সংখ্যার পরিমাণ ২৯.৩৩ শতাংশ। আয়-ব্যয় সমান এ ধরনের জনসংখ্যা ২১.৬৯ শতাংশ। সচ্ছল জনসংখ্যা ১৬.৫ শতাংশ এবং সঞ্চয় করতে পারে এমন জনগোষ্ঠী মাত্র ১২.৯৩ শতাংশ।

জেলার গত পাচ বৎসরের অপরাধ প্রবণতার ধরণ সারণী ৩.৭ আলোচনা করা হয়েছে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রেক্ষাপটে নেত্রকোণা জেলায় চুরি/ডাকাতি প্রবণতা কমেছে বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অপহরণ তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নির্বাচনোত্তর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। পরবর্তিতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সাথে সাথে অপহরণ প্রবণতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নির্বাচনোত্তর খুন খারাবির প্রবণতা কমেছিল। ধীরে ধীরে রাজনৈতিক লোকজনের মধ্যে ক্ষমতার সাধ ও আর্থিক মুনাফার বিষয়গুলি দৃশ্যমান হতে থাকলে, স্বাভাবিক বিবেক বিবেচনা লোপ পেতে থাকে। অত্র এলাকায় স্বভাবত সম্পত্তি ও বৈষয়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নিয়েই খুন খারাবি হয়ে থাকে। দাঙ্গা প্রবণতা কমে যাওয়া নিঃসন্দেহে একটি সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। শিশু/ নারী নির্যাতন প্রবণতা কমেছে, তার মূলতঃ দুটি কারণ হতে পারে, প্রথমতঃ সারা বিশ্বব্যাপী এ বিষয়ে যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রভাব ও সুফল নেত্রকোণা জেলাবাসী ও পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন নারী শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক

www.pathagar.com

সচেতনতা ইত্যাদির সফল বাস্তবায়ন ও এ অর্জনের অন্যতম কারণ। আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) এবং রাহাজানি দেশের স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। তাই স্থানীয় রাজনৈতিক অবস্থা ভালো থাকলে এ অবস্থার উন্নতি হয়।

সারণী ৩.৭: অপরাধ প্রবণতার ধরণ

ধরণ	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	মোট
চুরি/ডাকাতি	৬	৮	৪	৫	৫	২৮
অপহরণ	৯	৮	৪	৭	৮	৩৬
তার চুরি						
খুন	৫৩	৪৭	৪৯	৪৩	৬২	২৫৮
দাংঙ্গা	৬৭	৩৫	২৪	২৭	৬	১৫৯
শিশু/ নারী নিযার্তন	১৫৮	২০১	২৭৫	২০৭	৮৯	৯৩০
রাহাজানি	১	৩	৫	৫	৩	১৭
আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ	-	৫	২	১১	৬	২৪

সারণী ঃ নেত্রকোণা জেলা প্রশাসন, ২০০৬

সনাতন কৃষি ব্যবস্থা

অতীতে হাট বাজারের জন্যে ও কৃষিপণ্যের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে যে সমস্ত স্থানগুলি অত্যন্ত বিখ্যাত তাহ'লঃ নেত্রকোণা, কেন্দুয়া, ফতেপুর গোবিন্দগঞ্জ, দুর্গাপুর, কলমাকান্দা, নাজিরপুর, রূপগঞ্জ, মোহনগঞ্জ, নীলগঞ্জ, আমতলা, বাউসী ইত্যাদি। ১৯০৮ সালে গেজেটিয়ারে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, এ জেলায় পশুপালনের ব্যাপারে দৃষ্টি দেয়া হতো না। স্থানীয় জাতের গরু অত্যন্ত দুর্বল ও আকারে ছোট। গরু দিয়েই চাষবাসের কাজ করা হতো। শীতকালে খড় খেয়ে গবাদি পশু বেঁচে থাকে। ভাটি এলাকা ছিল বলে বর্ষায় গো-খাদ্যের বড় অভাব। কেবল বাড়ীঘরের রাস্তার ধারের ঘাঁস খেয়ে গরু বাঁচে। জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে কিছু চারণভূমি ছিল, যা আজ নেই বললেই চলে। এসব অঞ্চলে ঘি ও পনির ভাল হয়। সুসঙ্গের পাহাড়ী এলাকায় অনেক চারণভূমি ছিল, তাও বর্তমানে বিলীন প্রায়। কৃষি কাজের জন্য মহিষও ব্যবহার করা হয়, বিশেষ করে গারো পাহাড়ের সংলগ্ন এলাকায়। এ জেলায় নানান ধরনের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। নানান ধরনের কৃষি উৎপাদিত দ্রব্য পুরস্কারের জন্য প্রদর্শনীতে আনা হয়। কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুরের মসলিন প্রাচীন কালে খুবই বিখ্যাত ছিলো। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এ দু'জায়গাতেই কারখানা স্থাপন করে ছিলো। ইংরেজ আমলে নেত্রকোণা মহকুমার সানদিকোণায় কাগজ তৈরী করা হতো।

www.pathagar.com

জনাব নুরুল আনোয়ার তাঁর প্রবন্ধে বৃহত্তর ময়মনসিংহ তথা নেত্রকোনার কৃষি কাজ ও কৃষি ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে বলেছেন যে এ এলাকায় কৃষি ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন গভীর জ্ঞানের, তা এ জেলায় ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। তৃণমূল মানুষ সে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তার নিজস্ব লোকসংস্কৃতি থেকে। সেদিন কৃষি দপ্তর ও কৃষি কর্মকর্তা ছিল না। ধান, পাট ও অন্যান্য চাষবাস পশু পালন ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হয়েছিলো হাতেনাতে কাজকর্ম করা থেকে। কৃষি সম্পর্কে এদেশে প্রাচীনকাল থেকে বহু প্রবাদ রচিত হয়েছে। বিশেষ করে খনার বচন তো সর্বজন বিধিত। মানুষের মুখে মুখে আজও খনার বচন শোনা যায়। বৃহত্তর ময়মনসিংহের গ্রামীণ সমাজে প্রতিটি ক্ষেত্রেই খনার বচনের অত্যন্ত প্রভাব। ডঃ আলী নওয়াজ গবেষণায় দেখেছেন, এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ খনার বচন দ্বারা প্রভাবিত এবং কৃষি ও জীবন চর্চায় এর প্রবল প্রভাব। খনার বচন অসাধারণ জ্ঞানের বচন বলে বহুকাল ধরে মানুষ এগুলো মেনে নিয়েছে, তাছাড়া এগুলো অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান থেকেই উদ্ভুত। এগুলো যে হাজার বছরের পুরানো, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কৃষি বিষয়ে যে সব খনার বচন রয়েছে, তা পূর্ব ময়মনসিংহ তথা নেত্রকোনা জেলার অতীত কৃষি ও সভ্যতারই অংশ বিশেষ।

১। চৈত্রেতে খরখর। বৈশাখেতে ঝড় পাথর।
জ্যৈষ্ঠে তারা ফুটে। তবে জানবে বর্ষা বটে।।
২। জ্যৈষ্ঠে শুখো আষাঢ়ে ধারা। শস্যের ভার না সহে ধরা।
৩। মাঘ মাসে বর্ষে দেবা। রাজা ছাড়ে প্রজার সেবা।।
৪। ভাদ্র, আশ্বিন পূবে বাও। খাল কেটে ঘরে যাও।
৫। যদি বর্ষে মাঘের আগা। ধানে ধান কাপাসে পাখা
যদি বর্ষে মাঘের মগরে। ধান হয় আলে টিকরে।
৬। চৈতে বৃষ্টি নাশে রিষ্টি। চাষার ক্ষেতে শুভ দৃষ্টি।।
৭। চৈতের কুয়া আমের হয়। তাল তেঁতুলের কিবা হয়।।

সাধারণ কৃষি, ধান ও অন্যান্য ফসল নিয়ে খনার বচন আরও বিস্ময়কর এবং এমন বিজ্ঞানসম্মত যে ভাবলে অবাক হতে হয়। সে গুলোরও কিছু উদ্বৃতি দেওয়া হলো ঃ

পূর্ণিমা অমায় যে ধরে হাল। তার দুঃখ চিরকাল।
তার বলদের হয় বাত। ঘরে তার না থাকে ভাত।।

পূর্ণিমা আমবশ্যা তিথিতে হালচাষ করলে কৃষকের অমঙ্গল হয়, বলদের বাত হয় এবং ফসল ভাল হয় না।

www.pathagar.com

খনা বলে শুন কৃষকগণ। হাল লয়ে মাঠে যাবে যখন।
শুভন দেখে করবে যাত্রা। পথে যেন না হয় অশুভ বার্তা।
মাঠে গিয়ে আগে দিক নিরূপণ। পূর্বদিক হতে কর হাল চালন।।

পরিবেশ বিজ্ঞান পাঠে আমরা জানি সৌর শক্তির উৎস সূর্য। বিজ্ঞান পড়ে না জানলেও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সৌর শক্তির সাথে চাষাবাদের গুরুত্ব ও প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। ভোর বেলায় শুভক্ষণে হাল গরু নিয়ে যাত্রা করবে এবং জমির পূর্ব দিক হতে চাষ আরম্ভ করবে। এতে সকালের রোদ জমিতে সহজে প্রবেশ করতে পারে। সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও সুফল সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়ে খনার বচনে বলা হয়েছে।

১। খেতে পাশ না দেয় কৃষাণ। ওর ঘরে দারিদ্র্য সমান।।
যে কিষাণ খেতে সার ব্যবহার করে না, তার ঘরে দারিদ্র লেগেই থাকে।

২। চতুর্দিকে দিয়ে বেড়া। ধর তবে চাষের গোড়া।।
খেতের চারদিকে বেড়া দেওয়া, চাষাবাদের গোড়ার কথা।।

খনার সময়ে পাট একটি ভালো ফসল বলে গণ্য হতো না। তখন শনই ছিল গুরুত্বপূর্ণ ফসল। ইংরেজ শাসনের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাট চাষ না করে মানুষ শনের চাষ করেছে। ১৮১৬ সালে শুধু ঢাকা থেকেই পঞ্চাশ হাজার মণের বেশী শন ইংল্যান্ডে রপ্তানী হতো। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে বৃহত্তর ময়মনসিংহ তথা নেত্রকোনা জেলার কৃষি ব্যবস্থাকে খনার বচনের মাধ্যমে সাবলীল করে প্রকাশ করা হয়েছে। এ কারণে যে খনার বচন বাংলাদেশের আদি কৃষি বিজ্ঞান। খনার বচনকে অনুসরণ করেই বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে কৃষি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। খনার বচন বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফসল। এদেশের মাটি হতেই তা উদ্ভূত। ফলে আজও কৃষক সমাজে ও কৃষি কাজে নানান ভাবে খনার বচনের প্রভাব রয়েছে। খনার বচন এদেশের গবেষণার বিষয়। খনার বচনকে আরও উপযোগী করে তোলা যেতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা, কৃষি গবেষণা যে ভাবে পাশ্চাত্য রীতির হুবহু অনুসরণ করে চলেছে, তাতে এসব ঐতিহ্য ও নিজস্ব জ্ঞান বিজ্ঞান বিলীন হয়ে যাবে শীঘ্রই। তাছাড়া কৃষি বা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের যে কোনো বিষয়ের সার্থক প্রসার হবে তখনই যখন দেশের পরিকল্পনা প্রণয়নকারীরা জাতির সকল বিষয়ে ঐতিহ্য সচেতন হবে এবং মনন-সমৃদ্ধ মনমানসিকতার অধিকারী হবে এবং এ সব বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার।

কৃষি জমি ও খামারের আয়তন ঃ জাতীয় অবস্থা

কৃষি সার্বিক পরিস্থিতি আলোচনা করতে হলে স্থানীয় জলবায়ুর বাইরে কৃষি খামারের আয়তন, মাটির উপযোগীতা ও উৎপাদন ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্যক অবগত থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশ অতি ঘন বসতিপূর্ণ দেশ। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৯০৪

www.pathagar.com

জন। দেশের মোট ভূখন্ডের শতকরা মাত্র ৫৩ ভাগ চাষোপযোগী এবং বনভূমির আওতায় রয়েছে শতকরা ১৪ ভাগ। মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৭.২১ মিলিয়ন হেক্টর। বর্তমানে কৃষি খামারের সংখ্যা ১১.৮০ মিলিয়ন এবং এ সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত ১৩ বছরে বেড়েছে এক মিলিয়ন। তাতে করে খামারের গড় আয়তন ছিল ০.৮০ হেক্টর, এখন তা দাঁড়িয়েছে ০.৬১ হেক্টরে (সারণী ৩.৭) অর্থাৎ বার্ষিক হ্রাস হলো শতকরা ১.৮৮ ভাগ (সাহা, ২০০০)। এরূপ হ্রাসের প্রধান কারণ হলো অকৃষিতে জমির ব্যবহার বৃদ্ধি বিশেষ করে বাড়ীঘর তৈরী, রাস্তাঘাট ও মার্কেট নির্মাণে (কাশেম, ২০০৫)। ড. কাশেম তাঁর গ্রন্থে নিম্নে সারণী ৩.৮ কৃষি খামারে জাতীয় অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন।

সারণী ৩.৮: ১৯৯৬ সালের কৃষিশুমারী অনুযায়ী কৃষক পরিবারের সংখ্যা এবং খামারের গড় আয়তন

খামারের আয়তন (হেক্টর)	পরিবারের সংখ্যা (%)	গড়ে চাষের জমির পরিমাণ (হেক্টর)	১৯৮৩-৮৪ এর তুলনায় ১৯৯৬ সালে জমির পরিমাণে পরিবর্তন (%)
০.০২-০.২০	২৮.৪৪	০.০৮১	০.৪৩
০.২১-০.৬০	৩৫.৫৫	০.৩১২	(-)০.২১
০.৬১-১.০১	১৫.৮৭	০.৬৯২	(-)-.৫৮
১.০২-৩.০৪	১৭.৬১	১.৪৭০	(-)০.২৪
৩.০৫ এবং উর্দ্ধে	২.৫৩	৪.২৭০	০.০৬
মোট খামার	১০০.০০	০.৬১০	(-)১.৮৮

উৎসঃ কাশেম, ২০০৫
নোট ঃ এক হেক্টর = ২.৪৭ একর।

বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে বর্তমানে প্রায় ৩৪ ভাগ পরিবার অকৃষি খাতে নিয়োজিত। তাদের অধিকাংশই ভূমিহীন। সম্পূর্ণ ভিটেমাটি ছাড়া পরিবারের সংখ্যা শতকরা ১ ভাগ। ভিটেমাটি রয়েছে তবে চাষের জমি নেই এমন পরিবার হলো শতকরা ২৮.১ ভাগ। ভিটেমাটি আছে এবং চাষের জমির পরিমাণ ০.২০ হেক্টর পর্যন্ত এমন পরিবারের সংখ্যা ২৯.১২ ভাগ। ভূমিহীনদের সাধারণতঃ শারীরিক শ্রম বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় এবং তাদের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। আর যারা খুদে ব্যবসায়ী এবং পরিবার প্রধানের বাইরে অপর কোন সদস্য কর্মরত তাদের অনেকে দারিদ্র্য সীমার উপরে বাস করছে; তবে ভয় রয়েছে যে কোন সময় তারা দারিদ্র্য সীমার নীচে নামতে পারে এবং এমনটা হয়ে থাকে বন্যা, নদী ভাঙ্গন ও ঝড়ের কারণে।

ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় কৃষক পরিবারের মধ্যে অনেকে অতি আর্থিক দৈন্যতায় বাস করে, এর প্রধান কারণ হলো তাদের খামারের আয়তন খুবই সামান্য। ১৯৯৬ সালের কৃষিশুমারী অনুযায়ী ২৮.৪৪% কৃষক পরিবারের খামারের আয়তন আধা একরের নিম্নে; আবার ৭.৫০ একরের উর্দ্ধে রয়েছে মাত্র ২.৫৩% (সাহা, ২০০০)।

www.pathagar.com

মাঝারি আকারের খামারের (২.৫০ থেকে ৭.৫০ একর পর্যন্ত) সংখ্যা ১৭.৬১% এবং তারা কিছুটা সফল কৃষক এবং তাদেরকে মোটামুটি স্বচ্ছল বলা চলে। প্রাকৃতিক কোন দূর্যোগ যেমন বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় হলে অধিকাংশ কৃষকই অসহায়ত্বের স্বীকার হয় এবং ভূমিহীন, প্রান্তিক এবং খুদে কৃষক যাদের সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগের উপর, তারা অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন ফসলের ফলন (হেক্টর প্রতি): জাতীয় চিত্র

বাংলাদেশে জমি অত্যন্ত উর্বর হলেও বিভিন্ন দেশের উৎপাদনশীলতার তুলনায় ফলন স্বল্প। হেক্টর প্রতি চাউলের গড় উৎপাদন মাত্র দু'টন। তবে বোরো মৌসুমে উৎপাদন তিন টন, কারণ এসময়ে প্রায় সব জমিতেই উফশী ধান চাষ হয়ে থাকে। চালের এ উৎপাদন মাত্রা যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ (৭.০৪ টন) এবং এর পরে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া (৬.৬ টন) এবং জাপান (৬.৪১ টন) (হোসেন, ২০০২)। দেশে ডাল ও তৈলবীজের গড় উৎপাদন এক টনেরও নীচে। ফলনের ক্ষেত্রে যা লক্ষ্যণীয় তা হলো, বিগত দশকের বছরগুলোতে ফলনের উল্লেখযোগ্য কোন বৃদ্ধি নেই। বৃদ্ধি কিছুটা লক্ষ্য করা গেছে কেবল গমের ক্ষেত্রে। আর প্রতিটি ফসলেই স্থবিরতা বিরাজ করছে। ফলনের এরূপ স্থবিরতা বাংলাদেশের মত ঘন বসতিপূর্ণ দেশে মোটেই কাংঙ্খিত নয়, যেহেতু জমি অত্যন্ত দুস্প্রাপ্য, আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধিও বেশী (বার্ষিক ১.৪%)। অন্যদিকে জনগণের আয় বৃদ্ধিতে খাদ্যের চাহিদার যে বহুমূখিতা তা পূরণ করাও দরকার। দেশে এই বিরাট জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে ভূমির উপর মারাত্মক চাপ, তাই টেক্‌সই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এখনই, অন্যথায় বিপর্যয় অনিবার্য।

সার বিতরণ ও প্রাপ্তি: জাতীয় চিত্র

সারের বর্তমান ব্যবহার সুষম না হওয়ার পেছনে বাজারদরের বাইরে আরও কতিপয় কারণ রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে সকল প্রকার সারের সময় মতো বাজারজাতকরণ, যেন সার কৃষকদের নিকট সময়মত পৌঁছে। এই বিতরণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এখনও মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে ইউরিয়া ব্যতীত অন্যান্য সকল সারের আমদানী প্রাইভেট খাতে দেয়া হয়েছে। ইউরিয়া সারের উৎপাদন এবং মিলগেইটে বিক্রয় মূল্য সরকার নির্ধারণ করে থাকে। মিলগেইট থেকে ক্রয় করার পর সারা দেশে ইউরিয়ার বিতরণ সার ব্যবসায়ীরাই করে থাকে। আর অন্যান্য সার আমদানী থেকে শুরু করে দেশের সর্বত্র বিক্রয় করা পুরোপুরি পাইকারী ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীল। তবে বর্তমানে সরকার কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে দেশে সার বিতরণ পরিস্থিতি মনিটরিং করছে, তবে তা কতটুকু জোরদার তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, গ্রামাঞ্চলে সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে ডিলারশীপ ব্যবস্থা উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে

www.pathagar.com

এবং দেশের কয়েকটি খ্যাতনামা মার্কেটে 'বাপার' মজুদ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। তদুপরি, অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন ফসফেটিক সার আমদানী উৎসাহিত করতে সরকার টি এস পি, ড্যাপ এবং এনপিকেএস মিশ্র সার আমদানীর উপর হতে আগাম আয়কর ও উন্নয়ন সারচার্জ মওকুফ করেছে।

সার বিতরণের ঐতিহাসিক পটভূমি পর্যালোচনায় দেখা যায়, দেশে সত্তর দশকে সার ব্যবহারে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) এর বিশেষ অবদান রয়েছে। তখন সারের উপর সরকারের ভর্তুকি ছিল (৫০-৬০ শতাংশ)। ১৯৭৮-৭৯ সালে সারের ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ১৩০ কোটি টাকা, যা কৃষি খাতের উন্নয়ন বাজেটের ২৭ শতাংশ। ভর্তুকির পরিমাণ হ্রাস করতে ১৯৭৯ সাল থেকে পরীক্ষামূলকভাবে দেশের একটি বিভাগ এবং ১৯৮০ সালে সারা দেশে সারের বিতরণ ব্যবস্থা বেসরকারী খাতে স্থানান্তর করা হয়। তবে তখন সারের বাজার মূল্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৮৩ সাল থেকে খুচরা মূল্যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়। তখনও অবশ্য মিলগেইট ও বন্দর থেকে সার উত্তোলনের পাইকারী মূল্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে।

১৯৯১ সালের জুলাই মাস থেকে সরকারী খাতে সার আমদানী সংকোচিত করে বেসরকারী খাতে ফসফেট ও পটাশ সার আমদানীর অনুমতি দেয়া হয়। পরবর্তীতে ভেজাল / নকল / নিম্নমানের সার উৎপাদন, আমদানী ও বাজারজাতকরণ নিয়ন্ত্রণ করা সহ সারের গুণগত মান অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে সার নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৯৯ জারী করা হয়েছে এবং তদানুযায়ী বেসরকারী খাতে আমদানীকৃত সারের ক্ষেত্রে পোষ্ট ল্যান্ডিং ইন্সপেক্শন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের ফলাফল এখনও অজানা। তবে আশা করা হয় যে, সার-নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৯৯ দেশের সারের মান অক্ষুন্ন রাখতে সফল হবে বলে আশা করা হয়েছিল। দেশে সারের উর্ধ্বগামী চাহিদা মেটানোর জন্য শুধু রসায়নিক সার আমদানির উপর নির্ভর করা কৃষি ব্যবস্থা এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা কোন দিকের জন্যই সহায়ক নয়।

সেচ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন

এই প্রসঙ্গে ড. কাশেমের গ্রন্থে মূল্যায়ন প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে খাদ্যে দ্রুত স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে উফশী ধান ও গমের জমি বৃদ্ধিতে জলসেচকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আর বন্যার কারণে ফসল হানি হ্রাস কল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (Flood Action Plan) গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৭২ সালে পানি সম্পদ উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক তাদের সম্পাদিত Land and Water Sector Study তে ক্ষুদ্র প্রযুক্তির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের উপর জোর দেয়ার সুপারিশ করে। আশির দশকের প্রথমার্ধে পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে Master Plan Organization (MPO) নামে একটি সংস্থা গঠন করে এবং তারা দীর্ঘমেয়াদী সেচ

www.pathagar.com

অবকাঠামো সম্প্রসারণের নীতিমালা সুপারিশ করে। এ বিষয়ে হোসেন, ২০০৩ তাঁর প্রবন্ধে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর রিপোর্ট অনুযায়ী স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় ১৯৮৫-৯৫ সময়কালে ৬৩টি ক্ষুদ্র আয়তনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। তার মধ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সেচ নালা ও সুইচ গেইট নির্মাণও রয়েছে।

সেচ জমি সম্প্রসারণে পানি উন্নয়ন বোর্ড বৃহদাকারে ইরিগেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, আর ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প প্রণয়ন ও সম্প্রসারণে বিএডিসি প্রধান দায়িত্ব নেয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড সেচ প্রকল্প এলাকায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে এবং কৃষককে তাদের জমির পরিমাণ অনুযায়ী পানির মূল্য (খাজনা) পরিশোধ করতে হয়। তবে যতদূর অবগত, চাষীরা সেচের এ খাজনা পরিশোধে অনেক পিছিয়ে। এ দূরবস্থার অবসানকল্পে বোর্ডের ছোট ছোট প্রকল্প এখন স্থানীয় কমিউনিটি ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সারণী ৩.৯: বিভিন্ন সেচ যন্ত্রের জমির পরিমাণ এবং হেক্টর প্রতি মার্জিন

সেচ	সেচকৃত জমি (হেক্টর)	হেক্টর প্রতি মার্জিন (টাকা)	বার্ষিক মার্জিন (টাকা)
অগভীর নলকূপ (ডিজেল)	২৮.৪৪	০.০৮১	০.৪৩
অগভীর নলকূপ (বিদ্যুৎ)	৩৫.৫৫	০.৩১২	(-)০.২১
লো-লিফ্‌ট্‌ পাম্প (ডিজেল)	১৫.৮৭	০.৬৯২	(-)-.৫৮
লো-লিফ্‌ট্‌ পাম্প (বিদ্যুৎ)	১৭.৬১	১.৪৭০	(-)০.২৪
গভীর নলকূপ (ডিজেল)	২.৫৩	৪.২৭০	০.০৬

নোট ঃ Kranti Associates, 1998 (Calculated by Dr. Kashem).

দীর্ঘ মেয়াদি টেকসই পরিকল্পনা ছিলনা বিধায় বিএডিসি পরিচালিত গভীর নলকূপ এবং পাওয়ার পাম্পের ক্ষেত্রে সেচ গ্রহীতারা পাম্প/নলকূপ ভাড়া ও পানির মূল্য পরিশোধ করলেও তাদের পক্ষে সকল প্রশাসনিক ও প্রকল্প পরিচালনা ব্যয় (যন্ত্রপাতি মেরামত সহ) মিটানো সম্ভব হয়নি বিধায় সরকারকে বেশ অর্থ ভর্তূকি দিতে হয়। ভর্তূকির পরিমাণ হ্রাস করতে আশির দশকের মাঝামাঝি তাদের সকল সেচযন্ত্র বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয় এবং বিক্রয় পদ্ধতির পাশাপাশি ভাড়া পদ্ধতি চালু থাকে ১৯৮৭-৮৮ সাল পর্যন্ত। অগভীর নলকূপ অবশ্য বরাবরই প্রাইভেট সেক্টরে ছিল। তবে তাদের উপর কিছু বিধি-নিষেধ ছিল যেমন অগভীর নলকূপের ইঞ্জিন আমদানীর উপর নিয়ন্ত্রণ এবং কোন ধরনের ইঞ্জিন আমদানী করা যাবে তা নির্দিষ্টকরণ ইত্যাদি।

নলকূপ বসানোর ক্ষেত্রেও দু'টি নলকূপের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা অর্ডিন্যান্স প্রবর্তন। কিন্তু জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী কর্তৃক প্রণীত Agriculture Sector Review এর সুপারিশে এ বিধি-নিষেধগুলো ১৯৮৯ সাল

www.pathagar.com

থেকেই উঠিয়ে নেয়া হয় এবং কৃষি যন্ত্রপাতির উপর আরোপিত আমদানী শুল্ক হ্রাস করা হয়। তাতে অগভীর নলকূপের বিক্রয় মূল্য হ্রাস পাওয়ায় সারা দেশে এর দ্রুত বিস্তার ঘটে এবং সেচ জমির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। ফলে উফশী বোরো ধানের উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ক্ষুদ্র সেচযন্ত্র প্রকল্প পুরোপুরি বেসরকারি খাতে। তবে সেচযন্ত্রের আওতায় জমি বৃদ্ধি উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যাংক নানা ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ ও সেচনালা মেরামত এবং ম্যানেজারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে। বিগত দশকে সেচের জমি বৃদ্ধি পাওয়ায় বোরো ধান, গম এবং আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও অন্যদিকে ডাল, তৈলবীজ এবং মশলা জাতীয় ফসলের আবাদ হ্রাস পেয়েছে। এর প্রধান কারণ অপ্রধান ফসল যেমন ডাল ও তৈলবীজের উৎপাদনশীলতা কম এবং ধান উৎপাদনের তুলনায় কম লাভ।

কৃষি আধুনিক উপকরণ

কৃষিখাতে অন্যান্য আরও যে সব আধুনিক উপকরণ ব্যবহৃত হয় তা হলো কীটনাশক ঔষধ; এবং কৃষি যন্ত্রপাতির মধ্যে স্প্রেয়ার, পাওয়ার টিলার এবং থ্রেশার। এসব উপকরণ বর্তমানে পুরাপুরি প্রাইভেট খাতে। এ সবের আমদানীও মোটামুটিভাবে অবাধ এবং বিক্রয় মূল্য কোম্পানীরা নিজেরাই নির্ধারিণ করে থাকে। আভ্যন্তরীণ সরবরাহ তাদের নিয়োজিত ডিলারদের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

কীটনাশক ঔষধ

বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে প্রকাশ পায় যে, প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ ঔষধ ব্যবহারকারীদের কীটনাশক ঔষধের গুণাগুণ নিয়ে অভিযোগ রয়েছে এবং তাতে তাদের চাষের প্রায় ৪০% জমি আক্রান্ত হয়। ভেজাল ঔষধের ব্যবহার অধিকতর হলো সব্জীতে এবং ফলে তাদের উৎপাদনও ১৫-২০% কম (কাসেম, ২০০১)। এ ছাড়াও পরিবেশগত প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি বিবেচনার মত তথ্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

সবুর ও মোল্লা, ২০০১ তাদের গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, সব্জীতে কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার অনেক বেশী এবং প্রায় প্রতিটি ফসল ও সব্জীতেই এ ঔষধ ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে মাত্রার ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান। অনেকেই সুপারিশের মাত্রার অধিকও ব্যবহার করছে। কাসেম, ২০০১ তার সমীক্ষায় উচ্চ ফলনশীল ধানেও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার অধিকতর বলে উল্লেখ করেছেন। আইপিএম ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে ঔষধের ব্যবহার কিছুটা কম (সারণী ৩.১০)। সারণীতে দেখা যায় যে, বোরো ধানে কীটনাশক ঔষধের ব্যয় প্রতি হেক্টরে ৭৬১ টাকা যা মোট উৎপাদন ব্যয়ের শতকরা তিন ভাগ। সব্জীর ক্ষেত্রে ঔষধ ব্যয় বেশ বেশী (হেক্টর প্রতি ৩২১৩ টাকা)। বিভিন্ন ফসলের বাগানেও গড়ে ঔষধ ব্যয় ২৬৮৯ টাকা যা মোট ব্যয়ের শতকরা তিন ভাগ। হিসেব করে দেখা গেছে, কীটনাশক ঔষধ

www.pathagar.com

ব্যবহারে উৎপাদকদের লাভ হয়েছে (সবুর ও মোল্লা, ২০০১)। কিন্তু এর ব্যবহারে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। যেহেতু পানি ও বাতাস দূষিত হচ্ছে। পরিবেশ দূষণ এবং স্বাস্থ্যহানির কারণে আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহার করা অধিকরত সমীচিন।

সারণী ৩.১০: বিভিন্ন ফসলে কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার (ফসলের জমির শতকরা হার)

ফসল	শতকরা হার (%)
বোরো ধান	৬৩
আমন ধান	৪৬
আউশ ধান	৫১
পাট	১১
ডাল	২৩
তৈলবীজ	৪৩
আখ	৪
আলু	৯০
বেগুন	৮৩
অন্যান্য সজী	৬২
অন্যান্য ফসল	৪৯

Source: Sabur and Molla, 2001.

সারণী ৩.১১: বোরো ধান, নির্বাচিত সজী ও ফলের বাগানে কীট নাশক ঔষধের ব্যবহারের মাত্রা (প্রতি হেঃ)

ফসল	আইপিএম কৃষক		অ-আইপিএম কৃষক		সকল কৃষক		মোট ব্যয় (টাকা)
	দানাদার কি. গ্রাম	তরল (মি.লিটার)	দানাদার (কি.) গ্রাম	তরল (মি.লিটার)	দানাদার (কি.) গ্রাম	তরল (মি.লিটার)	
বোরো ধান	২.৯২	১৫২.১৩	৭.৩১	৪৩৩.৪৯	৫.৮৫	৩৩৯.৭	৭৬১
আলু					৩.৮৮	১৮০০	৪৬৭৩
সিম					০	৫০৭৯	৩১৯৯
পাতাকপি					৬.৭	৪২১৪	৪৪৫৬
বেগুন					০.৬৩	৭৮১	৫২৪
মোট সজী					২.৭৮	২৮৩৯	৩২১৩
কলা (সাগর)					৪.০২	১৫৩৩	১৫৪৮
কলা (সবরী)					৮.৭৮	৪৮৮	৪৮০৬
পেয়ারা					০	১৬৮	৬২৪
আম					১.৬৫	৩৭৪৩	৩৭৭৬
মোট ফল					৩.৬১	১৪৮৩	২৬৮৯

উৎস ঃ Sabur and Molla, ২০০১ ও কাশেম, ২০০৫

www.pathagar.com

নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি: সরকার নতুন এ নীতির আলোকে কৃষি ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সাথে কার্যকরী সহযোগিতা ও সম্পুরকমূলক সেবা প্রদান করে কৃষি ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন উদ্যোগ নিয়েছে। এ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলোঃ

(ক) সকল শ্রেণীর কৃষক এবং তাদের দলের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ সহায়তা দেয়া;
(খ) দক্ষ সম্প্রসারণ সেবা প্রদান;
(গ) প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ;
(ঘ) চাহিদাভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ;
(ঙ) কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণ সম্পর্ক জোরদার করণ;
(চ) সম্প্রসারণকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ;
(ছ) উপযুক্ত ও সমন্বিত সম্প্রসারণ পদ্ধতির ব্যবহার; ও
(জ) পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান।

বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ কর্মধারায় যা বিশেষভাবে কতিপয় উদ্যোগ লক্ষণীয় সেগুলি হচ্ছে, উপজেলায় সকল সেবাদানকারী সংস্থা, যেমন পশু সম্পদ ও মৎস্য অধিদপ্তর এবং এনজিওদের সাথে সমন্বয় করে আইপিএম এর ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে এবং ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে সংযুক্ত করা। এইসব কৃষি কার্যক্রমকে সময়োপযুগী করে বাস্তবায়ন করতে এবং তা টেক্সই ও স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে দুইটি কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রথমটি ছিল তিন বছরের (১৯৯৯-২০০২) এবং দ্বিতীয়টি চার বছরের (২০০২-২০০৬)। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে বিষয়গুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা হলো খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কৃষি উপকরণ ও ঋণ সহায়তা প্রদান, শস্য বহুমূখীকরণ, ভূমির যথার্থ ব্যবহার, মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা ও কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ। তাছাড়া খামার বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টিকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের উপরও গুরূত্ব দেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, মহিলা ও বেকার যুবকদের জন্য অভূমি ভিত্তিক কর্মকান্ড চিহ্নিত এবং পরিচালনায় সহায়তা প্রদান। দ্বিতীয় এ কৌশলগত পরিকল্পনায় প্রথমটির অসমাপ্ত কার্যক্রমগুলো স্থান পায় এবং বলা হয় যে, সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে অনেক উদ্দেশ্যই অবাস্তবায়িত থেকে যায়। তা ছাড়া অধিদপ্তরের ভিতরে ও বাইরের যোগাযোগ যথেষ্ট ছিলনা বলেও উল্লেখ আছে (কৌশলগত পরিকল্পনা ২০০২-২০০৬ এবং ড. কাশেম, ২০০৫)।

নেত্রকোণার কৃষি কার্যক্রম

নেত্রকোণা অঞ্চলে কৃষিকাজ ছিল এক যৌথ গ্রামীন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। হালচাষ, ফসল সংগ্রহ, ফসল বপন, ফসলের যত্ন গ্রহণে ছিল যৌথ উদ্যোগ। এইভাবে একত্রে কাজ করাকে আঞ্চলিক ভাষায় বলা হত হাংড়া। আর একত্রে হালচাষ হল হামুড়। এই হাংড়া ও হামুড়

www.pathagar.com

শব্দ দু'টি ষাটের দশক পর্যন্ত নেত্রকোণা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চালু ছিল। হাংড়া করে কৃষক জনগোষ্ঠী প্রতিদিন গ্রামের এক বা একাধিক কৃষকের জমির ফসল কেটে দিত এবং ধানের বোঝা খেলাধূলা ও গানবাজনার চাঁদা হিসেবে তুলে রাখতো। হামুড় করে একত্রে হালচাষ করা ছিল সত্যি অপূর্ব। তাই সমাজ কাঠামোতে কোনো রূপ ভেদাভেদ তেমন কোন প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়নি। নেত্রকোণা অঞ্চলের লোক সমাজ কাঠামোকে গতিশীল রাখার জন্য লোকজ খেলাধুলা ছিল এক ঐশ্বরিক শক্তি তুল্য। খেলার মাঠের ঐক্য সমাজ দেহে এনে দেয় ঐক্যের অভিনব গতি। ফলে সমাজ কাঠামো অনেকাংশ থাকতো বিভেদ মুক্ত।

ভূমি ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা

বাংলাদেশের বর্তমান ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রেক্ষাপটে ভূমি ব্যবহারের অবস্থাটি পর্যালোচনা প্রয়োজন। নেত্রকোণা জেলার ভূমি ব্যবহারের চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে জেলার প্রায় ১২ শতাংশ ভূমি স্থায়ীভাবে পতিত অথবা সাময়িকভাবে পতিত অবস্থায় রয়েছে (সারণী ৩.১২)। জেলার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ভরণ পোষণের জন্য চাষাবাদ ও অন্যান্য ব্যাবহারযোগ্য ভূমি ব্যবস্থাপনায় একটি স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা রাখা প্রয়োজন। সে জন্য প্রয়োজন স্থানীয় উদ্যোগ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণ। স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে এবিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অঙ্গিকার ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা ও একান্ত প্রয়োজন ।

সারণী ৩.১২: জেলার কৃষি জমির পরিমাণ

কৃষি জমি	জমি (হেক্টর)	শতকরা
মোট জমি	২,৪১,৫০৬	
স্থায়ী পতিত জমি	২৩,০৪৯	৯.৫৪
সাময়িক পতিত	৫,৭৮৪	২.৩৯
নীট ফসলী জমি	২,১২,৬৭৩	৮৮.০৬
এক ফসলী জমি	৬৬,৩৬৬	২৭.৪৮
দো ফসলী জমি	১,১৯,৬২৮	৪৯.৫৩
তিন ফসলী	২৬,৬৭৯	১১.০৪
মোট ফসলী	৩,৮৫,৬৫৯	১৫৯.৬৮
ফসলের নিবিড়তা (%)	১৮১%	
জমি ব্যবহারের নিবিড়তা (%)	৮৮%	

উৎস: জেলা কৃষি অফিস, নেত্রকোণা, ২০০৫

www.pathagar.com

এ জেলার আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ২,১৫,০৪৩ হেক্টর, অনাবাদী জমির পরিমাণ ১৬,১১৮ হেক্টর এবং খাস জমির পরিমাণ ৬৬,০৬৫.৬৯ একর। ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রসঙ্গটির অবতারণা হলেই ভূমি বিতরণ ব্যবস্থার বিষয়টি এসে যায়। সারণী ৩.১৩ থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, নেত্রকোণা জেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৫৪.১৬ শতাংশ। দেশের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থার পর্যালোচনান্তে আরো দেখা যায় যে, জেলার দ্রুতবর্ধমান জনসংখ্যার প্রেক্ষাপটে এ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। এহেন পরিস্থিতিতে করণীয় কি? মাথা পিছু ভূমি যেহেতু বাড়ানোর কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। তাই একমাত্র পথ ভূমি নির্ভরশীলতা কমিয়ে জেলার বিরাট জনগোষ্ঠীকে বিকল্প অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করা। তাও কি আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে নিয়েই করা সম্ভব! এজন্যে নিশ্চিত করতে হবে ভূমির কাম্য ব্যবহার। বিকল্প অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অর্থ ভূমিবিহীন কর্মকান্ড নয় বরং ধান চাষাবাদের জন্য অধিক ভূমি নির্ভরতাশীলতা কমানো। যেমন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের শিল্পকারখানা, মৎস্য চাষ, পোলট্রি চাষ, রফতানি মুখী বিভিন্ন শাকসব্জি ও ফলফলাদির চাষাবাদ যেখানে স্থানীয় প্রযুক্তি এবং অধিক শ্রম শক্তির ব্যবহার করা যাবে।

তাছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করে কারিগরি শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং কম্পোস্ট শিল্পে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করে অতি সহজে জনশক্তি রফতানী বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সারণী ৩.১৩: ভূমি বিতরণ অবস্থা

বিবরণ	সংখ্যা	শতকরা
কৃষক পরিবারের সংখ্যা	২৯৮৩৪১	
(ক) বড় কৃষক ৭.৫ একর ও তদূর্ধ্ব	১৫৩৫৩	৫.১৪
(খ) মধ্যম কৃষক ২.৫-৭.৪৯ একর	৪৫৯৫৯	১৫.৪০
(গ) ক্ষুদ্র কৃষক ১.৫-২.৪৯ একর	৬৯০১৪	২৩.১৩
(ঘ) প্রান্তিক কৃষক ০.৫০-১.৪৯ একর	৯২৫৪৫	৩১.০২
(ঙ) ভূমি হীন- ০.৪৯ একর ও তার কম	৭৫৪৭০	২৫.২৯
(ছ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)	১.৮	

উৎস: জেলা প্রসাশন, নেত্রকোণা, ২০০৫

www.pathagar.com

সারণী ৩.১৪ এ তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে নেত্রকোণা জেলায় ফসলী জমির প্রায় ৮৩.০৭ শতাংশ ধান চাষে ব্যবহার হয়। এ জন্যে কতিপয় বিষয় বিবেচনায় আনা যেতে পারে, তাহলো খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা, ধান চাষের বিকল্প হিসেবে দ্রুত আয় বর্ধন এবং আয় উপার্জনশীল খাতে ভূমিকে ব্যবহার করা। ভূমির কাম্য ব্যবহার বলতে গৃহ আঙ্গিনা ও রাস্তার দুই ধারসহ মসজিদ, মাদ্রাসা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে খালি জায়গার যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা যা অতীত ও বর্তমানে পতিত অবস্থায় রয়েছে। এসব উদ্যোগে পরিবারের শ্রমশক্তিকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। ফলে পরিবারে ব্যবহৃত শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার ও বাড়তি আয়ের সংস্থান ও অতিরিক্ত কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সারণী ৩.১৪ নেত্রকোণার ফসল ভিত্তিক মোট জমির পরিমাণ ও তার শতকরা হার

ফসলের নাম	মোট ফসলী জমি	শতকরা হার
ধান	৩,২০,৩৫০	৮৩.০৭%
গম	৫,১০০	১.৩২%
ভুট্টা	৫০০	০.১৩%
সবজী	৮,১৩৫	২.১১%
পাট	৬,৭৫০	১.৭৫%
তেল ফসল	৭,৭০০	২.০০%
কন্দাল ফসল	৩,২০০	০.৮৩%
মসলা ফসল	৩,০০০	০.৭৭%
ডাল ফসল	৩,২৫০	০.৮৪%
ফল	২৫,৯০৪	৬.৭২%
অন্যান্য	১,৭৭০	০.৪৬%
মোট	৩৮,৫৬৫৯	১০০%

উৎস: জেলা প্রসাশন, নেত্রকোণা, ২০০৫

যান্ত্রিক সেচের কিংবদন্তী: ডঃ ওসমান গণি

নুরুল আনোয়ার তাঁর প্রবন্ধে যান্ত্রিক সেচের ক্ষেত্রে বৃহত্তর ময়মনসিংহের এক কিংবদন্তী কথা আলোচনা করেছেন। ১৯৫৬ সালে কিশোরগঞ্জের হামিদ উদ্দিন সাহেব ছিলেন কৃষিমন্ত্রী আর কিশোরগঞ্জের আরেক কৃতী পুরুষ প্রফেসর ডঃ ওসমান গণি (মৃৎ বিজ্ঞানী এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য) ছিলেন তখন কৃষি কমিশনার। বিদেশ থেকে তাঁরা ২/৩ টি পাওয়ার পাম্প নিয়ে এসে বাজিতপুরে বোরো ধানের ক্ষেতে সেচ দেওয়ার সুত্রপাত ঘটান। এখান থেকেই মনে করা হয় যান্ত্রিক সেচের আরম্ভ এদেশে। আজকে সেচ, সার, উন্নত বীজ ছাড়া কৃষিকাজ অকল্পনীয়। অথচ গভীর নলকূপ, পাওয়ার পাম্প, উন্নত জাতের বীজ, সারের ব্যবহার এগুলো কৃষকদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে

www.pathagar.com

কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাঠ কর্মীদের দুরূহ ও জটিল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এরপর সকলেরই জানা আছে ময়মনসিংহের কেওয়াটখালি ইউনিয়নের ছত্রপুর গ্রামে পঞ্চাশের দশকে পশু চিকিৎসা কলেজ, শেরপুরে ও গৌরীপুরে কৃষি সম্প্রসারণ মাঠকর্মীদের কৃষি স্কুল (পরবর্তীতে ইনষ্টিটিউট), শহর সংলগ্ন খাগডহরে পশু চিকিৎসা ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, কিশোরগঞ্জে বাদাম তেলের মিল, সরকারী পোল্ট্রি ফার্ম, শম্ভুগঞ্জের জুট মিল, জামালপুরে কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের আঞ্চলিক শাখা এবং সর্বোপরি ১৯৬১ সালে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কৃষিক্ষেত্রে ময়মনসিংহকে বাংলাদেশে এক উচ্চ আসনে স্থাপন করে। পঞ্চাশ, ষাট দশকের পর বৃহত্তর ময়মনসিংহের রাজনৈতিক নেতৃত্ব শূন্যতা স্বাধীনতাত্তোর আর পূরণ হয়নি ফলে, সারা দেশের উন্নয়ন জোয়ারের সাথে তাল মিলিয়ে এগুতে পারেনি বৃহত্তর ময়মনসিংহ তথা নেত্রকোণা জেলার জনগোষ্ঠী। তাই সংগঠিত ও সমন্বয়ের আশু প্রয়োজন। এ দায়িত্ব সর্বাগ্রে নিতে হবে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকেই।

সারণী ৩.১৫: নেত্রকোণা জেলার বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের শস্য বিন্যাসের বিবরণ

শস্য বিন্যাসের বিবরণ	বিদ্যমান (%)
বোরো- পতিত - রোপা আমন	৩৫%
পতিত- বোরো - পতিত	১০%
রবি শস্য- আউশ/পাট - রোপা আমন	২০%
রবি শস্য- বোরো - রোপা আমন	১২%
রবি শস্য- পতিত - রোপা আমন	০৭%
রবি শস্য- বোরো - পতিত	০৬%
রোপা আমন- পতিত - আউশ/পাট	০৫%
রোপা আমন- পতিত - আউশ/পাট	০২%
অন্যান্য	০৩%
মোট	১০০%

উৎস: জেলা কৃষি অফিস, নেত্রকোণা, ২০০৫

২০০৫ সালের নেত্রকোণা জেলা কৃষি অফিস থেকে পাওয়া তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, কৃষি উপকরণ সরবরাহ সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশেষত একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরীর হার নেত্রকোণায় রবি মৌসুমে সাধারণত ৭০.০ টাকা। মৌসুমের মোট আয় হয় একজন শ্রমিকের প্রায় ৪৯০০.০ টাকা সাধারণত দেড় দুই মাস মৌসুম থাকে। তবে খরিপ মৌসুমে সাধারণত ৬০.০ টাকা এই মৌসুমের মোট আয় হয় একজন শ্রমিকের প্রায় ২,৭০০-৩,৬০০ টাকা ।

www.pathagar.com

সেচকৃত এলাকা

পূর্ব ময়মনসিংহের নিম্নাঞ্চল নেত্রকোণা জেলা, এখানে ৮৩ শতাংশ এলাকায় ধান চাষ করা হয়। তার মধ্যে প্রধান ফসল হচ্ছে বোরো, উপজেলা ওয়ারী আবাদের বিন্যাস থেকে ২০০৪ সালের পরিস্থিতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নেত্রকোণা সদর, পূর্ব ধলা, আটপাড়া ছাড়া ১০টি উপজেলার ৭টিই খাদ্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত। অত্র এলাকার দারিদ্র বিমোচনে ও সহস্রাব্দ লক্ষ্যার্জনে এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

সারণী ৩.১৬: ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৩-২০০৪ সন পর্যন্ত নেত্রকোণা জেলার খাদ্য পরিস্থিতি

সন	মোট জনসংখ্যা	বার্ষিক খাদ্য চাহিদা (মেঃ টন) (জন প্রতি ৪৫৩.৬০ গ্রাম/প্রতিদিন)	মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন (চাউল ও গম) (মেঃ টন)	১১.৫৮% বীজ ও অপচয় বাদে মোট খাদ্যেও পরিমাণ (মেঃ টন)	খাদ্য পরিস্থিতি	
					উদ্বৃত্ত	ঘাটতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯৯৮ - ১৯৯৯	২০১২০৬৯	২৯৬০৯০	৬৩১০৭৪	৫৬৭৯৬৭	২৭১৮৭৭	--
১৯৯৯ - ২০০০	২০৩৬৫১৪	২৯৯৬৮৭	৬৫৪৩৩২৯	৫৮৮৯৫৩	২৮৯২৬৬	--
২০০০ - ২০০১	২০৭৩১৭৩	৩৩৫০৮১	৭৭৩৫১৫	৬৯৬১৬৩	৩৯১০৮২	--
২০০১ - ২০০২	২১১০৪৯০	৩১২৩৫২	৫৬৩৫২৮	৫৭৭৮৪৯	২৬৫৪৯৭	--
২০০২ - ২০০৩	২১৪৮৪৭৯	৩১৬৫৮৩	৭৬০৯৪২	৬৭২৮২৫	৩৫৬২৪২	--
২০০৩ - ২০০৪	২১৯৫৭৪০	৩৬৩৫৩৬	৮০৮৫৩৯	৭১৪৯১৯	৩৫১৩৭৫	--

উৎস: জেলা প্রসাশন, নেত্রকোণা, ২০০৫

সারণী ৩.১৬ এ নেত্রকোণা জেলার ১৯৯৮-৯৯ এবং ২০০৩-২০০৪ সালের খাদ্য চাহিদা ও সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গত ছয় বছরের প্রতি বছরেই নেত্রকোণার খাদ্য সরবরাহ উদ্বৃত্ত ছিল। এ প্রবণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে ২০০০-২০০১ এর খাদ্য উদ্বৃত্ত ছিল এ যাবত কালের সর্বোচ্চ ৩৯১,৩৮২ মেট্রিক টন। পরবর্তীকালের খাদ্য উৎপাদন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে জেলার সম্ভাবনাকে ব্যবহার করতে দীর্ঘ মেয়াদী সময়োপযোগী পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। যার ফলে উদ্বৃত্ত খাদ্য পরিস্থিতির ধারাকে অব্যাহত ও টেকসই রাখা সম্ভব হয়নি। এ জন্যে সকল পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করে তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

সারণী ৩.১৭: রবি মৌসুম/২০০৪-২০০৫ইং সনে নেত্রকোণা জেলায় বোরো ফসলের আবাদ

উপজেলার নাম	আবাদের লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর)		মোট	আবাদের অগ্রগতি (হেক্টর)		মোট	উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (মেঃ টন)		মোট	মন্তব্য
	উফশী	স্থানীয়		উফশী	স্থানীয়		উফশী	স্থানীয়		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
নেত্রকোনা সদর	১৭৩০০	২৩০০	১৯৬০০	১৬৬৩৫	২৩৫০	১৮৯৮৫-	৫৮৮২০	৪০০২	৬২৮২২	হেক্টর প্রতি উৎপাদন
পূর্বধলা	১৫৫০০	৯৫০	১৬৪৫০	১৪১৭০	৮৭০	১৫০৪০-	৫২৭০০	১৬৫৩	৫৪৩৫৩	লক্ষ্যমাত্রা
দূর্গাপুর	১১০০০	১৭০০	১২৭০০	১১১৩০	১৮৩০	১২৯৬০-	৩৭৪০০	২৯৫৮	৪০৩৫৮	উফশী-
কলমাকান্দা	১২৭৫০	৩৯০০	১৬৬৫০	১২৬০০	৪৪০০	১৭০০০+	৪৩৩৫০	৬৭৮৬	৫০১৩৬	৩.৪ মেঃ
মোহনগঞ্জ	৯২০০	২১০০	১১৩০০	১১০৮৫	১৮০০	১২৮৮৫+	৩১২৮০	৩৬৫৪	৩৪৯৩৪	টন।
বারহাট্টা	১০৮৫০	২১৭০	১৩০২০	১০৮০০	২২৪৫	১৩০৪৫+	৩৬৮৯০	৩৭৭৬	৪০৬৬৬	স্থানীয় -
কেন্দুয়া	১৮৬০০	১৩৫০	১৯৯৫০	১৯০০০	১০০০	২০০০০+	৬৩২৪০	২৩৪৯	৬৫৫৮৯	১.৭৪ মেঃ
আটপাড়া	৯৪০০	১০৮০	১০৪৮০	৮৪৬০	১১৮০	৯৬৪০+	৩১৯৬০	১৮৭৯	৩৩৮৩৯	টন।
মদন	১১৬০০	৩৬০০	১৫২০০	১২২০০	৩৬০০	১৫৮০০-	৩৯৪৪০	৬২৬৪	৪৫৮৭৪	
খালিয়াজুরী	১০৯০০	৬৩৫০	১৭২৫০	১১১০০	৬২২৫	১৭৩২৫+	৩৭০৬০	১১০৪৯	৪৮১০৯	
মোট	১২৭১০০	২৫৫০০	১৫২৬০০	১২৭১৮০	২৫৫০০	১৫২৬৮০+	৪৩২১৪০	৪৪৩৭০	৪৭৬৬৮০	

উৎসঃ জেলা প্রসাশন, নেত্রকোণা, ২০০৫

পূর্ব ময়মনসিংহের নিম্নাঞ্চল নেত্রকোণা জেলা, এখানে ৮৭ শতাংশ এলাকায় ধান চাষাবাদ করা হয়। তন্মধ্যে প্রধান ফসল হচ্ছে, বোরো। উপজেলাওয়ারী আবাদেও বিন্যাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নেত্রকোণা, পূর্বধলা এবং আটপাড়া ছাড়া দশটি উপজেলার সাতটিই খাদ্যোৎপাদনে উদ্বৃত্ব। এ জেলার খাদ্যোৎপাদনের সম্ভাবনাকে দারিদ্র বিমোচন ও সহস্রাব্দ লক্ষার্জনের কাজে লাগানো যেতে পারে ।

এ প্রসংঙ্গে জেলার খাদ্য উৎপাদনের চাহিদা নিরূপণ ও পুনঃমূল্যায়ন করার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ক্যালরি গ্রহণের চাহিদার আলোকে খাদ্য চাহিদা নিরূপন করা যেতে পারে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণের সরবরাহ্ পর্যালোচনা করে তা পর্যাপ্ত কিনা সে আলোকে সর্ব পর্যায়ে কৃষি উপকরণ সরবরাহ্ ও নিশ্চিত করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

সারণী ৩.১৮ : নেত্রকোণা জেলার রবি মৌসুমে/২০০৪-২০০৫ইং এর আওতায় বোরো ব্যতীত অন্যান্য ফসল আবাদের অগ্রগতি

ফসলের নাম	আবাদের লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর)	আবাদের অগ্রগতি (হেক্টর)	প্রাপ্ত হেক্টর প্রতি গড় ফলন (মেঃ টন)	মোট ফলন (মেঃ টন)	লক্ষ্যমাত্রা ও তা অর্জনে সঙ্গতি/অসংগতি
গম	৬,০০০	৫,০০০	১.৮৯	৯,৪৫০	+
আলু	৩,০০০	২,৫০০	১২	৩০,০০০	+
সরিষা	৭,০০০	৬,০০০	০.৯০	৫,৪০০	-
মিষ্টি আলু	৬৫০	৮৫০	১৪	১১,৯০০	+
শীতকালীন সবজী	৫,০০০	৪,৮০০০	১৮	৮৬,৪০০	+
মরিচ	১,৬৭০	১,৮০০	২.০	৩,৬০০	+
পিয়াজ	৩৯৫	৪৫০	৬.০	২,৭০০	+
রসুন	৩৮০	৩৫০	৫.০	১,৭৫০	+
ধনিয়া	৩০০	২৫০	১.০	২৫০	-
আদা	৫৬০	২০৬	৬.০	১,২৩৬	+
হলুদ	৩০০	৩৪৯	৫.৮৭	২,০৪৮	+
মসুর	৫৫০	২৫০	০.৮০	২০০	-
মাসকলাই	৮১০	৮২০	১.০	৮২০	+
মুগ	২৬০	১৪০	০.০৬০	৮৪	-

উৎস: জেলা প্রসাশন, নেত্রকোণা,২০০৫

সারণী ৩.১৮ এ নেত্রকোণা জেলায় বোরো ধান ব্যতীত অন্যান্য ফসলের যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে এ বিষয়ে কোন মানসম্পন্ন মানদন্ড অনুসরণ করা হয়নি। ফলে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের সাথে তা অর্জনে কোন সামঞ্জস্য নেই। এ ক্ষেত্রে ধানের পরিবর্তে অধিক লাভবান এবং রপ্তানীমুখী ফসল উৎপাদনে জনগণকে উৎসাহিত করার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া প্রতি হেক্টরে গম উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থা, উন্নতমানের চাষাবাদ পদ্ধতি ও বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করার সুযোগ রয়েছে। সর্বোপরি কৃষকদের প্রশিক্ষণসহ শিক্ষা কারিকুলামে আধুনিক ও উন্নতমানের চাষাবাদের প্রবর্তন করা উচিত।

www.pathagar.com

সারণী ৩.১৯ নেত্রকোণা জেলার ২০০৪-২০০৫ইং সনের ইউরিয়া সারের চাহিদা ও প্রাপ্তি

মাসের নাম	২০০৪-০৫ ইউরিয়া সারের চাহিদা (মেঃ টন)	২০০৪-০৫ বিসিআইসি কর্তৃক বরাদ্দ (মেঃ টন)	পার্থক্য %	২০০৫-০৬ ইউরিয়া সারের চাহিদা	বিসিআইসি ডিলারের সংখ্যা
জুলাই	৬,০০০	৩,০০০	৫০	৩,৫৫০	১১১
আগষ্ট	৭,০০০	৫,৫০০	৩০	৭,৬৫০	
সেপ্টেম্বর	১২,০০০	৯,০০০	২০	১,৫০০	
অক্টোবর	৭,০০০	৪,৫০০		৭,০০০	
নভেম্বর	১০,০০০	৬,০০০		১০,০০০	
ডিসেম্বর	১২,০০০	১০,০০০		১২,০০০	
জানুয়ারী	১৫,০০০	১৪,০০০		১২,০০০	
ফেব্রুয়ারী	১৭,০০০	১৫,৫৪০		১৮,০০০	
মার্চ	১৫,০০০	১২,৫০০		১৬,০০০	
এপ্রিল	২,০০০	২,৫০০		২,৫০০	
মে	২,০০০	১,৫০০		১,৫০০	
জুন	৫,০০০	৩,০০০		৪,৫০০	
মোট	১,১০,০০০	৮৭,০০০		৯৯,০০০	

উৎস: জেলা প্রসাশন, নেত্রকোণা,২০০৫

মাঠ প্রশাসনের কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, তৃণমূল পর্যায়ে সারের চাহিদা নিরূপণের কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কোন মানদণ্ড নেই। এ বিষয়ে কোন সমীক্ষা বা পর্যাপ্ত গবেষণা কর্ম সহজলভ্য নয়। ফলে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বা মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতার আলোকেই এসব চাহিদা নিরূপণ করা হয়। এমনিতেই চাহিদা সরবরাহের ব্যপক ঘাটতি দেখানো হয়েছে। সত্যিকারভাবে চাহিদা নিরূপণ করা হলে সারের ব্যবহারের বর্তমান ঘাটতি অবিশ্বাস্য পরিমাণ হতে পারে। কৃষি খাতের সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্য এখনই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

সারণী ৩.২০ : সারের বাজার দর প্রতি কেজি

সারের নাম	প্রতি কেজির মূল্য	সার সরবরাহ পরিস্থিতি জেলা প্রশাসনের মন্তব্য	সাধারণ মন্তব্য
ইউরিয়া	৬.০০ টাকা	সন্তোষজনক	চাহিদা নিরূপন করে সরবরাহ পরিমাপ করলে প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাবে।
টি এস পি	১৪.০০ টাকা	সন্তোষজনক	
ডি এ পি	১৫.০০ টাকা	সন্তোষজনক	
এনপিকেএস	১৫.০০ টাকা	সন্তোষজনক	
এস এস পি	৮.০০ টাকা	সন্তোষজনক	
এম ও পি	১০.০০ টাকা	সন্তোষজনক	
জিপসাম	১০.০০ টাকা	সন্তোষজনক	
জিংক	৪৫.০০ টাকা	সন্তোষজনক	

উৎস: জেলা প্রসাশন, নেত্রকোণা, ২০০৫

www.pathagar.com

সারণী ৩.২০ সারের দামের পরিস্থিতির বিষয় সন্তোষজনক বলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সরকারী ভাষ্য দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে দামের সাথে যথাসময়ে সরবরাহ, পরিস্থিতি বিতরণ ব্যবস্থা, প্রান্তিক চাষীদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে কিনা নেত্রকোণা জেলার বিষয়ে কোন গবেষণা পাওয়া যায়নি। কৃষি গবেষণা সংস্থাগুলো এ বিষয়ে গবেষণা করে জেলা পর্যায়ে কৃষি কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করতে পারে।

সারণী ৩.২১ : নেত্রকোণা জেলার বোরো মৌসুম/২০০৪-২০০৫ইং সনের ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রের পরিসংখ্যান

উপ জেলার নাম	গভীর নলকূপ (টি)			অগভীর নলকূপ			পাওয়ার পাম্প			অন্যান্য দেশীয় যন্ত্র	সেচকৃত জমির পরিমাণ (হেঃ)			অন্যান্য দেশীয় যন্ত্রের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ (হেঃ)	মোট সেচকৃত জমির পরিমাণ (হেঃ)
	বিদ্যুৎ চালিত	ডিজেল চালিত	মোট	বিদ্যুৎ চালিত	ডিজেল চালিত	মোট	বিদ্যুৎ চালিত	ডিজেল চালিত	মোট		গভীর নলকূপের আওতায় জমির পরিমাণ (হেঃ)	অগভীর নলকূপের আওতায় জমির পরিমাণ (হেঃ)	পাওয়ার পাম্পের আওতায় জমির পরিমাণ (হেঃ)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
নেত্রকোণা সদর	২৮	১৮	৪৬	৩৫০	১৬০০	১৯৫০	২৪	১৬৪	১৮৮	১৫০০	৩০০০	১০৫০০	৪০০০	১৫০০	১৯০০০
পূর্বধলা	২৪	২০	৪৪	৪০৭	৪০৩১	৪৪৩৮	-	৯৯	৯৯	৬৫৭	৯৫০	১২৬০৫	৪৮৫	৯০০	১৪৯৪০
দূর্গাপুর	০২	০৭	০৯	১৪০	১৫২৭	১৬৬৭	২৯	১০৩	১৩২	৪৮৭	২২৫	৯২৪০	১৮৫১	৬৮৪	১২০০০
কলমাকান্দা	০১	০৯	১০	১৮০	১৫৯০	১৭৭০	৯০	১৬৬	২৫৬	৭৮৫	২৪৫	১২৪৫৫	২৬৪৮	১৩৪৭	১৬৬৯৫
মোহনগঞ্জ	১৯	১৬	৩৫	৬৭	৫২০	৫৮৭	৫০	২৭০	৩২০	৩২০০	১৬৩০	৩৪০০	৩৭০০	৩৫০০	১২২৩০
বারহাট্টা	২৯	০৭	৩৬	১৩৫	১০৬৩	১১৯৮	৪২	৩০৫	৩৪৭	২৩০০	১৫০০	৬০১৫	৩৪৫৯	১৯০৫	১২৯০৯
কেন্দুয়া	১৪	১১	২৫	২৬৩	৩৪৫১	৩৭১৪	০৬	৩০	৩৬	১৩৮০	৬৪৫	১৮০৫৫	৫৪৫	৭৬০	২০০০০
আটপাড়া	৩২	৩২	৬৪	১০	৪৬৬	৪৭৬	০৫	২৪৭	২৫২	৩০০	২২০০	৩৩৯৫	৩৭১৬	২২৯	৯৫৪০
মদন	০৩	০৪	০৭	-	৭৩০	৭৩০	১০	৩০৫	৩১৫	২০০০	২৮০	৫৮৪০	৩৭৮০	২০০০	১১৯০০
খালিয়াজুরী	-	-	-	-	১০	১০	-	৬৫০	৬৫০	২২৫০	-	৭০	১১০৮০	৬১০০	১৭২৫০
মোট	১৫২	১২৪	২৭৬	১৫৫২	১৪৯৮৮	১৬৫৪০	২৫৬	২৩৩৯	২৫৯৫	১৪৮৫৯	১০৬৭৫	৮১৫৭৫	৩৫২৬৪	১৮৯৯৫	১৪৬৭৬৪

উৎস: জেলা প্রশাসন, নেত্রকোণা, ২০০৫

সারণী ৩.২১ এ নেত্রকোণা উপজেলা ওয়ারী গভীর নলকূপের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দুর্গাপুর, কলমাকান্দা এবং মদনে এর সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। এ তিনটি উপজেলার খাদ্য উৎপাদন পরিস্থিতি উদ্বৃত্ত। এ সব উপজেলায় বিদ্যুৎচালিত নলকূপের অবস্থা আরো ভয়াবহ। তৃণমূল পর্যায়ে সমীক্ষা করে এ সম্ভাবনাকে সময়োপযোগী কাজে লাগানো যেতে পারে। সারণী ৩.২২ এ সেচ আওতাধীন জমিনের পরিমাণ পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, নেত্রকোণা জেলা (কিশোরগঞ্জ+নেত্রকোণা) আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ মাত্র ৫১.৪৬% সেচের আওতাধীন রয়েছে। যা আরো বৃদ্ধি করলে অতি সহজে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সহায়ক হবে। উপর্যুক্ত আলোচনান্তে নেত্রাকোণা জেলার সার্বিক কৃষি উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাগুলো নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

সারণী ৩.২২ : অঞ্চল ভিত্তিক সেচ অবস্থার পরিবর্তন (২০০২/০৩-২০০৩/০৪)

অঞ্চল/ সেচের প্রকৃতি % পরিবর্তন	পাওয়ার পাম্প % পরিবর্তন	গভীর নলকূপ % পরিবর্তন	অগভীর নলকূপ % পরিবর্তন	হস্তচালিত নলকূপ % পরিবর্তন	মোট নলকূপ % পরিবর্তন	খাল % পরিবর্তন	স্বপ্রথাগত % পরিবর্তন	মোট সেচকৃত এলাকা % পরিবর্তন	মোট শস্য এলাকা % পরিবর্তন	%সেচকৃত এলাকা % পরিবর্তন
জামাল পুর	০১.০৮	০০.৯৩	০১.০৫	০০.৮০	০১.০৩	০১.০০	০১.০০	০১.০৩	০০.৯৯	০১.০৪
নেত্রকোণা-কিশোর গনজ	০০.৯১	০০.৯৮	০১.০৮	০১.০০	০১.০৭	০১.০০	০০.৯৩	০১.০০	০০.৯১	০১.১০
ময়মনসিংহ	০০.৯৫	০১.১৫	০১.২৪	০১.৫০	০১.২০	০০.৯১	০১.০০	০১.১৭	০১.০২	০১.১৫
টাঙ্গাইল	০১.০০	০০.৯৫	০১.০৭	০০.৬৭	০১.০৫	০০.০	০১.০০	০১.০৪	০০.৯৯	০১.০৬
বাংলাদেশ	০০.৯২	০১.০৫	০১.০৯	০০.৯২	০১.০৮	০০.৯৪	০০.৯৬	০১.০৫	০০.৯৮	০১.০৪

উৎস: বিবিএস, ২০০৫

(ক) জেলায় নদী-নালা, খাল-বিল ঝিল ও হাওর ভরাট হওয়ায় পাহাড়ী ঢল ও আগাম বন্যায় বোরো ও রোপা আমন ফসল ক্ষতি হয় (খ) শুস্ক মৌসুমে জেলার অনেক এলাকার পানির স্তর নীচে নেমে যায় বলে সেচকার্য ব্যাহত হয় (গ) উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, সহজ বিপনণ ব্যবস্থা না থাকায় কৃষকরা উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায়না (ঘ) আন্তর্জাতিক বাজারে এবং দেশে ডিজেলের দাম বাড়ার ফলে এবং গ্রাম পর্যায়ে বিদ্যুত সংযোগ না থাকায় সাধারণ মানুষ জমিতে সেচ দিতে পারছেনা, ফলে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে (ঙ) উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নেই বলে বীজ সংরক্ষণে চাষীদের জ্ঞানের অভাব ও মানসম্মত বীজ প্রাপ্তির অভাব (চ) মৌসুমে কৃষি শ্রমিকের অপ্রতুলতা। সমস্যা সমাধানের সুপারিশসমূহ নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করা যেতে পারে:

সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন

(ক) জেলার নদ নদী ও খালের পানি ধরে রাখার জন্য নদ নদী ও খালগুলি পুনঃ খনন করা;

(খ) আগাম বন্যা প্রতিরোধ জন্য ছোট ছোট বাঁধ ও স্লুইচগেট তৈরীর ব্যবস্থা করা;

(গ) পানি ধরে রাখার জন্য রাবার ড্যাম তৈরীর প্রয়োজন এবং ডাবল লিফটিং পাম্পের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করা;

ঘ) হাওর, বাওরগুলির টেক্সসই ব্যবস্থাপনা ও সংকোচ রোধকরণ।

সংরক্ষণ ও বাজারজাত করণ ব্যবস্থা উন্নয়ন

(ক) পঁচনশীল কৃষি উৎপাদিত শস্য যেমন শাক সবজী, আলু, ফলমুল সংরক্ষণের জন্য হিমাগার তৈরী করণ, তা ব্যাক্তিমালিকানায়ও হতে পারে ;

(খ) ন্যায্য মূল্য প্রদানের জন্য সরকারী ভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করণ ;

www.pathagar.com

(গ) চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প জোরদার করণ ;
(গ) কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ ;
(ঘ) সেচ কার্যে বিদ্যুতায়নের সম্প্রসারণ করণ ;
(ঙ) কৃষকদের সংঘটিতকরণ ও যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।

উপসংহার

এ অধ্যায়ে নেত্রকোণার জনসংখ্যা বৃদ্ধির অবস্থা, এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর বর্তমান ও অতীত অবস্থার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ও এ সবের অব্যবস্থাপনার অভাবে এ সম্পদ দ্রুত হারিয়ে যাবার বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ছিল অত্যন্ত প্রকৃতিপ্রেমিক। তাদের প্রকৃতি নির্ভর সংস্কৃতি আজ হারিয়ে যাচ্ছে কৃত্রিম আধুনিকতার মাঝে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থায় এ জেলা আজো পিছিয়েই রয়েছে। এলাকার কৃষি ব্যবস্থা ও সনাতন। এসব উত্তরণের জন্য প্রয়োজন স্থানীয় উদ্যোগ, জাতীয় নীতি ও কৌশল। সর্বোপরি স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক অঙ্গিকারের পাশাপাশি স্থানীয় নেতৃত্বও গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে।

সহায়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থপঞ্জী

১. জেলা প্রশাসন নেত্রকোণা, ২০০৫
২. কেদারনাথ মজুমদার, ময়মনসিংহের ইতিহাস, ১৯০৭।
৩. কেদারনাথ মজুমদার, ময়মনসিংহের বিবরণ, ১৯০৭।
৪. গোলাম সামদানী কোরায়শী, ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা, ১৯৮৭
৫. নূরুল আনোয়ার, ময়মনসিংহের কৃষি ব্যবস্থা, ১৯৮৭
৬. মুহম্মদ আবদুশ শাকুর, ময়মনসিংহের শিক্ষা ব্যবস্থা, ১৯৮৭
৭. আবদুল কাদির খান, ময়মনসিংহের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, ১৯৮৭
৮. খান সাহেব এম. আবদুল্লাহ, মোমেনশাহীর নতুন ইতিহাস, ১৯৭১
৯. আ.ফ.ম. আবদুল বারী (ড.), আমাদের শিক্ষার ইতিহাস, ১৯৭২
১০. অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন, শেরপুরের ইতিকথা, ১৯৬৯
১১. দীনেশ চন্দ্রসেন (সম্পাদিত), ময়মনসিংহ গীতিকা, ১৯৫৮,পৃঃ ১৩০
১২. ময়মনসিংহ জেলা দ্বিশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা, ১৯৮৭
১৩. ড. মোঃ আবুল কাশেম, বাংলাদেশের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি, ২০০৫
১৪. বিবিএস আদমশুমারী ১৯৯১ ও ২০০১
১৫. আনোয়ারুল হাকিম খান ১৯৮৭, ময়মনসিংহ জেলার দ্বিশত বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ ১৯৮৭
১৬. অধ্যাপক শরফুদ্দীন (১৯৮৭), ময়মনসিংহ জেলার দ্বিশত বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ ১৯৮৭, ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা, ১৯৮৭
১৭. গোলাম এরশাদুর রহমান ১৯৯৫, মুক্তি সংগ্রামে নেত্রকোণা
১৮. মাসিক প্রতিবেদন জেলা সদর হাসপাতাল, ২০০৫ (ডা. সাদিকুল আজম)

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

সার সংক্ষেপ

পূর্ব ময়মনসিংহ তথা নেত্রকোণা অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রধান ও অন্যতম ভান্ডার হলো জলাভূমি। এখানে মুক্ত ও বদ্ধ উভয় প্রকার জলাভূমি রয়েছে। নেত্রকোণা জেলা মুক্ত জলাশয়ের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। বদ্ধ জলাশয়গুলি মাছের প্রাচুর্য এবং সারা বৎসর কৃষি সেচ কাজের জন্য পানি থাকতো। মুক্ত জলাশয়ে মাছের প্রাচুর্য ছাড়া ও বিচিত্র ধান চাষের পদ্ধতি ছিল। বিশাল বিশাল চারণভূমি ছিল বিধায় পশু সম্পদ, দুধের ও ফলমূল এবং পুষ্টির কোন অভাব ছিল না। নেত্রকোণা অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যের প্রাচুর্যের কথা আলোচিত হয়েছে এ প্রবন্ধে যা এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবিকার অন্যতম উৎস। তাছাড়াও ঔষধী গাছ, গুল্মলতার কথা ও তুলে ধরা হয়েছে এ অধ্যায়ে। ভূমি উৎপাদন প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান উপাদান এ অধ্যায়ে নেত্রকোণা অঞ্চলের ভূমি বিবর্তনের ধারাবাহিকতাসহ ভূমি প্রশাসনের মাধ্যমে কিভাবে এ দেশে শোষণের ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল তার বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ ও ব্যর্থতার কারণগুলি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পশু পাখি, বন সম্পদ, মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং এ সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালার পর্যালোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি উত্তরাঞ্চলের গারো পাহাড়ের পাদদেশে সাদা মাটি, সুমেশ্বরী ও কংসনদীর সাদা বালি ও কয়লা যে অত্রাঞ্চলের কর্মসংস্থানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ তা তুলে ধরা হয়েছে যা আজ বিপন্ন প্রায়। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর নীতি ও কৌশলের অভাব রয়েছে এ সব প্রাকৃতিক সম্পদ সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায়। সর্বোপরি নেত্রকোণায় প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ যথা ভূমি, পানি ও জলাশয়, বিল ও বাউর হাওর, জীববৈচিত্র ঔষধি গাছ ও গুল্মলতা, পাহাড় ও সাদা মাটি, বালু ও সুমেশ্বরীর কয়লা ইত্যাদির স্টক ও দ্রুত বিলুপ্তির বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে এ প্রবন্ধে।

জলাশয়ের বৈশিষ্ট্য ব্যবস্থাপনা

পূর্ব ময়মনসিংহের নেত্রকোণা অঞ্চল বিল ও হাওরের জন্য প্রসিদ্ধ। এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ বিল ও হাওরের মধ্যে রয়েছে; সুসঙ্গ পরগণায়- জারিয়া, রাজধলা, নালিয়া ও মগুরা; নসিরুজিয়াল পরগণায়-নরুনসার, জালিয়ার হাওর, গণেশের হাওর ও তলার হাওর; খালিয়াজুরী পরগণায়- চিলমৃগা। 'হাওর বাউর মইষের সিং' এ তিনে ময়মনসিংহ। পূর্ব ময়মনসিংহের নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডারকে নিয়েই এ প্রবাদ। ব্রহ্মপুত্র, সুমেশ্বরী ও কংস নদী প্রবাহের গুরুত্বপূর্ণ জলধার এ জেলার হাওর বাউর। এ সমস্ত জলাশয়সমূহকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়; মুক্ত জলাশয় ও বদ্ধ জলাশয়।

www.pathagar.com

বদ্ধ জলাশয়ঃ বদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে পুকুর, ডোবা ও দীঘি। অত্র জেলায় বর্তমানে মাছ চাষ উপযোগী পুকুর ও দীঘির সংখ্যা ৩৫,৯৩২ টি যার আয়তন ২,৮১৮.৮৫ হেক্টর। তন্মধ্যে ব্যক্তি মালিকানাধীন ও প্রতিষ্ঠানের পুকুরের সংখ্যা ৩৫,৭৭২টি, যার আয়তন ২,৭৪০.৮০ হেক্টর এবং খাস পুকুরের সংখ্যা ১৬০ টি, আয়তন ৭৮.০৫ হেক্টর। এ সব বদ্ধ জলাশয় টেক্‌সই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে কতিপয় সম্ভাব্য উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। এ সব সময়োপযোগী সরকারী উদ্যোগের ফলে বর্তমানে পুকুরে গড়ে প্রায় ১.১৫ টন/হেক্টর/বৎসর মাছ উৎপাদিত হচ্ছে, যা বাড়িয়ে গড়ে ৫.০ টন/হেক্টর/বৎসর করা সম্ভব। পুকুর-দীঘিতে মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যে গুনগত মান সম্পন্ন পোনা সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন ব্যক্তি পর্যায়ে মৎস্য হ্যাচারী স্থাপন, পুঁজি যোগানের ব্যবস্থা করা, প্রশিক্ষণ দেয়া এবং সর্বোপরি উদ্বুদ্ধকরণ ও সম্প্রসারণ সেবা নিশ্চিত করা। পুকুর-দীঘিতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচীর মাধ্যমে চাষীদের প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও ঋণ প্রদান করে চলছে। ব্র্যাক, কেয়ার, স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি ইত্যাদি এন.জি.ও. বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষ কৌশল প্রসারে প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। একই চাষী যাতে একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা না পায় সেই লক্ষ্যে এই সেক্টরে উন্নয়ন প্রয়াসী সকল সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করতে হবে।

মুক্ত জলাশয় ঃ পূর্ব ময়মনসিংহের নিম্নাঞ্চল নেত্রকোণা যা বৃহত্তর সিলেটের সংলগ্ন। এ জেলার প্রধান বৈশিষ্ট হ'ল প্লাবন ভূমি যা বৎসরে বেশির ভাগ সময় এসব এলাকা পানির নিচে থাকে। এ আলোচনায় মুক্ত জলাশয় বলতে, নদী, হাওড়, প্লাবনভূমি এবং হাওর ও বিলকে বুঝানো হয়েছে। এ জেলায় মোট ১৯২ টি বিল রয়েছে যার মোট আয়তন প্রায় ২৪১২.৪৫ হেক্টর। অত্র জেলাধীন ২০ একরের উর্ধে জলমহালের উপজেলাওয়ারী তালিকা সারণী ৪.১-এ বর্ণনা করা হয়েছে।

নেত্রকোণা জেলায় মোট ১০ টি উপজেলার রয়েছে তন্মধ্যে ৫ টি উপজেলার বেশীর ভাগ এলাকায় বড় বড় হাওর রয়েছে। জমির পরিমান এবং জীবিকার্জনে এসব হাওরের ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য বিবরণী সারণী ৪.২ এ দেখানো হল। উল্লেখ্য ১০ উপজেলার মধ্যে কেন্দুয়ায় কোন জলমহাল নেই।

www.pathagar.com

সারণী ৪.১: নেত্রকোণা জেলাধীন ২০ একরের উর্ধ্বে জলমহালের তালিকা

নেত্রকোণা সদর	মাটিয়া বিল	২৪। ধলাই বিল	**মদন উপজেলা**
উপজেলা	১২। মরাছড়া নদীর	২৫। গোনা খরখরিয়া	১। ছিনাই নদী
১। জুলকান্দি	ঝরূয়া বিল	২৬। ছায়াবিল	২। নরূনশ্বরের বিল
২। জলশিমূলকান্দি	১৩। বড়ইউন্দ দিঘর	**বারহাট্টা উপজেলা**	৩। হিরণকোনা বিল
৩। গোড়াডুবা বিল	১৪। উন্দাখালী নদী ও	১। কলমধরের ডোবা	৪। বালান্দর
৪। যোগা বিল	হোগলা বিল	২। চিতলিয়ার ডোবা	৫। দেওসহিলা
৫। গাইসাত্রা	১৫। গোমাই নদী	৩। গোলামখালি	৬। বালিয়াজুরী
৬। মাগুরা বিল	**খালিয়াজুরী**	৪। সাগড়দিতা বিল	৭। যুই বিল
৭। গোগড়া	১। চুনাই	৫। কলাভাংগা বিল	৮। বোয়ালি বিল
পুর্বধলা উপজেলা	২। রানীচাপুর	৬। হানা বিল	৯। বয়রাহালা নদী
১। হোগলা	৩। দলিমাটি	৭। বিয়ারবন্ধ বিল	১০। ভাটিবালই নদী
২। পাকলা বিল	৪। মরানদী	৮। রাংগাদাইর	**দূর্গাপুর উপজেলা**
৩। কোমা বিল	৫। কাঠালজান	৯। সিংগুয়া জলদিঘর	১। গলইখালি নদীর
৪। চেচুয়া বিল ও	৬। নরসিংহপুর	১০। অতীতপুরের নীম	ডোবা
চন্দ্রকোনার ডোবা	৭। নাজিরপুর-	১১। রৌহা বিল	২। হোগলা খালি নদী
৫। আতলা বিল	মোরাদপুর	১২। ছাতিগাঁও	৩। চিনাকুড়ি বিল
৬। বোয়ালিয়া ডোবা	৮। কীর্ত্তনখলা	১৩। জলআরাকা	৪। কাকুরিয়াকান্দা নদী
৭। মতিয়ার ডোবা	৯। চৌতরা	১৪। জল-জালালাবাদ	৫। জলা বিল
৮। হলুদাটিয়া বিল	১০। লড়িকানকাটি	১৫। মরা বিষনাই	৬। কাবর বিল
৯। রাজধলা বিল	১১। চিনামারা	**মোহনগঞ্জ উপজেলা**	৭। চিতলী বিল
১০। মরা নদী	১২। চাকুয়া	১। বরান্তর মরাধনু	৮। সুমেশ্বরী নদীর ডালা
১১। জারিয়া নদী	১৩। জগন্নাথপুর	২। গজারিয়া বিল	**আটপাড়া উপজেলা**
কলমাকান্দা উপজেলা	১৪। চেলাপাইয়া	৩। পাগলা বিল	১। বিল হেলুচিয়া
১। পাঁচকাঠা	১৫। বোজ বিল	৪। নায়ের গোপ বিল	২। কালামগড়া
২। মান্দরুয়া বিল	(বাওয়াইজ)	৫। বদরখালি টুনাইবাড়ী	৩। রাজাখালি
৩। যাত্রাবাড়ী দিঘর	১৬। রোয়াইল বিল	নদী	৪। চাড়িয়া
নানিয়া বিল	১৭। হোগড়াডুবি বিল	৬। বৈঠাখালী	৫। চিত্তর খালি
৪। মহিষাউড়া বিল	১৮। মরাধনু	৭। ডোয়ারকোনা বিল	৬। গরিয়াখালি খাল
৫। মেদা বিল	ফরিদপুরের ঘোনা	৮। দিঘা বিল	৭। নক্তি বিল
৬। জলমেদী দিঘর	১৯। বালিয়া বিল	৯। চেংগা বিল	৮। হাঁসকুড়ি বিল
৭। রাঙ্গামতিয়র বিল	২০। মাখলাইন	১০। জলদে ওয়াজান	
৮। বিশরপাশা	২১। নন্দের পেটনা	১১। বিলচিরাইন বাইনর	
৯। গোড়াডুবি বিল	২২। মরাধনু	১২। সাপমারা খাল	
১০। মেদা বিল	খালিয়াজুরীর ঘোনা	১৩। গোড়াউত্রা	
টুনাইবাড়ী খাল	২৩। মরাধনু জগন্নাথ		
১১। তেলেংগা চিকন	পুরের ঘোনা		

www.pathagar.com

সারণী-৪.২ নেত্রকোণা জেলার উপজেলাওয়ারি হাওড় এলাকার পরিমান

উপজেলার নাম	উপজেলার মোট আয়তন (হেঃ)	হাওড় এলাকা		আবাদী জমির পরিমাণ (হেঃ)	মোট হাওড় এলাকার শতকরা হার	প্রধান শস্য বিন্যাস
		সংখ্যা	জমির পরিমণ			
কলমাকান্দা	৩৭৬২২	০৪	৪৫০০	৪০৫০	১২	রবি - খরিপ - ১ - খরিপ -২
মোহনগঞ্জ	২৪৩০৩	০৪	৯২০০	৮৪৬০	৩৮	১. সরিষা (স্থানীয়)- পতিত - পতিত বোরো (উফশী)
আটপাড়া	১৯৩৭৫	০৬	১১০০	১০০০	৫.৬৭	
মদন	২২৫৯০	১৬	১১০০	১০২০০	৪৮.৬	২. বোরো (উফশী)- পতিত
খালিয়াজুরী	২৫৮৯০	২৬	২১০৫০	১৭০০০	৮১.৩	৩. বোরো - পতিত - আমন (স্থানীয়)
মোট	১২৯৭৮০	৫৬	৫২১০০	৪০৭১০		৪. গম - পতিত - পতিত
						জেলার মোট আয়তনের প্রায় শতকরা ১৮ ভাগ হাওড় এলাকা।

উৎস ঃ জেলা প্রশাসন, নেত্রকোণা, ২০০৫

হাওড় এলাকায় বিচিত্র ধান চাষ পদ্ধতি

বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিশেষত নেত্রকোণার কৃষির ইতিকথা রুপকথার মতো। তম্মধ্যে হাওর অঞ্চলের কৃষি বৈশিষ্ট্য অনন্য। খালিয়াজুরী বাইতনার হাওরে মানুষ বর্ষার আগে আগে ধান বপন করে এবং বর্ষার পানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধানের চারা গাছগুলোও পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। হাওরের পানি স্থির অচল। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কেবল পানি। উঁচু স্থানে ঘর বাড়ি, কি এক অপূর্ব দৃশ্য ভরা বর্ষা। যখন বাতাসের বেগ বেড়ে যায় এবং বড় বৃষ্টির তান্ডব দেখা দেয়, তখন ধান গাছগুলোর শিকড় মাটি থেকে আলাদা হওয়ার ফলে হাজার হাজার গাছ পানিতে ভাসতে থাকে, চলতে থাকে বাতাসের গতির স্বপক্ষে। শিকড় মাটিতে না ঠেকলেও গাছের জীবন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এমনি ভাসমান জীবন নিয়ে ধান গাছে ফুল হয়। এমনি অবস্থায় বর্ষার পানি কমতে থাকে এবং এক পর্যায়ে ধান গাছের শিকড় অন্য আরেক অঞ্চলের মাটি স্পর্শ করে। আবার তার মাটি থেকে রস খাদ্য নেওয়া চলতে থাকে। ধানের ছড়া বড় হতে থাকে। ফসল কাটার সময় হয়। কি এক ভাগ্যের খেলা। খালিয়াজুরীর চাষীর বোনা ধান গিয়ে উঠলো ইটনার হাওরের চাষীদের ঘরে। সিলেটের হাওর অঞ্চলেও এমনি হয়ে থাকে। হাওর অঞ্চলের কৃষি ও ধান চাষ পদ্ধতি দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে একটু ভিন্ন ও অভিনব। সৃষ্টির সকল অবারিত সম্পদ মানব কল্যাণেই নিয়োজিত। সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমেই মানুষ তার জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ সম্পদের সময়োপযোগী টেক্সই ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানুষ তার জীবন ব্যবস্থাকে আরো সাবলীল করে তুলতে পারে। দ্রুত অগ্রসরগামী পৃথিবীতে জীবন ব্যবস্থার ক্রমাগত চাহিদা মিটানোর জন্য তার মননশীল জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ দিগন্তহীনভাবে এগিয়ে চলছে। হারিয়ে যাচ্ছে এ অঞ্চলের অতীত ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ।

www.pathagar.com

গো-চারণের সুবিধা ও দই-দুধ

মুক্ত জলাময়, বদ্ধ জলাময়, খালবিল, পাহাড় ও নদীনালা, ডোবা থাকায় নেত্রকোণা জেলায় গোচারণের সুবিধা ছিল অনাবিল। এ ক্ষেত্রে অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে নেত্রকোণা অঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদে এতো সমৃদ্ধ ছিল যে সুলভ মাছ ও দুধের কথা নিয়ে কোনদিন কাউকে ভাবতে হয়নি। বর্তমানে শিশু খাদ্যসহ দুধ আমদানী ছাড়া আমাদের কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না, তাতে প্রতি বৎসরই প্রয়োজন হয় বিপুল পরিমান ব্যয়বহুল বৈদেশিক মুদ্রার। অথচ অতীত ইতিহাস থেকে দেখা যায় সুপ্রাচীন কাল থেকেই নেত্রকোণা জেলায় দুধ-দই-এর প্রাচুর্য ছিল। ময়মনসিংহ গীতিকার দস্যু কেনারামের পালায় আছে-

বাতানে মহিষ আর পালে যত গাই।
কত যে চরিত তার লেখাজুখা নাই।।
পরান ভরিয়া কে না করে দুধ পান।
তাইতে হইল দুষ্ট এত বলীয়ান।

সচ্ছল কৃষকের ঘরে গরু ও মহিষ ছিল হাল চাষ ও দুধ খাওয়ার জন্য। গরু ও মহিষের দুধের ব্যবহার ছিল ব্যাপক ও বিস্তর। দই, ক্ষীর, ঘোল, মাখন ও ঘি প্রস্তুত করা হতো। ঘি-দুধ-দই ছিল খাদ্যের বিশেষ উপকরণ। গ্রামাঞ্চলের সচ্ছল গৃহস্থের বাড়ীতে এখনও পারিবারিকভাবে দুধের গাভি পালনের অভ্যাস দেখা যায়। গারো পাহাড় সীমান্ত এলাকায় বাঁশের চোঙ্গায় মহিষের দুধ দিয়ে দই তৈরী করা হতো। বর্তমানে মহিষের সংখ্যা একেবারে কমে গিয়েছে, মূলতঃ চারণভূমির অভাবেই। বর্তমানে জেলার নানা স্থানে কিছু কিছু দইয়ের ব্যবসা রয়েছে তাও চাহিদার তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল।

জীব বৈচিত্র্য, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা

গ্রামীণ তরিতরকারী এ জেলার জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা পুষ্টি হীনতা দূরীকরণে সহায়তা করতো। বিপন্ন প্রায় এ প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা ও সংরক্ষণ করার এখনই সময়। তা না হলে এ জাতিকে অদুর ভবিষ্যতে আরো চরম মূল্য দিতে হবে। আশুতোষ পাল তাঁর প্রবন্ধে ময়মনসিংহ তথা নেত্রকোণার বিভিন্ন তরিতরকারী বর্ণনা দিয়েছেন। বিভিন্ন মওসুমের নানা রকম তরি-তরকারী এ জেলায় উৎপন্ন হয়। তরি-তরকারীর মধ্যে প্রধান হচ্ছে পালং শাক, পুঁই শাক, নালিতা শাক, লালশাক, ডাঁটাশাক, নিমপাতা, দন্ডকলস (দ্রাণ), হেলঞ্চা, লাউ ও লাউশাক, কুমড়া ও কুমড়া শাক, কচু, কচুর ডাঁটাশাক, মুখী, লতা, শাক, ডাঁটা, বেগুন, মূলা, আলু, পটল, মিষ্টি আলু, শাপলার ডাঁটা, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, গাজর, শালগম, ছিম, পেঁপে, নিমপাতা, সজনেপাতা, গিমাশাক, বৃহতী, হিঞ্চেশাক, উচেছ বা করলা, কাঁচাকলা, মানকচু বা ফেনকচু, ঢেড়শ, ঘেটু (ঘাট) শাক, কলমীশাক, কাঁটানটে, সরিষাশাক, শকরকন্দ আলু, কাঁকরোল, শশা, ক্ষীরা, কাঁচা কাঁঠাল, ঘৃতকুমারী, ডুমুর, পুদিনা, বকফুল, বেতোশাক, ব্রাহ্মীশাক, শুসনিশাক, সজিনা, টমাটো, গন্ধভাদুলিয়া, ধুন্দুল,

www.pathagar.com

প্রভৃতি। পেঁচা কচু নামে পরিচিত পাহাড়ী কচু আগে গারো পাহাড় অঞ্চল থেকে প্রচুর আসতো, বর্তমানে জেলায় খুব কম উৎপন্ন হয়। বেগুনের প্রধান মওসুম শীতকাল হলেও সারা বছরই এখানে কিছু কিছু বেগুন পাওয়া যায়। এছাড়াও এ জেলায় সরিষা, তিল, তিসি, রাই, পিয়াজ, আদা, হলুদ, মেথি, কালজিরা, রসুন, লেবু, মরিচ, ধনে, রেড়ী, চিনাবাদাম, ভেরেন্ডা, আমলকী, হরবড়ই, বহেড়া, হরিতকী, খোরাসানী যোয়ান, তেজপাতা, বচ, লবঙ্গ, মৌরী, যমানি প্রভৃতি তৈলবীজ ও মশলা হিসেবে উৎপন্ন হয়। বালিজুরি মরিচ এ জেলায় বিখ্যাত। এ সব ফসলের অনেক গুলোকেই কৃষি পণ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। ধনেপাতা অনেকের নিকট মুখরোচক। এসব শাক সবজীর চাহিদা আগের তুলনায় অনেক বেশী। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারেও রফতানি করার ও বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে ব্যাপক। দুর্ভাগ্য হলে ও যে এসব শাক সব্জির চাষাবাদ আজ বিলুপ্ত প্রায়। প্রথমতঃ বর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে অধিক ধান চাষের ফলে। দ্বিতীয়তঃ এসব ফসল বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ না করার ফলে কৃষকদের জন্য তা মোটেও লাভজনক হয়নি। এজন্যে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং স্থানীয় প্রযুক্তি ও গড়ে উঠেনি। অতীত ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যকে হারিয়ে আমাদের অর্থনীতি আজ আমদানি নির্ভর হয়ে উঠেছে। নেত্রকোণার সর্বোপরি দেশের টেক্সই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন অতীতের চাষাবাদ পদ্ধতিকে আধুনিকীকরণ ও বাণিজ্যিকিকরণ। এ লক্ষ্যে এ সম্পদের দেশে ও বিদেশে বিপণন সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হবে।

জীববৈচিত্র্য ঔষধী গাছ ও গুল্মলতা

ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা জেলার বিভিন্ন স্থানে এমন কিছু গাছ, লতা, গুল্ম জন্মে, যেগুলো কবিরাজী ও ইউনানীমতে ঔষধ এবং ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন গাছ নিয়ে ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করে এ্যালপ্যাথিক ঔষধও তৈরী হচ্ছে। 'প্রায় চারশ জাতের এরকম গাছ রয়েছে। নীচে বহুল-পরিচিত কতকগুলো মূল্যবান গাছের নাম দেওয়া হল–

অতসী, অনন্তমূল, অপরাজিতা (নীল ও সাদা) অপামার্গ (অর্ক, আকন্দ), অর্জুন, অশোক, অশ্বগন্ধা, অশ্বত্থ, আমরূল, আলকুশী (চোতরা), আলোকলতা, দুন্দল, এরন্ড, কন্টিকারী, কদম্ব, কনকচাঁপা, কনকধুতুরা, করবী, করমচা, কাঁকুড়, কাঞ্চন, কাঠচাঁপা, কামিনী, কালকাসুন্দা, কালধুতুরা, কালমেঘ, কাশ, কালহরিদ্রা, কিংশুক (পলাশ) কুঁচ, কুঁচিলা, কুকসিম, কুন্দ, কারচি, বকুসুমফুল, কৃষ্ণচুড়া, কৃষ্ণতুলসী, কেতকী (কেয়া), তেপাপড়া, (পর্পটি), খানকুনী (থানকুনী), পিপুল, গণিয়ারী (গণিকারিকা), গন্ধতৃণ (ভেদালিয়া, ভদ্রবল্লী), গন্ধ ভাদুলিয়া, গাম্ভারী, গিলা, গুঞ্জা, গেঁদাফুল, গোয়ালে লতা, (মইভাঙ্গা), গোলঞ্চ, পদ্‌শগোলঞ্চ, ঘন্টাপুষ্প, ঘৃতকুমারী, ঘোষালতা, ঘোড়াবচ, চাঁপা (চম্পক), ভূঁইচাপা, চামেলী, চিতা, চিরেতা, ছাতিম, জয়ন্ত্রী, জারুল, জিওল (জিগা), ঝাউ, টগর, ঢোলসমুদ্র (ঢোলামানকন), তমাল, তেলাকুচা (মামার লাড়ু), দ্রোণ (দন্ডকলস), দারুহরিদ্রা, দুধকলমী, দুধলতা, দুর্বা, দেবদারু, দোপাটি, নয়নতারা নটে, চাঁপানটে, নাগকেশর, নাগেশ্বর, নাটাকরঞ্জা (ফুলিয়া লেডেরা), নিম, নিসিন্দা, পলাশ, পাকুড়, পাথরকুচি,

www.pathagar.com

পারিজাত, পারুল, পিটুলি, পুনর্ণবা (লাল ও শ্বেত), ফণিমনসা, বকুল, বচ, কুকুরচিতা, রিঠা, বনতুলসী, বনমল্লিকা, বরুণ, বহেরা, বান্দরলড়ি (যষ্টিমধু, বান্দরলাঠি, সোঁদাল, সোন্দাল), বামুনহাঁটি (ব্রক্ষ্মযষ্টি), বাবলা, বাসক, বিশলাকরণী, বেড়েলা, বৈচি ব্রাক্ষী, ভাঁট, ভীমরাজ, ভৃঙ্গরাজ, মণিরাজ, ময়নাকাঁটা, মহুয়া, মাকাল, মাধবীলতা, মুচকন্দ চাঁপা, মুথা, মেন্দী, যজ্ঞডুমুর, যুঁই, রজনীগন্ধা, রামবাসক, শঙ্করজটা, শটি, শতমূলী, শিয়াকুল, শিরীষ, শিশু, শুঁঠ, শেয়ালকাঁটা, শ্যামালতা, সপ্তপর্ণী (ছাতিম), সুসুনিশাক, স্বর্ণলতা, সোমরাজ, হরিতকী, হাড়জোড়া, হাতীশুঁড়, হিঞ্চা ও হিমসাগর।

নেত্রকোণায় ফলফলাদি উৎপাদনের অতীত ঐতিহ্য ও প্রাচুর্য রয়েছে। তবে মারাত্মক অভাব দেখা দিয়েছে সংরক্ষণের। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে পেঁপে, জলপাই, কুল (বড়ই বা বদরী ফল), ডালিম (দাড়িম্ব), লিচু জাম্বুরা (বাতাবী লেবু), লেবু, টাবা, কাগজী লেবু, আতাফল, পেয়ারা (সবরী বা গৈয়ব), আমলকী, হরবড়ই, বেল, গোলাপজাম (মেওয়া), করঞ্জা প্রভৃতির গাছ লাগানো হয়। তরমুজ, খরমুজ, ফুটি, বাজি, শশা, ক্ষীরা প্রভৃতির চাষ করা হয়। তাছাড়া রাস্তার ধারে, ক্ষেতের আইলে, মাঠে প্রান্তরে, জঙ্গলে বা জঙ্গলের ধারে অজস্র দেশী কুল বড়ই, হরবড়ই, তাল, খেজুর, করঞ্জা, তেঁতুল, ডুমুর, ডেউয়া, ডেফল, লট্‌কা বা ভুবি, আতাফল, নানা প্রকার বন্য আলু, কালজাম, গাব, ঝাউ ইত্যাদি গাছ দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ এ সকল ফল খায় ও কোন কোন ফল বাজারেও বিক্রয় হয়। কিছুদিন পূর্বেও সচ্ছল কৃষকরা ফল ফলাদি বিক্রি করা লজ্জাকর বিষয় মনে করতো। গ্রীষ্মকালে আম কাঠাল ও দুধ নিয়ে আত্মীয় বাড়িতে বিশেষ করে জামাই বাড়িতে এবং ছেলের শ্বশুড় বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া প্রায় বাধ্যতামূলক প্রথা ছিল।

কোন এলাকার মানুষের খাদ্যাভ্যাস প্রধানতঃ জলবায়ু, পরিবেশ, জিনিসের প্রাপ্তি সম্ভাবনা, আঞ্চলিক উৎপাদন ব্যবস্থা, ব্যক্তির উপার্জন সামর্থ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। নেত্রকোণা জেলার গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ গরীব ও নিম্ন মধ্যবিত্ত। প্রাচুর্যের দুঃস্বপ্ন তারা কখনও দেখে না। শহর-বাজার এলাকাতেও অনেক গরীব লোক বাস করে এবং তাদের মধ্যে বেকার সমস্যা প্রকট। এখানকার সাধারণ মানুষ প্রকৃতি-জাত, সহজপ্রাপ্য শাক-মাছ-ভাতই বেশী খায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাকৃতিক সম্পদের মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হয়েছে, ফলে তরি-তরকারী, মাছ-মাংসের পরিমাণও জনসংখ্যানুপাতে মারাত্মকভাবে কমে যাচ্ছে। অনেকেই মনে করেন যে, অতীতকালে মানুষ বর্তমান মানুষের চেয়ে সুখী ছিল। কিন্তু ব্যক্তি মালিকানায় সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার পর থেকে পৃথিবীর অনেক দেশই সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। তাই, সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও, এ জেলাতেও সচ্ছলতা এবং দারিদ্র্য অনাদিকাল থেকেই হাতধরাধরি করে চলছে। এ জেলার মানুষের মাথাপিছু সম্পদের ভাগ করে আসবে দ্রুত হারে। সম্পদ উৎপাদন ও বৃদ্ধির প্রধান উপায় হচ্ছে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য। এ জেলার শিল্পজাত দ্রব্যাদির পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না, বর্তমানেও তেমন নেই।

www.pathagar.com

গ্রামীণ এবং নগরবাসীগণ বর্তমানে যেমন ইট-কাঠ-টিনের ঘরে বাস করে, অতীতেও তেমন ভাবেই বাস করতো। দরিদ্ররা বাঁশ, খড় ও ছনের ঘরে বাস করতো। প্রাকৃতি সম্পদের ধনভান্ডার থাকা সত্ত্বেও এ জেলার জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক দূরাবস্থার কারণ হলো রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব। ফলে সামাজিক সচেতনতা এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তৎপর করে তুলার মত নেতৃত্বের মুখ কোনদিন তারা দেখেনি, যেমনটি রয়েছে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও সিলেটের জনগোষ্ঠীর। এ জন্যে প্রয়োজন সময়ের চাহিদা নিরূপণ, গণসচেতনতা সৃষ্টি করা, তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা এবং সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া। এ ভাবে স্থানীয় সৎ নেতৃত্ব ও গড়ে উঠতে পারে।

ভূমি ব্যবহার

সারণী-৪.৩ : অঞ্চল ভিত্তিক ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন (২০০২/০৩-২০০৩/০৪)

('০০০'একর)

অঞ্চল/ভূমি শ্রেণী	মোট এলাকা/ পরিবর্তন	বনাঞ্চল পরিবর্তন (+/-)	অকৃষি অঞ্চল পরিবর্তন (+/-)	কৃষি যোগ্য অব্যবহৃত অঞ্চল পরিবর্তন (+/-)	বর্তমান ফেলো এলাকা পরিবর্তন (+/-)	এক ফসলী এলাকা পরিবর্তন (+/-)	তিন ফসলী এলাকা পরিবর্তন (+/-)	নীট ফসলী এলাকা পরিবর্তন (+/-)	মোট ফসলী এলাকা পরিবর্তন (+/-)
জামালপুর	৮৩৯	০.০	৭.০	-১.০	০.০	-২.০	-৩.০	-৬.০	-১৩.০
নেত্রকোণা-কিশোরগঞ্জ	১৩৮০	০.০	৫৪.০	০.০	১.০	-৬.০	-২০.০	-৫৫.০	-১২৪.০
ময়মনসিংহ	১০৭৮	০.০	-৫.০	-৪.০	-৩.০	-২.০	৬.০	১২.০	৩২.০
টাঙ্গাইল	৮৪৪	০.০	৮.০	০.০	০.০	-৩.০	-২.০	-৮.০	-১৫.০
বাংলাদেশ	৩৬৬৬৯	০.০	১২.০	-২৮.০	১৮.০	-১৪.০	-৭.০	-২.০	৩.০

উৎস: বিবিএস, ২০০৫

আঞ্চলিক ভিত্তিক ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নেত্রকোণা কিশোরগঞ্জ ৫৪ হাজার একর বেড়েছে, যা বৃহত্তর ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল ও জামালপুর অঞ্চলের চেয়ে প্রায় সাত আট গুণ বেশী। বর্তমান ফেলো এলাকা নেত্রকোণা কিশোরগঞ্জ এলাকাতেই একমাত্র রয়েছে। তবে এক ফসলী এলাকা, দুই ফসলী এলাকা, তিন ফসলী এলাকা, নীট ফসলী এলাকা ও মোট ফসলী এলাকা কমেছে ব্যাপকভাবে। এর তাৎপর্য হতে পারে, গৃহ নির্মানের সংখ্যা, নগরায়নের জন্য বা শিল্পায়নের জন্য জমির ব্যবহার বেড়েছে। মোট ফসলী এলাকা জমির পরিমান কমা কোন অবস্থাতেই এ অঞ্চলের জন্য শুভ লক্ষণ বলে প্রতীয়মান মনে হয়না।

www.pathagar.com

ভূমিঃ শোষণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী

এ অঞ্চলের আদি সমাজ ব্যবস্থায় ও সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সমাজ জীবনে জীবিকা আহরণের ক্ষেত্রে আরো একটি ভূমি ভিত্তিক নতুন গোষ্ঠী গড়ে উঠে। তা হলো মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রায় স্থায়ী ব্যবস্থা ইজারাদারী। এই ইজারাদারীর একটি প্রাথমিক পর্যায় ছিলো জায়গীরদারী। ইজারদারীরা স্থানীয় শাসন প্রতিভূদের সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করতো। এদের শোষণের ফলে সাধারণ মানুষের দুর্দশার মাত্রারও অন্ত ছিলনা। কারণ যারা নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে ইজারা নিতো, তারা স্বভাবতঃই অধিক আদায় করে লাভবান হতে চাইতো। ফলে ফসল হানি বা পণ্য উৎপাদানের অসুবিধার দিকে তারা কখনো বিবেচনায় ও আনতো না। এমন কি বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষের সময় এ সকল মধ্যস্বত্বভোগী রায়তদেরকে রেয়াত বা সহায়তা করার কথা কদাচিৎ ভাবতো। এভাবেই আবর্তিত হতে থাকে এ অঞ্চলের শাসন ও শোষণের ইতিহাস।

আদি কালে এ দেশের সামাজিক ও দারিদ্র চিত্র নিয়ে অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে, তাতে ও সমাজের বিভিন্ন চিত্র নানাভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণভাবে 'গোলায় গোলায় ধান আর গলায় গলায় গান' থাকার যে কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে, তার বাস্তবতা দরিদ্র জনসাধারণের জীবনে সবসময় এবং সর্ব ক্ষেত্রে দেখা দেয়নি। তাদের গোলায় ধান না থাকলেও তাদের গলায় গান এর কমতি ছিলোনা; প্রকারান্তরে জীবনের ভারে অবনত বেদনার কথা বলা হয়েছে অন্য গানে। 'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে আমি আর বাইতে পারলাম না,' উদাসী কন্ঠের এই গানে জীবন ও জীবিকার বেদনা এক হয়ে গেছে। কারণ 'ঘরে নাই ধানচাল চালে নাই ছানি, আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি' এই-ই ছিলো এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ অবস্থা। দারিদ্র, সামাজিক বঞ্চনা ও বৈষম্য, নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ, কর্মহীনতা, তার মাঝে ও গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল এ সমাজের আদি অবস্থা। সর্বোপরি কালের আবর্তে দুর্যোগ মোকাবিলার অনেক কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। অনাহরিত প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার আরো তীব্রতর করা হয়েছে। সর্বত্র সৃষ্টি হয়েছে উন্নয়নের গতি ধারা। সহায়ক অনুকুল পরিবেশ বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার সত্ত্বেও কি সামাজিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে কি এ জিজ্ঞাসা আজ সকলের।

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, কোম্পানীর শাসন ও শোষণ প্রক্রিয়া! আকৃতি, এমন কি প্রকৃতির দিক থেকে ছিলো অনেকখানি ভিন্ন। আগেকার শাসক ও শোষকরা এযাবতকাল পর্যন্ত যে সমাজ ও উৎপাদন কাঠামো গড়ে তুলেছিলো, কোম্পানী এসে ধীরে ধীরে তাকে ভেঙ্গে ফেলেছিল নিজেদের স্বার্থানুকুলে। কারণ কোম্পানী শাসকরা তাদের স্বার্থে শিল্প বিপ্লবোত্তর ইউরোপীয় পণ্য ও জ্ঞান দুটোই তাদের প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করে আসছিলো। এভাবে এদেশের বিশেষ জনগোষ্ঠী প্রাকৃতিক সম্পদ ভান্ডার লুন্টন করে তাৎক্ষনিয় সুবিধা আহরণে মেতে উঠে।

www.pathagar.com

ফলে জীবিকা আহরণের প্রধান উৎস নিঃশেষিত করে দারিদ্রের দিকে ঠেলে দিচ্ছে দেশের অসহায় জনগোষ্ঠীকে। তাই তারা যেমন একদিকে পণ্যের নিরংকুশ বাজার সৃষ্টির চেষ্টা করলো, অন্য দিকে নিজেদের সেই প্রয়োজনে শাসন ব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থানুকূলে ব্যবহার করার সুযোগ পেল। ফলে বিত্তহীন নিরক্ষর সাধারণ মানুষের জীবিকার প্রসার ঘটেনি। বরং প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত জীবিকার ধারা থেকে তারা ক্রমান্বয়ে বঞ্চিত হচ্ছে। এই ভাবেই ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষন এতদঞ্চলের পরাধীন মানুষকে পরস্পর বিচিছন্ন করে পূর্বাপেক্ষা আরো বেশী অসহায় ও নির্ভরশীল করে তুলেছিল।

বর্তমানে শাসন ও শোষণের কলা কৌশল আরো জটিল; শহর ও গ্রামের মধ্যে আরো ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলেই গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষর নিরুপায় মানুষ যখন অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের মারমুখী হয়ে উঠেছে, তখন শহরের শিক্ষিতরা বিচলিত হয়নি বা সহযোগিতার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়নি। তারা তাদের জীবিকার তাড়নায় শাসক ও শোষকের পদানত সহযোগী হতে লজ্জা অনুভব করেনি। এভাবেই ক্রমাগত সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক সংঘাত। যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত শাসন শোষণের ও নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদের লুষ্ঠনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এ অঞ্চলের জীবন ও জীবিকার উৎস মারাত্মক ভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। এ কথা ভাবলে, হতাশার দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। নদ-নদীর অববাহিকাজাত ও বনাঞ্চলের ছায়ানিবিড় এর ভূমি সংস্থান হয়তো পূর্বের তুলনায় আরো অধিক সম্প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় উর্বরাশক্তি বাড়েনি মোটেও। আধুনিক সার, সেচ, কীটনাশক, বীজ, এমনকি কলের লাঙ্গল ব্যবহার করেও প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটানোর মত ফসল পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ পর্যাপ্তভাবে মানব সম্পদের উন্নয়ন না হওয়ার ফলে পুরো ব্যবস্থাটাই এখনো মান্ধাতার আমলের ধাঁচে রয়ে গেছে। অথচ এই কৃষির উপরে এখনো এ অঞ্চলের শতকরা আশিজনের জীবন ও জীবিকা নির্ভর করছে। যার আশু ব্যবস্থার জন্য এখন থেকেই প্রয়োজন স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ।

জেলার ভূমি উৎপত্তির রাজস্ব ইতিহাস

এ অঞ্চলের ভূখন্ডে পলিমাটি সমৃদ্ধ বঙ্গ উপত্যকা বহু প্রাচীন কালে গন্ডোয়ানা নামক মহাদেশের অংশ ছিল। প্রায় ১৯ কোটি বছর আগে ভারতীয় উপমহাদেশ যে ভূখন্ডে অবস্থিত, তা গন্ডোয়ানা থেকে পৃথক হয়ে উত্তরমুখী হয়ে সরে আসতে থাকে এবং আনুমানিক ৫ কোটি বছর আগে এশীয় ভূখন্ডের সাথে এসে এটি যুক্ত হয়। হিমালয় পর্বত ঐ সময়ই গঠিত হয় (হা. রশিদ, ১৯৮১)। তবে ঐতিহাসিক তথ্য থেকে যতদূর জানা যায় বহুদিন পর্যন্ত হিমালয়ের পাদদেশ থেকে ভারতের পূর্বসীমা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল।

ডঃ মোয়াজ্জাম হুসাইন তাঁর প্রবন্ধে ময়মনসিংহ জেলা ভূমি সংস্থানের ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলেন যে তিব্বতের মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে হিমালয়ের গিরিখাত দিয়ে প্রবাহিত যে

www.pathagar.com

স্রোতোধারা বৈদিক যুগে লৌহিত্য নাম ধারণ করেছিল, তার জলরাশি এসে মিশেছিল লৌহিত্য সাগরের জলধারার সাথে। সে যুগে বর্তমান ময়মনসিংহ অঞ্চল জলমগ্ন এলাকা ছিল বলে অনুমিত। অবশ্য ভূ-তাত্ত্বিক ভাবে পুরাতন পলল ভূমি হিসেবে মধুপুর গড়ের সৃষ্টি বহু পূর্বেই হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

মৌর্য আমলেই সম্ভবতঃ লৌহিত্য ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করেছিল। ময়মনসিংহ অঞ্চলে তখন স্থল ভাগ জেগে উঠেছিল এবং জনবসতি স্থাপিত হয়েছিল বলে অনুমিত। আরও ধারণা করা হয় যে এ অঞ্চল তখন কামরূপের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

চতুর্থ শতাব্দীতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের শাসনামলে ময়মনসিংহ এলাকাসহ কামরূপের অন্তর্ভূক্ত বিভাগ মগধের অধীনে গিয়েছিল। সপ্তম শতাব্দীতে পরিব্রাজক হিউয়েনসাঙ্গ এ উপমহাদেশে এসেছিলেন, তাঁর বিবরণীতে কামরূপ রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের ভূমি ছিল খুব উর্বরা এবং এখানে প্রচুর পরিমাপে নারিকেল এবং ধান উৎপন্ন হতো। ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বাঞ্চল ছিল কামরূপের অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমাংশ ছিল পৌন্ড্রবর্ধনের এবং পুর্বাংশ ছিল সমতটের অন্তর্গত (কেদারনাথ মজুমদার; ১৯০৭)।

যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠী এ অঞ্চলে এসে বসবাস করেছে। বিভিন্ন বহিরাগত শক্তি দ্বারা শাসিত হয়েছে এ অঞ্চল। তাই এখানে যুগ বিবর্তনের ধারায় গড়ে উঠেছে এক মিশ্র জনগোষ্ঠী। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রসারের ফলশ্রুতিতে এবং বহিরাগত রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে এতদঞ্চলে বিচ্ছিন্ন ভাবে স্থানীয় সামন্ত প্রভুদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেন আমলেও আমরা এ ধরণের সামন্ত শাসনের অস্তিত্বের পরিচয় পাই। অনৈক্য ও বিভেদের ফলে এ সব স্থানীয় শক্তি সব সময়ে বহিরাগত আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে পারেনি।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ময়মনসিংহ অঞ্চলে মুসলিম শক্তির আবির্ভাব ঘটে। ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে হুসেনশাহ বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন এবং তাঁর রাজত্বকালেই সমগ্র ময়মনসিংহে মুসলিম শাসন প্রবর্তিত হয়। নসরত শাহ এ সময় কামরূপের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিছুকাল পর কামরূপ তাঁর হস্তচ্যুত হলে তিনি গারো পাহাড় অতিক্রম করে মুয়াজ্জামাবাদে চলে আসেন। তার নতুন শাসিত 'প্রদেশ' নসরতশাহী নামে অভিহিত হয়, যা পরবর্তীতে মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে সরকার বাজুহা নামে পরিচিত হয় এবং ইংরেজ শাসনামলে ময়মনসিংহ জেলায় রূপান্তরিত হয়।

ভূমিস্বত্বের ঐতিহাসিক বিবর্তন: প্রাচীন ও বর্তমান কাল

এ অঞ্চলের শস্য শ্যামল উর্বর প্রাকৃতিক সম্পদ তথা ভূমির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল ইউরোপীয় উপনিবেশীবেশদের। নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য তাদের একটি লক্ষ্য ছিল কি করে সম্পদ লুন্ঠন করে নিজেদের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা যায় এবং ভাগ্যোন্নয়ন নিশ্চিত

www.pathagar.com

করা যায়। এ লক্ষ্যার্জন ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত করার জন্য তারা সকল সময় একটি মধ্যসত্ত্বভোগী নিয়োগ করতো।

ডঃ মোয়াজ্জাম হুসাইন তাঁর প্রবন্ধে এ দেশের ভুমি স্বত্বের ঐতিহাসিক বিবর্তন আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনায় তিনি উল্লেখ করেন যে প্রাচীনকালে ভারতীয় উপমহাদেশের ভূমি ব্যবস্থা এরূপ ছিল যে যিনি জমিকে কর্ষণযোগ্য অবস্থায় আনয়ন করতেন, তিনিই জমির মালিক বলে স্বীকৃত ছিলেন। গ্রামের জমিতে ব্যক্তি মালিকানা ছিল না। গ্রাম প্রধান জমি বরাদ্দ করতেন। সাধারণতঃ যিনি জমি চাষ করতেন, তাকেই জমি বরাদ্দ করা হতো। গ্রাম প্রধানের মাধ্যমে যৌথভাবে পুরো গ্রামবাসীর নিকট থেকে রাজস্ব সংগৃহীত হতো। কর প্রদানের পর ফসল বন্টন করা হতো।

তৎকালীন সময়ে রাজা যদিও রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তিনি রাজস্ব হিসেবে জমির ফসলের একটি অংশ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। সাধারণতঃ শান্তির সময় ফসলের এক ষষ্ঠাংশ এবং যুদ্ধের সময় এক চতুর্থাংশ রাজস্ব হিসেবে নির্ধারিত ছিল। অবশ্য এ সীমারেখা সব সময়ই যে মেনে চলা হতো এমন নয়। মধ্যসত্ত্বভোগীরাই তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীকে শোষণ ও নিপীড়িন করতো।

মুসলিম রাজত্বকালের প্রথম পর্বে রাজস্ব ব্যবস্থায় পূর্ববর্তী অর্থাৎ হিন্দু আমলের রীতিনীতি পালন করা হতো। গ্রাম প্রধানের ওপর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। পরবর্তীতে সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে কেন্দ্রীয় শাসনের ক্ষমতা যখন বিস্তৃত হল, গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা তখন অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ায় রাজস্ব আদায়ের জন্য আরও শক্তিশালী ব্যবস্থা প্রচলিত হল। গ্রাম প্রধানদের স্থান দখল করল চৌধুরী, কানুনগো ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ। এরাই পরে জমিদার বা তালুকদার নামে অভিহিত হয়েছিলেন। মূলতঃ এ শ্রেনীটি ছিল শাসক গোষ্ঠীর তাবেদার। বর্তমানে আমাদের সমাজে শাসক গোষ্ঠীকে ঘিরে এক প্রকার মধ্যসত্ত্ব ভোগী গড়ে উঠেছে যারা বিভিন্ন টেন্ডার, ইজারা, সংগ্রহ, সরবরাহ করার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাদি নিয়ে থাকে। এসব নব্য মধ্যসত্ত্বভোগীদের বদৌলতে সমাজে মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছে দুর্নীতি।

শের শাহের স্বল্পকালীন শাসনামলে বাংলায় ভূমি বন্দোবস্ত হয়েছিল। তিনি বঙ্গদেশকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করে ভূমি বন্দোবস্ত করে দেন ও রাজস্ব নির্ধারণ করেন। প্রদেশে প্রদেশে তিনি শাসনকর্তাও নিযুক্ত করেন। মুঘল আমলে উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসেবে নির্ধারিত ছিল। সম্রাট আকবর ফসলের পরিবর্তে মূল্যর বা অর্থের মাধ্যমেও রাজস্ব প্রদানের ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন; প্রজা বা রায়তের কাছ থেকে সরাসরি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল জমিদারদের ওপর। তবে তৎকালীন জমিদারগণ ভূ-স্বামী বা ভূমিস্বত্বের অধিকারী ছিলেন না, রাজস্ব প্রশাসনের সুবিধার্থে তখন সুবা, সরকার, পরগণা ইত্যাদি প্রশাসনিক অঞ্চলের সৃষ্টি করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

সম্রাট আকবরের রাজত্বে তাঁর সুদ দেওয়ান রাজা টোডরমল্ল বঙ্গদেশে ভূমি ও রাজস্বের সুবন্দোবস্ত করেন। তার এই বন্দোবস্ত ইতিহাসে" ওয়াসিল তুমার জমা" (Rent Roll of 1582) নামে পরিচিত, বঙ্গদেশকে তিনি ১৯টি সরকারে এবং তার অধীনে ৬৮২টি মহালে বা পরগণায় বিভক্ত করেন। সরকার বাজুহা নামে যে সরকারের সৃষ্টি হয় তার অন্তর্ভূক্ত ছিল ৩২টি মহাল। এর রাজস্ব নির্ধারিত হয় ৩৯৫,১৬,৮৭১ দাম বা ৯,৮৭,৯২১ টাকা। এ ছাড়াও সরকার বাজুহা থেকে ১৭০০ জন অশ্বারোহী, ১০টি হাতী ও ৪৫,৩০০ জন পদাতিক সৈন্য যোগাতে হতো।

শাহ সুজার শাসনকালে ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় দ্বিতীয়বার রাজস্বের বন্দোবস্ত হয়। এতে বঙ্গভূমি ৩৪টি সরকারে এবং ১৩৫০টি মহালে বিভক্ত হয়। পরবর্তীতে ধার্য রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩১ লক্ষ টাকায়।

মুর্শিদকুলী খাঁর সময় (১৭২২ খৃঃ) বাঙ্গলার তৃতীয় বন্দোবস্ত হয়। রাজস্ব ধার্য করা হয় ১৪২ লক্ষ টাকা। বাঙ্গালাদেশকে ১৩টি চাকলা (প্রদেশ), ৩৪টি সরকার ও ১৬৭০টি মহালে (পরগণা) বিভক্ত করা হয়। বাঙ্গালার এই চাকলাগুলি ২৫টি জমিদারী বিভাগে বিভক্ত ছিল। সরকার বাজুহার মহালগুলি নতুন ৪টি চাকলায় বিভক্ত হয়ে গেলেও জমিদারী বিভাগ অনুসারে এই বিভিন্ন চাকলার অধিকাংশ মহালগুলিই রাজস্ব সম্পর্কে জালালপুর দিগরের বা ঢাকা নেয়াবতের অন্তর্গত ছিল। রাজস্ব ও জমাজমির বন্দোবস্তের জন্য স্থানে স্থানে কানুনগোর কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। জমিদারদিগকে রাজস্বের টাকা সুবাদারের দেওয়ান খানায় কিস্তিবন্দী মতে প্রদান করতে হতো। মুর্শিদকুলী খাঁর পূর্বে জমিদারী অপেক্ষা ইজারা প্রথার প্রচলন বেশী ছিল। তিনি ইজারা প্রথা রহিত করে জমিদারগণের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার অপর্ণ করেন।

মুর্শিদকুলী খাঁ রাজস্ব ছাড়াও তিনটি 'আবওয়াব' বা রাজস্ব অতিরিক্ত কর ধার্য করেন। এগুলো ছিল খাস নবিসি, কৈফিয়ত ও তৌফির। তাঁর উত্তরাধিকারী সুজাউদ্দিন খাঁ (১৭২৭-১৭৩৯) বন্দোবস্ত সংশোধন করেন, প্রজার কর প্রদানের ক্ষমতার অথবা ভূমির উৎপাদিকা শক্তির ওপর নির্ভর না করে তিনি জমিদারের কর প্রদানের ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে কর ক্ষমতা আরোপ করেন। ফলে সরকারের রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। প্রজাদের ওপর রাজস্বের চাপ বৃদ্ধি পায়।

আলিবর্দি খাঁ আরও আবওয়াব ধার্য করেন এবং মারাঠাও 'চৌথ'ও আরোপ করেন। রাজস্বের পরিমাণ বেড়ে তখন ২৫৬ লক্ষ টাকায় পৌছে, যার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আবওয়াবের পরিমাণই ছিল ১১৯ লক্ষ টাকা।

www.pathagar.com

প্রাচীনকাল থেকে মুসলিম শাসনামল পর্যন্ত এ অঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থা এরূপ ছিল যে, মধ্যস্বত্ত্ব ভোগী কোন ভূস্বামী প্রথার প্রচলন হয়নি। ভূমির স্বত্ব বাস্তবে কৃষকের হাতেই ন্যস্ত ছিল। রাজ্যের প্রজা হিসেবে কৃষককে অবশ্যই রাজস্ব প্রদান করতে হতো, তা ফসলের মাধ্যমেই হোক বা অর্থের মাধ্যমেই হোক। রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট না থাকলেও এ সম্পর্কিত কিছু নিয়ম কানুন প্রচলিত ছিল।

বিশেষ করে মুসলিম শাসনামলে দেখা যায় যে, রায়ত জমিদার সম্পর্কে পরগণা নিরিখ ও পরগণা দস্তুর ছিল সর্বসম্মত আঞ্চলিক শাসনতন্ত্র বিশেষ, যা ছিল জমিদার রায়ত কর্তৃক অলংঘনীয়। প্রতিটি পরগণার উৎপাদিকাশক্তি জরিপ করে যে, রাজস্ব হার ঠিক করা হতো, সে হার ছিল ঐ পরগণার জন্য স্থায়ী দস্তুর। অবশ্য পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কখনো কখনো পরগণার দস্তুর সমন্বয় ও সংশোধন করতেন। তবে এ ধরণের কার্য সম্পাদনের ও কতিপয় স্থানীয় রীতিনীতি অনুসৃত হতো যাকে বলা হতো পরগণা নিরিখ। দস্তুর ও নিরিখ ছিল রায়তের জন্য নিরাপত্তার চাবিকাঠি।

ইংরেজ শাসন

ইংরেজরা যখন ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করল বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা করের বিনিময়ে, তখন তারা প্রথম দিকে রাজস্ব আদায়ের জন্যে মুহাম্মদ রেজা খানকে নায়েব দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করে। রেজা খানের কার্যকলাপে সন্দেহের উদ্রেক হওয়াতে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে একজন রাজস্ব পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয় তাঁর কার্যাবলী তদারকের জন্য। পরবর্তীতে রেজা খানকে পদচ্যুত করা হয় এবং ওয়ারেন হেষ্টিংস পরিদর্শক পদের বদলে কালেক্টরের পদ সৃষ্টি করেন (১৭৭২)। ইংরেজ শাসনের প্রথমাবস্থায় আদায় ব্যবস্থা উন্নতির বদলে ক্রমশঃ অবনতির দিকে যায়। রাজস্ব আদায়ের নামে প্রজাদের উপর অত্যাচার ও অরাজকতা বৃদ্ধি পায়। কৃষকের সমস্যাবলীর দিকে নজর না দিয়ে প্রশাসন রাজস্ব আদায়ের প্রতিই অধিক মনোযোগী হয়। ঐ সময় বিভিন্ন মেয়াদী ভূমি বন্দোবস্ত প্রথা একের পর এক চালু করা হয়, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। তাই কৃষক অসন্তোষ এবং রাজস্ব ব্যবস্থার অরাজকতায় এ সময়ই ময়মনসিংহ জেলার সৃষ্টিয় হয়েছিল। জেলার রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনার ভার প্রথম গ্রহণ করেন মিঃ রটন। রেভিনিউ বোর্ড রটনকে জেলার ভূমি বন্দোবস্তের ভার দেন। রটন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাই পরবর্তীতে কিছু পরিবর্তিত হয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে প্রচলিত হয়েছিল ১৭৯৩ সালে।

রাজস্ব ব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটিসমূহ বিবেচনা করে এ ব্যাপারে একটি পাকাপোক্ত ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যেই লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় প্রথমে দশ সনা বন্দোবস্ত চালু করা হয় এবং এটি ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তরূপে গৃহীত হয়।

www.pathagar.com

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদেশের ভূমি ব্যবস্থায় এক মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়। এই ব্যবস্থায় নতুন যে জমিদার প্রথা সৃষ্টি হল, তাতে জমিদারকে জমির স্বত্ব প্রদান করা হল। জমিদারগণ সরকারকে যে রাজস্ব দেবেন, তার পরিমান চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হল। তবে কৃষকদের নিকট থেকে প্রাপ্য রাজস্ব বা খাজনার হার নির্ধারণ না করার ফলে জমিদারগণ ইচ্ছামত খাজনা বৃদ্ধি করতে পারতেন। বস্তুতঃ এ আইনে কৃষক বা রায়তের স্বার্থরক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হয়নি। রায়তকে জমি থেকে উচেছদ করার ব্যাপারেও কোন বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়নি। তাছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমিও একটি পণ্যে রূপান্তরিত হল। ধীরে ধীরে মধ্যস্বত্বভোগীদের অত্যাচারে বহু কৃষক ভুমিহীন কৃষকে পরিণত হয়েছিল।

ডঃ মোয়াজ্জাম হুসাইন তাঁর প্রবন্ধে ময়মনসিংহ জেলা ভূমি সংস্থানের ইতিহাস পর্যালোচনায় ইংরেজ আমলে বিভিন্ন ধরণের ভোগাধিকার স্বত্ব অনুযায়ী সাধারণভাবে চার প্রকার ভূমির কথা উল্লেখ করেন।

(১) এষ্টেট - চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী বহু জমিদার এষ্টেট গড়ে উঠেছিল। ১৭৯৩ সালের বন্দোবস্তের সময় ময়মনসিংহ জেলায় ১৭টি জমিদারী ছিল যা ৪১ ভাগে বিভক্ত ছিল; এদের মধ্যে ৬৪ ভাগ ১৮৭৩ সালের মধ্যে অন্যত্র চলে গিয়েছিল এবং বাকি ৩৬ অংশ পরবর্তীতে ১০৯ অংশে বিভক্ত হয়। এর সাথে আরো যুক্ত হয় অন্যান্য জেলার ৪টি অঞ্চল। সবচেয়ে বড় জমিদারীগুলোর মধ্যে ছিল আলাপসিংহ, ময়মনসিংহ, আটিয়া, পুখরিয়া, কাগমারি, সুসং এবং হুসেনশাহী জমিদারীগুলো। উল্লেখ্য, জমিদারী ছাড়াও কিছু স্বাধীন তালুক ছিল এ অঞ্চলে। দশসালা বন্দোবস্তের পূর্বে জমিদারগণ এগুলো সৃষ্টি করেছিলেন এবং রাজস্ব আদায় করতেন। ১৭৯৩ এর পরে এগুলো জমিদারী থেকে বিচিছন্ন হয়ে পড়ে এবং সরাসরি সরকারকে রাজস্ব প্রদান করে।

(২) সরকার কর্তৃক দখলীকৃত এষ্টেট (বাজেয়াপ্ত জমি)- রাজস্ব অনাদায়ে ক্রীত অথবা নতুন জেগে ওঠা জমি এ শ্রেণীর আওতাভূক্ত ছিল। ১৮৭৩ সালে ময়মনসিংহে এ ধরণের ৩৭টি এষ্টেট ছিল। এগুলো যাদেরকে বন্দোবস্ত দেয়া হতো, তারাও জমিদার বা তালুকদারদের মর্যাদা ভোগ করতেন।

(৩) রাজস্বমুক্ত এষ্টেট বা জমি-ময়মনসিংহ জেলায় ১৩৯টি নিষ্কর বা লাখরাজ এষ্টেট ছিল। লাখরাজ বলতে সাধারণতঃ দুই প্রকারের নিষ্কর ভূমিকে বুঝায় অর্থাৎ বাদশাহী লাখেরাজ এবং আবাদশাহী লাখেরাজ। প্রথমোক্ত প্রকার জমি মুসলিম সম্রাটগণ কর্তৃক অনুমোদিত ছিল। দ্বিতীয় প্রকার জমি সাধারণতঃ ধর্মীয় বা দাতব্য কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জমিদারগণ বা রাজস্ব আদায় বিষয়ক সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক অনুমোদিত ছিল। ওয়াকফ, পীরপাল, ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর সম্পত্তিও এ শ্রেণীর জমির অর্ন্তভূক্ত। এ ধরণের জমিও এ জেলায় রয়েছে।

www.pathagar.com

(৪) অধীনস্ত জোত-ইংরেজ রাজত্বে ময়মনসিংহ জেলায় বিভিন্ন ধরনের অধীনস্থ জোতের অস্তিত্ব ছিল। হান্টারের বর্ণনা অনুযায়ী ১৯ প্রকারের অধীনস্ত জোতের (Under tenures) সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে (ক) পত্তনী তালুক, (খ) দরপত্তনী তালুক,(গ) শিকমী তালুক, (ঘ) ইসতি্মরারী বা মোকাররারী (ঙ) মৌরশী (চ) নগদী জমা তালুক, (ছ) ইজাহারী তালুক, (জ) দিখলী (ঝ) সিটাখ (ঞ) মিরাশ (ট) মৌরশী ইজারা (ঠ) ইজারা (ড) দায়শোধী ইজারা, (ঢ) দর ইজারা (ণ) কটকবালা (ত) চক (থ) জোত-রায়তী বা আবাদী স্বত্ব(দ) নিজ জোত বা খামার (ধ) বর্গা।

গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী জমিদারগণ কর্তৃক নিযুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে রয়েছে নায়েব, গোমস্তা, তহশীলদার, পাটওয়ারী, মন্ডল, পাইক, দেকরা ইত্যাদি।

জমিদারী প্রথার কুফলসমূহ বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মত বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা ও নেত্রকোণা অঞ্চলে প্রকটভাবে অনুভূত হয়েছিল। ১৭৯৩ এর পর বহু আইন পাশ করা হয় ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে। বিশেষতঃ জমিদার রায়ত সম্পর্ক নির্ধারণে; কিন্তু বাস্তবে ১৮৮৫ সালের বেঙ্গল টেনান্সী অ্যাক্টের পূর্বে প্রজাস্বত্বের ব্যাপারে কার্যকরী কোন আইন রচিত হয়নি। এর পরও ১৯২৮ ও ১৯৩০ সালে রায়তদের জমি হস্তান্তর সম্পর্কিত দুটো আইন প্রণীত হয়। ১৯৩৮-এ স্যার ফ্রান্সিস ফাইডের নেতৃত্বে তৎকালীন ভূমি ব্যবস্থা পরীক্ষার জন্য সরকার একটি ভূমিরাজস্ব কমিশন গঠন করে। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট ১৮৪০ সালে পেশ করা হয় এবং এতে জমিদারী প্রথা উচেছদের সুপারিশ করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার ফলে রিপোর্টটি কার্যকরী করা হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হলে পৃথক পৃথক ভাবে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় ভূমি সংস্কারমূলক আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

পাকিস্তান শাসনামল

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫০ সালে পূর্ববাংলা জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করা হয়, যার ফলে জমিদারী প্রথাসহ সকল প্রকার মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকার বিলুপ্ত করা হয়। জমির ওপর রায়তের স্বত্ব স্বীকৃত হয় এবং সকল প্রকার খাজনার মালিক হলেন সরকার। পরিবার পিছু ১০০ বিঘা বা মাথা পিছু ১০ বিঘা (যেটি অধিক হয়) জমির উচ্চতর সীমা হিসেবে বেঁধে দেয়া হয়। ক্ষতিপূরণ সহ উদ্বৃত্ত জমি সরকারের নিকট অর্পিত হবে বলে স্থির করা হল। জমি উপ-ইজারা দেয়া নিষিদ্ধ করা হল। হাট বাজার এবং জলমহালের মালিকানা সরকারের হাতে অর্পিত হল। বিভিন্ন কারণে এর বাস্তবায়ন বাধাপ্রাপ্ত ও বিলম্বিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৬১ সালে আইউব খাঁর সামরিক শাসনকালে জমির সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘা থেকে ৩৭৫ বিঘায় উন্নীত করা হয়।

www.pathagar.com

১৯৫০ সালের আইনে জমিদারী প্রথা উচেছদ করার কথা বলা হলেও বাস্তবে এর আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্যগুলো সাধিত হয়নি। জোতদারী প্রথা এবং ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত বর্গা প্রথা চালু রয়ে গেল। তাছাড়া ময়মনসিংহ অঞ্চলে অগ্রিম নগদ টাকার বিনিময়ে বার্ষিক চুক্তিতে জোতদারদের কাছ থেকে জমির ইজারা নেয়ার প্রথা 'রংজমা" চালু রয়ে গেল। অর্থাৎ রায়তের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান এ আইনের মাধ্যমে করা বাস্তবে সম্ভব হয়নি।

স্বাধীনতাত্তোর ভূমি সংস্কার

দেশ স্বাধীনতাত্তোরের পর আওয়ামী লীগ সরকার কৃষি সংস্কারের বিষয় দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পদক্ষেপগুলোতে একটি ছিল ২৫ বিঘার (৮.৩ একর) কম পরিমাণ জমির মালিকের কর মওকুফ করণ সংক্রান্ত। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির মূলধন অনুযায়ী আইনগত ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকারের গঠিত ভূমি সংস্কার কমিটির রিপোর্টের এ বিষয়ে সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ ঃ

(ক) ২৫ বিঘার অধিক পরিমান জমির মালিকদের ভূমি কর প্রদান থেকে অব্যাহতি প্রদান ;
(খ) ভূমি করের অব্যাহতি আওতাভূক্ত জমির স্বত্বাধিকারের যথাযথ রেকর্ড রক্ষার উপায় অনুসন্ধান করণ ;
(গ) বড় আকারের জমির বিভক্তি প্রতিরোধের বিষয়ে উদ্ভাবন করণ; যার ফলে ভূমি কর ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়।

তৎপ্রেক্ষিতে কমিটির নিকট বড় সমস্যা ছিল এরূপ পরিবারের সংখ্যা নির্ণয় করতে হলে কমপক্ষে তিন বৎসর সময় লাগতে পারে। কমিটি আরো উল্লেখ করে যে, সংশোধনী জরিপ কার্যক্রমে ১০ মিলিয়ন টাকা ব্যয় হবে। এ ছাড়া এলাকার ধরণ চিহ্নিত করা সম্ভব হবে না।

বাস্তবে সরকার ভূস্বামীদের মতামত নিয়ে তা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এ জন্যে ১৯৭২ সালে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার অনুকূলে, তা থাকলে ও রাজনৈতিক নীতি নির্ধারকগণ ইসলামী মূল্যবোধের উপর হস্তক্ষেপ করা সমীচিন হবে না বলে মনে করেছিলেন। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যা সর্বজনবিধিত, আইয়ুব সরকার ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা ৩৩.৩ একর (একশত বিঘা) থেকে বৃদ্ধি করে ১২৫ একরে (৩০০ বিঘা) উন্নীত করেছিল। কমিটির আইয়ুব সরকারের সিদ্ধান্তই বজায় রেখেছিল। উল্লেখ্য, ১৯৫০-৬০ সময়কাল জমিনের এরূপ বড় মালিকানা বিদ্যমান ছিল। ১৯৫০ সালের পর সরকারের আয়ত্তে কি পরিমাণ জমি ছিল, তার কোন হিসাব নির্ধারিণ সম্ভব ছিলনা। মোটকথা ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা নির্ধারণ রাখা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। কারণ দেখানো হয়েছিল ১৯৭২ সালে সরকারে ভূমি ব্যবস্থাপনার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

বিষয় ছিল শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। তাই ভূমি মালিকানার মত জটিল বিষয় নিয়ে কেউ বিতর্কে জড়াতে চায়নি।

১৯৭৫-৮২ ঃ বি.এন.পি. শাসন আমল

জিয়াউর রহমান সরকারের সময় কৃষি উন্নয়নের জন্য সেচ্ছাশ্রমে খাল কাটার মাধ্যমে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ প্রবর্তন করে। উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হলেও বাস্তবে ভূমি সংস্কার ও বিতরণের তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি।

১৯৮১-৮৪ ঃ জাতীয় পার্টি শাসন আমল

এরশাদ শাসনামলে ভূমি সংস্কারের কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৮৩ সালের ভূমি সংস্কার কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে একটি জরিপ করা হয়েছিল। সুপারিশগুলি ছিল, আইনগত ধরনের প্রথম ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এবং কৃষি মজুর (সর্বনিম্ন মজুরী) অধ্যাদেশ ১৯৮৪। পাঁচটি অধ্যায়ে জরিপটি উপস্থাপিত হয়েছিল। প্রথমতঃ ভূমি মালিকানায় সর্বোচ্চ সীমা। দ্বিতীয়তঃ ক্ষেত মজুরদের অধিকার সংরক্ষণ। তৃতীয়তঃ কৃষি মজুরদের সর্বনিম্ন মজুরীর আইনগত প্রতিষ্ঠা। চতুর্থতঃ বিকেন্দ্রীকরণের প্রতিষ্ঠা এবং জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রশাসনকে শক্তিশালী করা এবং পঞ্চমত; আভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধিতে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

পরবর্তীতে ভূমি সংস্কারের পদক্ষেপের বিষয়গুলোর উপর যে গুরুত্ব নেয়া হয়েছে, তার অন্যতম ছিল ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা। বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কেউ ২০ একরের বেশী জমির মালিক হতে পারবে না। এ বিষয়ের উপর আইনগত কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অতীতে ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশনার বিষয়ে ভূমিহীনদের মৌলিক চাহিদা পূরণের দিকটি বিবেচনা করা হয়নি (শওকত আলী, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা- ১৮৮)।

ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা আরো হ্রাস করনের আইনগত ভিত্তি বাংলাদেশ ভূমি মালিকানা (সীমিত করণ) আদেশ ১৯৭২। এই আদেশ বলে সরকার সর্বোচ্চ সীমা হ্রাস করতে পারে। তৎপ্রেক্ষিতে ১৯৭৭ সালে ভূমি অধিকার জরিপে দেখা যায় যে, ৯.৬৭ শতাংশ পরিবার বাংলাদেশের ৫০.৬৮ শতাংশ কৃষি জমির মালিক। পক্ষান্তরে ৭৭.৬৭ শতাংশ পরিবার মাত্র ২৫.১৭ শতাংশ ভূমির মালিক। মোট গ্রামীণ পরিবারের ২৮.১০ শতাংশ ভূমিহীন। ১৯৬৮ সালের এর পরিমাণ ছিল ৩১.১০ শতাংশ যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৭ সালে ৩২.৭৯ শতাংশ হয়। নিঃসন্দেহে এ সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

www.pathagar.com

১৯৮১ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ১৪.২৭ শতাংশ পরিবার (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতিত) একদম ভূমিহীন। ২৩.৭৭ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের শুধুমাত্র বসতবাটি আছে। শুধু বসতবাটির মালিকসহ ৩.০ একরের কম জমিনের মালিকানা ছিল ৬৮.৭৫ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের। যারা মোট জমির ৩৪.৮৪ শতাংশের মালিক। মাত্র ০.৭৩ শতাংশ ১৬.৬৬ একর জমির মালিক এবং তা সর্ব মোট জমির ১০.২১ শতাংশ (১৯৮১ সালের ভূমি নীতি রিপোর্ট)।

১৯৭৭ সালের ভূমি সত্ব জরিপ থেকে দেখা যায় যে, ১০০ বিঘার উপরের জমির মালিকানা রয়েছে অনেকের। ভূমি রেকর্ডের আধুনিককরণ ছাড়া নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমার অধিক পরিমাণে জমির মালিকের সংখ্যা নিরুপণ করা কঠিন। ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা আরো কমিয়ে আনার বিষয়ে কার্যকারী পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়ের যুক্তিও দেখানো হয়। পঞ্চাশ থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত ভূমি কৃষি বিষয়ক কার্যকরী পদক্ষেপ ছিল সীমিত। অথচ, সেচ ব্যবস্থার বিস্তৃতি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নর্দমা ব্যবস্থা এবং এইচ ওয়াইভি এবং কীটনাশকের ব্যবস্থার ফলে ভূমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ছাড়া ও ছোট ভূমি মালিকানা বৃদ্ধির ফলে, ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা হ্রাস করার যৌক্তিকতা ও বৃদ্ধি পায়।

১৯৮৩ সালে ভূমি সংস্কারের কমিটি জনমত যাচাই করে। কমিটি সুপারিশ করেছে যে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এলাকাভূক্ত জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ মালিকানা হবে ৭৫ বিঘা, অর্থাৎ ২৫ একর। অন্য অঞ্চলে তা হবে ১০০ বিঘা। অনুপস্থিত মালিকদের ক্ষেত্রে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এলাকার জন্য সর্বোচ্চ সীমা হবে ৩০ বিঘা বা ১০ একর এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত এলাকার জন্য হবে ৫০ বিঘা বা ১৬.৬ একর। কমিটি সর্বোচ্চ সীমার বাহিরের জমি অধিগ্রহণ করার সুপারিশ করেছিল। কমিটি সীমানা অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের সুপারিশ করেছে। তবে যে সমস্ত মালিকগণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত জমির মালিকানা স্বত্ব ত্যাগ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে না। কমিটি আরো সুপারিশ করেছে যে, এখন থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি অথবা বিবাদমান সর্বোচ্চ সীমানীতি অনুযায়ী মালিকানার বাহিরের জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ ৬০ বিঘা অথবা ২০ একরের নির্ধারণ করা হবে। কিন্তু ৬০ বিঘার অতিরিক্ত জমির অধিগ্রহণ বাতিল করা হয়।

১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ সুপারিশ চুড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। এই অধ্যাদেশে কোন ব্যক্তি বা পরিবার কর্তৃক ৬০ বিঘার উপর জমির মালিকানার অধিগ্রহণের উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। এ সর্বোচ্চ সীমার কাঠামো বন্যামুক্ত এবং বন্যাকবলিত সকল এলাকার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। সম্ভবতঃ এ সুপারিশ বাস্তব সম্মত না হওয়ায় তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এ ভাবে ভূমি সংস্কারের উদ্যোগটি অদ্যাবধি বাস্তবায়নের আলো দেখেনি।

www.pathagar.com

ক্ষেত মজুরদের অধিকার সংরক্ষণ ঃ বর্গাচাষীদের অধিকার সংরক্ষণ আইন

১৯৮৪ সালে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশে বর্গাচাষীদের অধিকার সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়। ইহা একটি স্বাগত নির্দেশনা, যার ফলে কৃষি সংস্কারের উপর নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। নতুন মাত্রার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

- আইনগতভাবে সম্মতভাবে চুক্তিবদ্ধ না হয়ে কোন ব্যক্তিই তার জমির অন্য ব্যক্তি দ্বারা চাষাবাদ করাতে পারবেনা। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি আইনগতভাবে চুক্তিবদ্ধ না হয়ে অন্যের জমিতে ফসল উৎপাদন করতে পারবে না;
- মালিক ও ভাগ চাষীর মধ্যে চুক্তি থাকবে ৫ বৎসরের।
- মালিক ও ভাগ চাষীদের বিবাদমান চুক্তির নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।
- মালিক ও ভাগ চাষীদের চুক্তি ভাগ চাষীর মৃত্যুর পর ও চাষাবাদ করতে সক্ষম তার পরিবারের এমন জীবিত সদস্যের সঙ্গে বহাল থাকবে।
- মালিক ও ভাগ চাষীদের মধ্যে চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে চুক্তি নবায়ন করতে হবে আইনের সুনির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী।

১৯৮৪ সালের নতুন আইন বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ও কৃষক জাগরণের ইতিহাসে সম্পর্কিত প্রাপ্ত অধ্যায়কে পূনর্জীবিত করে। নতুন আইন অনুযায়ী বর্গা জমির উৎপন্ন ফসল নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা হয়।

- ভূমি মালিক পাবে এক তৃতীয়াংশ;
- বর্গাদার তার পারিশ্রমিক হিসেবে পাবে এক-তৃতীয়াংশ।
- এক-তৃতীয়াংশ পাবে মালিক অথবা বর্গাদার অথবা উভয়ই, শ্রম আইনের বাহিরের উৎপাদন খরচের জন্য (ভূমি সংস্কারের অধ্যাদেশ ৮৪ এর ১২শ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কারের অধ্যাদেশে যে সমস্ত ফাঁক বা অসম্পূর্ণতা ছিল, তার কোন বিকল্প আছে কিনা সে প্রশ্নে আলোচনা করা জরুরী। এক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গের অভিজ্ঞতা প্রাসঙ্গিক। পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা এ দেশের অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বিপরীত। পশ্চিম বাংলায় বর্গাদারদের আইনগত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে বাংলাদেশের পূর্বে। আরো গুরুত্বপূর্ণ হল, বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।

১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ পশ্চিম বাংলার রাষ্ট্রপতির আইন ১৯৭০-এর কাঠামোর মতোই কম বেশি রয়ে গিয়েছে। মূলত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়েছে। প্রথম, বর্গাদারের অবহেলার কারণে মালিক কর্তৃক জমি ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটি রয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, মালিকের ব্যক্তিগত কৃষি কাজের জন্য জমির পরিমাপের কোন সর্বোচ্চ সীমা বেধে দেওয়া হয়নি। তৃতীয়ত, বর্গাদারের সাথে যদি মালিকের ফসল সংরক্ষণ ও

www.pathagar.com

মাড়াই করার কাজের স্থান নির্বাচন নিয়ে কোন মতানৈক্য ঘটে, তবে বর্গাদারের অধিকার থাকবে উক্ত কাজের স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে।

যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, বর্গাদারের স্বার্থ-সংরক্ষণ আরো জোরদার করার উদ্দেশ্যে উপর্যুক্ত তিনটি শর্তকে বর্তমান আইনে আরোপ করা যেত। অবশ্য ব্যাপকভাবে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে বর্গাদারের স্বার্থের ব্যাপারে উদারনীতি গ্রহণ করা হয়েছে, তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। পশ্চিম বাংলার দীর্ঘ পরিকল্পনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তা অর্জন করা যেতে পারে পশ্চিম বঙ্গে তা এভাবেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছিল ।

কৃষি মজুরদের সর্বনিম্ন মজুরীরঃ কৃষি শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের আইনগত প্রতিষ্ঠা

কৃষি ক্ষেত্রে নতুন সংস্কার পদক্ষেপের তৃতীয় মাত্রা হল কৃষি মজুরদের জন্য নিম্নতম মজুরী প্রতিষ্ঠা করা। এ উদ্যোগ কৃষি মজুরদের সমস্যা কৃষি কল্যাণ সম্পর্কিত গণনীতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ন অধ্যায়। কৃষি মজুর (ন্যূনতম মজুরী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ সালের কৃষি কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক নিশ্চিত করার প্রচেষ্টার মাইল ফলক। ন্যূনতম মজুরী প্রতিষ্ঠার আইনগত উদ্দেশ্য ছিল ভূমি-মজুরদের যারা জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা ৫৫% উৎপাদনের ব্যাপারে অবদান রাখে, তাদের নিম্নতম পারিশ্রমিক নিশ্চিত করা। ১৯৮৩ সালের ভূমি সংস্কার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সর্বনিম্ন মজুরী প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভূমি-শ্রমিকদের সর্বনিম্ন দৈনিক মজুরী প্রতিষ্ঠিত হয় ৩.২৭ কেজি চাউল অথবা স্থানীয় বাজার দর অনুযায়ী উক্ত চাউলের মূল্য।

আইন অনুযায়ী কৃষি উৎপাদিত ফসল সংক্রান্ত ব্যাপারে যে ব্যক্তি নিয়োজিত, সেই কৃষি মজুর। নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিগণ কৃষি শ্রমিক সংক্রান্ত আওতা বহির্ভূত বলে বিবেচিত হবেন ঃ

- সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তি;
- ১৯৩৬ সালের শ্রম আইনের অধীনের চাষাবাদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি;
- মাসিক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পারিবারিক মজুর;
- ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী নিবন্ধনকৃত কোম্পানিতে নিয়োজিত ব্যক্তি;
- ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ অনুযায়ী বর্গাদার বলে সংজ্ঞায়িত।

১৯৮৪ সালে ভূমি সংস্কার আইনের মতো এ আইন লংঘনের জন্যে কোন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না। এ আইনের ধারায় মজুরী সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ ও আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে। আইনে বিধান রয়েছে যে ব্যক্তি ন্যূনতম মজুরী পরিশোধ করতে ব্যর্থ হবে, তাকে বঞ্চিত ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য অর্থের দ্বিগুণ পরিমাণে পরিশোধ করতে হবে। কৃষি শ্রমিকদের মজুরী আদায় ও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ব্যাপারের মামলার নিষ্পত্তি হবে গ্রাম্য আদালতে।

www.pathagar.com

আইন অনুযায়ী গ্রাম্য আদালতের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, যদিও তার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কোন পক্ষ সন্দেহ প্রকাশ করলে অন্য কাউকে এ দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট আইনে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন সম্পর্কিত ব্যাপারে কোন ভূমিহীনকে মনোনয়ন দান করা হয়নি। তিনজন মহিলা সদস্যা মনোনয়নের ব্যবস্থা আছে। যদি এটা আইনগত কাঠামো হয়ে থাকে, তবে দুর্দশাগ্রস্থ কৃষি মজুর কর্তৃক আইনের আশ্রয় নিয়ে মজুরী ও ক্ষতিপূরণ নেয়ার (যার ব্যবস্থা অধ্যাদেশে আছে), প্রত্যাশা বাস্তবসম্মত নয়। এ পরিস্থিতিতে বঞ্চিত কৃষি মজুরকে বিচার পাওয়ার জন্য পাহাড়ের সাথে লড়তে হয়।

এতদ্‌সত্ত্বেও কাল মেঘের আড়ালে আশার আলো দেখা যায়। গ্রাম্য আদালত সম্পর্কিত আইনের অধীনে বঞ্চিত ব্যক্তি ইচ্ছা করলে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কর্তৃক দরখাস্ত না-মঞ্জুরের বিরুদ্ধে বিবাদমান দলসমূহের আওতাধীন মোন্সেফ আদালতে আবেদন করতে পারে।

সাম্প্রতিককালের বিচার বিভাগীয় প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টার ফলে প্রত্যেক উপজেলায়ই মুন্সেফ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা বর্তমানে জেলা পর্যায়ে স্থানান্তর করা হয়েছে। অবশ্য চেয়ারম্যান কর্তৃক বাতিলকরণের আদেশ বিরুদ্ধাচারণ করে মুন্সেফ আদালতে নালিশ করে কোন ফল লাভ করা একজন কৃষি শ্রমিকের জন্য অত্যন্ত কঠিন ও জটিল বিষয়। যাহোক বিষয়টি, গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমে সরলীকরণ সম্ভব (শওকত আলী, ২০০২)।

ভূমি-ব্যবস্থা শোষণ প্রসূত আন্দোলন

অতীতের বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত কৃষক স্বার্থ বিরোধী ভূমি ব্যবস্থার প্রতিবাদে বিচিছন্নভাবে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় ময়মনসিংহেও কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। প্রতিরোধের এসব আন্দোলন কখনো কখনো রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের রূপ ধারণ করেছিল। এসব আন্দোলনের ও সংগ্রামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ময়মনসিংহের পাগলপন্থী বিদ্রোহ (১৮২৪-৩৩), টঙ্ক আন্দোলন (১৯৩৭-৪৯) এবং তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭)। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হবে।

বন সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য পূর্বে " ফরেষ্ট এ্যাক্ট, ১৯২৭" প্রচলিত ছিল। পাকিস্তান সরকার" পূর্ব পাকিস্তান প্রাইভেট ফরেষ্ট অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৯" জারী করে। এই আইনের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত ধারাসমূহে উল্লেখ আছে বনজ সম্পদ হিসাবে চিহ্নিত হবে

www.pathagar.com

বনাঞ্চলে প্রাপ্ত সকল উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদ অংশ, কাঠ, ফল, ফুল, পাতা ইত্যাদি, বন্য প্রাণী, চামড়া, রেশম, মোম, মধু এবং অন্যান্য দ্রব্য যা মানুষের কাছে অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহন করে। ' প্রাইভেট ফরেষ্ট' বলতে বুঝানো হয়েছে, যা সরকারের মালিকানাধীন নয়। এই অধ্যায়ে উল্লেখ আছে বন সংক্রান্ত কাজে বৎসর গণনা করা হবে ১লা এপ্রিল থেকে বৃটিশ পদ্ধতি অনুসরণে এই আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত ধারা অনুসারে সরকারের পরিকল্পনাধীন কোন এলাকায় অবস্থিত জমি ব্যক্তি-মালিকানাধীন হলেও বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তাকে বনজ সম্পদ উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ব্যপারে গবাদিপশু চড়ানোর সুযোগ এই আইনে রয়েছে। তবে শন উৎপাদনের জন্য চিহ্নিত এলাকা বা নতুন চারা লাগানো সংরক্ষিত এলাকায় গবাদি পশু চড়ানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

গত কয়েক দশক ধরে বন সম্পদ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সামাজিক বনায়নের প্রক্রিয়াকে টেক্সই ও গতিশীল করার জন্য বন প্রশাসনের সাম্প্রতিক সংস্কার ও সাধন করা হয়েছে। সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য সারাদেশকে ৪৫টি সামাজিক বনায়ন জোনে ভাগ করা হয়েছে। বন সম্প্রসারণ বিভাগের নাম দেওয়া হয়েছে সামাজিক বনায়ন বিভাগ। এছাড়াও বন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামোতে সামাজিক বন উইং নামে একটি নতুন ইউনিট চালু করা হয়েছে। উক্ত ইউনিট প্রধান বন সংরক্ষকের তত্ত্বাবধানে সমগ্র বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে সামাজিক বনায়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। বন উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কাজকে গতিশীল করার জন্য বন আইনকে সংশোধন করা হয়েছে এবং নতুন নীতিমালা বন নীতি ১৯৯৪ প্রনয়ন করা হয়েছে ।

চিত্র ৪.১ : বৃক্ষহীন বণাঞ্চল

উৎস ঃ Miller, 1993

www.pathagar.com

বন আইন সংশোধন

The Forest (Amendment) Act ২০০০ এর মাধ্যমে ১৯২৭ সনের বন আইনকে সংশোধন করে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে বন আইনের আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম আইনের ভিত্তি পেয়েছে। এছাড়া সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য বন বিভাগ ১৯২৭ সনের বন আইনের আওতায় সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০২ তৈরী করছে। উক্ত সামাজিক বনায়ন বিধিমালায় সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে যে সব অসুবিধা আছে তা দূর করার ফলে সামাজিক বনায়নের গতি ত্বরান্বিত হবে।

জনগণকে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে বনায়নে সম্পৃক্ত করণ

ফরেস্ট্রি সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পুরাতন বাগান কর্তন করতঃ জনগণকে চুক্তি পত্রের শর্ত মোতাবেক তাদের ন্যায্য অংশ বন্টন করার পর জনগণের মধ্যে বন বিভাগের বিশ্বাসযোগ্যতা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। জনগণ ও বন বিভাগের যৌথ অংশীদারিত্বে সৃজিত বাগান কর্তনের পর ১৯৯৯-২০০০ সালে ২৩৮ জন অংশীদারের মধ্যে ২৫.৩৭ লক্ষ টাকা এবং ২০০০-২০০১ সালে ২১১০ জন অংশীদারের মধ্যে ৪১৮.৭৩ লক্ষ টাকা বন্টন করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ৩৪ হাজার উপকারভোগীদের মধ্যে ৫৩.৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ তহবিল গঠন

ফরেস্ট্রি সেক্টর প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বনায়ন কার্যক্রমে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করণ করা হয়েছে। অংশীদারদের মধ্যে বন্টনকৃত অংশের পুনর্বিন্যাস করে বৃক্ষরোপণ তহবিল নামে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। বৃক্ষ কর্তন থেকে প্রাপ্ত টাকার শতকরা ১০ ভাগ উক্ত তহবিলে জমা রাখা হয়। এ অর্থ দ্বারা কর্তনকৃত এলাকায় নতুনভাবে বনায়ন করা সম্ভব হবে। ফলে বনায়নের জন্য অংশীদারদেরকে স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসম্পূর্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ।

বেসরকারী সংস্থা (এন জি ও) ও ব্যক্তি উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করণ

সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে গতিশীল ও কার্যকর করার জন্য উপকারভোগীদেরকে সংগঠিত ও আর্থিক সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে থানা বনায়ন ও নার্সারী উন্নয়ন প্রকল্পের শেষের দিকে বাগান সৃজন ও রক্ষণাবেক্ষণে এনজিও নিয়োগ করা হয়েছে এবং বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় সংশ্লিষ্ট এনজিওকে বাগানের একটা নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয় (১০%)। পরবর্তীতে ফরেস্ট্রি সেক্টর প্রকল্প ও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত এনজিওদের, তাদের সেবার বিনিময়ে অর্থাৎ বাগানের উপকারভোগী নির্বাচন এবং তাদেরকে সংগঠিত করা বাবদ উপকারভোগী প্রতি

www.pathagar.com

বাৎসরিক ২০০/- টাকা হিসাবে তিন বছর সম্মানী প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ফলে তারা সরাসরি উপকার ভোগী হচ্ছে।

সামাজিক বনায়নের টেকসই ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এ লক্ষ্যে বন বিভাগ যেসব পদক্ষেপ ও কৌশল এ যাবত গ্রহণ করেছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

(ক) *সামাজিক বনায়ন প্রশিক্ষণ ঃ* অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার সাথে সাথেই সামাজিক বনায়ন প্রশিণ কার্যক্রম শুরু হয়। প্রশিক্ষণে স্থানীয় উপকারভোগী, গ্রাম্য নেতা, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, ধর্মীয় নেতা প্রমুখের সামাজিক বনায়নে তিন দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

(খ) *অংশীদারিত্বের দলিল প্রদান ঃ* সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় জনগণকে তাদের প্রাপ্য অংশ নিশ্চিত করার জন্য নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পের উপর সম্পাদিত দলিল দেয়া হচ্ছে।

(গ) *জনগণকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ* প্রত্যেক সামাজিক বনায়ন এলাকায় প্রধানতঃ বৃক্ষরোপণ তহবিল পরিচালনা এবং সৃজিত বনের সুষ্ঠু পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করার ফলে অংশীদারদের উপর বাহির থেকে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে যা টেক্সই সামাজিক বনায়ন ও বন সম্পদ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

(ঘ) *স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি ঃ* সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য জেলা সমন্বয় কমিটি ও উপজেলা সমন্বয় কমিটি রয়েছে। জেলাতে জেলা প্রশাসক সভাপতি এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সদস্য সচিব। উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতি এবং সহকারী বন সংরক্ষক বা রেঞ্জ কর্মকর্তা সদস্য সচিব। তাছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে এপেক্স বডি রয়েছে, যার প্রধান কাজ হল বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বনায়ন কাজ সমন্বয় সাধন করা। এপেক্স বডির সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব এবং প্রকল্প পরিচালক, ফরেস্ট্রি প্রকল্প উক্ত কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

মহাপরিকল্পনা ও বন নীতি প্রণয়ন

বাংলাদেশ সরকার দেশের বন উন্নয়নের জন্য ১৯৯৩ সালে বন খাতে বিশ বছর মেয়াদী মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে। উক্ত মহাপরিকল্পনার আলোকে ১৯৯৪ সালে নতুন বন নীতি ঘোষণা করা হয়। নতুন বন নীতিতে প্রাকৃতিক বন ও বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বন ব্যবস্থাপনায় তৃণমূল পর্যায়ে জনগণ বিশেষতঃ গরীব, ভূমিহীন, মহিলা ও উপজাতীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করতঃ বন সৃজন ও সংরক্ষণ করার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়। এ বন নীতিতে ২৯টি ঘোষণা দেয়া হয়। তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলোঃ

www.pathagar.com

(১) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং বনজ সম্পদকে উৎপাদনে এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাদের সমূহের সমন্বিত করে এবং জনগণকে সম্পৃক্ত করে দেশের মোট ভূমির শতকরা বিশ ভাগ বনায়নের আওতায় আনা;

(২) দেশের সংরক্ষিত বনভূমির পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত বিধায় সংরক্ষিত বনভূমির বাহিরে গ্রামীণ এলাকায়, উপকূলবর্তী অঞ্চলে জাগিয়া উঠা নতুন চরভূমিতে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অশ্রেণীভূক্ত বৃক্ষহীন বনাঞ্চলে এবং সমগ্র বরেন্দ্র অঞ্চলসহ দেশের উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ;

(৩) গ্রামীণ এলাকায় ব্যাক্তি মালিকানাধীন পতিত ও প্রান্তিক ভূমিতে, পুকুর পাড়ে এবং গৃহাঙ্গণে বৃক্ষায়ন ও বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যক্তি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা এবং তাদের পতিত ও প্রান্তিক ভূমিতে এবং কৃষি খামারে কৃষিবন পদ্ধতির প্রচলনে কারিগরী ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান;

(৪) গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান সমূহ যথা ঃ ইউনিয়ন পরিষদ, স্কুল, ঈদগাহ, মসজিদ, মক্তব, মন্দির, ক্লাব, এতিমখানা, মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রাঙ্গণে এবং আশেপাশের খালি জাগগায় বৃক্ষায়ন কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ এবং কারিগরী ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান এবং

(৫) সরকারী মালিকানাধীন প্রান্তিক ভূমি যথাঃ সড়ক, রেলপথ, ও সকল প্রকারের বাঁধের উভয় পার্শ্বে, খাস পুকুরের চতুপার্শ্বে সরকারী উদ্যোগে এবং স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ও বেরসকারী সংস্থার অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ এবং দেশের বিভিন্ন উপযুক্ত স্থানে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে রাবার চাষ উৎসাহিত করা।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট তার প্রয়োগিক ও অভিযোজিত গবেষণার মাধ্যমে ৪৪টি বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে (বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৯)। তার মধ্যে অনেকগুলো হস্তান্তরযোগ্য তবে সে লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করা উচিত।

বাংলাদেশে পরিবেশ রক্ষার বাইরেও বনায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু বিষয় রয়েছে যা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। তার মধ্যে রয়েছে সুন্দরনের জীব-বৈচিত্র্য, ঔষধি বৃক্ষরাজি, উদ্ভিদ বৈচিত্র্য ও আগর তৈল/আতর উৎপাদন ইত্যাদি।

বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন (World Heritage Site)

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (ইউনেস্কো) গত ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির ২১তম অধিবেশনে সুন্দরবনকে হেরিটেজ সাইট বা বিশ্ব সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করেছে (শাহ-ই-আলম, ২০০২)। এই ঘোষণার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর ৭৯৮তম ঐতিহ্য স্থান হিসেবে সুন্দরবনের নাম অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

www.pathagar.com

ঔষধি বৃক্ষরাজির সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান

সরকার বর্তমানে ফলজ ও বনজ বৃক্ষের পাশাপাশি ঔষধি বৃক্ষের সম্প্রসারণে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে এবং ফলে গ্রাম বাংলার প্রচলিত চিকিৎসার কাজে যে সব উদ্ভিদ ব্যবহার হতো এবং যা এখন প্রায় বিলুপ্ত, সে সব প্রজাতি সংরণ করা যাবে। এ ছাড়াও বাংলাদেশের আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী চিকিৎসায় বিদেশ থেকে কাঁচামাল হিসেবে বিভিন্ন দ্রব্যাদি আমদানী করতে প্রতি বছর যে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় হয় তার সাশ্রয় হবে। বাংলাদেশ সরকারের ফরেস্ট্রি মাস্টার প্লান এর ননউড ফরেস্ট প্রোডাক্টস এর ১৯৯২ এর রিপোর্ট অনুসারে আমাদের দেশে প্রায় ৪০০টি বনৌষধি নির্ভর শিল্পগুলোতে সারা বাংলাদেশে মোট ৪২৩৪ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে (রুখসানা, ২০০২)।

পূর্ব ময়মনসিংহ তথা নেত্রকোণা অঞ্চল বন সম্পদে তেমন সমৃদ্ধ নয়। কেবল মাত্র দুর্গাপুর, কলমাকান্দা ও ধোবাউরা এলাকায় বন সম্পদ রয়েছে, অব্যবস্থাপনার ফলে তাও আজ বিপন্ন প্রায় ।

সারণী ৪.৪ ময়মনসিংহ বন বিভাগের অধীন নেত্রকোণার বনাঞ্চল সমূহের একটি উপজেলাওয়ারী বিবরণ ঃ

জেলা	উপজেলা / মোট বনভূমি	মৌজা	জমির পরিমান (একরে)	উপজেলা	মৌজা	জমির পরিমান (একরে)
নেত্রকোণা	ধোবাউড়া (৩৭.২২ একর)	গানই	৩৭.২২ একর			
	দুর্গাপুর (১৬০৬.৬০ একর)	উত্তর রাণীপুর	১৮.৪৪	দুর্গাপুর	গোবরচেনা	১.৭৮
		ভেদিকোরা	১৪০.২২		আড়াপাড়া	১০৪.১৫
		বাহেরাতলী	৬৯.৫১			
	কলমাকান্দা (৪২৫.১৪ একর)	লেঙ্গুরা চৈতান নগর	১০২.৯৬ ২৪৩.৩০	কলমাকান্দা	জগন্নাথপুর চেননি	২৪.৩৯ ৫৪.৩৯

উৎস : বন বিভাগ, ময়মনসিংহ

উত্তরের বণাঞ্চলের আর একটি মূল্যবান উদ্ভিদ হচেছ আগর। দুর্গাপুর অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে আগর পাওয়া যায় বলে এম.আর.চৌধুরী তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন। আগর একটি মূল্যবান কাঠ। এর সুগন্ধ কস্তুরীর সাথে তুলনীয়। এক টুকরা কাঠ জ্বালালে পুরো বাড়ীই সুগন্ধে ভরে উঠে। এই কাঠ থেকে তেল উৎপাদন করা যায় এবং এক ফোঁটা তেল এক বোতল নারিকেল তৈলকে সুগন্ধি করে তোলে। আগর গাছ দেখতে বেশ বড় হয়। এই কাঠ বেশ মূল্যবান। মাত্র এক সের কাঠ এক হাজার টাকার উর্ধে বিক্রয় হতো বলে

www.pathagar.com

জানা যায়। আগরের একটি ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে মনিসিংহ তাঁর জীবন সংগ্রামে লিখেছেন" সোমেশ্বর পাঠকের উত্তরাধিকারীদের প্রায় তিনশত বছর আগে উত্তরে প্রাগ্ জ্যোতিষপুর (আসাম) ও দক্ষিণে ঈশা খাঁর সঙ্গে বিবাদ বেঁধে যায়। এই দুই দিক থেকে চাপ সৃষ্টির ফলে, এই বংশের রাজা রঘু অন্য কোন উপায় না দেখে মানসিংহের মারফতে বাদশাহ আকবরের শরাণাপন্ন হন। বাদশাহকে উপঢৌকন দেবার জন্য সঙ্গে নেন সেই ঐন্দ্রজালিক সুগন্ধি কাঠ আগর। এই সুগন্ধি কাঠ হেরেমে যাওয়ার পর অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। আগরের গন্ধে সকলেই মাতোয়ারা হয়ে যান। বাদশাহ আকবর ও রাজা রঘুর মধ্যে এক চুক্তি হয়। রাজা প্রতি বছর আগর কাঠ পাঠাবেন, আর বাদশাহ আকবর সব আক্রমণ থেকে রাজা রঘুকে রক্ষা করবেন। রাজা রঘুকে পাঁচ হাজারী মসনদদারীর অধিকার দেওয়া হয়।"

পশু পাখি

বনভূমির সৌন্দর্য হচ্ছে বৃক্ষ ও পশু সম্পদ। ময়মনসিংহের বনাঞ্চলের সৌন্দর্য বর্ধন করে এক সময়ে সেখানে বিচরণ করতো বিচিত্র ধরণের পশু পক্ষী। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, বনজ বৃক্ষের ব্যাপক কর্তন ও পশু পক্ষীর নির্বিচার হত্যার ফলে এই বনাঞ্চল থেকে অনেক পশু পক্ষীই বর্তমানে নিশ্চিহ্ন। এই অঞ্চলের বাঘ কিংবা হাতীর কাহিনী এখন অনেকটা রূপকথার গল্পের মতো শোনায়।

ময়মনসিংহের বনাঞ্চলের পশু সম্পদের বর্ণনা দিতে গিয়ে কেদারনাথ মজুমদার লিখেছেন" হরিণ, বানর, উল্লুক, ভল্লুক, গয়াল, বাঘ প্রভৃতি সুসঙ্গ ও মধুপুরের গড়ে পাওয়া যায়। ছোট ছোট বাঘ ও বিষধর সর্পাদি প্রায় সর্বত্র অল্পাধিক পরিমানে দেখিতে পাওয়া যায়। মানিকজোড়, ময়ুর, ধনঞ্জয়, ভৃঙ্গরাজ, বনমোরগ, ময়না, টিয়া, তোতা প্রভৃতি যাবতীয় পক্ষীয় সুসঙ্গের পাহাড় এবং ভাওয়াল ও মধুপুরের জঙ্গলে পাওয়া যায়।" তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ আছে " বন্য মহিষ মধুপুরের জঙ্গলে পাওয়া যায়। বন্য হস্তী সুসঙ্গের পাহাড়ে পাওয়া যায়।" বর্তমানে ও শেরপুর এলাকায় বন্যহাতির উৎপাত থেকে রক্ষায় জন সমিতি গঠন করেছে।

ময়মনসিংহের বনাঞ্চল ছিল বাঘ আর চিতাবাঘ অধ্যুষিত। ১৮৬৮ সনের এক রিপোর্টে উল্লেখ আছে এ অঞ্চলে বাঘের সংখ্যা ছিল ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বেশী। এ অঞ্চলে চিতাবাঘও প্রচুর ছিল বলে উল্লেখ আছে। অনেক সময় বিশেষ করে বন্যা আর অনাবৃষ্টির সময়ে এরা গ্রামাঞ্চলে হানা দিয়ে কৃষকের গরু, ছাগল প্রভৃতির ক্ষতি সাধন করতো। মাঝে মাঝে এদের আক্রমনে মানুষের প্রাণ হানির কথাও শোনা যেত। বাঘের হাত থেকে কৃষক ও তার পশু সম্পদ রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতো পেশাদার শিকারীরা। এ সমস্ত শিকারীরা সে যুগে সাধারণের চোখে বীর হিসাবে চিহ্নিত হতো।

ময়মনসিংহ বন বিভাগের বিভিন্ন বছরের রিপোর্টে প্রায় প্রতি বছরই কিছু কিছু বাঘ শিকারের কথা উল্লেখ আছে। মাঝে মাঝে বাঘের আক্রমণে মানুষের প্রাণ-হানির উল্লেখও এই সমস্ত

www.pathagar.com

রিপোর্টে দেখা যায়। ১৯২৯-৩০ সনে দুইটি বাঘ শিকার করা হয়েছিল। বাঘের আক্রমনে এই বছর দুই জন মানুষের প্রাণহানি ঘটে। ১৯৩০-৩১ সনে ছয়টি বাঘ শিকার করা হয় এবং বাঘের আক্রমণে লোকের প্রাণ-হানি ঘটে। ১৯৩৩-৩৪ সনে ২টি বাঘ শিকার করা হয়। এই বছর বাঘের আক্রমণে কোন প্রাণ-হানির কথা শোনা যায়নি। ১৯৩৪-৩৫ সনে বাঘের আক্রমণে একজন লোকের প্রাণ-হানি ঘটে এবং ৩টি বাঘ শিকার করা হয়। ১৯৩৫-৩৬ সনে ৬টি বাঘ শিকার করা হয় এবং ৫ জন লোকের প্রাণ-হানি ঘটে। ১৯৩৬-৩৭ সনে একজন লোকের প্রাণ-হানি ঘটে, কিন্তু কোন বাঘ শিকারের কথা শোনা যায় নি। ১৯৩৭-৩৮ সনে একটি বাঘ শিকার করা হয় এবং কোন লোকক্ষয় হয়নি। ১৯৩৮-৩৯ সনে একজন চৌকিদার ও একটি বাঘের মৃত্যুর কথা জানা যায়। ১৯৩৯-৪০ সনে ৩টি বাঘ ও ২ জন গ্রামবাসী, ১৯৪০-৪১ সনে ৮টি বাঘ ও ১ জন গ্রামবাসী এবং ১৯৪২-৪৩ সনে ৪টি বাঘ ও ২ জন মানুষের প্রাণ-হানির কথা শুনা যায়। সরকার বাঘ শিকারে উৎসাহিত করতেন এবং মাঝে মাঝে পুরস্কারও ঘোষণা করতেন। জেমস টেলরের লেখা থেকে জানা যায়" এদের ধ্বংস করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে পুরস্কার ঘোষণা করা হতো। মোঘল আমলে বাঘ শিকারের জন্য জায়গীর বরাদ্দ করা হতো। এদের পীড়াপীড়ির ফলে ১৭৭১ সালে সরকার পুনরায় এ ব্যাপারে অনুমোদন দান করেন এবং জমিদারদের লোক সরবরাহের নির্দেশ দেন। ১৮০৪ সালে সরকারী পুরস্কারের জন্য মোট ২৭০টি বাঘের চামড়া শহরে আনা হয়েছিল। কিন্তু পুরস্কারের ধার্য অংক থেকে পাঁচ টাকা কমানোর ফলে এই সংখ্যা নেমে গিয়ে বছরে গড়ে ৩৫টিতে দাঁড়িয়েছিল। আর বিগত তেরো বছরে সামগ্রিকভাবে অনুধিক একশত বারোজন পুরস্কার গ্রহণ করেছে। এই অঞ্চলের শিকারীগণ বাঘ শিকারে সাধারণতঃ বিষ মাখানো তীর ব্যবহার করতো।"

কিছু দিন আগেও মধুপুর বনে প্রচুর চিতাবাঘ দেখা যেত। নরখাদক বাঘ শিকারের জন্য শিকারীকে পুরস্কৃত করা খুব বেশী দিন আগের কথা নয়। বর্তমানে এ অঞ্চলে কোন বাঘ আছে বলে জানা যায় না।

ময়মনসিংহ বনাঞ্চলে এক সময়ে প্রচুর হাতী ছিল। সুসঙ্গের জমিদারগণের আয়ের মুল উৎসই ছিল খেদা বা ফাঁদ তৈরী করে হাতী ধরা। গারো পাহাড়ে বন্য হাতী ছিল, আজও আছে। ঐ সময়ে হাতীর ছিল অভাবনীয় কদর। হাতী ছাড়া সামন্ত প্রথা ছিল অচল। তাছাড়া সভ্রান্ত বংশীয়দের হাতীই ছিল ঐশ্বর্যের মাপকাঠি। কাজেই সুসং রাজ গারো পাহাড় থেকে বন্য হাতী ধরতেন এবং ওগুলোকে পোষ মানিয়ে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা করতেন।"

উনিশ শতকের শেষ ভাগেও এ অঞ্চলে এরূপ খেদা তৈরী হতো। এ অঞ্চল থেকে হাতী রপ্তানীও হতো বলে জানা যায়। আসামের জঙ্গল থেকে হাতী ধরে এনে শ্রীবর্দি, তাঁতিহাটি, গেরামারা প্রভৃতি স্থানে পোষ মানানো হতো। সরকারী গজ বিভাগ এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো। বন বিভাগের ইউরোপীয় কর্মচারীরা এ সব পোষ মানানো হাতী এখানেই নিলামে বিক্রয় করতো। এর ক্রেতা ছিলেন স্থানীয় জমিদারেরা এবং বহিরাগত সওদাগরেরা।

www.pathagar.com

কালিকাকুড়ার সওদাগরেরা হাতীর ব্যবসা করতো। খেদায় দ্রুত হাতী বাইরেও রপ্তানী করা হতো বলে অনুমান করা হয়। কিছু কিছু উন্নত মানের হাতী ঢাকায় সরকারী পিলখানায় পাঠানো হতো। ১৮৭৯ সনে আইনের মাধ্যমে খেদা তৈরী নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এরপরও ১৮৮৭ সর পর্যন্ত সুসঙ্গের মহারাজা খেদা তৈরী করেছেন। ১৮৮৪ সনের ১৯মে সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগে সুসঙ্গের মহারাজার খেদা তৈরী বন্ধ করা হয়। এর পরও কিছু কিছু খেদা তৈরীর কথা জানা যায়। কেদারনাথ মজুমদার লিখেছেন" প্রায় ৪০/৫০ বৎসর হইল স্বর্গীয় ভোলানাথ চাকলাদার ভাওয়ালের জঙ্গলে একবার খেদা করিয়াছিলেন। সে খেদার চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান আছে।" বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে ১৯৬৭ সন পর্যন্ত খেদা তৈরী হতো তবে ১৯৬৭ সনে খেদা তৈরীর ব্যাপারে কড়াকড়ি করায় আর খেদা তৈরীর কথা শুনা যায়নি।

ময়মনসিংহ বন বিভাগ দশটি রেঞ্জ সমন্বয়ে গঠিত। এর অধীনে রয়েছে ২৭টি বিট। ময়মনসিংহ বন বিভাগের অধীনস্থ নেত্রকোণার রেঞ্জ, বিট এবং জমির পরিমান নিম্নরূপঃ

রেঞ্জ	বিট	জমির পরিমান (একর)
দুর্গাপুর	ক) দুর্গাপুর	৭৪১.০৬
	খ) গোপালপুর	১৭৫৯.৫১
	গ) বিজয়পুর	৩৫২.৭৩
	ঘ) ভেদিকুড়া	২৪৫.১৮
	ঙ) লেঙ্গুরা	৮৫৭.৭৬

ময়মনসিংহে বন ব্যবস্থাপনা আইন

ময়মনসিংহ অঞ্চলে বনজ সম্পদ পরিবহন নিয়ন্ত্রণের জন্য" ময়মনসিংহ ফরেষ্ট ট্রানজিট রুল, ১৯৫৯" এর অধীন কতিপয় সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। এই আইন ময়মনসিংহ জেলার সীমার মধ্যেও যে কোন বনজ দ্রব্য পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই আইন অনুসারে নির্ধারিত মুল্যে কোন বনজ দ্রব্য ক্রয়ের পর বন বিভাগ থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে ময়মনসিংহ জেলার সীমার মধ্যে বনজ দ্রব্য পরিবহনযোগ্য। এই আইনে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে তারাপুর, তাজপুর, মুক্তাগাছা, বাইথামারী এবং গোলাবাড়িতে চেক ষ্টেশন স্থাপন করে কাগজপত্র পরীক্ষা করার ব্যবস্থা রয়েছে। এই আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ছয় মাসের জেল অথবা পাঁচশত টাকা জরিমানা অথবা উভয়ই প্রয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য ১৯৭৩ সনে জাতীয় সংসদ" বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭৩" নামে একটি আইন প্রণয়ন করে। এই আইনে আটচল্লিশটি বিধি, উনপঞ্চাশটি ধারা এবং বহু উপধারা রয়েছে। এই আইন কতিপয় বন্যপ্রাণী শিকার করা বা আহত করা নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছে। এই আইনে উল্লেখ আছে, সরকার ইচ্ছে করলে যে

www.pathagar.com

কোন সরকারী বা বেসরকারী এলাকাকে বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য, জাতীয় পার্ক ও শিকার যোগ্য প্রাণী সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করতে পারবেন। বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতায় 'বাংলাদেশ বন্য প্রাণী উপদেষ্টা পরিষদ' গঠনের বিধান রয়েছে। এই আইনে তিনটি তপসিলে বিভিন্ন বন্য প্রাণীর নাম উল্লেখ করে কোনটিকে হত্যা করা যাবে না, তার সুনির্দিষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

প্রথম তপছিলে প্রথম খন্ডে কিছু কিছু বাংলাদেশী সরীসৃপ, পাখী এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর তালিকা রয়েছে সেগুলো শিকারযোগ্য। তবে এ জন্যে গেম হান্টিং লাইসেন্সের প্রয়োজন হবে।

প্রথম তপসিলে দ্বিতীয় খন্ডে উল্লেখ আছে, কোন এলাকায়, যদি দেখা যায়, স্তন্যপায়ী, পাখী বা সরীসৃপ সংখ্যায় এমনভাবে বেড়েছে যে, তা জনজীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ (মানুষ খেকো বাঘ, পাগলা হাতি), তাহলে চীফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেনের অনুমোদনক্রমে সে সব প্রাণী বধ করা যাবে। তবে কোন মৌসুমে কোন এলাকায় তা মারা যাবে, ওয়ার্ডেন তা নির্দিষ্ট করে দিবেন।

দ্বিতীয় তপসিলে উল্লেখ আছে কতকগুলো প্রাণীর ট্রফি বা মাংস যার অধীনে থাকবে, যে বহন করবে বা আমদানী করবে তার বৈধ সার্টিফিকেট লাগবে। সার্টিফিকেট লাগবে এমন জিনিস ও প্রাণীর মধ্যে রয়েছেঃ

(১) যে কোন জীবন্ত সংরক্ষিত প্রাণী বা গেম এনিম্যাল।
(২) সংরক্ষিত প্রাণী থেকে উদ্ভূত কোন ট্রফি বা মাংস।
(৩) হরিণ, সম্বর বাইসন, গয়াল, গৌর এবং হাতির গজদন্ত ও শিং।
(৪) ভল্লুক, উদবিড়াল, বাঘ, চিতাবাঘ, বন বিড়াল, গুইসাপ, হরিণ, সম্বর, বনরুই, কুমীর ও অজগরের চামড়া।

চিত্র ৪.২ : বন্যপ্রাণী ও চামড়ার ব্যবসা

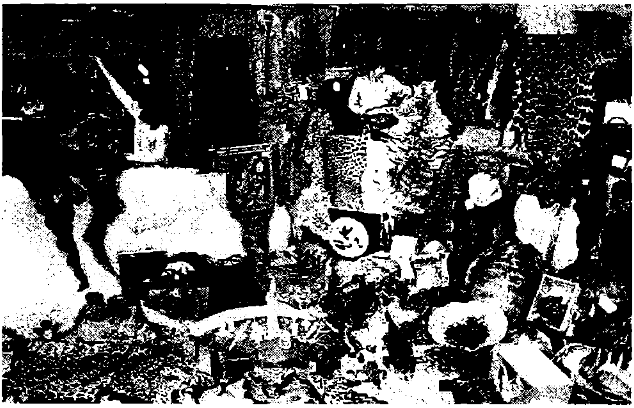

উৎস ঃ Miller, 1993

তৃতীয় তপসিলে বাইশ প্রজাতির সরীসৃপ, চারশ সাতাশি প্রজাতির পাখী ও উনসত্তর প্রজাতির স্তন্যপায় প্রাণীর নাম উল্লেখ করা আছে। এদের সংরক্ষণ যোগ্য প্রাণী বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এ ছাড়া উল্লেখ আছে সরীসৃপ, পাখী স্তন্যপায়ী গেম এনিমেলের গর্ভিনী, শাবককে স্তন্যদানরত বা খাবার পরিবেশনরত স্ত্রী-প্রাণী, শাবকসহ স্ত্রী প্রাণী প্রভৃতি মারা ও ধরা যাবে না। বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের জন্য বন বিভাগের অধীনে বন্য প্রাণী সার্কেল গঠন করা হয়েছে। টেক্সই ব্যবস্থাপনা অভাবেই আমাদের বন সম্পদ এবং বন্যপ্রানী অবস্থা আজ বিপন্ন প্রায় ।

সর্বোপরি, বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ অতি অল্প (১৭.৫%) এবং উদ্ভিদ আচ্ছাদিত হলো মাত্র ৪.৩% তা আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে এবং জীব-বৈচিত্র্যের বিলোপ ঘটছে। বনভূমির পরিমাণ হ্রাসের গতি রোধ করতে এবং নতুন করে বনায়নের লক্ষ্যে ২০ বছর মেয়াদী (১৯৯৫-২০১৫) বন মহা-পরিকল্পনা গ্রহণ এবং ১৯৯৪ সালের বন নীতির ঘোষণায় গৃহীত পরিকল্পনা কালেই দেশের মাটি মোট আয়তনের শতকরা ২০ ভাগ বনায়নের লক্ষ্যে নির্ধারিত করা হয়েছে। (Ministry of Environment and Forest, ১৯৯৫)। মহা-পরিকল্পনায় সামাজিক বনায়নকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, যেখানে অংশীদারসহ সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত ও জোরদার করার সুপারিশ রয়েছে। বর্তমানে মাঠ পর্যয়ে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ আশানুরূপ সফলতা অর্জনে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে।

বন উন্নয়ন কর্মসূচীকে সফল করতে ও জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে অধিদপ্তরকে আরও আস্থাভাজন ও সচেষ্ট হবার প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পগুলো প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় বাসিন্দাদের মতামত গ্রহণ অত্যাবশ্যক। স্থানীয় সরকার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশগ্রহণ নতুন বনায়ন, অবৈধ বৃক্ষ কাটা এবং দুর্নীতি রোধ করতে সহায়ক হতে পারে। এজন্যে প্রচলিত বন আইনের যথোপযুক্ত সংশোধন এবং যথাযথ প্রয়োগের দরকার ।

গৃহপালিত পশু

মানব সভ্যতার এক পর্যায়ে পশুকে পোষ মানিয়ে মানুষের কাজে লাগানো হয়েছে। পশুকে পোষ মানানোর ব্যাপারটি খুবই পুরানো। কখন থেকে তা শুরু হয়েছে, সে কথা স্থির করে বলা যাবে না। পশু পালনের শুরু নিশ্চয়ই যাযাবরবৃত্তির পরের ঘটনা নয়। ব্যাপকভাবে কৃষি কাজ ও অর্থনীতিতে যুক্ত গৃহ-পালিত পশুর মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ঘোড়া, ভেড়া ইত্যাদি প্রধান। এক সময় হাতীও গৃহপালিত পশু হিসেবে গন্য হতো। আমাদের কৃষি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় গরু,মহিষ, ছাগল ও ভেড়া বিদ্যমান ছিল।

মধ্যযুগে এই অঞ্চলে যে শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল তাতে রাষ্ট্রীয়ভাবে পশু সম্পদ উন্নয়নের বিদুমাত্র প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। তবে সামন্ত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঘোড়া ও হাতীর যথেষ্ট কদর ছিল। যুদ্ধ, ভ্রমণ, শিকার ও পরিবহনের জন্য সেকালে স্থানীয় জমিদার হতে শুরু করে সম্রাট পর্যন্ত শাসন ক্ষমতার প্রতিটি স্তরে এ দুটি প্রাণীর উপর নির্ভরশীলতা ছিল। সম্ভবতঃ

www.pathagar.com

সে কারণেই মধ্যযুগে এ অঞ্চলে হাতী ও ঘোড়ার সংখ্যা ছিল প্রচুর। বৃহত্তর ময়মনসিংহের কোথাও চারণভূমির অভাব ছিল না। কৃষকরাও চাষাবাদের জন্য যেমন গরু-মহিষ প্রতিপালন করতো, তেমনি দুধ ও মাংসের জন্য ছাগল-ভেড়াও পালন করতো। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত ময়মনসিংহের ডিষ্ট্রিক্ট গেজেট অনুসারে দেখা যায় যে, সে সময় প্রায় ২০ লক্ষ গরু এবং ৫০ হাজার মহিষ ছিল। ১৯৪০ সালে এবং ১৯৬০ সালের এসব প্রাণীর একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

পশু	১৯৪০ সাল	১৯৬০ সাল
গাভী	১২,৮৫,২২১টি	৮.২০.৫৯০টি
বলদ	১১,৯৬,৩০১টি	৯,০৫,০১০টি
মহিষ	৬৮,৯৬০টি	৩৬,৪২০টি
ঘোড়া	১৬,৫২০টি	১১,৫৯০টি

১৯৪০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বৃহত্তর ময়মনসিংহে ছাগল ৬,২৫,৭৬৯টি, ভেড়া-৩৭,৭১৩টি এবং শুকর ৩,১২৮টি। ১৯৬০ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় এই এলাকার মোট গবাদি পশুর সংখ্যা ২৯,৫৯, ৬২০টি, এবং মহিষের সংখ্যা ৫২,১৬০টি। প্রজননের জন্য ব্যবহারযোগ্য ষাঁড়ের সংখ্যা ২৭, ৫১০ এবং বাছুরের সংখ্যা ৮, ৯৬,০২০টি; তন্মধ্যে গো-বাছুর ৮.৮৭,২৯০ এবং মহিষ-বাছুর ৮,৭০০টি ছিল। ১৯১৭ সালের তুলনায় এই সময়ে গবাদি পশু বৃদ্ধির হার ৪৫% ভাগ; তন্মধ্যে মহিষের বৃদ্ধির হার মাত্র ৪%।

নির্বাচিত গৃহপালিত পশুর সংখ্যা-১৯৭৭

	মহিষ		ছাগল		ভেড়া	
এলাকা	পালনগৃহ	মহিষের সংখ্যা	পালনগৃহ	ছাগল সংখ্যা	পালনগৃহ	ভেড়া সংখ্যা
নেত্রকোনা	১.০০৪	২.৪৭২	৩৬,০৯৭	৮৫,৮২১	৭২২	২,৭৩২

গবাদি পশু পালন গৃহ এবং গৃহ প্রতি পশুর সংখ্যা ১৯৭৭

এলাকা	মোট গৃহ	১ পশু গৃহ	২ পশু গৃহ	৩ পশু গৃহ	৫-৭ পশুগৃহ	১০-১৭ পশু গৃহ	২০ বা তদূর্ধ
নেত্রকোণা	১.০০৪	১১৭	৬৯২	১১৯	৬৫	১১	-

নেত্রকোণার পূর্বাঞ্চলে বিশাল প্রান্তসমূহে গো-মহিষ চরানো হয়। এই প্রান্তর ও পশু পালন উভয়কেই বাথান বলা হয়। মুলতঃ ঐ সব নীচু এবং বিল এলাকায় ভাল ঘাস জন্মে এবং মহিষগুলো পর্যাপ্ত খাবার পেয়ে থাকে। মহিষ কদাচিৎ হিংস্র হয় এবং আকারে গরুর চেয়ে সামান্য বড় হয়। অধুনা চাষাবাসের কাজে মহিষের ব্যবহার খুবই কম। এক্ষেত্রে গরুর ব্যবহার বেশী। একজোড়া বলদ একদিনে বড়জোড় এক বিঘা জমি চাষ করতে পারে।

গৃহ পালিত পশুর মধ্যে গরুর ন্যায় উপকারী আর কোনটি নয়। মাতৃদুগ্ধে একমাত্র সন্তান প্রতিপালিত হয়, কিন্তু গো-দুগ্ধে আবাল-বৃদ্ধ-বর্ণিতা সক্ষমভাবে প্রতিপালিত হয়। তাই হিন্দুগণ গাভীকে মাতৃ সম্বোধন করে থাকে। এমনকি হিন্দু শাস্ত্রে গো-জাতিকে ভগবতীস্বরূপ

www.pathagar.com

বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দুধ সরবরাহের জন্য প্রায় গৃহস্থ বাড়ীতে গো-পালন করা হয়। গাভীর দুধ বৃদ্ধির জন্য স্থানীয়ভাবে কতগুলো পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। গাভীকে প্রসবের পনর দিন পর নালি ও চাল একত্রে সিদ্ধ করে খাওয়ানো হয় এবং ৮/১০ দিন সামান্য পরিমাণ (১/১৬) তোলা) তেঁতলের আটা খাওয়ানো হয়। কাঁচা ঘাস, খেসারী ডাল, সিদ্ধ মাসকালাই, ভাতের মাড়, নালি গুড়, পিপলী চূর্ণ এবং বাঁশ পাতা সিদ্ধ করা পানি ইত্যাদি গাভীকে খেতে দেওয়া হয়। গরু মহিষের নানা প্রকার রোগ হয়। ফোলা, পেটের পীড়া (পেট-ফাঁপা, পেট কামড়ানী; উদরাময়), গুটি, বাটে ঘা, নাম্বে (গরুর গায়ে ঘাসহ পোকা হওয়া) কৃমি, জিহ্বায় ঘা, ক্ষুন্ত ইত্যাদি রোগ সাধারণতঃ হয়ে থাকে। কৃষকেরা বংশানুক্রমে গ্রাম্য টোটকা চিকিৎসা করে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসব চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকলেও অধিকাংশই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চলে বছরের বিশেষ সময়ে যশোহরের গোয়ালাদের দেখা যেতো। এরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে গরুর চিকিৎসা করতো। বিশেষতঃ 'গরু দাগানো' তাদের প্রধান চিকিৎসা পদ্ধতি। অধুনা প্রত্যেক জেলা সদরে পশু হাসপাতাল এবং উপজেলা গুলোতে সরকারী পশু চিকিৎসক আছে। পশু চিকিৎসা কিছু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পেয়েছে।

ময়মনসিংহের পশুদুগ্ধ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। গড় বার্ষিক সরবরাহ মাথা প্রতি ২৫ সের। শহর অঞ্চলে ১৯৬০ সালে দুধ সরবরাহের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ-

বাজার	জনসংখ্যা	সরবরাহকৃত দুধ (মণে)
নেত্রকোণা	১৭০০৮	৫,০০০

হাঁসমুরগীর পরিসংখ্যান - ১৯৭৭

এলাকা	হাঁস		মোরগ-মুরগী	
	পালকগৃহ	সংখ্যা	পালকগৃহ	সংখ্যা
নেত্রকোণা	৬২,০৬৮	২,৮১,২১৯	৯৯,২৫৪	৬,৭৫,৭৭৫

মৎস্য সম্পদ

জোলা মানে তাঁতে
বাঙ্গালী কাঙ্গালী মানে মাছে আর ভাতে ।।

নেত্রকোণা অঞ্চলে মাছ ছাড়া বাঙ্গালীর জীবন ভাবা যায় না। পঞ্চাশ বছর বা তারও আগে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বাঙ্গালীর খাদ্য বিষয়ক গ্রন্থে লিখেছিলেন, বাঙ্গালীরা চিরকালই মাছ-মাংসভোজী। আমাদের এই ময়মনসিংহের সন্তান ডঃ নিহাররঞ্জন রায় তাঁর সুবিশাল বাঙ্গালীর ইতিহাস-এ লিখেছেন, " নদ-নদী খালবিল বহুল প্রশান্ত সভ্যতা প্রভাবিত এবং আদি অষ্ট্রেলীয় মুল বাংলার মৎস্য অন্যতম প্রধান খাদ্যবস্তু হিসাবে পরিগণিত হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। বাংলাদেশের এই মৎস্য প্রীতি আর্য সভ্যতা কোন দিন প্রীতির চক্ষে

দেখিত না মাংসের প্রতিও এই বিরাগ বাঙ্গালীর কোনদিনই ছিল না। ..... বাংলার অন্যতম প্রথম ও প্রধান স্মৃতিকার ভট্ট বাসুদেব সুদীর্ঘ যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত করিয়া বাঙ্গালীর এই অভ্যাস সমর্থন করিয়াছিলেন। বস্তুত মাংস বা মৎস্য আহার বাংলাদেশে এত সুপ্রচলিত ও গভীরাব্যস্ত যে, এই সমর্থন ছাড়া ভট্টদেবের কোন উপায় ছিল না।"

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ঐ বইয়ে আরও লিখেছেন, " বাঙ্গালীর মৎস্যপ্রীতির পরিচয় পাহাড়পুর এবং ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলিতে কিছু কিছু পাওয়া যায়। মাছ কুটা এবং ঝুরিতে ভরিয়া মাছ হাটে লইয়া যাওয়ার দুটি অতি বাস্তব চিত্র কয়েকটি ফলকে উৎকীর্ণ।" বৃহত্তর ময়মনসিংহের জীবন-জীবিকায় মৎস্য আহরণ, বিপণন এবং সর্বোপরি পরিমান মত মসলাপাতি দিয়ে রেঁধে স্বাভাবিক স্বাদ-গন্ধ-রসকে আরও বাড়িয়ে পাতে পরিবেশন পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক কর্মকান্ড জড়িয়ে আছে। মাছ খাওয়ার জন্য মাছ রান্নার কায়দার রকমারিত্বের শেষ নেই। সুখের বিষয় দাদী-নানী মা- খালাদের কাছ থেকে শেখা এই সব রান্না প্রণালী এখনও বর্ষীয়ান মহিলাদের বদৌলতে টিকে আছে। তবে আর কতদিন এসব রান্না টিকে থাকবে বলা মুশকিল। আমাদের দেশে মেয়েরা মাছ রাঁধেন পুড়িয়ে, সেঁকে, ভেজে, ভাপে সিদ্ধ করে ঝাল, ঝোল, টক আর অজস্র রকম সাধারণ আর পেশাকি তরকারী করেন যার ফিরিস্তি দিতে গেলে পাতার পর পাতা ভরে যাবে।

পূর্ব ময়মনসিংহের জন জীবনের সাথে মৎস্য প্রসঙ্গ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ছড়া, প্রবাদ, লোক সাহিত্য এমন কি আধুনিক সাহিত্যেও মাছের উপস্থিতি সদর্পে। যেমন একটি বহু প্রচলিত ছড়া

খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কুলে
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে মাছ নিয়ে গেল চিলে।

ছড়ার পর প্রবাদের কথায় আসা যাক। প্রবাদ-প্রবচনগুলো হলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙ্গালীর গ্রাম জীবনের সুখ দুঃখ, দৈনন্দিন সাংসারিক খুটিনাটি ঘরকন্না সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতালদ্ধ জ্ঞানের সারাৎসার। মানব চরিত্রকে ব্যঙ্গরস দিয়ে এমন অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন বিশ্লেষণ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া ভার। যেমনঃ মাছ মরেছে বেড়াল কাঁদে, গভীর পানির মাছ, মাছের তেলে মাছ ভাজা, মাছকে সাঁতার শেখানো, ধরি মাছ না ছুঁই পানি, মাছ খায় না মাছের ঝোল খায়, চ্যাপার নৌকায় বিড়াল চৌকিদার ইত্যাদি।

এরপর বাংলা সাহিত্যে মাছের কথা। প্রাক বাংলা অপভ্রংশ ভাষায় রচিত প্রাকৃত পৈঙ্গলের একটি পদ একাই এক শ'।

ওগগর ভত্তা রন্‌ভঅ পত্তা, গাইক খিত্তা দুদ্ধ সযুত্তা ।
মৌলি মৃছা নালিচ গৃছা দিজ্জই কন্তা খাই পুনবন্তা ।।

www.pathagar.com

অর্থাৎ রোজ কলাপাতে গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল, আর পাটশাক যার স্ত্রী পরিবেশন করে, সেই তো পুণ্যবান।' এরপরও বাংলা সাহিত্য থেকে মাছ প্রসঙ্গের হাজারটা উদাহরণ দেওয়া যায়।

সুদুর অতীত থেকে ময়মনসিংহে অজস্র মাছ পাওয়া যেতো। ময়মনসিংহ জলাশয়ে যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি সমৃদ্ধ মৎস্য সম্পদে ও। তাই এই অঞ্চলে অধিবাসীগণ নানা ধরণের মাছ নানা উপায়ে খেয়ে থাকে। ছোট ' কেচকি মাছ' হতে শুরু করে বিশাল রুই, কাতলা, বোয়াল চিতল ইত্যাদি মহার্ঘ মৎস্য পর্যন্ত এখানকার মানুষের খুবই প্রিয়। মহাশোল মাছ ময়মনসিংহের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী মাছ। এক সময় কংস সুমেশ্বরীতে এই মাছের প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু এখন আর আগের মতো পাওয়া যায় না।

ময়মনসিংহে প্রচুর ' পুঁটি মাছ' পাওয়া যায়। তাৎক্ষনিক চাহিদা পুরণ করেও অনেক মাছ বাড়তি হয়। কাজেই সেগুলো সংরণ করতে হয়। 'সুটকি' আর 'চ্যাপা' এ দু পদ্ধতিতে পুঁটি মাছ সংরক্ষণ করা হয়।

ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চলে প্রচুর মাছ ধরা পড়ে। একে ভাটি এলাকা বলা হয়। এখানকার অনেক গ্রামেই স্থায়ীভাবে মাছ ধরার ব্যবস্থা রয়েছে। বিল বা জলার তীরে জেলেরা সারি বেঁধে কুটির তৈরী করে তাদের পরিবারবর্গ থাকার জন্য। এগুলোকে 'খোলা' বলে। মাছের মৌসুমে এই খোলাগুলো মাছ ধরার পশ্চাদভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জেলেরা নৌকার সারি বেঁধে মাছ ধরে এবং বাজারে বিপণনের জন্য সেসব খোলায় নিয়ে মাছ জমায়।

অতিরিক্ত মাছ ধরা পড়লে বাজারে চাহিদা পড়ে যায়। তখন অবিক্রিত তাজা মাছ কেটে রোদে শুকানো হয়। বাঁশের মাচা তৈরী করে কাক চিল থেকে নিরাপদে রাখার জন্য জাল দিয়ে ঢেকে রোদে দেয়া হয়। এই অঞ্চলে মাছ সংরক্ষণের জন্য এখনও কোন আধুনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি। সাবেকি 'শুঁটকী' করার পদ্ধতি এখনও এখানকার মাছ সংরক্ষণের একমাত্র ব্যবস্থা। আজমিরীগঞ্জ হচ্ছে শুঁটকী মাছের বিখ্যাত বাজার। কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী; ঢাকা ও রংপুরে ময়মনসিংহের শুঁটকি মাছের প্রচুর চাহিদা। পাবদা মাছের শুঁটকী খুবই ভাল। রুহিত, পুঁটি, ইলিশ ইত্যাদি শুঁটকী খুবই চড়াদামে বিক্রয় হয়। ময়মনসিংহ থেকে বছরে প্রায় ৫ লাখ টাকার শুঁটকী মাছ দেশের অন্যান্য এলাকায় রপ্তানী হয়। তথাপি জেলে সম্প্রদায় খুবই দরিদ্র। তবে তাদের মধ্যে মাতব্বর গোছের লোকেরা বিভিন্ন প্রকারে জলধার ইজারা পায় এবং তারা আর্থিকভাবে যথেষ্ট মুনাফা করে থাকে।

শহরে সৌখিন মৎস্য শিকারীরা সাধারণতঃ বড়শী দিয়ে মাছ ধরে। তবে আজকাল শুধু বড়শী, টোপ ও ছিপ দিয়ে মাছ ধরা যায়না, জানতে হয় মাছ ধরবার কায়দা কানুন, টোপ

www.pathagar.com

বানাবার প্রক্রিয়া, চার বানাবার রীতিনীতি। সেই ভাল মৎস্য শিকারী যে মাছের লাফ দেওয়ার ধরন দেখেই মাছ চিনতে পারে। যেমন একজন ভাল মৎস্য শিকারী জানেন যে রুই মাছ পানির সঙ্গে ৪০ ডিগ্রী কোণ করে চলে আর লেজে ঝাপটা দেয়। তারা এও জানেন মৃগেল পানি তলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলে আর পাঁকে বুজকরি দিয়ে চলে। কাতলার স্বভাব মুখ দিয়ে ডিগবাজী দেওয়া। মাছ শিকারীদের কাছে রুই কাতলা আর মৃগেল এর কদর বেশী। তবে বিদেশে মহাশোল ও অন্যান্য কার্প মাছের কদর খুবই বেশী। চার বা টোপ তৈরী করা এক বিচিত্র ব্যাপার। প্রত্যেক মাছ-শিকারী তার নিজস্ব টোপ তৈরী করে এক নিজস্ব প্রক্রিয়ায়। এই প্রক্রিয়া সে অন্য কারো কাছে বলতে চায় না। তবে সকলেই রুই, কাতলা, মৃগেল ধরতে পাউরুটি, ছাতু, হাঁড়িয়া এবং সময়ে সময়ে তার সঙ্গে মদও ব্যবহার করে। মজার কথা হল স্থানকাল পাত্রভেদে মাছের টোপও যায় পাল্টে।

'গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ'- এর কথা ভেবে কেউ কেউ দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। ওরকম কল্পনার মাছ কোনো কালেই এদেশে ছিলনা। এখন মাছের ঘাটতি অনেক বেড়েছে। আমাদের আমিষ খাদ্য বলতে তো একমাত্র মাছ। কিন্তু আজ মাছের বাজারে আগুন। একালে মানুষ বুঝতে শিখেছে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হলে চলবে না। ব্রিটিশ আমল হতে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। দেশ বিভাগের পর থেকে থানায় থানায় মৎস্য কর্মকর্তা নিয়োগ এবং বিভিন্ন স্থানে মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার প্রত্যেক উপজেলায় মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠা করেছে।

ময়মনসিংহের মাসকান্দা, চর রঘুরামপুর, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, মেলান্দহ, নান্দাইল, দুর্গাপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, ফুলপুর, টাঙ্গাইল, হেমনগরে মৎস্য খামার আছে। প্রতিটি খামারে গড়ে প্রায় ৫ একর জমি আছে। প্রতি খামারের বার্ষিক আয় প্রায় ৩ লাখ টাকা। এসব খামার হতে চাষীদের কাছে নানা আকারের পোনা বিক্রি করা হয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের শোচনীয় অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়েছে এমন বলা মুস্কিল। বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ডানিডা প্রকল্পের সহায়তার সত্তর দশকের শেষার্ধে অ্যাকুয়া কালচার এক্সপেরিমেন্টাল ষ্টেশন গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে এই ষ্টেশনকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হয়েছে স্বাদু পানির মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র ও মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের তত্ত্বাবধানে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু গবেষণা তৎপরতা চালু আছে। এগুলোর সম্ভাবনা আশাব্যঞ্জক। পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের উজানে আজকাল শুষ্ক মৌসুমে বাঁধ দিয়ে বোরো চাষ হয়। বর্ষার প্রাক্কালে সে বাঁধ ভেঙ্গে ফেলা হয় না। ফলে নদী মরে যাচ্ছে। অসংখ্য জলাশয় চাষের জমিতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। বিল ঝিল ভরাট করে চাষের অধীনে আনা হচ্ছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ

নদী বহুল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। এদেশের প্রধান খাদ্য ভাতের পরই মৎস্যের স্থান। দেশের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রণীজ আমিষের শতকরা ৬০ ভাগের উৎস মৎস্য। মোট জাতীয় আয়ের ৫.২৩ শতাংশ মৎস্যের অবদান যা পশু সম্পদের প্রায় দ্বিগুণ। রফতানির ক্ষেত্রেও মৎস্য গুরূত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। মোট রফতানির ৫.২ শতাংশ মৎস্যের। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে ৪৭,৩৭১ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রফতানি করে ১৯৪১.৫৯ কোটি টাকা আয় করেছে (অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০০৪)। তাছাড়া মৎস্যখাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে। সারাদেশে মৎস্য চাষ ও আহরণে নিয়োজিত রয়েছে প্রায় ১.২ কোটি লোক (আহমেদ, ২০০৩)। তার মধ্যে, সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিতদের সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ এবং বাকী এক কোটি আংশিক ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত। মৎস্য ব্যবসা, মৎস্য যন্ত্রপাতি তৈরী, খাদ্য তৈরী, হ্যাচারি পরিচালনা এবং উপকূলে চিংড়ি পোনা সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকান্ডে অনেক লোক জড়িত। এক হিসেবে সারাদেশে বর্তমানে ২০ লক্ষ মৎস্য চাষী এবং ১০ লক্ষ চিংড়ি চাষী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছ চাষ করছে (ইসলাম, ২০০৩ ও কাশেম, ২০০৫)।

বিগত দশকে মৎস্যের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা সাত এর উপর, তবে শেষার্ধের দু'বছর কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। প্রবৃদ্ধির হার সন্তোষজনক মনে হলেও ধারণা করা হয় যে, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি আরও দ্রুততর করা সম্ভব। বর্তমানে প্রবৃদ্ধির হার দ্রুত হলেও মাথাপিছু মাছের ভোগের পরিমাণ খুব একটা বাড়েনি বরং কমেছে। ২০০০ সালে মাথাপিছু দৈনিক ভোগের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৮.৪ গ্রাম, যা ১৯৯৫/৯৬ সালের তুলনায় মৎস্য উৎপাদন প্রায় শতকরা ৪২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু বিবিএস প্রকাশিত পুষ্টি জরিপে দেখা যায় মাছের ভোগের পরিমাণ কমছে।

বিষয়টি নিয়ে বিশদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বাংলাদেশে মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন কমেছে উল্লেখযোগ্যভাবে, তবে বিগত এক দশক এর অংশ ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়ে ২০০০/০২ সালে মোট উৎপাদনের ৩৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যেখানে ১৯৯২/৯৩ সালে ছিল প্রায় ৫৩ শতাংশ। মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদন এত দ্রুত গতিতে হ্রাসের কারণ কি এবং তা প্রতিরোধে কি কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি? নেয়া হয়ে থাকলে এর ফলাফল কি দাড়িয়েছে? এসব বিষয়ে তেমন কোন গবেষণা ও বিশ্লেষণ নেই। তদুপরি দেশে মৎস্য উৎপাদনে হ্রাস ও বৃদ্ধি নিয়ে সরকারী নীতিমালার কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে তার ধরন ও কারন কি তা নিয়েও কোন সুনির্দিষ্ট সমীক্ষা রিপোর্ট নেই। আপাত দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে খাদ্যোৎপাদনের প্রয়োজনে দেশের জলাভূমিগুলি কৃষি খামারে পরিণত করা হচ্ছে এবং নদী নালা খাল বিল ভরাট হয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য করপোরেশন দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ ভুমিকা রাখছে। এ দুয়ের মধ্যে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা সারা দেশ জুড়েই রয়েছে, যারা নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং মৎস্য চাষীদেরকে এ সবের সঠিক প্রয়োগে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে। তাদের সাথে রয়েছে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট। এ ইনস্টিটিউট মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন প্রযুক্তি এবং উন্নততর ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবনে সচেষ্ট। বর্তমানে এসব সংস্থার অগ্রগতি কতটুকু এবং তা আগামীতে আরও বৃদ্ধির সুযোগ থাকলেও কিভাবে তা অর্জন করা সম্ভব সে বিষয়ে সকলকে অধিক সচেতন ও সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে করপোরেশনের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যাবলীর মধ্যে মৎস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে তারা কতটুকু সফলতা অর্জন করেছে এবং তাদের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে আর্থিক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক কোন সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে কিনা, তা নিয়েও ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে ।

বিগত দশকে মৎস্য উৎপাদনে বিভিন্ন উৎসের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি কতটুকু এবং মৎস্য উৎপাদনের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে ড. কাশেমের গবেষণায় দেখা যায় প্রতি বছর দুধ, ডিম ও মাছের মাথাপিছু দৈনিক ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যাপক হারে। এ পর্যায়ে মৎস্য উৎপাদন পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

সারণী ৪.৫: নির্ধারিত কয়েকটি বছর দুধ, ডিম ও মাছের মাথাপিছু দৈনিক ভোগের পরিমাণ

বছর	দুধ		ডিম		মাছ		মাংস		চিনি/গুড়	
	জাতীয়	গ্রামে	জাতীয়	গ্রামে	জাতীয়	গ্রামে	জাতীয়	গ্রামে	জাতীয়	গ্রামে
২০০০	২৯.৭	২৯.০	৫.৩	৪.৬	৩৮.৪	৩৭.৮	১৩.৩	১০.৮	৬.৮	৬.৪
১৯৯৫/৯৬	৩২.৩	৩০.৩	৩.২	২.৬	৪৩.৮	৪২.২	১১.৬	৯.১	৯.২	৯.১
১৯৯১/৯২	১৯.১	১৮.৫	৪.৭	৪.৬	৩৪.৫	৩২.৫	৮.১	৭.২	৮.৮	৮.৫

উৎস: বিবিএস, ২০০১ ও ড. কাশেম, ২০০৫

মৎস্য উৎপাদনের উৎস

বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদনের দুটো প্রধান উৎস হলোঃ (১) আভ্যন্তরীণ জলাশয় এবং (২) সামুদ্রিক জলাশয়। আভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আবার দুটো ভাগঃ (ক) মুক্ত জলাশয় এবং (খ) বদ্ধ জলাশয়। সামুদ্রিক উৎসেও দুটো ভাগ রয়েছে, যথা (ক) বাণিজ্যিক বা ট্রলারের মাধ্যমে আহরণ এবং (খ) ক্ষুদ্র আহরণ যা নৌকাকে অবলম্বন করে ধৃত। দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ বর্তমানে ১৯ লক্ষ টন, যা ১৯৯২/৯৩ সালে ছিল মাত্র ১০.২ লক্ষ টন (সারণী ৪.৬) অর্থাৎ বিগত দশকে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৮০ শতাংশ। এ বৃদ্ধি প্রতিটি মৎস্য ক্ষেত্রেই অর্জিত হয়েছে, তবে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ এক নয়। মৎস্য অধিদপ্তরের

www.pathagar.com

হিসেব অনুযায়ী ২০০০-০২ সালে মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ে উৎপাদনে শেয়ার হলো ৩৯ ও ৪০ শতাংশ এবং বাকী ২১ শতাংশ সামুদ্রিক উৎসের। ১৯৯২/৯৪ সালে তাদের শেয়ার যথাক্রমে ছিল ৫২, ২৪ ও ২৪ শতাংশ (সারণী ৪.৭)। তার অর্থ, বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বাধিক হলো বদ্ধ জলাশয়ে, বিশেষ করে পুকুরে এবং চিংড়ির ঘেরে যেখানে মাছ চাষ করা হচ্ছে। অন্যদিকে দেখা যায় যে, মুক্ত জলাশয়ে মোট উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও তাদের শেয়ার বর্তমানে হ্রাস পেয়েছে ২৬ শতাংশ এবং একইভাবে আর্টিসনাল সামুদ্রিক আহরণেওহ্রাস পেয়েছে।

সারণী ৪.৬ : উৎস অনুযায়ী মাছের উৎপাদন ১৯৯২-২০০২

মৎস্যের উৎস	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	১৯৯২-৯৩	৯৩-৯৪	৯৪-৯৫	৯৫-৯৬	৯৬-৯৭	৯৭-৯৮	৯৮-৯৯	৯৯-০০	০০-০১	০১-০২
১. অভ্যন্তরীণ জলাশয় ক) মুক্ত জলাশয়	৪৪.৩৬	৭.৭০	৮.৩৮	৯.০৮	৯.৮৮	১০.৮৬	১১.৯১	১২.৪৩	১৩.২৮	১৪.০২	১৪.৭০
১.১ নদী ও নদী মোহনা	৪০.৪৭+	৫.৩২	৫.৭৩	৫.৯১	৬.০৯	৬.০০	৬.১৬	৬.৪৯	৬.৭০	৬.৮৯	৭.১৬
১.২ সুন্দরবন	১০.৩২	১.৩৯	১.৪৩	১.৫৩	১.৬৬	১.৬০	১.৫৭	১.৫১	১.৫৪	১.৫০	১.৬৫
১.৩ বিল	-	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৯	০.০৭	০.১১	০.১১	০.১২	০.১৩
১.৪ কাপ্তাই লেক	১.১৪	০.৫৩	০.৫৬	০.৫৮	০.৬১	০.৬৩	০.৬৮	০.৭০	০.৭৩	০.৭৫	০.৮০
১.৫ প্লাবন ভূমি	০.৬৯	০.০৪	০.০৭	০.০৬	০.০৬	০.০৬	০.০৬	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৮
২. বদ্ধ জলাশয়	২৮.৩৩	৩.৩০	৩.৬১	৩.৬৮	৩.৬৯	৩.৬২	৩.৭৮	৪.১০	৪.২৫	৪.৪৫	৪.৫০
২.১ পুকুর	৩.৮৮	২.৩৮	২.৬৪	৩.১৭	৩.৭৯	৪.৮৬	৫.৭৫	৫৯৪	৬.৫৭	৭.১৩	৭.৫৫
২.২ বাওড়	২.৪২	২.০২	২.২২	২.৬৭	৩.০৮	৪.০৪	৪.৮৩	৫.০০	৫.৬১	৬.১৬	৬.৫০
২.৩ চিংড়ি খামার	০.০৫	০.০২	০.০২	০.০২	০.০৩	০.০৩	০.০৩	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৫
৩. সামুদ্রিক জলাশয়	১.৪১	০.৩৪	০.৩৯	০.৪৭	০.৬৮	০.৬৯	০.৮৮	০.৯০	০.৯২	০.৯৩	১.০০
৩.১ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে	-	২.৫০	২.৫৩	২.৬৫	২.৭০	২.৭৫	২.৭৩	৩.১০	৩.৩৪	৩.৭৯	৪.০০
৩.২ আর্টিসনাল ভিত্তিতে	০.৪৮	০.১২	০.১২	০.১২	০.১২	০.১৪	০.১৫	০.১৬	০.১৬	০.২৪	০.৩০
মোট	-	২.৩৮	২.৪০	২.৫৩	২.৫৮	২.৬১	২.৫৮	২.৯৪	৩.১৮	৩.৫৫	৩.৭০
	-	১০.২১	১০.৯১	১১.৭৩	১২.৫৮	১৩.৬০	১৪.৬৪	১৫.৫২	১৬.৬১	১৭.৮১	১৮.৭০

উৎস ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩। (পোল্ডার ও এনক্লোজার এর হিসাব ধরা হয়নি)

মৎস্য অধিদপ্তর ফিসারিজ রিসোর্স সার্ভে অনুযায়ী আরও লক্ষ্যণীয় যে, ১৯৮৩/৮৪ থেকে ১৯৯৮/৯৯ সাল পর্যন্ত দেশে ইলিশ মাছের বার্ষিক গড় উৎপাদন ২.০৩ লক্ষ টন। ইদানিং অবশ্য আভ্যন্তরীণ জলাশয়ের অবদান ১৯% হ্রাস পেয়েছে এবং বর্তমানে তাদের শেয়ার শতকরা ৩০-৩৫ ভাগ। একইভাবে সামুদ্রিক জলাশয় হতে আহরিত ইলিশ মাছের উৎপাদনওহ্রাস পেয়েছে (ড.কাশেম,২০০৫)।

www.pathagar.com

সাধারণত ধারণা করা হয় যে, মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে, যেহেতু অনেক জলাভূমি নদী ও খালে পলি পড়ে ভরাট হয়ে গেছে এবং আবার অনেক জমি বোরো ধান চাষের জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাছাড়া অপরদিকে কৃষি উৎপাদনে বিভিন্ন রসায়নিক ব্যবহার ও শিল্পবর্জ্যে পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ বিনষ্ট হওয়ায় নদ-নদী ও হাওরে মাছের উৎপাদন হ্রাস কমে যাচ্ছে। তবে সরকারের মৎস্য ব্যবস্থাপনা জোরদার করা, পোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচী এবং অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবারও সম্ভাবনা রয়েছে (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ২০০১)। মৎস্য উৎপাদনের এ সকল বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা থাকা প্রয়োজন।

সারণী ৪.৭: উৎস অনুযায়ী ১৯৯২-৯৪ এবং ২০০০-০২ (শতকরা হিসেবে)

মৎস্যের উৎস	১৯৯২-৯৪	২০০০-০২	বৃদ্ধির পরিমাণ (%)
১.আভ্যন্তরীণ জলাশয়	৭৬.১৪	৭৮.৬৬	৩.৩১
১.১ মুক্ত জলাশয়	৫২.৩২	৩৮.৪৮	(-)২৬.৪৫
১.২ বদ্ধ জলাশয়	২৩.৭৭	৪০.২১	৬৯.১৬
২. সামুদ্রিক জলাশয়	২৩.৮২	২১.৩৪	(-)১০.৪২
২.১ বাণিজ্যিক	১.১৪	১.৪৮	২৯.৮২
২.২ আর্টিসনাল	২২.৬৩	১৯.৮৬	(-)১২.২৫
মোট	১০০.০০	১০০.০০	-

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তরের দেয় তথ্য থেকে হিসাবকৃত –ড. কাশেম, ২০০৫।

উৎস অনুযায়ী মৎস্য উৎপাদনশীলতা

উৎস অনুযায়ী মৎস্য উৎপাদনশীলতা হিসেব ও বিশ্লেষণ করা খুবই কঠিন। তবে কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের উদ্বৃত অধিদপ্তরের দেয় পরিসংখ্যান অনুসারে প্রবাহমান বা আধা মুক্ত জলাশয়ের হেক্টর প্রতি মাছের উৎপাদন বর্তমানে ১৭৪ কেজি এবং কাপ্তাই লেকে ১১৮ কেজি। আর প্লাবন ভূমিতে উৎপাদিত হয় ১৪২ কেজি (সারণী ৪.৮)। চাষকৃত পুকুরে বার্ষিক উৎপাদন হয় ২৫৪৭ কেজি আর ধানের জমিতে ২২৫ কেজি। এ উৎপাদনশীলতা হিসেবের সঠিক ভিত্তি জানা নেই। তবে দাবী করা হচেছ যে, অধিদপ্তরের নির্দিষ্ট কিছু কিছু এলাকার আহরণকৃত মাছের পরিমাণ থেকে এরূপ হিসেব করা হয়। এসব তথ্যাবলী আরও সঠিক হওয়া প্রয়োজন। কারণ বিলের জমিতে যদি ৭১৭ কেজি হয়, তবে কাপ্তাই লেকে কি করে মাত্র ১১৮ কেজি হতে পারে এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ড. কাশেম তাঁর গ্রন্থে।

www.pathagar.com

সারণী ৪.৮ : প্রধান মৎস্য জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা

জলাশয়	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	উৎপাদন (কেজি/হেক্টর)
১। প্রবাহমান উম্মুক্ত বা আধামুক্ত জলাশয়	১০,৩১,৫৬৩	১৭৪
২। কাপ্তাই লেক	৬৮,৮০০	১১৮
৩। প্লাবন ভূমি (উম্মুক্ত)	২৩,৩২,৭৯২	১৪২
৪। নিয়ন্ত্রিত প্লাবন ভূমি	৮,৭৩,০০০	৭০
৫। বিল	১,১৪,১৬১	৭১৭
৬। ধানি জমি (৬-৮ মাস পানি থাকে)	১২,৫০০	২২৫
৭। বাৎসরিক পুকুর	২,১৯,৫০০	২,৫৪৭
৮। বাওর	৫,৪৮৮	৯০০
৯। চিংড়ি খামার (সাদা মাছসহ)	১,৪১,৩৫৩	৬৩৭
১০। বাণিজ্যিক সামুদ্রিক আহরণ	১,৬৬,৭০০	১৭৪

উৎসঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ২০০১।

গ্রামাঞ্চলে মৎস্য চাষ ও আহরণ এবং জেলেদের আর্থিক অবস্থা

১৯৯৬ এর কৃষি শুমারীর তথ্য অনুযায়ী সকল ফার্মের মধ্যে মৎস্য চাষীর সংখ্যা বর্তমানে শতকরা ১৮ জন। আর মৎস্য আহরণকারী বা পেশাগত জেলের সংখ্যা শতকরা ৮ জন (সারণী ৪.৯)। কৃষি ফার্মের আয়তন বৃদ্ধির সাথে মৎস্য চাষী ও আহরণকারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বড় ফার্মের গ্রুপে তাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩ ও ১৭ জন। শুমারীর এ তথ্যে আরও দেখা যায় যে, মাথাপিছু গড়ে এক সপ্তাহে মাছ ধরার পরিমাণ মাত্র ৫৭ কেজি, যার মূল্য মাত্র ৪৩৯ টাকা। প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী বিশ্লেষণে আরও প্রকাশ পায় যে, ফার্মের আয়তন অনুযায়ী আহরণের পরিমাণের নির্দিষ্ট কোন প্যাটার্ন নেই (ড.কাশেম, ২০০৫)।

মাছ ধরার বিভিন্ন উৎসের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ধরেছে পুকুর/দীঘি হতে (৪.১%) এবং পরবর্তী উৎস হলো নদীনালা ও খাল । খামারের আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিটি উৎসেই মাছ আহরণকারীর সংখ্যাও বেড়েছে (সারণী ৪.১০)।

www.pathagar.com

সারণী ৪.৯ : খামারের আয়তন অনুযায়ী মৎস্য চাষী এবং মৎস্যজীবিদের সংখ্যা

খামারের আয়তন	মৎস্য চাষী (%)	মৎস্য আহরণকারী (%)	গত এক সপ্তাহে গড়ে ধৃত মৎস্যের পরিমাণ	
			(কেজি)	(টাকা)
ভূমিহীন (-০.৪৯ একর)	১০.৪	৫.২	৬৫	৩৯৫
প্রান্তিক (০.৫০-০.৯৯)	১৪.৩	৬.৩	৬৬.৮	৪২২
ছোট (১.০-২.৪৯)	১৯.৩	৮.৫	৫০.৬	৩৯১
মাঝারি (২.৫০-৪.৯৯)	২৬.১	১২.৬	৪৯.৯	৪৩৬
বড় (৫.০+)	৩৩.৪	১৭.৪	৬৩.৪	৬২৭
মোট	১৭.৭	৮.৩	৫৭.২	৪৩৯

উৎসঃ বিবিএস, কৃষি শুমারী, ১৯৯৬।

সারণী ৪.১০: খামারের আয়তন অনুযায়ী মাছ ধরার উৎস সমূহ এবং আহরণকারীর সংখ্যা

খামারের আয়তন	পুকুর/দীঘি	বিল/হাওর	নদী/খাল	সমুদ্র
ভূমিহীন	১.৪	১.২	২.৬	০.৩
প্রান্তিক	২.৯	১.৫	২.০	০.৩
ছোট	৪.৫	১.৮	২.৩	০.৩
মাঝারি	৭.১	২.৫	৩.৪	০.৫
বড়	১১.৩	২.৭	৩.৭	০.৬
মোট	৪.১	১.৮	২.৬	০.৪

উৎস ঃ বিবিএস, কৃষি শুমারী, ১৯৯৬।

দেশে কৃত্রিম উপায়ে পোনা উৎপাদন ও মাছ চাষের উন্নত প্রযুক্তি বেসরকারী পর্যায়ে হস্তান্তরের ফলশ্রুতিতে দীঘি/পুকুর তথা জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৩ সালের হিসেব অনুযায়ী সরকারী ১১২ টি এবং বেসরকারী খাতে ৬৭১টি সহ দেশে মোট ৭৮৩টি হ্যাচারী ও খামার রয়েছে, ফলে বেসরকারীখাতে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, দেশে দিন দিন মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় তাদের আর্থিক অবস্থারও অবনতি ঘটছে, যা টেক্‌সই উন্নয়নের জন্য মারাত্মক হুমকির সামিল।

আভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দখল হয়ে যাওয়া জলাশয়ের উদ্ধার এবং পলি পড়ার ফলে যে সকল মৎস্য-সম্ভাবনাময় নদ-নদীর প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে এবং গতি পথের পরিবর্তন ঘটেছে, তাদের সংস্কার জরুরী ভিত্তিতে করা প্রয়োজন। আজকাল অনেকেই আবার স্বাভাবিক সংরক্ষণের

www.pathagar.com

বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে মুক্ত জলাশয়গুলো পুরো মাত্রায় পানি সেচে শুকিয়ে ফেলে এবং তাতে মাছের বংশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় এবং তৃণমূল পর্যায়ে এর বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া অত্যাবশ্যক। শহর এলাকায় এবং শিল্প এলাকায় শিল্প কারখানার বর্জ্য ও পানি শোধন না করে ছেড়ে দেয়ায় প্রবাহমান ও মুক্ত উৎসের জলাশয় মারাত্মক দূষণ করছে ব্যাপকভাবে (মজিদ, ২০০২)। এতে মাছের জৈবিক প্রক্রিয়া, চলাচল ও প্রজনন পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে এবং জীব-বৈচিত্রের বিলুপ্ত ঘটছে। এ ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণ আইনের প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরী, আর অপরদিকে দিকে ঐতিহ্যগত জৈবিক সম্পদ সংরক্ষণে বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা গ্রহণ অপরিহার্য। এজন্যে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের সম্পৃক্ততা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার ভীষণ প্রয়োজন ।

মৎস্য সংরক্ষণ এবং নীতিমালা

দেশের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় সরকার বেশ কিছু আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। এ আইনগুলোর মধ্যে রয়েছে :

(ক) মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রতিপালন আইন, ১৯৫০ এবং সংশোধনী অর্ডিনেন্স ১৯৮৮;
(খ) পুকুর উন্নয়ন আইন, ১৯৩৯ এবং সংশোধনী অডিনেন্স ১৯৮৬;
(গ) সামুদ্রিক মৎস্য অর্ডিনেন্স, ১৯৮৩;
(ঘ) মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৮৩;
(ঙ) চিংড়ি চাষ অভিকর আইন, ১৯৯২ এবং
(চ) চিংড়ি ও মৎস্য পোনা আহরণ নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০০,

উপরোক্ত আইন ছাড়াও আরও যে দুটো উৎপাদন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে তা হলোঃ

(ক) জলমহাল ব্যবস্থাপনায় নতুন নীতিমালা, ১৯৮৬ এবং
(খ) জাতীয় মৎস্য নীতি, ১৯৯৮।
(গ) উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৪

ব্রাক (BARC) ২০০১ এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, আইগুলোতে নানা সীমাবদ্ধতার কারণে, মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও রক্ষায় আশানুরূপ কার্যকর হয়নি। উল্লেখ্য মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার তদারকী মৎস্য অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত থাকলেও আইনের প্রয়োগ ও বলবৎকরণে 'ম্যাজিস্ট্রেসী' ক্ষমতা ও পুলিশী সহায়তার জন্য অন্যান্য কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। তাছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক এবং দক্ষ জনসম্পদের মারাত্মক অভাব রয়েছে। তাই এ সমস্ত আইনের প্রয়োগ একান্ত অপরিহার্য। পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

www.pathagar.com

১৯৮৬ সালের জলমহল ব্যবস্থাপনা নীতি গৃহীত হলে কিছুটা ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। পরবর্তীতে এ নীতির সাথে 'সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা নীতি' সংযুক্ত হলে প্রকৃত সুফলভোগীদের জলমহালের অংশীদারীত্ব, মাছ চাষ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সরাসরি অংশ গ্রহণ নিশ্চিত হয় বলে দাবী করা হয়। এতে করে বাস্তবে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি কতটুকু এবং মৎস্যজীবিদের জীবনমান উন্নয়নে কতটুকু অবদান রেখেছে তা সমীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। দীর্ঘ মেয়াদে মৎস্য সম্পদের দক্ষ ব্যবহার ও সংরক্ষণে আইনের সদ্ব্যবহার এবং নীতিমালার যথার্থ প্রযোগ প্রয়োজন।

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে মাছের প্রাকৃতির বংশ বিস্তার ও সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাপনা অভয়াশ্রম স্থাপন মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির যুগোপযোগী কৌশল। পৃথিবীতে সব প্রাণীকুলেরই একটি আশ্রয়স্থল আছে। মাছ সে প্রাণীকুলেরই শীতল রক্তবিশিষ্ট একটি প্রাণী যার অবাধ বিচরণ এবং পরবর্তী বংশবৃদ্ধির জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন। শাব্দিক অর্থে এই নিরাপদ আশ্রয় স্থলকে অভয়াশ্রম বলে। মনুষ্য ও প্রাকৃতিক সৃষ্ট নানাবিধ কারণে মুক্ত জলাশয়ে বিগত বছরগুলোতে মাছের উৎপাদন অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলো ধ্বংস হওয়ার ফলে অনেক প্রজাতির মাছের বিলুপ্তি ঘটেছে। এপরিস্থিতিতে মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কয়েকটি পদক্ষেপের মধ্যে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ, খালিয়াজুরী, পূর্বধলা, কলমাকান্দা, সদর, বারহাট্টা ও মদন উপজেলার গভীরমত জলমহালে বা প্রবাহমান নদীর গভীরতম স্থান যেখানে সারা বছর পানি থাকে সেখানে অভয়াশ্রম স্থাপন করা গেলে একাধারে যেমন মাছের উৎপাদন বাড়বে পাশাপাশি মাছের প্রজাতি সংখ্যা তথা জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাবে।

বর্তমানে নেত্রকোণা জেলায় চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের আওতায় সদর উপজেলার জলঘাগুটিয়া জলমহালে এবং সিবিএফএম প্রকল্পের আওতায় পূর্বধলা উপজেলায় পাকলা বিল, আতলা বিল ও বোয়ালিয়ার ডোবা বিল জলমহালে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। পানির গভীরতা, মাছের প্রাচুর্যতা, নদীর সংযোগ ইত্যাদি বিবেচনা করে অত্র জেলায় বিভিন্ন নদী ও বিলে আরো মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এ জেলার কলমাকান্দা উপজেলার জলমেদি দিঘর জলমহালে; খালিয়াজুরী উপজেলার মরানদী জলমহাল ও কাঁঠালজাম জলমহালে; মদন উপজেলার মগরা নদীতে; বারহাট্টা উপজেলার কলমধরের ডোবা ও চিতলিয়ার ডোবা জলমহালে, মোহনগঞ্জ উপজেলার গজারিয়া বিল জলমহালে এবং সদর উপজেলার কংস নদীর বরওয়ারী অংশে অভয়াশ্রম স্থাপন করা যেতে পারে। তাতে যে সকল মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ সম্ভব হবে তা'হল নান্দিল মাছ, কাতলা মাছ, সিলুন মাছ, দেশী সরপুটি, মহাশোল, রামচেলা (বাঁশপাতা) ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে

www.pathagar.com

টাংগুয়ার হাওর-এ অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ঘোষণা করায় সেখানে ঘনিয়া, কাতলা, বোয়াল, কালিবাউশ ইত্যাদি মাছের সফল প্রজণন সম্ভব হয়েছে যার সুফল সুনামগঞ্জ বাসীর পাশাপাশি মোহনগঞ্জবাসীও পেতে শুরু করেছে।

নেত্রকোণায় মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার

বছরের পর বছর বর্ষা মওসুমে উজান হতে বয়ে আনা পলি মাটি ও বালু জমে এ জেলার সুমেশ্বরী, মগরা, গোরা উৎরা, কংস, শিবগঞ্জ ধলাই ইত্যাদি নদী ও এদের শাখা-প্রশাখাসমূহ এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন বিল ও বিভিন্ন বিল ও বিলের সংযোগ রক্ষাকারী খালের তলদেশ ভরাট হয়ে গেছে। ফলে বর্ষাকালে অনেক নদীতে স্থানে স্থানে চর পড়ে শুকিয়ে যায়। বিলগুলোর পানি ধারন ক্ষমতা কমে যাওয়ায় শীতকালে প্রায় সিংহভাগ বিলগুলোকেই শুকিয়ে ফেলে মাছ ধরা হয়। এতে করে মাছের বংশ সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। উপরন্তু, ইদানীংকালে বিলগুলো শুকানোর পর কাদার উপর ইউরিয়া ছিটিয়ে বাইম জাতীয় মাছ ধরা হয়ে থাকে। বর্ষাকালে অধিক হারে চট জাল ব্যবহার করার ফলে হাওড়গুলোর তলদেশ জলজ আগাছা শুন্য হয়ে যাচ্ছে যার পরিণতিতে আবাসস্থল নষ্ট হওয়ায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে অনেক দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ। জলমহালগুলো (হাওর, নদী, বিল ও খাল) পরিপূর্ন জরিপের ভিত্তিতে ড্রেজিং করে এদের নাব্যতা ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। এতে করে মাছের প্রজননক্ষেত্র সৃষ্টি হবে এবং মাছের বংশবৃদ্ধি ঘটবে।

পাইল ফিশারী স্থাপন

পাইল ফিশারী স্থাপন মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এই প্রথায় ইজারাগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট জলাশয়ে একটি নির্দিষ্ট বিরতিতে (কমপক্ষে-২ বছর) মাছ ধরা বন্ধ রেখে মাছের উৎপাদন ও বংশবিস্তারে সহায়তা করে। প্রতিটি জলমহালকে তার বৈশিষ্ট্যের উপর লক্ষ্য রেখে এই ব্যবস্থাপনায় আনা দরকার। যে সমস্ত জলমহালে শীতকালে পর্যাপ্ত পানি থাকে সেগুলোকে ইজারা প্রদানের সময় উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ সাপেক্ষে কমপক্ষে ২ বছরের পাইলের ব্যবস্থা রেখে ইজারা বন্দোবস্ত দিতে হবে। এতে করে সাময়িকভাবে মাছের অভয়াশ্রমের কাজ হবে এবং জলমহালে মাছের নবায়ন সহজতর হবে, জীববৈচিত্র্য রক্ষা পাবে এবং সর্বোপরি মাছের উৎপাদন বাড়বে। এর সুফল পাবে ইজারাদার ও দেশবাসী। জলমহালগুলোতে এ ধরনের পাইল প্রথা বিগত আশির দশকেও প্রচলিত ছিল। এগুলো অমৎস্যজীবিদের দখলে চলে যাবার পর থেকেই এ প্রথা উঠে যায়। দুরূহ হলেও পাইল প্রথাটি পূনরায় চালু করতে হবে।

www.pathagar.com

ইজারা প্রথার মাধ্যমে রাজস্ব ভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে জীবভর (Bio-mass) ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার প্রথা চালু করা ঃ

বর্তমানে প্রচলিত রাজস্বভিত্তিক ইজারা প্রথার কারনে ইজারা গ্রহীতা তার অধিকার ভুক্ত জলমহালের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কথা বিবেচনা না করে তার লিজ টার্মের মধ্যে সর্বোচ্চ মৎস্য আহরনের মাধ্যমে অধিক মুনাফা লাভের চৈষ্টা করে। এতে করে জলমহালগুলো শুধু মৎস্য শুন্যই হয় না বরং মাছের আবাসস্থলও বিনষ্ট হয়। ফলে ভবিষ্যতে উৎপাদন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং উক্ত জলাশয়ের জৈবিক উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। তাই রাজস্বভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে জীবভর ভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা প্রথা চালু করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইজারা গ্রহীতা একটি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসরণ করবেন যাহা উক্ত জলাশয়ের উৎপাদনশীলতার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি মাছের নবায়নের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতি বছর এমন পরিমান মাছ আহরণ করবেন যাতে উক্ত জলাশয় হতে বছরের পর বছর টেকসই ভাবে একই পরিমান মাছ আহরণ করা যায়। এ প্রথায় জলাশয়ের সর্বোচ্চ জীবভর ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে মাছের উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় যেমন বাড়বে, ইজারাগ্রহীতাও অধিক মুনাফা লাভ করতে সক্ষম হবে। তবে এই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সফলভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিতে হবে স্থানীয় প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরকে এবং তা হতে হবে সকল প্রকার রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত।

সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা (সি. বি. এফ. এম)

এ ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তর, এনজিও এবং ইজারাগ্রহীতা সুফলভোগী গোষ্ঠীর সমন্বিত অংশগ্রহনের মাধ্যমে জলমহালের জৈবিক ব্যবস্থাপনা ও ইজারা মূল্য আদায় নিশ্চিত হয়। জলমহালের সার্বিক জৈবিক ব্যবস্থাপনা, মৎস্য উৎপাদন ও সহনশীল মৎস্য আহরনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং জলমহাল সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজ মৎস্য অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সিবিএফএম-এর আঙ্গিকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং এ কাজটি মৎস্য বিভাগ করতে পারবে। নেত্রকোণা জেলার বর্তমানে সি. বি. এফ. এম. প্রকল্প (২য় পর্যায়)-এর আওতায় পূর্বধলা উপজেলার বোয়ালিয়ার ডোবা, রাজধলা বিল, আতলা বিল, ডোবা বিল, কোমা বিল ও পাকলা বিল; কলমাকান্দা উপজেলার ঘোড়া ডুবি বিল ও মেদী বিল এবং খালিয়াজুরী উপজেলার নরসিংহপুর জলমহালে মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু আছে। এ জেলার অন্যান্য মাঝারী আকারের জলমহালকে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা যেতে পারে স্থানীয় পর্যায়ে। কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলা ও যশোরে এ ধরণের উদ্যোগ অত্যন্ত সফল হয়েছে।

www.pathagar.com

মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগ

সরকার মৎস্যজীবিদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে সব সময়ই কাজ করতে চায় এবং করে যাচ্ছে। কিন্তু এতে করে মৎস্যজীবিদের পক্ষে মৎস্য চাষ, মৎস্য আহরণ, মৎস্য উৎপাদন, মৎস্য বাজারজাতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ১০০ ভাগ সাফল্য আসছে না। মৎস্যজীবিদেরকে সরকারের সাথে সমন্বয়ের দৃঢ় সেতু বন্ধন গড়তে হবে। আর সে কারণেই উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ রক্ষার্থে গুরু দায়িত্ব নিতে হবে মৎসজীবি সম্প্রদায়ের। তাদেরকে সচেতনতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। আর এ জন্য রয়েছে সরকারের কিছু নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুন। নেত্রকোণা জেলার অধিকাংশ নদী, হাওড় ও বিল মাছের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্রে। কাজেই এই ব্রিডিং ও নার্সারী গ্রাউন্ডকে রক্ষা করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

ক) নিষিদ্ধকৃত কারেন্ট জালের (গিল নেট- যার ন্যুনতম সাইজ ৪.৫ সে. মি. এর কম) ব্যবহার ও বিক্রি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ) ফেব্রুয়ারী মাস থেকে জুন মাস পর্যন্ত আহরণ নিষিদ্ধ ১২ ইঞ্চির নীচে বোয়াল, আইর ও সিলুন মাছের পোনা লাড় বড়শী (লং লাইনিং) দিয়ে ধরা বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

গ) "মশারীর জাল- পোনা মাছের কাল" এ কথা বাস্তবিক পক্ষে সত্যি হলেও মশারীর ন্যায় ঘন ফাঁসের খনা জাল, কাঁথা, চট জাল জগৎ বেড় জাল (সিন এবং পার্স সিন নেট) দিয়ে ছোট জাতের মাছ (এস আই এস বা এস আর এস) ধরা হলেও বাস্তবে কার্প বা বোয়াল মাছের পোনা বিশেষ করে ঘনিয়া মাছের পোনা জালে আসে। তাছাড়া এ জাল বার বার টানার ফলে মাছের আবাসভূমির (হেবীটেট) উপর বিরুপ প্রভাব পড়ে। তাই খনা জাল আইনতঃ নিষিদ্ধ না হলেও কম পক্ষে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে আগষ্টের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত শুধুমাত্র কার্প জাতীয় মাছের প্রজনন ক্ষেত্র ও নার্সারী গ্রাউন্ডে নিষিদ্ধ বা সীমিত করা যেতে পারে।

ঘ) সর্বোপরি হাট-বাজারে অবৈধ জালের বেচাকেনা কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। এ কাজটি জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও মৎস্য বিভাগের যৌথ উদ্যোগের হতে পারে। আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে একটি সামাজিক আন্দোলনের গড়ে তোলা যায় এবং এ কাজটি করার ব্যাপারে সরকারের মৎস্য বিভাগই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। সাময়িক ভাবে ৩-৪ মাস শুধু মাত্র মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের জন্য জল থানার অনুকরণে নেত্রকোণা জেলায় বর্ষাকালে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা যেতে পারে।

মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগে মৎস্যজীবিদের উৎসাহিত করণে এবং নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার থেকে বিরত থাকাকালীন লীন পিরিয়ডে বিকল্প জীবিকা না পাওয়া পর্যন্ত

www.pathagar.com

তাদেরকে ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানের সহায়তা করা যেতে পারে। বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে স্থানীয় এনজিও-এর সহযোগীতা নেয়া যেতে পারে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় অবস্থিত হাইল হাওড়ে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠাকালে এমএসিএইচ (মাছ প্রকল্প) মৎস্যজীবিদের বিভিন্ন ধরনের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছে। নেত্রকোণা জেলার জন্য মাত্র ৪ মাসে সদাশয় সরকারের যে আর্থিক ব্যয় হবে্ মাছের উৎপাদন তার পরিমানকে কয়েক গুণ পুষিয়ে দেবে এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। বরঞ্চ বাড়তি উৎপাদনের সুফল পাবে সারা দেশের মানুষ।

মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ

মাছ একটি নবায়ন যোগ্য সম্পদ। একে সংরক্ষণের মাধ্যমে বছরের পর বছর উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। যদি প্রাকৃতিক বা মনুষ্য সৃষ্ট কারণে কোন জলাশয়ে বিশেষ বিশেষ কোন প্রজাতির অস্তিত্ব বিলোপের হুমকি এসে যায়, তবে সে সব স্থানে পোনা মাছ অবমুক্ত করা উচিত। মৎস্য অধিদপ্তরাধীন মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ কার্যক্রম আবারো চালু করা উচিত বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন।

প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা

নেত্রকোণা জেলার মৎস্য উৎপাদনের অন্যতম খাত হলো মুক্ত জলাশয়গুলো অর্থাৎ খাল-বিল, নদী, হাওড় ইত্যাদি। মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৮৫ শতাংশই আসে এই জলরাশি থেকে। মুক্ত জলাশয়গুলোর মধ্যে প্লাবন সমভূমির আয়তন প্রায় ৭৫৫৪৪.৭১৫ হেক্টর। বর্ষা মৌসুমে ধানী ফসলের জমি গুলো যখন পানির নীচে চলে যায় তখন এগুলো হয়ে যায় অব্যহৃত সম্পদ। প্লাবিত এসব ফসলী জমিগুলো থেকে কৃষক ৪-৫ মাস কোন ফসল পায় না। সম্পদ হয়ে যায় তার কাছে মূল্যহীন। এসব প্লাবন ভূমির বৈশিষ্ট্য হলো মাঝখানে সামান্য ছোট আকারের বিল বা নালা চতুর্দিকে বহু মালিকানার বোরো ধানের জমি। এগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা সাধারণ পুকুর বা বদ্ধ জলাশয়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি। প্লাবনভূমিতে স্বল্প ব্যয়ে উন্নত মানের বড় আকারের পোনা মাছ মজুদ করে কোন প্রকার খাবার প্রয়োগ না করেও স্বল্প সময়েই প্রচুর মাছ উৎপাদন করা যায় যা উন্নত খাবার প্রয়োগ ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব। সুতরাং এখানে একক কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন সবার ঐক্যবদ্ধতা ও সম্মিলিত প্রয়াস। সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে প্রত্যেকটি প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষ করা সম্ভব হলে একদিকে যেমন সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হবে, তেমনি মাছের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। আমাদের হৃত ঐতিহ্য 'মাছে-ভাতে বাঙ্গালী' পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর আয় যেমন বাড়বে, তেমনি সৃষ্টি হবে কর্মসংস্থানের।

www.pathagar.com

প্লাবনভূমিতে মৎস্য চাষ কার্যক্রম ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের অনেক স্থানে বেশ সংগঠিত ভাবেই শুরু হয়েছে। এর অধিকাংশ উদ্যোক্তাই হলো গ্রামের সাধারণ জনগণ, কিংবা একক উদ্যোক্তা অথবা কোন এনজিও বা বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এসব মৎস্য চাষ কার্যক্রমের কতক গুলোতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে, আবার কিছু কিছু প্রকল্প সম্পূর্ণ ব্যক্তি মালিকানাধীন অবস্থায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। দাউদকান্দির উত্তর ইলিয়টগঞ্জ ইউনিয়নের "পানকৌড়ি মৎস্য প্রকল্প" -এর আয়তন ৮৫০ (আটশত পঞ্চাশ) বিঘা এবং চাষীর সংখ্যা ৫০০ (পাঁচশত) জন। জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে, পুঁজি গঠন থেকে শুরু করে বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে স্থানীয় সম্পদ তথা অর্থ, জনসম্পদকে সর্বাধিক মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং একই সাথে স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সমন্বিত কৌশলকে প্রয়োগ করা হয়েছে। পানকৌড়ির মুনাফা শুধুমাত্র শেয়ারধারী মালিকগনই পেয়েছেন তা নয়, বরং কমিউনিটি জুড়ে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনও এসেছে। পানকৌড়ির সহযোগী এনজিও শিসউক (শিক্ষা স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচী)-এর ন্যায় এস ইউ এস (স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি, নেত্রকোণা) বা যে কোন এনজিও কে মৎস্য বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট করা প্রয়োজন হবে। কারণ নেত্রকোণার বিরাট জনগোষ্ঠীকে একটি ছাতার নীচে নিয়ে আসার মত গুরু দায়িত্বের কাজটি শিসউকের ন্যায় এস ইউ এস বা অন্য যে কোন এনজিও করতে পারবে বলে সকলের দৃঢ় বিশ্বাস।

মাছ একটি নবায়নযোগ্য সম্পদ। প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক কারণেই নেত্রকোণার বিভিন্ন জলাভূমিতে এখনও কম-বেশি মাছ পাওয়া যায়। তাই, দারিদ্র্যপীড়িত এই অঞ্চলের চাষীদের কাছে প্রধান ফসল ধান। ঘরে ধান থাকলে তারা নিজেদেরকে সুখী মনে করে। অথচ তার পুকুরটিই যে তার বিভিন্নভাবে টাকার খনি হতে পারে এই বিষয়ে তাদের মধ্যে সচেতনতা খুবই কম। তথাপি বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতার কারণে মাছ চাষ জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেছে। সমাজের বিত্তবানরা আজ মাছ চাষে এগিয়ে আসছে। অন্য জেলার বিত্তবানরাও আজ এই জেলায় মৎস্য খামার স্থাপনে এগিয়ে এসেছে, এটি শুভ লক্ষণ। তবে এই জেলার পুকুর-দীঘি সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। সুতরাং অত্র জেলার মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে মুক্ত জলাশয়ের উপরই সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে। তবে, কোন জলাশয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারনের পূর্বে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের জন্য ব্যাপক ভিত্তিক জরীপ কার্যক্রম পরিচালনা করা। স্থানীয় প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমন্বিত এবং সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ করলে মৎস্য সম্পদে আবার ভাটির (মাছের) রাজধানী নেত্রকোণা তার হৃত গৌরব ফিরে পাবে বলে দৃঢ়ভাবে আশা করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

বিভিন্ন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে দেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির গতি আশাপ্রদ নয় বিধায় মাছের মূল্য বেড়েছে এবং মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে উৎপাদন বৃদ্ধিতে পুকুরে মৎস্য চাষ এবং উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ির খামার বিশেষ অবদান রাখছে। মৎস্য অধিদপ্তরের হ্যাচারি নির্মাণ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে চিংড়ির উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। আভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় এলাকার জলাশয় থেকে অতিরিক্ত মাছ আহরণের ফলে সারাদেশে জীব-বৈচিত্র্যে ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। অনেক প্রজাতির মাছ দেশ থেকে বিলুপ্ত প্রায়। এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে মাছ আহরণ সহনীয় পর্যায়ে রাখতে রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। সরকার এ ক্ষেত্রে যে কয়েকটি অভয়াশ্রম সৃষ্টি করেছে, তাদের সঠিক সংরক্ষণও অতীব জরুরী। দেশের বিভিন্ন মৎস্য উৎসের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কার্যক্রম আরও কার্যকর ও বিস্তৃত করা প্রয়োজন ।

মৎস্য উৎপাদন ও সংরক্ষণে সরকারী আইন এবং নীতিমালার যথার্থ প্রয়োগে স্থানীয় প্রশাসন, প্রাইভেট খামার ও আহরণকারী এবং এনজিওদেরকে আরও সক্রিয় এবং তাদের মধ্যে দৃঢ় সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সর্বোপরি স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদের স্টকের হিসাব এবং এসব তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ দুর্গাপুরের সাদা মাটি

চীনা মাটি আমাদের দেশে অতি পরিচিত শব্দ। চীন দেশে সর্বপ্রথম ব্যবহার হওয়ার কারণে সাদামাটিকে অনেকে চীনামাটি নামে অভিহিত করেন। বাংলাদেশের নেত্রকোণা জেলার দূর্গাপুর উপজেলার গোপালপুর, বিজয়পুর, মাইজপাড়া, ভেদিকুরা ও অন্যান্য স্থানে অনেকগুলো টিলায় সাদামাটি ভূ-পৃষ্ঠে উন্মুক্ত অবস্থায় মজুত আছে। শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী ও ঝিনাইগাতী উপজেলার সর্ব-উত্তর সীমানায় গারো পাহাড়ের পাদদেশে বাংলাদেশের সীমান্তের ছোট ছোট টিলাগুলোতেও সাদামাটি রয়েছে।
সাদামাটি (White Clay) বাংলাদেশের অন্যান্য খনিজ সম্পদের মতই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। এই সাদামাটি ষাটের দশকের দিকে বাংলাদেশের নেত্রকোণা জেলায় বাংলাদেশের ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের ভূ-বিজ্ঞানীরা আবিস্কার করেন। কিন্তু অদ্যাবধি সাদামাটির (White Clay) যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয় নাই। কিন্তু বর্তমানে দেশে অনেকগুলো সিরামিক ফ্যাক্টরী গড়িয়া ওঠায় এর চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলছে। এ দেশে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান সাদামাটি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠায়ও এগিয়ে আসছে ।

খনিজ সম্পদ ব্যুরোর প্রতিবেদনে পর্যালোচনান্তে জানা যায় যে, নেত্রকোণা ও শেরপুর জেলার নিম্নলিখিত এলাকায় সাদামাটি রয়েছে। দূর্গাপুর উপজেলার কোয়ারী এলাকা সুমেশ্বরী নদীর পূর্ব দিকে ফারাঙ্গা পাড়া, থাউশাল পাড়া, গোপালপুর।

www.pathagar.com

চিত্র ৪.৩ : বাংলাদেশের সাদামাটি এলাকা

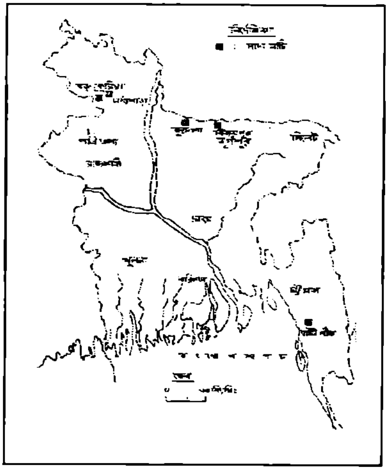

উৎস : নেত্রকোণা ও শেরপুর জেলার সাদামাটি খনিজ; ২০০৪

সুমেশ্বরী নদীর পশ্চিম দিকে সমস্ত এলাকায় সাদামাটি রয়েছে। তা'হল - মাইজপাড়া, বরইকান্দি, বাহেরতলী, পাঁচতলী, পাঁকানিয়া, নাওয়ারা, মধুপুর, গুচ্ছপাড়া, ভেদিকুরা, উত্তর মাঝপাড়া, সমসচুড়া, বুরুঙ্গা, গোমড়া, বালিজুড়ি।

চিত্র ৪.৪ : দূর্গাপুর এলাকার ভূমিরূপ ও সাদামাটি টিলার অবস্থান

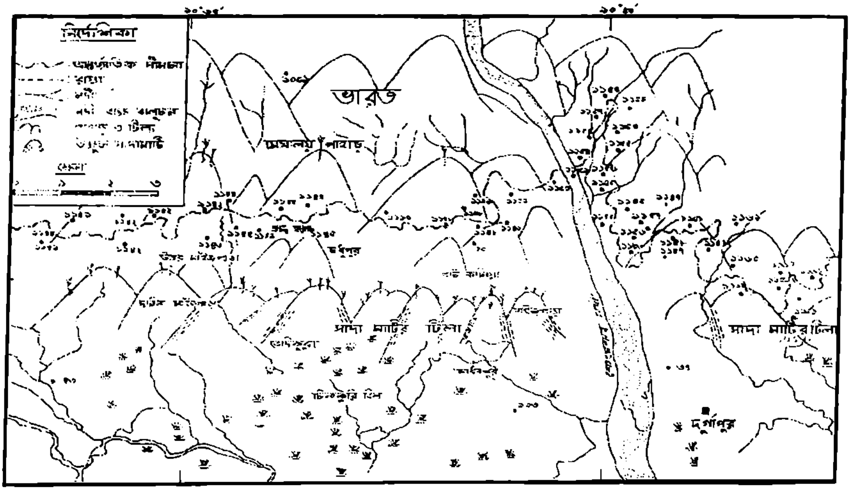

উৎস : সাইদুল হোসেন, নেত্রকোণা ও শেরপুর জেলার সাদামাটি খনিজ, ২০০৪

www.pathagar.com

সাদামাটি আহরণ (White Clay Exploitation):

এই এলাকার সাদামাটি উত্তোলন শুরু হয়েছে প্রায় ষাট দশকের দিকে। ১৯৬২ সনে এই উত্তোলন ছিল মাত্র ১২১ টন কিন্তু ১৯৯৫ সনে এই উত্তোলন বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ৬৫৪১ টন যা প্রায় ৫৩ গুণ বেশি (সারণী-৪.১১) এ বৎসর ওয়ারী বিবরণী দেয়া হল। এই সারণী থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে প্রতি বছর সাদামাটির উত্তোলণের হার ও চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে এ ধারা অব্যাহত থাকলে খুব শীঘ্রই এ সাদামাটির ষ্টক যথাযথ অর্থনৈতিক ব্যবহার ছাড়াই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

সারণী ৪.১১ : বিজয়পুরে চীনামাটি উৎপাদন

সাল	উৎপাদন (টন)	সাল	উৎপাদন (টন)
১৯৬২	১২১	১৯৭৭	৪৩১৬
১৯৬৩	৫৩৭	১৯৭৮	৬৫৪১
১৯৬৪	৯৬৬	১৯৭৯	৮৪৭৭
১৯৬৫	১১০২	১৯৮০	৮৮৪৩
১৯৬৬	২৬০৫	১৯৮১	৭৫৫৮
১৯৬৭	২৮৪৫	১৯৮২	৪৫১৩
১৯৬৮	৩০০৭	১৯৮৩	২০২৬
১৯৬৯	৩৯৪৬		
১৯৭০	৩০২০	১৯৮৯	৩৩১২
১৯৭১	৭২৫	১৯৯০	৭৩৬৬
১৯৭২	২২৭৬	১৯৯১	৬৫৭০
১৯৭৩	৩৪৬০	১৯৯২	১৮৮০
১৯৭৪	৩৪৭৪	১৯৯৩	২৪৫২
১৯৭৫	৪৫৯৭	১৯৯৪	৩২৮৩
১৯৭৬	২২৩৬	১৯৯৫	৬৫৪১

উৎস: খনিজ সম্পদ ব্যুরো-২০০৪

বর্তমান ইজারা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান

গারো পাহাড়ের পাদদেশে দূর্গাপুর ও নালীতাবাড়ী এলাকার যে সমস্ত ইজারা প্রাপ্ত কোম্পানী বর্তমানে সাদামাটি আহরণ করছে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপ:-

ক) বি.আই.এস এফ (BISF) বাংলদেশ ইনস্যুলেটর এন্ড স্যানেটারী ওয়্যার ফ্যাক্টরী লিঃ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিসিআইসি-র নিয়ন্ত্রনাধীন একটি প্রতিষ্ঠান।

খ) পি.সি.আই (PCI)ঃ পিপল্স সিরামিক ইন্ড্রাষ্ট্রিজ লিঃ, মতিঝিল, ঢাকা ।

গ) ফু ওয়াং সিরামিক ইন্ড্রাষ্ট্রিজ লিঃ, বনানী, ঢাকা ।

ঘ) মোমেনশাহী সিরামিক এন্ড গ্লাস ইন্ড্রাষ্ট্রি, ভালুকা, ময়মনসিংহ ।

www.pathagar.com

ঙ) মেসার্স নিজাম উদ্দিন, ঝিকাতলা, ঢাকা ।
চ) জাকের রিফ্যাকট্ররীজ এন্ড টাইল্‌স ইন্ড্রাষ্ট্রি এন্টারপ্রাইজ, মিরপুর, ঢাকা ।
ছ) তাজমা সিরামিক লিমিটেড, লাল ভবন, ঢাকা ।
জ) বেঙ্গল ফাইন সিরামিক্স লিমিটেড, ঢাকা ।
ঝ) ষ্ট্যান্ডার্ড সিরামিক ইন্ড্রাষ্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা ।
ঞ) মেসার্স পারুল এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা ।

চিত্র ৪.৫ : বিজয়পুর এলাকার ভূগঠন ও সাদামাটি খনিজ

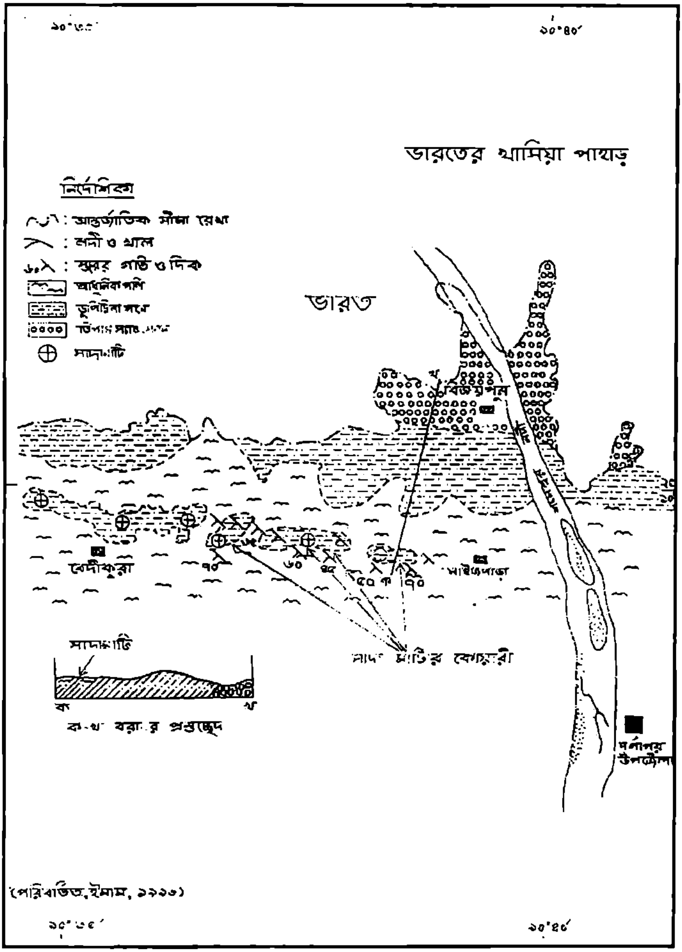

উৎস : সাইদুল হোসেন, নেত্রকোণা ও শেরপুর জেলার সাদামাটি খনিজ, ২০০৪

www.pathagar.com

রাজস্ব আয় ও উন্নয়ন সম্ভাবনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর সাদামাটি থেকে যথেষ্ট পরিমাণ রাজস্ব পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। খনিজ সম্পদ ব্যুরোর তথ্য অনুসারে ২০০২ ইং সনের রাজস্ব আয়ের হিসাব দেখান হল (সারণী-৪.১২)।

সারণী-৪. ১২: ২০০২ ইং সনের রাজস্ব আয়ের হিসাব (টাকায়)

কোম্পানীর নাম	জানু-মার্চ	এপ্রিল-জুন	জুলাই-সেপ্টেম্বর	অক্টোবর-ডিসেম্বর	মোট
পি.সি.আই	-	২৭,৯১৪	১৬,৫৪৪	১৯,৬৬১	৬৪,১১৯
ফু-ওয়াং	৪২,০৮১	৭৫,৩৩৮	৭৪,৭৯৯	৮০,৭১৯	২,৭২,৯৩৭
মোমেনশাহী	২৭,১৫৮	১৪,৮১৬	২১,৫২৫	২৯,১৯০	৯২,৬৮৯
নিজামউদ্দিন	৮,৭৫৭	১২,৫৪৮	১৩,৫৪৮	১৫,০০২	৪১,৮৫৫
জাকের	৭,৮০৩	৬,৪৫৮	৮,৬১০	১৩,১৮৪	৩৬,০৫৫
রিফ্যাক্টরীজ	-	৪,৫৭৪	২,১৫৩	২,৬৯১	৯,৪১৮
তাজমা সিরামিক	-	২৪,১৬১	৪৮,০৩৮	৩৯,১৬৫	১,১১,৩৬৪
বেঙ্গল সিরামিক				সর্বমোট-	৬,৩৬,৪৩৭

উৎস: সাইদুল হোসেন, খনিজ সম্পদ ব্যুরো-২০০৪ ।

দূর্গাপুর এলাকার সাদামাটির খনিজ সম্পদ ভূ-পৃষ্ঠে পাহাড়ী টিলার পাদদেশে উন্মুক্ত অবস্থায় বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে কোয়ারী সমূহে এই সাদামাটি খনিজের স্তর সামান্য কেঁটে নেয়ার পর এর বিস্তৃতি আরো গভীরে বিদ্যমান থাকে। তখন অবশ্যই গভীরের সাদামাটি উত্তোলনের জন্য প্রায় ৩০-৪০ ফুট নীচে খনন করিয়া উত্তোলন করতে হয় এ পদ্ধতিকে ওপেনপিট মাইন (Open Pit Mine) পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে ।

সাধারণত: শুষ্ক মৌসুমে নদী বক্ষে অর্থনৈতিকভাবে সঞ্চিত বালুর (Sand Deposit) উত্তোলনকে বালু কোয়ারী (Sand Quarry) বলে। যেমন সুমেশ্বরী নদীর বালু কোয়ারী। এ ক্ষেত্রে খুব গভীর থেকে বালু সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয় না কিন্তু সাদামাটি খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই পদ্ধতিতে উত্তোলনের জন্য ভূ-প্রকৌশল প্রযুক্তি অবলম্বন করে ভূ-অভ্যন্তরে অনেক গভীর পর্যন্ত মাটি কাটতে হয় বা মাইনিং করা হয়।

সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ

সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, অনেক কোম্পানী সরকারী নিয়মনীতিমালার তোয়াক্কা না করে অপরিকল্পিত ও নিজেদের ইচ্ছা মাফিক মাটি উত্তোলন করছে। কোম্পানীগুলোর উপর স্থানীয়ভাবে ও সরাসরি সরকারী কোনো তদারকি ব্যবস্থা না থাকায় ফ্রি-ষ্টাইল পদ্ধতিতে মাটি উত্তোলনের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য দিন-দিন নষ্ট হচ্ছে। সাদা মাটি

www.pathagar.com

উত্তোলনের বর্তমান ফ্রি-ষ্টাইল পদ্ধতি অব্যাহত থাকলে এ মূল্যবান খনিজ সম্পদের আয়ু ১০০ বছর কমে যেতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন। জানা গেছে সাদা মাটি উত্তোলনের পরিমান হিসাব নিকাশ রাজস্ব আদায় ইত্যাদি বিষয়ে তদারকি করার জন্য খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো প্রকল্প এলাকায় কোন কর্মচারী নিয়োগ দেয়নি।

প্রকল্প এলাকায় শ্রমিকদের সংগে কথা বলে জানা যায়, কঠোর পরিশ্রমের এ কাজে তাদের পারিশ্রমিক দেয়া হয় খুবই কম। এছাড়া, অধিকাংশ কোম্পানীগুলোতে ঠিকাদারের মাধ্যমে শ্রমিকদের কাজ করতে হয় বলে ঠিকাদাররা সময়মতো পারিশ্রমিক দেন না বলে আবু বক্কর নামে অনেক শ্রমিকের অভিযোগ রয়েছে। কোম্পানী গুলোতে মাটি উত্তোলনের কাজে মোট শ্রমিকের অর্ধেকেই আদিবাসী নারী। অনেক আদিবাসী নারী শ্রমিক অভিযোগ করেন তাদেরকে পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায মজুরী কম দেওয়া হয়। মেসার্স বাংলাদেশ ইন্সুলেটর এন্ড স্যানিটারী ওয়্যার ফ্যাক্টরী লিমিটেডের মাইনিং ম্যানেজার জানান প্রতিটি কোম্পানীতে শত শত শ্রমিক কাজ করে। এদের দৈনিক প্রায় ৬৮ টাকা হারে বেতন দেওয়া হয়। পিপলস্ সিরামিক ইন্ড্রাষ্টিজ এর জনৈক শ্রমিক অনিল চাম্বু গং জানান তাদের দৈনিক বেতন দেওয়া হয় মাত্র ৫৫ টাকা করে।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যারো থেকে কোম্পানীগুলো বছরে ১০ টন মাটি উত্তোলনের অনুমতি নিয়ে পরবর্তীতে শত শত টন মাটি উত্তোলন করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেলেও স্থানীয় প্রশাসনের কোন এখতিয়ার না থাকায় মাটি উত্তোলনের ব্যাপারে কোন রকম তদারকি করতে পারছেন না বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় ইউ.পি চেয়ারম্যান এর।

সরে জমিনে পরিদর্শন কালে উপজেলা ও ইউনিয়ন ভুমি অফিস সূত্রে জানা যায়, ১৯৮৫ সাল থেকে বেঙ্গল ফাইন সিরামিক ৯০ একর ভূমি থেকে সাদামাটি উত্তোলন করলেও আজ পর্যন্ত খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করেনি। তারা ১৫ টাকা হারে ভূমি ব্যবহার কর যা আজ পর্যন্ত পরিশোধ করেনি। এর পরও খনিজ সম্পদ উন্নয় ব্যুরো থেকে তাদেরকে প্রতি মাসে ৫ থেকে ৭ টন মাটি উত্তোলনের অনুমতি দেযা হচ্ছে। চায়না বাংলা নামে একটি সিরামিক কোম্পানী ভূমি অফিস থেকে স্থান নির্ধারণ বা ভূমি বুঝে না নিয়েও গত ৩ বছর ধরে মাটি উত্তোলন করে আসছে এবং ৩ বছরের মধ্যে কোন রাজস্বও জমা দেয়নি। এদিকে পিপলস্ সিরামিক ইন্ডাষ্ট্রিজ নামে একটি কোম্পানীও ৩ বছর ধরে ভূমি কর জমা দেয়নি। এছাড়া, বিগত সময়ে তারা ২০ একর ভূমি লীজ নিয়ে মাত্র ১১ একর ভূমির কর পরিশোধ করেছিল।

পিপলস্ সিরামিক ইন্ড্রাষ্টিজ লিমিটেড এর সহকারী জেনারেল ম্যানেজার জানান ১৯৬৪ সালে তাদের কোম্পানী বিজয়পুরে সাদা মাটি উত্তোলনের জন্য ২০ একর জমি লীজ নেয়। বর্তমানে তারা ১১ একর জমি থেকে মাটি উত্তোলন করছে। এ এলাকায় খুব উন্নত মানের সাদা মাটি পাওয়া যায়। তবে, অনুন্নত মাটির ব্যবস্থাপনায় ঢাকা পৌঁছাতে প্রায় ৫০ টাকা পরিবহণ খরচ হয়। প্রকল্প এলাকা ঘুরে দেখা গেছে এ এলাকায় কর্মরত শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত

www.pathagar.com

দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে। মাটি ধ্বসে অনেক সময় দুর্ঘটনাও ঘটে এবং ইতিমধ্যে কয়েক জনের মৃত্যুও ঘটেছে। কিন্তু এ প্রকল্প এলাকায় কোন ডাক্তার বা প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র নেই।

দুর্গাপুর বিজয়পুরের মাটির সুফল থেকে বঞ্চিত স্থানীয় জনগোষ্ঠী। এ নিয়ে তাদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি সিরামিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে এবং তা বাস্তবায়িত হলে দুর্গাপুরের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর একটি স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সুমেশ্বরীর কালো সোনা:
কয়লা, জীবিকা নির্বাহের অনন্য উপাদান

দুর্গাপুরের সুমেশ্বরী নদী থেকে কায়িক শ্রমের মাধ্যমে কালো সোনা কয়লা সংগ্রহ করে দূর্গাপুরের শত শত পরিবার আয় উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করছে বছরের পর বছর ধরে। আর এ থেকে অর্থ উপার্জন করে সংসার চালানো যায় এমনকি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া পর্যন্ত করানো যায় তারই প্রমাণ মিলেছে দূর্গাপুর উপজেলার বিরিশিরি ইউনিয়নের কাপাসকাটিয়সা গ্রামের মালেকা খাতুনের (৪৫) নিকট থেকে। দূর্গাপুরের সুমেশ্বরীর পাড়ে দাঁড়ালেই দেখা যায় শত শত মহিলা একত্রে অথবা একা সোমেশ্বরীর বালির নিচ থেকে কয়লা সংগ্রহ করছে। বিনা বিনিয়োগে আয় রোজগার করায় এ এক অপরূপ দৃশ্য। এই কয়লা উত্তোলন থেকেই হাজার-হাজার মানুষ বেঁচে যাচ্ছে।

ভারতীয় পাহাড়ীয়া এলাকায় কয়লা খনি থাকায় সেই এলাকা থেকে সুমেশ্বরীর ঢলের সাথে কয়লা আসে। এই কয়লা বালির নীচে চাপা পড়ে যায়। পানি কমলেই কয়লা সংগ্রহে লেগে যায় দূর্গাপুর ও আশপাশের এলাকার পুরুষ ও মহিলা। মহিলাদেরকেই কাজ করতে দেখা যায় বেশী।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা কাজ করে। প্রতিদিন একজন দেড় থেকে দু'মণ কয়লা সংগ্রহ করতে পারে বলে জানা গেছে। প্রতিমণ ৭০ থেকে ৮০ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। একেকজন কয়লা বিক্রি করে ১শ' থেকে দেড়শ' টাকা পর্যন্ত উপার্জন করে থাকে বলে জানা গেছে। এ সমস্ত কয়লা স্থানীয় ইটখলা এবং চায়ের রেষ্টুরেন্টে বিক্রি করা হয়। এক জরিপে দেখা গেছে, এ পেশায় ৫ থেকে ৬ হাজার মহিলা জড়িত। সারা বছরই তারা কয়লা সংগ্রহ করে থাকে। শুকনো মৌসুমের চাইতে বর্ষা মৌসুমেই বেশী কয়লা সংগ্রহ করা যায়।

চিত্র ৪.৬ : কয়লা উত্তোলনে কর্মসংস্থান

চিত্র ৪.৭ : কয়লা উত্তোলনে নিয়োজিত মহিলা

www.pathagar.com

কাপাসকাটিয়া গ্রামের স্বামী হারা এক মহিলা জানান, কয়লা সংগ্রহ করে তিনি চার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। কয়লা বিক্রি করেই তিনি নাতনীকে লেখা পড়া শেখাচ্ছেন। নাতনী এবার এসএসসি পরীক্ষার্থী। তিনি অভিযোগ করেন কয়লা সংগ্রহ করলেও স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি কমমূল্যে কয়লা বিক্রয়ের জন্য ভয়-ভীতি দেখিয়ে থাকে। অনেক সময় সারাদিন পরিশ্রমের পর অনোন্যপায় হয়ে কম মূল্যেই কয়লা বিক্রি করতে হয়। স্থানীয় হোটেল ও ইটেরভাটার মালিকরা জানান, এই কয়লা দিয়ে এলাকার লোকজনের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে ঠিকই। তবে ইটেরভাটায় এই কয়লা ব্যবহার করা খুব কঠিন। কারন কয়লার টুকরো গুলো খুবই ছোট। তবুও তারা এই কয়লা ক্রয় করছেন এবং কাজে লাগাচ্ছেন। সরেজমিনে স্থানীয় কয়েকজনের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে এই কয়লার উপর থেকে কোন টোল আদায় করা হয় না। সরকার থেকেও কোন কর ধার্য করা হয়নি। তবে আগে যেভাবে কয়লা পাওয়া যেত সেভাবে এখন আর কয়লা পাওয়া যাচ্ছে না বা ঢলের পানির সাথে কয়লা আসছে না। এরপরেও শত শত পরিবার দিনান্ত পরিশ্রম করে কয়লা সংগ্রহ এবং তা বিক্রি করে সংসার চালিয়ে যাচ্ছে (সংবাদ পত্রের প্রতিবেদন)।

সাদামাটি আহরণ ও পরিবেশের ভারসাম্য

বর্ণিত এলাকায় খনিজ সম্ভাবনাময় এলাকা বালু ও পাথর (Sand and Gravel) স্থরের ছোট ছোট টিলা এবং টিলার মধ্যে অবস্থিত উপত্যকা এর সমন্বয়ে গঠিত। খনিজ সম্পদ ব্যুরো কর্তৃক ইজারার জন্য মঞ্জুরীকৃত নালিতাবাড়ী-ঝিনাইগাহী এলাকায় সংরক্ষিত বন বিভাগের বাহিরে।

পতিত পাহাড়ী এলাকা থেকে পরিকল্পিতভাবে খনি প্রযুক্তি যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে সাদামাটি উত্তোলন ও আহরণ করা হলে পরবর্তীকালে খনি পরিত্যক্ত উচ্চ-সমতল (Table Land) ভূমি বিভিন্ন ফলের বাগান হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সাদামাটি উত্তোলনের পরে খনির পরিত্যক্ত এলাকায় যথাযথভাবে পূনর্বহাল (Reclaimed) করা হলে এবং খনি উন্নয়নে Slope Management সঠিকভাবে অনুসরণ করা হলে জমির সমতল এলাকা আবাদী ভূমি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সাদামাটি উত্তোলনের সময় পাহাড়ের পার্শ্ব-ঢাল এর (Side Solpe) ডিগ্রি অধিক হলে বর্ষাকালে ভূমি ধ্বস এর কারণে শ্রমিকদের প্রাণহানীর ঝুঁকি রয়েছে।

চিত্র ৪.৮ : সাদামাটি আহরণকৃত পরিবেশ ভারসাম্যহীন পাহাড়

ভূমি ধ্বস প্রতিরোধে পার্শ্ব-ঢাল যাতে ৪৫ ডিগ্রি এর নীচে থাকে এ দিকে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। উপত্যকা থেকে সাদামাটি উত্তোলন করে পরবর্তীকালে এসব খনন জমিকে কৃষি অথবা মৎস্য ক্ষেত্রে হিসেবে উন্নয়ন করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক নিয়মে প্রতি বছর বর্ষাকালে পাহাড়ী ঢলে উজান নদী (Upstream) এলাকার উন্মুক্ত পললসমূহ নদীর বহমান জল-ধারার সাথে প্রবাহিত হয়ে বালু,

www.pathagar.com

নুড়িপাথর ও পাহাড়ী পদার্থ বিভিন্ন অবস্থায় এই এলাকার প্রসস্ত উপত্যকা, সরু উপত্যকা ও নদীর তলদেশে জমা হচ্ছে। এই জমাকৃত বালু ক্রমান্বয়ে নদীকে ভরাট করে ফেলছে। ফলে পানি প্রবাহের স্বাভাবিক অবস্থার বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং এই সকল স্থানে Open Pit Mine-এর স্বার্থে নদীর তলদেশে ভরাট বালিও উত্তোলন করা উচিত। জমায়িত এই মূল্যবান খনিজ সম্পদ পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন উপত্যকা ও নদীর তলদেশ থেকে উত্তোলন করলে কতিপয় পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক সুফল পাওয়া যাবে। যেমন উত্তোলিত স্থানে পুনরায় বালু ও পাথর জমা হতে পারে। তাছাড়া অত্র এলাকার নদীর তলদেশ থেকে বালু ও পাথর উত্তোলন করলে নদীর গতিপথ ও নাব্যতা বাড়বে, ফলে মূল্যবান খনিজ সম্পদ প্রাপ্তি ছাড়াও এলাকার পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। পরোক্ষভাবে এই প্রকার সম্পদ আহরণ নদী ড্রেজিং এর সমতুল্য কাজ করবে। এ প্রক্রিয়াতে নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় নদী ভাঙ্গন ও বন্যার সম্ভাবনাও অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এই বর্ধিত পানি সম্পদ (Surface Water) শুষ্ক মৌসুমে এলাকার কৃষি কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। ফলে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমে আসবে ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপও হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য যে, ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে ভূগর্ভস্থ সুপেয় পানির (Drinking Water) উৎস নিঃশেষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তদুপরি এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ স্তরে রাসায়নিক বিক্রিয়া সাধন করতে পারে। এইরূপ প্রক্রিয়াতে বিভিন্ন প্রকার ধাতবজাত পদার্থ জনস্বাস্থ্যের সংরক্ষণ করা সম্ভব।

সাদামাটির খনি ও কোয়ারী সমূহ বিভিন্ন স্থানীয় যন্ত্রপাতি যেমন- কোদাল, বেলচা, শাবল, ঝুরি ইত্যাদি এবং মানব শ্রম নির্ভরশীল। এইক্ষেত্রে কোন প্রকার স্বীকৃত খনিজ প্রযুক্তি অনুসরণের তেমন কোন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি সাদামাটির সঞ্চয় ক্রমশ: নি:শেষিত হওয়ায় উত্তোলনকারীগণ ক্রমেই গভীরতর স্তর হতে সাদামাটি আহরণ করতে থাকে। অথচ আধুনিক খনি পরিকল্পনা, প্রযুক্তি অনুসরণ না করায় তাহা সম্পদ অপচয় ও শ্রমিক উভয়ের জন্যই মারাত্মক ঝুকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা (Environmental Management)

চিত্র ৪.৯ : পরিবেশ ব্যবস্থাপনাহীন সাদা মাটির পাহাড়

চিত্র ৪.১০ : অরক্ষিত পরিবেশে গো-চারণভূমি

www.pathagar.com

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিতভাবে খনি উন্নয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ আহরণ করলে ভূতাত্ত্বিক ও খনি কার্যক্রমে প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবেশের উপর কিছুটা প্রতিকূল প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা থাকে। তবে পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে খনিজ সম্পত উত্তোলন এবং সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই প্রতিকূলতা হ্রাস করা সম্ভব। খনিজ সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রচলিত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা অনুসরণপূর্বক খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও আহরণ করা হলে বর্তমান অবস্থা থেকে অধিকতর উন্নত পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হবে। বিধি অনুযায়ী ইজারা গ্রহীতাগণ মঞ্জুরীকৃত এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রয়েছে। তাই খনিজ-সম্পদ আহরণ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া একই সাথে বাস্তবায়ন আবশ্যক। তবে এই কাজে সরকারী নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থার দৃষ্টি রাখা ছাড়াও স্থানীয় সাধারণ জনগনের সহযোগীতা ও সচেতনতা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে পরিবেশ সংরক্ষন বিধিমালা ১৯৯৭ এর আলোকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক আইন থাকা সত্ত্বেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এবিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

খনিজ আহরণ চলাকালীন ও পরবর্তী সময়ে নিম্নলিখিত পরিবেশগত বিষয়ের দিকে নজর রাখা ও গুরুত্ব প্রদান করা একান্ত বাঞ্ছনীয় ।

১। প্রতি বৎসর মঞ্জুরীকৃত এলাকার বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক জরিপ রিপোর্ট ও প্রকল্পের পরিবেশগত প্রতিবেদন (Environment Impact Assessment) এর ভিত্তিতে গৃহীত পরিবেশ ব্যবস্থাপনার তৎপরতার রিপোর্ট পেশ করা ;

২। খনিজ আহরণের জন্য সংরক্ষিত বন এলাকা বিনষ্ট না করা, গাছ-পালা বিনষ্ট হলে আহরণের পরবর্তী সময়ে পরিকল্পিত উপায়ে তা প্রতিস্থাপন করা এবং Polluter's Pay Principle অনুসারে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ দেয়া উচিত ;

৩। প্রাকৃতিক নদী নালার চলমান ধারাকে বাধা প্রদান না করে এসবের প্রবাহকে চলমান রাখার উদ্যোগ নিতে হবে ;

৪। মঞ্জুরীকৃত এলাকায় লীজ গ্রহনকারী প্রতিষ্ঠান চারিপার্শ্বে সবুজ বেষ্টনী (Green Belt) সৃষ্টি করা যেতে পারে ;

৫। খনিজ সম্পদ উত্তোলনের পর সৃষ্ট বৃহৎ খাদ সমূহ মৎস চাষ উপযোগী করে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালু রাখা উচিত ;

৬। পাহাড় কিংবা ভূমির ঢাল (Slope) ভূতাত্ত্বিক গঠনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে খনন করা যাতে ভূমিধ্বসের সম্ভাবনা না থাকে, প্রয়োজনে ঢাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূ-বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;

www.pathagar.com

৭। ভূমির ব্যবহার ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনার (Landuse and Environmental Management) জন্য বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত "কমিটি" মতামতের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তিসহ যুগোপযুগী তথা পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা অপরিহার্য। এই কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন ও জনগনকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করলে অধিক সুফল পাওয়া যাবে।

উপসংহার

দেশের অন্যান্য এলাকার মতই পূর্ব ময়মনসিংহের নেত্রকোণার জলাভূমি ও প্লাবনভূমির অবস্থা আর আগের মত নেই। এসব জলাশয় মাছ, গাছ ও জীববৈচিত্র্যের অফুরন্ত ভান্ডার ছিল যা আজ বিপন্ন প্রায়। অত্র এলাকার বিরাট জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও জীবিকার প্রধান উৎস ছিল এ সব জলাশয়। টেক্সই উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন ও সহস্রাব্দ লক্ষার্জনে এ সম্পদ সংরক্ষণের কোন বিকল্প নেই। খাদ্য নিরাপত্তা সহজ ও সুলভ পুষ্টির কোন অভাব ছিল না এ এলাকায় আজ যা দ্রুত বিলুপ্তির পথে। ঔষধী গাছ ও গুল্মলতাই ছিল এ এলাকার চিকিৎসার অন্যতম অবলম্বন যা আজ বিপন্ন প্রায়। এ সব জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কোন কৌশল ও কর্মসূচি নেই। ফলে অব্যবস্থাও অবহেলায় হারিয়ে যাচ্ছে এ সব অমূল্য সম্পদ ভান্ডার। দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীকে সফল করতে হলে এসব সম্পদকে দ্রুত সংরক্ষণ কৌশল প্রণয়ন করতে হবে, সম্প্রক্ত করতে হবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে, রুখতে হবে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাঘব বোয়ালদেরকে। ভূমি ব্যবহার অব্যবস্থাপনা ও ভূমি ভিত্তিক শোষণের ইতিহাস এ দেশে কোন নতুন কথা নয়। খাদ্যোৎপাদনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সকল অনাবাদী, খাসজমি, জলাভূমি ও গোচারণভূমি আজ আবাদী ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। ভূমিসত্বের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় রাজনৈতিক সদিচ্ছা স্বচ্ছতার অভাবেই সকল ভূমি সংস্কার উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে। তাই জণকল্যাণমূখী স্বচ্ছ রাজনৈতিক সদিচ্ছা ভিত্তিক উদ্যোগ ছাড়া ভূমি সংস্কার ও ভূমির অর্থনৈতিক ব্যবহার এবং সংক্রান্ত সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এজন্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার এখনই সময়।

তাছাড়াও অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার যেমন জীববৈচিত্র্য, পশুপাখি, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও মৎস সম্পদ স্থানীয় পর্যায়ে যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে। এ সম্পদ সংরক্ষণ করা এ অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের জন্য একান্ত অপরিহার্য। তাই প্রাকৃতিক ভারসম্য, সামাজিক ভারসম্য রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কোন বিকল্প নেই। এজন্য সহস্রাব্দ লক্ষ্যার্জনে দারিদ্র বিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ের উদ্যোগের পাশাপাশি স্থানীয় উদ্যোগ থাকা প্রয়োজন ।

www.pathagar.com

দূর্গাপুর এলাকার সাদামাটি সিরামিকস্ ও পর্যটন দ্রব্য শিল্পের জন্য একটি সম্ভাবনাময় খনিজ সম্পদ। বর্তমানে অনেকগুলো সিরামিক বা ইনস্যুলেটর কোম্পানী ঐ সাদামাটি উত্তোলন ও নিজস্ব শিল্পে ব্যবহার করে আসছে। কোয়ারী বা ওপেনপিট মাইনিং এলাকা থেকে দুর্গাপুর-ঢাকা মহাসড়কে আসার প্রায় ৮ থেকে ১২ কিঃ মিঃ রাস্তা অত্যন্ত খারাপ বা পায়ে চলা পথ হওয়ায় সাদামাটি উত্তোলনের পর তা ঢাকায় এনে বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা কম। সে সাথে রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিপুল সাদামাটি অপচয় হচ্ছে প্রতিদিন। দেশের এ গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেয়ার এখনই সময়।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি

কেদার নাথ মজুমদার (১৯০৭), ময়মনসিংহের ইতিহাস

কেদার নাথ মজুমদার (১৯৭), ময়মনসিংহের বিবরণ

জেলা প্রশাসন, নেত্রকোণা, ২০০৫

ডঃ মোয়াজ্জাম হুসাইন (১৯৮৭) ময়মনসিংহ জেলা ভূমি সংস্থানের ইতিহাস, ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা ময়মনসিংহ জেলা দ্বিশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (১৯৮৭)

এম এম শওকত আলী (১৯৮৬) ভূমি সংস্কা পদক্ষেপ এবং তার প্রয়োগ

এম এম শওকত আলী (২০০২), বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থা ও রাজনীতি

মো: আবুল কাশেম (২০০৫), বাংলাদেশের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি

অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, বাংলাদেশ সরকার,

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (২০০১) মৎস্য খাতে পর্যালোচনা ও ১০ বৎসরের (২০০২-২০১২) উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নিরূপন, বিবিএস (১৯৯৬), কৃষি শুমারি, বাংলাদেশ সরকার।

Mazid,M A (২০০২) Development of Fisheries in Bangladesh Plans and Strategies for Income Generation and Poverty Alleviation, Nasima Mazid, Dhaka

সাইদুল হোসেন (২০০৪) নেত্রকোণা ও শেরপুর জেলার সাদামাটি সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রতিবেদন,

আলতাফ হোসেন (২০০৪), প্রথম আলো প্রতিবেদন

ইমাম, এম.বি ১৯৯৬, বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ১৫৯।

Mineral Commodity Summeries ১৯৯৮, U.S. Geological Survey, PP-১৪৪ - ১৪৬.

আনিসুর রহমান ১৯৯৭, বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ ও আবিস্কারের ইতিহাস।

সাইদুল হোসেন, ২০০৪ নেত্রকোণা ও শেরপুর জেলার সাদামাটি খনিজ, খজিসম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো

www.pathagar.com

তথ্য চিত্র - ১
বাংলাদেশে ভূমি-স্বত্বের ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

	মালিকানার ধরণ		কর সংগ্রাহক	রাজস্বের হার	রাজস্ব পরিশোধ পদ্ধতি
আমল	কেন্দ্রীয়	স্থানীয়			
প্রাচীন (হিন্দু আমল)	রাজা	গ্রামীণ মালিকানা	গ্রাম প্রধান	ফসলের ৬/১ থেকে ৪/১ অংশ	প্রধানতঃ ফসলে মুদ্রায় ও দেওয়া যেত
মুসলিম আমল (প্রথম পর্ব)	বাদশা	ঐ	গ্রাম প্রধান/চৌধুরী, কাননগু তালুকদার	ফসলের ৩/১ অংশ	ঐ
(দ্বিতীয় পর্ব)	বাদশা	ঐ ভাঙ্গন সূচিত	গ্রাম প্রধান / জমিদার / এবং নানাবিধ ইজারাদার / নবাব আবওয়াব (ভাঙ্গন সূচিত)	ঐ	
বৃটিশ আমল ১৭৯৩ পূর্ববর্তী	কোম্পানীর দেওয়ানী ও নামে মাত্র দিল্লীর বাদশাহ	ঐ (ভাঙ্গন ও ব্যক্তি মালিকানার সূত্রপাত)	গ্রামীণ তালুকদার/ নায়েব দেওয়ান/ ইজারাদার/পরিদর্শক কালেক্টর/রেভিনিউ	নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত লুণ্ঠন মূলক আবওয়াব	মুদ্রায় দেয়
ঐ (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী)	জমিদার	রায়তী	নায়েব, গোমস্তা তহসীলদার,পাটোয়ারী, মন্ডল, পাইক, দেকরা	ঐ	ঐ
পাকিস্তানী আমল ১৯৫০	রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে ব্যক্তি মালিকানা	জোতদার. ও অনুরূপ মালিকানার সাথে রায়তী শোষণ	রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা	বন্দোবস্তের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট হারে ও নানাবিধ উন্নয়ন কর, বর্গা প্রথায় ২/১ অংশ	মুদ্রায় দেয় এবং বর্গা প্রথার অংশ ফসলে দেয়
বাংলাদেশী আমল ১৯৭২	ঐ	ঐ	ঐ	২৫ বিঘার নীচে জমির খাজনা মাফ / রাজস্ব ও উন্নয়ন কর, বর্গা প্রথা পূর্ববৎ	ঐ

উৎস্য ঃ ড. মোয়াজ্জাম হুসাইন, ১৯৮৭

www.pathagar.com

তথ্য চিত্র - ২

বাংলাদেশে ভূমি-স্বত্বের ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারার বৈশিষ্ট্য নিরূপক সমর্থিত তথ্যাবলী

আমল	বন্দোবস্তের ধরণ	প্রধান বৈশিষ্ট্য
শেরশাহী আমলে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার	১। বঙ্গদেশ কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত; ২। প্রতি অঞ্চলের জন্যে শাসনকর্তা নিযুক্ত	রাজস্ব আদায় নিয়মিতকরণ
মুঘল আমলের বাদশাহ আকবরের সময় ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা টোডরমল্ল প্রণীত ওয়াসিল তুমার	১। সুবা সরকার ও পরগণায় প্রশাসনিক বিন্যাস করা হয়; ২। ভূমি জরিপের মাধ্যমে রাজস্ব নিরূপিত হয়; ৩। কর আদায়ের জন্যে জমিদার নিয়োগ করা হয়।	১। নিয়মিত রাজস্ব আদায় ২। কৃষি অধিকাঠামোয় সহায়তা কল্পে সেচ ব্যবস্থার বিধান
শাহ সুজার আমলে ১৬৫৭ সালের রাজস্ব বন্দোবস্ত	১। দেশকে ৩৪টি সরকার ও ১৩৫০টি মহালে বিভক্ত করা হয়; ২। রাজস্ব নির্ধারিত হয় ১৩১ লক্ষ টাকায়	রাজস্ব আদায় ও অধিকাঠামোয় সহায়তা
১৭২২ সালে মুর্শিদকুলী খাঁর বন্দোবস্ত	১। দেশকে ১৩টি চাকলা বা প্রদেশে ও ১৬৭০টি মহালে বা পরগণায় বিভক্ত করা হয়; ২। রাজস্ব ও জমাজমি বন্দোবস্ত নিয়মিত করার জন্য বিভিন্ন স্থানে কাননও কার্যালয় স্থাপিত হয়; ৩। প্রথমে ইজারাদারী ও পরে জমিদারের মাধ্যমে খাজনা আদায় হয়।	১। রাজস্বের সাথে খাস নবিস কৈফিয়ত ও তৌফির নামক তিনটি আবওয়াব পরিশোধ করতে হতো।
১৭২২ সুজা উদ্দিন খাঁর বন্দোবস্ত	জমিদারের কর প্রদানের ক্ষমতা ওপর ভিত্তি করে কর পুনঃনির্ধারিত হয়।	বর্ধিত হারে রাজস্ব আদায়
আলীবর্দীর আমলের বন্দোবস্ত	নতুন নতুন অসংখ্য আবওয়ার ও চৌথ আদায়ের ফলে রাজস্বের পরিমাণ ২৫৬ লক্ষ টাকায় উন্নীত।	ঐ
১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	১। সরকারের নিকট নির্ধারিত রাজস্ব জমার পরিবর্তে জমিদার জমির মালিক হয়, ২। জমিদার ইচ্ছামত খাজনা ও আবওয়াব বাড়াতে ও আদায় করতে পারতো; ৩। অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব হওয়ায় রায়তের জীবন দুর্বহ হয়ে ওঠে।	১। জমির মালিকানা চাষীর হাত থেকে জমিদারের হাতে চলে যায়; ২। কল্যাণমুখী সকল প্রয়াস তিরোহিত, তদস্থলে কর আদায় ও শোষণই মুখ্য হয়ে ওঠে ।

www.pathagar.com

তথ্য চিত্র - ৩

বাংলাদেশে ভূমি বন্দোবস্তের ধরণ ও প্রধান বৈশিষ্ট্য

আমল	বন্দোবস্তের ধরণ	প্রধান বৈশিষ্ট্য
১৮৮৫ সালে বেঙ্গল টেনান্সি এ্যাক্ট	রায়তদের অনুকূলে অধিকার ও স্বত্ব সংক্রান্ত কতিপয় নীতি গৃহীত হলেও তা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয় না।	পূর্বের অবস্থাই চলতে থাকে
১৯৪০ সালের ফাউড কমিশনের সুপারিশ	জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করণের সুপারিশ করা হয় বটে কিন্তু তা তখন কার্যকর করা যায়নি।	রায়তের অধিকার মেনে রায়তের অধিকার নেয়ার উদ্যোগ
১৯৫০ সালের জমিদার দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন	১। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়; ২। জমির ওপর চাষীর ব্যক্তি স্বত্ব স্বীকৃতি হয়; ৩। খাজনার মালিক রাষ্ট্র; ৪। জমির সিলিং ১০০ বিঘা (আয়ুবী আমলে তা ৩৭৫ বিঘায় উন্নীত হয়)	১। জোতদার, তালুকদার প্রকৃতি দেয় শোষণ অব্যাহত থাকে; ২। বর্গাশোষণ তীব্র হয় ও ভূমি হীনদের সংখ্যা বাড়তে থাকে।
১৯৭২ সালে ভূমি-সংস্কার অধ্যাদেশ	১। জমির সিলিং ১০০ বিঘার নামানো হয়; ২। ২৫ বিঘার নীচে জমির খাজনা মাফ; ৩। ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন তে মজুরদের অনুকূলে জমি বরাদ্দের বিষয় নীতিগতভাবে গৃহীত হয়।	৩ নম্বরে বর্ণিত বিষয়টি তাৎক্ষনিকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারেনি; ৭৫-পরবর্তীকালে এ নীতি পরিবর্তিত
১৯৮২ সালের ভূমি-সংস্কার কমিশন	১। বর্গাদারদের আইনগত স্বীকৃতি ২। কৃষি মজুরীর ন্যুনতম হার নিরূপন; ৩। জমির সিলিং কমানোর সুপারিশ।	প্রচলিত ক্ষমতা কাঠামোয় সুপারিশের বাস্তবায়নের সম্ভাবনা ক্ষীণ।
১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ	বর্গাচাষীদের অধিকার সংরক্ষণ মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে চুক্তি। ভূমি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ।	এ আইন লংঘনের জন্য কোন শাস্তির বিধান নেই।

উৎস ঃ ড. মোয়াজ্জাম হুসাইন, ১৯৮৭

www.pathagar.com

সাধারণ জীবনযাত্রা ও আচার অনুষ্ঠান

সার সংক্ষেপ

একই জাতি হলেও অঞ্চলভেদে তাদের ভিন্ন সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা ও আচার অনুষ্ঠান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ অধ্যায়ে পূর্ব ময়মনসিংহ জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভাস, সামাজিক বৈশিষ্ট্য, লোকসাহিত্য, আদিবাসীদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠান জীবন যাপন ও জীবিকাসহ বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

পুষ্টি ও খাদ্যাভাস

পূর্ব ময়মনসিংহের নেত্রকোণা জেলার জমি অত্যন্ত উর্বর বলে এখানে নানাবিধ ফসল ও ফলফলাদি জন্মায়, এগুলোর মধ্যে বেগুন উৎপাদন ছিল অন্যতম। এ প্রসঙ্গে কেদার নাথ মজুমদার তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে নাসিরাবাদ শহর তখনকার দিনে "বাইঙ্গন পুড়া শহর" বলে পরিচিত ছিল। সে সময় নাসিরাবাদের বেগুন অতি সুসাধু ও উৎকৃষ্ট বলে অত্যন্ত পরিচিত ছিল। তখন মজা করে সবাই বেগুন পুড়া ভর্তা দিয়ে ভাত খেতো। নাসিরাবাদের বেগুন ভর্তা দিয়ে থাল ভরা ভাত তৃপ্তির সাথে খাওয়া যেতো। বর্তমানে ও বেগুন পুড়া ভর্তা নেত্রকোনা অঞ্চলে যথেষ্ট জনপ্রিয়, বিশেষত নিজের ক্ষেতের গোল বেগুন হলে তো কথা নেই।

এদেশে পুষ্টিকর বিভিন্ন মুখরোচক রান্নারও একটি বিশেষ ও ঐতিহ্য রয়েছে যা আশুতোষ পাল তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। বৃহত্তর ময়মনসিংহ তথা নেত্রকোণার আদি গোষ্ঠীর খাদ্য তালিকায় নানা শাক-সব্জী-ফল-মূল-মাছ-মাংস থাকলেও তাদের তেমন রন্ধন-নৈপূণ্য বা নানা রকম খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করার পারদর্শীতা ছিল না। ভোজন বিলাসীদের রসনাতৃপ্তিকর নানা সুগন্ধি অন্নব্যঞ্জন এদেশে আর্যদের দান। সে সময় থেকেই চাল এবং চালের গুঁড়া দিয়ে প্রস্তুত নানা রকম পিঠা জাতীয় খাদ্য, মাংসের তৈরী বিভিন্ন প্রকার ব্যঞ্জন এবং দুধ থেকে তৈরী দই-ঘি-মাখন, নানা প্রকার মিষ্টান্ন ও মিষ্টি দ্রব্য তৈরী করা শুরু হয়।

অতীতের আর্থসামাজিক অবস্থা ও খাদ্যাভ্যাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার নেত্রকোণার গ্রামীন সমাজে স্বচ্ছলতার সাথে দারিদ্র্যের সহাবস্থানও ছিল। গ্রামগুলোতে উৎসবের সমারোহ ছিল; বিশেষ করে কাজাগরী পূর্ণিমায়, নবান্ন উৎসবে এবং বৈশাখী হালখাতা, মেলা, অষ্টমী ও চৈত্রসংক্রান্তিতে চিড়া-মুড়ি-নারিকেল এবং নারিকেলের তৈরী বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি দ্রব্য তৈরী করা হত। ধান থেকে তৈরী খইও সে যুগের একটি বিশেষ খাদ্য ছিল। নবান্নে খই ও মুড়ি ভাজা হতো প্রতিটি ঘরেই। বিশেষত অগ্রাহায়ন, পৌষ ও মাঘে সকালের মিষ্টি রোদে বসে ঝাল মুড়ি খাবার পারিবারিক আসর বসতো প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই। প্রতিদিন সকাল বেলা সম পরিমান ধানের বিনিময় গরম মুড়ি বিক্রি

www.pathagar.com

হতো। আজকাল পাড়ায় পাড়ায় চা বিস্কুটের দোকান হয়ে যাওয়ায় পারিবারিক ঝালমুড়ির আসর আর বসে না, বরং বিভিন্ন চায়ের দোকানে আড্ডা বসে। ফলে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে পারিবারিক আসর। মনসাপূজা পূর্ব ময়মনসিংহের তথা নেত্রকোণায় একটি প্রাচীন উৎসব, যা আজও এ এলাকার প্রতিটি হিন্দু গৃহেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ জেলার বারো মাসের সুস্বাদু, মুখরোচক খাদ্য তালিকা নিয়ে যে ছড়াটি প্রচলিত আছে, তা হলোঃ-

পৌষে কাজি, মাঘে তেল,
ফাল্‌গুনে গুড়, আদা, বেল,
চৈতে গিমা তিতা,
বৈশাখে ঘৃত-নালিতা,
জ্যৈষ্ঠে খই
আষাঢ়ে দই,
শ্রাবণে ঘোল-পান্তা,
ভাদ্রে তালের পিঠা,
আশ্বিনে শসা মিঠা,
কার্তিকে ওল
অঘ্রাণে খলিশার ঝোল।

খনার বচনে বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা জেলার প্রচলিত প্রায় সব রকম শস্য-ফল-মূল বপনের প্রণালী, ক্ষেত্র চাষের পদ্ধতি এবং ফসল কাটার সময় সম্পর্কে ছড়ার মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাগুলোকে এমন সহজ সরল ছড়ার ছন্দে বাণীবদ্ধ করা হয়েছে, যাতে অতি সাধারণ অশিক্ষিত কৃষকও এগুলো মনে রাখতে পারে। রসনাতৃপ্তিকর সাধারণ রন্ধন প্রণালী সম্পর্কে নিম্নোক্ত ডাকের বচনটি উল্লেখযোগ্য ;

নিমপাতা কাসুন্দির ঝোল। তেলের উপর দিয়া তোল।।
পলতা শাক, রুহি মাছ। বলে ডাক ব্যঞ্জন সাঁচ।।
নদগুর মৎস্য দায়ে কাটিয়া। হিং আদা লবণ দিয়া।।
তেল হলদি তাহাতে দিব। বলে ডাক ব্যঞ্জন খাব।।
পোনা মাছ জামিরের রসে। কাসুন্দি দিয়া যে জন পরশে।।

- - - - - - - - - - - - - - - - -

পাকা তেতুলি বৃদ্ধ বোয়াল। অধিক করিয়া দিহ জ্বাল।।
কাটি দিয়া করিহ ঝোল। খাবার বেলা মাথা নাহি তোল।।

মোট কথা এ জেলায় প্রকৃতি সম্পদের প্রাচুর্য এবং এ দিয়ে বিভিন্ন রেসিপি ও সুস্বাদু খাবার জনগোষ্ঠীকে পরিতৃপ্ত রাখতো। দিন দিন দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নির্বিচারে এসব প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা হচ্ছে। পরিনামে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এ অঞ্চলের অতীত

www.pathagar.com

ঐতিহ্য। প্রশ্ন হচ্ছে এ সম্পদের টেক্‌সই ব্যবহার নিশ্চিত না হলে এতো সুলভ পুষ্টি মিলবে কোথা থেকে!

মাছে-ভাতে বাঙালী

এ জেলার মানুষের খাদ্যাভাস সাধারনতঃ জলবায়ু, পরিবেশ, সম্পদের প্রাপ্তি সম্ভাবনা, আঞ্চলিক উৎপাদন ব্যবস্থা, ব্যক্তির উপার্জন সামর্থ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। নেত্রকোণার গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ হতদরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্ত। প্রাচুর্যের দুঃস্বপ্ন তারা কখনও দেখে না। শহর-বাজার এলাকাতেও অনেক গরীব লোক বাস করে এবং তাদের মধ্যে বেকার সমস্যাও প্রকট। এখানকার সাধারণ মানুষ প্রকৃতি-জাত, সহজপ্রাপ্য শাক-মাছ-ভাতই বেশী খেয়ে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হয়েছে, ফলে তরি-তরকারী, মাছ-মাংসের পরিমাণও জনসংখ্যানুপাতে মারাত্মকভাবে কমে যাচ্ছে। অনেকেই মনে করেন যে, অতীতকালে মানুষ বর্তমান মানুষের চেয়ে বেশী সুখী ছিল। কিন্তু ব্যক্তিমালিকানায় সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার পর থেকে পৃথিবীর অনেক দেশেই সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। নেত্রকোণাও এর ব্যতিক্রম নয়। সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও, এ জেলাতেও স্বচ্ছলতা এবং দারিদ্র্য অনাদিকাল থেকেই হাত ধরাধরি করে চলছে। এ জেলার মানুষের মাথাপিছু সম্পদের ভাগ কমে আসছে দ্রুত হারে। সম্পদ উৎপাদন ও বৃদ্ধির প্রধান উপায় হচ্ছে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য। এ জেলার শিল্পজাত দ্রব্যাদির পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না, বর্তমানেও নেই বললেই চলে। পরিকল্পিত ভাবে ব্যাপক শিল্পায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের সুযোগ একেবারেই সীমিত বলা চলে।

এ অঞ্চলের হত দরিদ্রদের সুলভ ও সস্তা পুষ্টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গ্রামীণ শাক সবজী ও হাওর, বাওর ও বিলের নানা প্রকারের মাছ। আশুতোষ পাল তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য যাত্রার প্রাক্কালে তার স্ত্রী সনকা চাঁদের পরিতৃপ্তির জন্য যে সকল আহার্য দ্রব্য ও খাবার তৈরী করেছিল, দ্বিজবংশীদাস মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যে তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে বিশেষ করে মাছের বিভিন্ন রেসিপি ও মজাদার খাবারের বর্ণনা রয়েছে।

ত্রিপদী ঃ কেহ মাছ মাংস কাচে, কেহ বা হরিদ্রা বাটে, কেহ ব্যঞ্জনের সজ্জা করে।
কেহ দুগ্ধ আবর্ত করি, থইলেক সারি সারি, দধি ঘৃত নানা উপহারে ।।১।।

পয়ার ঃ নিরামিশ ব্যঞ্জন ঘৃতেত সারিয়া।
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধে তৈলপাক দিয়া।।১।।
বড় কই মৎস্য পুর্নি আঞ্জি করিয়া।
জিরা মরিচ মাখি ঘৃতেত ভাজিয়া।।২।।
কাতলের কোল আর মাগুরের চাকি।

www.pathagar.com

চিতলের কোল ভাজে মশলায় মাখি। ।৩। ।
ইলিশা তিলত করে বাচা ভাজে নানা।
শকুলের খাড়কি আর শকুলের পণা। ।৪। ।

কবি নারায়ণ দেব রচিত পদ্মপুরাণে বেহুলার ভ্রাতৃবধু তারকাসুন্দরী লক্ষীন্দরকে খাওয়ানোর জন্যে যে সকল ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেছিল, তার দীর্ঘ তালিকা আছে। এ তালিকাটিতেও বৃহত্তর ময়মনসিংহ তথা নেত্রকোণা জেলায় উৎপাদিত ও সহজলভ্য প্রায় সব রকমের শাক-সব্জী, তরি-তরকারী ও মাছ-মাংসের উল্লেখ রয়েছে, যা এ জেলার জনগোষ্ঠীকে সস্তা ও সহজলভ্যভাবে পুষ্টি যোগান দিয়ে আসছে। এ অঞ্চলের রন্ধন প্রণালীর বৈশিষ্ট ও বৈচিত্র্য ছিল অপূর্ব। তৎকালীন স্বচ্ছল পরিবারের রসনা তৃপ্তিকর আহার্যের তালিকায় এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

নানা পরিপাটি করি করিলা রন্ধন।
বহুশ্রমে করিলেক অনেক ব্যঞ্জন। ।১। ।
পায়স পিষ্টক যত লোকাচার থাকে।
সকল রান্ধিলা কন্যা মনের কৌতুকে। ।২। ।
পাতিল মার্জন করি দিলা তৈলপাক।
রোহিতের মুন্ড দিয়া রান্ধে মূলা শাক। ।৩। ।
সরিষার শাক রান্ধে ইলিশার শিরে।
কুমড় বেগুন লাউ রান্ধে তার পরে। ।৪। ।
শউল মূলারে তবে করিলা রন্ধন।
কাতলের মুড়িখন্ড রান্ধিলা তখন। ।৫। ।
শেফালী নালিতা পাতে তিক্ত আছে ভাল।
মাগুরে মরিচে রাধে মিষ্টি মিষ্টি ঝাল। ।৬। ।

কবিতাটিতে এ অঞ্চলের উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার মাছ রান্নায় তরিতরকারী ব্যবহারের বর্ণনা রয়েছে। যেগুলো বিভিন্ন ঋতুতে জন্মে; সারা বছর ধরে এগুলোর চাষ হয়। তবু, এগুলো এ জেলার মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকার অংশ ছিল এবং আজো রয়েছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ভূমিক্ষয়ের ফলে দ্রুত বর্ধিত চাহিদা মিটানো ক্রমশই জটিল হয়ে পড়ছে যা, আগামী দিনের জন্য ভাবনার বিষয়।

গ্রামীণ এবং নগরবাসীগণ বর্তমানে যেমন ইট-কাঠ-টিনের ঘরে বাস করে, অতীতেও এ ভাবেই তারা বিভিন্ন ধরণের ঘরে বাস করতো। দরিদ্ররা বাঁশ, খড় ও ছনের ঘরে বাস করতো বর্তমানে যা বিলুপ্তির পথে। প্রাকৃতিক সম্পদের ধনভান্ডার থাকা সত্ত্বেও এ জেলার জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক দূরাবস্থার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় গতিশীল রাজনৈতিক

www.pathagar.com

নেতৃত্বের অভাব। সামাজিক সচেতনতা এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তৎপর করে তুলার মত নেতৃত্বের মুখ কোনদিন দেখেনি এ অঞ্চলের মানুষ, যেমনটি পেয়েছে দেশের কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও সিলেট অঞ্চলের জনগোষ্ঠী। এখন সময়ের চাহিদা, তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা, জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত ও সামাজিকভাবে উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়া।

সাজ পোশাক

অতীতের সামাজিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্য আজকাল আর নেই। কেদার নাথ মজুমদার তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, পোশাকের মধ্যে কজনা ও চন্দ্রকোণার ধুতি ভদ্রলোকেরা ব্যবহার করতেন। স্ত্রীলোকেরা গণফেস, মেঘডুম্বুর, রাসমণ্ডল প্রভৃতি "তোলা কাপড়" রূপে ব্যবহার করতো, তঞ্জাব, মসলিন, জামদানি, জঙ্গিল খাসা প্রভৃতি ধনীগৃহে ব্যবহৃত হতো। পুরুষ লোকের বাবরী বা লম্বা চুল রাখার সখ ছিল। যে মসলিন ও জামদানীর নামে সারা বিশ্বে বাংলাদেশ পরিচিত, সুস্থ ব্যবস্থাপনার অভাবে এর সত্ত্ব (Property Rights) আজ প্রায় বিলুপ্ত ।

অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকেরা শরীরে "আঙ্গারখা" ও পায়ে দিলুয়ালী বা নাগরাই জুতা ব্যবহার করতেন। বড় লোকেরা থানচাঙ্গ, দোলা ও মহাপায়ায় যাতায়ত করতেন। যাঁরা পায়ে হেঁটে যেতো তাঁদেরও পশ্চাতে বাহকগণ আরাঙ্গী ছাতা নিয়ে যেতো। সাধারণ গৃহস্থেরা হাতি যুগীর "ঠেটি" কোমরে পেচ দিয়া বা নেংটীরূপে পরিধান করতো। সাধারণ ভদ্রলোকেরা অপেক্ষাকৃত বড় যুগীর ধুতি পরিধান করতেন।

আদিকালে ছেলে পেলেরা ৮-১০ বছর বয়স পযন্ত সাধারণত নেংটাই থাকতো। ঐরূপ ছেলেদের হাতে বাজু ও বালা, গলায় মালা ও অন্যান্য অলঙ্কার থাকতো। বৃদ্ধেরা একবস্ত্রে গৃহ থেকে বের হতেন না। স্ত্রীদের অলঙ্কার অর্থ রক্ষার জন্য করা হত। স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কারের মধ্যে মাথার ফেচুয়া, গলার হাসুলি, নাকের নথ, নাকফুল, বলাক ও হাতের কাটাবাজু, জসম, বাহু, কোমরের চন্দ্রহার, পায়ের বেকখারু, গোলখারু, হারবেকী প্রভৃতিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলো বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে একেবারে সেকেলে হয়ে গিয়েছে। অতি নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেও বর্তমান সময়ে এগুলো ব্যবহার করতে প্রায় দেখা যায় না। কেননা বর্তমান পাশ্চাত্য জগতের নতুন ডিজাইন ও ফ্যাশনের কাছে অতীত ঐতিহ্য যত্নের অভাবে আজ বিপন্ন প্রায় ।

খেলা ধুলা

ছেলেপেলে ও যুবকদের জন্য নৌকা দৌড়ান ও ঘুড়ী উড়ান আমাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। বড় বড় "ধাউশ" ঘুড়ী শণের সুতার দ্বারা উড়ান হতো। ষাঁড়ের লড়াঁই, মোড়গ লড়াঁই, বুলবুলের লড়াই, কুস্তী প্রভৃতি বিশেষ আমোদপ্রদ ছিল। এ সকল আমোদ প্রমোদের নির্দিষ্ট সময়ও ছিল। বালকেরা পূর্বে হাডুডু, পলাপুঞ্জি, গোল্লা ছুট, মলদাইর প্রভৃতি খেলা

www.pathagar.com

খেলতো। প্রায় সারা বৎসরে বারামাস, দাড়িয়াবান্দা মূলত শীতকালে বিশেষত চাঁদনী রাতে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব ও রুচির পরিবর্তনের ফলে বর্তমান সময়ে এ খেলার নাম পর্যন্তও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আদিকালের মতো বর্তমানে ও এই সব আমোদ প্রমোদের উপাদান নেত্রকোণায় গ্রামে গঞ্জে বেশ জনপ্রিয়। যা সংরক্ষণ করার জন্য স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে উদ্যোগ প্রয়োজন।

অতীতে এ অঞ্চলে গোলন্দাজ, পলারি, তিরন্দাজ, শিকারী ও লাঠি খেলোয়াড়দের খুব সম্মান ছিল। জমিদার তালুকদারেরা প্রচুর অর্থ দ্বারা তিরন্দাজ, গোলন্দাজ, লাঠিয়াল প্রতিপালন করতেন। তারা তীর, ধনু, কামঠা, টেটা, পেচ, কবচ, শাঙ্গ, বল্লাম প্রভৃতি ব্যবহার করত। তখন তুড়াদার বন্দুক ছিল, পলিতা দ্বারা তাতে আগুন ধরাতে হত। আদিকালে বন্দুকের ব্যবহার ছিল বন্য পশু পাখি শিকারের জন্য। পশু শিকারের স্থলে মানুষ মানুষের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হওয়ার ফলে আজকাল পিস্তল, রিভল্ভার ইত্যাদির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ভদ্র সমাজে। জনপ্রতিনিধি, ভিআইপি ও নিরাপত্তা কর্মীরা সকলেই এসব ছোট অস্ত্রের লাইসেন্স পেয়ে থাকেন ।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও লোক সাহিত্য

নেত্রকোণা অঞ্চলের লোককথা সবসময়ই তাৎপর্যপূর্ন। সবচেয়ে ব্যতিক্রম বিষয় হলো প্রতিটি গ্রামের জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, চলা-বলা, চাল-চলনে ছিল পৃথক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। তা দিয়েই নেত্রকোণার লোক সমাজের গাঁথুনীর দৃঢ়তা বিচার করা যায়। আর সকলের ধারণা এই গ্রামসমাজের সুদৃঢ় বুনটের পিছনে রয়েছে লোকজ ক্রীড়া জগতের অবদান (গোলাম এরশাদুর রহমান, ১৯৯৫)।

প্রাকৃতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতিতে অনন্য ছিলো এ অঞ্চল। অন্যান্য গ্রামীণ অঞ্চল থেকে এ জনপদেও ছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে। মৈমনসিংহ গীতিকা'র বিভিন্ন পালায় ময়মনসিংহের গ্রামীণ জীবন বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। মৈমনসিংহ গীতিকা'র গাঁথাগুলো জনশ্রুতিমূলক বিভিন্ন কাহিনী, সত্য ঘটনা এবং কিংবদন্তিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মতো পালাগুলোও লোকমুখে রচিত ও প্রচলিত।

মৈমনসিংহ গীতিকার পালাকারদের কাছে ধর্মীয় কোন আদর্শ বা সংস্কার বড় করে তুলে ধরা হয়নি। তাদের সামনে কোনো দেবমূর্তিও ছিলোনা। পালাকারদের রচনায় মানব জীবনের আবেগ ও মূল্যবোধই বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রে সংঘাত এসেছে কখনো গোষ্ঠীগত আবার কখনো বা ব্যক্তিক চেতনাজাত দ্বন্দ্বের কারণে। এ সংঘাত আবার এসেছে ক্ষমতাবান পুরুষের স্বার্থোদ্ধারজনিত ষড়যন্ত্রের কারণে, আবার কখনো বা সম্প্রদায়ের ভিন্নতার কারণে।

www.pathagar.com

অকৃত্রিমতাই পালাগুলোর প্রধান গুণ বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। গাঁথাগুলো সম্পর্কে এক সমালোচক মন্তব্য করেছেন- 'গাঁথাগুলো একাধারে নারী নির্যাতনের ও নারী মহিমার প্রচারকাব্যও বটে। উনিশ শতকের আগে নারীর প্রতি এত শ্রদ্ধা বা মমতা সুলভ ছিল না জীবনে কিংবা শাস্ত্র ও সমাজে'। পালাকারগণ সমাজকে, সমাজের মানুষকে সামগ্রিকভাবে অবলোকন করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবন ও জগত থেকেই কাহিনী নির্বাচন, ঘটনা বিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ করেছেন। পালাগুলোতে জীবনবোধের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো কবেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তবু গভীরভাবে চিন্তা করলে লক্ষ্য করা যায় নেত্রকোণা অঞ্চলে আজো বৃদ্ধা মা হলো পরিবারের ঐক্যের কেন্দ্র বিন্দু। ছেলেরা শহরে দূরাঞ্চলে বসতি গড়ে তুললেও, যতদিন মা জীবিত থাকেন মায়ের টানে ঈদে, পূঁজা-পার্বণে বা উৎসবে ছুটে আসে মায়ের স্নেহ নীড়ে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বিলুপ্ত হলেও, নিশ্চিহ্ন হতে পারেনি। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর আর এই আগমন ঘটতে বড়বেশী দেখা যায় না। তাই লোকমুখে বলতে শোনা যায়-

মা নাই যার
পোড়া কপাল তার।

ময়মনসিংহের লোক সাহিত্যে মানব গোষ্ঠীর স্বাধীন প্রণয়সাধনা তথা মুক্ত জীবনের চিন্তা ও আকাঙ্খা প্রকাশের সহজাত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যা নেত্রকোণা অঞ্চলেও বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় এ এলাকার লোক সাহিত্যের চরিত্র, জীবন সংগ্রাম, ভবিষ্যতে সৌন্দর্যের দীপ্তি ও প্রনয় গভীরতা তাদেরকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহ ময়মনসিংহের লোক সাহিত্যের স্বর্ণখনি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। গীতিকাসমূহে এ অঞ্চলের জীবনবোধের এবং জীবনালখ্যেও যে প্রতিফলন ঘটেছে-এক কথায় তা অপূর্ব ও অনন্য। সামাজিক সাম্যের অনুপস্থিত প্রণয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্যা ও সংকটে প্রকাশ পেয়েছে, সেই সমস্যা ও সংকটের পার্শ্বচিত্র যেনো গীতিকাসমূহ। গীতিকাসমূহে স্বাভাবিকভাবেই ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলের তথা নেত্রকোণার নৈসর্গিক, ভৌগলিক, নৃতাত্ত্বিক পরিবেশ উম্মোচিত হওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তি-আকাঙ্খার উৎসারণ ঘটেছে।

গীতিকাসমূহের তাৎপর্য পর্যালোচনা করলে বৃহত্তর ময়মনসিংহের তথা নেত্রকোণার লোক সঙ্গীতের কথা ও প্রসঙ্গে এসে যায়। মেয়েলী গীত, ছড়া, জারীগান, 'হাইর' বা সারি গান, গাডু বা ঘাটু গান, বারমাস্যা বা বারমাসী, বাউলগান, লোকায়ত শিল্পকলা ইত্যাদি ও নেত্রকোণার লোকসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ময়মনসিংহ গীতিকা সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন- 'স্থানীয় প্রকৃতি এবং জীবনই ময়মনসিংহ গীতিকার প্রধান উপজীব্য এবং ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বাঞ্চলই তথা

www.pathagar.com

নেত্রকোণা অঞ্চল ময়মনসিংহ গীতিকার 'ভুগোল'। প্রাকৃতিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতিতে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিলো এ অঞ্চল। অন্যান্য গ্রামীণ অঞ্চল থেকে এ জনপদ আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার মধ্যেই এ জনপদের স্বাতন্ত্র লক্ষ্য করা যায় ।

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে যে সমাজচিত্র বিবৃত হয়েছে, তার গুরুত্বও অপরিসীম। গীতিকাসমূহের উদ্ভব-কাল, ভাষা, কাহিনী নির্বাচন, ঘটনা বিন্যাস শৈল্পিক ও অত্যন্ত উন্নতমানের। গীতিকাসমূহে নারী চরিত্রসমূহের প্রেমের দুর্জয় শক্তি এবং আত্মমর্যাদার বৈশিষ্ট্য ও পবিত্রতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ প্রসঙ্গে মযহারুল ইসলামের মন্তব্য করে বলছেন- "বাংলা লোককাহিনী গুলোকে যদি বাঙালীর কল্পনার রঙিন আলোকে রঙিন বলা চলে, তবে ময়মনসিংহের গীতিকাগুলোকে বলতে হয় সমাজের বাস্তব জীবনালেখ্য"। মযহারুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছেন- "বলিষ্ঠ আত্ম প্রত্যয়োন্মুখ নারীর জীবনে সমাজের স্বৈরাচারের ফলে যে দুর্দৈব নেমে এসেছে, গীতিকগুলি যেন তার মর্মবেদনায় মুখর'। দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন- 'পালাগানের অধিকাংশই ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলের কোন কোন যথার্থ ঘটনা অবলম্বনে রচিত হয়েছে। যে সকল ঘটনা অশ্রুসিক্ত হয়ে লোকেরা শুনেছে, সকল অবাধ ও অপ্রতিহত যমের দুর্জয় চক্রের ন্যায় সরল নিরীহ প্রাণকে পেয়ে চলে গেছে- সে সকল অপরূপ করুণ কথা গ্রাম্য কবিরা পয়ারে গাঁথে রেখেছেন।'

গীতিকাগুলোতে সমাজের শাসক ও শোষকের ভূমিকা বিধৃত হয়েছে। আন্তরিক প্রণয়াবেগ, মানবীয় ঔদার্য, সংবেদনশীলতা, উন্নত চরিত্র গীতিকাসমূহে প্রাঞ্জল ভাষায় রূপায়ন করা হয়েছে। 'মহুয়া', 'দেওয়ান-ভাবনা' সংবেদনশীলতা, উন্নত চরিত্র গীতিকাসমূহে ভাষা পেয়েছে।

'মৈমনসিংহ গীতিকা'র উল্লেখযোগ্য একটি পালা মহুয়া'। এর ছত্র সংখ্যা ৭৭৫, প্রতিটিতে এ অঞ্চলের জনজীবনের বিভিন্ন চিত্র ও চরিত্রের রূপায়ন ঘটেছে। বিভিন্ন সমালোচকের মতে মহুয়া পালাটি বৃহত্তর ময়মনসিংহের তথা নেত্রকোণা অঞ্চলের সমাজ জীবনে ঘটা অনুরূপ কোন ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নেত্রকোণা ও ময়মনসিংহের লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে ময়মনসিংহ গীতিকার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ১৯২৩ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১০টি পালা নিয়ে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত হয়ে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়।

'মৈমনসিংহ গীতিকা'র পালাগুলোতে ময়মনসিংহ অঞ্চলের স্থান-কাল-পাত্র তথা ভৌগলিক অবস্থান ও পরিবেশের পরিচয় বিধৃত হয়ে উঠেছে। কাহিনীসমূহের চরিত্র এবং চরিত্রসমূহের মুখের ভাষা ও শব্দের উচ্চারণ এবং প্রয়োগ ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার প্রতিধ্বনি।

www.pathagar.com

পালাগুলো যে ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিদেরই রচিত এ নিয়েও সংশয়ের অবকাশ নেই। পাশাপাশি এ-ও বলা যায় যে, পালাগুলো ময়মনসিংহ বিভিন্ন অঞ্চলের গায়েনরা সাধারণ মানুষের চিত্তবিনোদনের উপযোগী করে রচনা করেছেন।

পালাগুলো চন্দ্রকুমার দে ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে দীনেশ চন্দ্র সেনকে দিয়েছিলেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলের অধিবাসী এবং চন্দ্র কুমার দে'র প্রতিবেশী রওশন ইয়াজদানী বলেছিলেন– 'ময়মনসিংহ গীতিকায় সংগৃহীত পালাগান সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন ভুল ধারণা নেই। আমারই প্রতিবেশী চন্দ্র কুমার দে যেখানে যেমনটি শুনেছিলেন, কাহিনী ঠিক তেমনটিই সংগ্রহ করেছিলেন। তবে দু একটি পালার নামকরণে অনাধিকার হাত দেয়া হয়েছে, একথা চন্দ্র কুমার দে জীবদ্দশায় তাঁর বাড়িতে বসেই স্পষ্ট স্বীকার করে নিয়েছিলেন; যেমন– 'বাদিয়ানীর পালা'র 'মহুয়া' নামকরণ অথবা 'উনার বাইদ্যাকে 'হুমরা বেদে' বলে উল্লেখ, 'আলালের দুলাল' পালার দেওয়ানা মদিনা নামকরণ ইত্যাদি। মৈমনসিংহ গীতিকায় ময়মনসিংহের বিচিত্র জনজীবন প্রতিফলিত হয়েছে। এতে নিত্যদিনের জীবনাচারণ, উচ্চারিত ভাষা কাঠামো যে ময়মনসিংহ অঞ্চলের জনজীবন ও ভাষারই প্রতিনিধিত্ব করে সে সম্পর্কে বলার অবকাশ থাকে না।

গীতিকায় সংকলিত বিভিন্ন পালাগুলো একই সময়ে রচিত নয়। পালাগুলো বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছিলো। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যেই পালাগুলো রচিত হয়েছিলো বলে ধরে নেওয়া যায়। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র বিভিন্ন পালায় কাহিনীর যে পরিণত রূপ পাওয়া যায়, তা-ও অনেক দিনের সৃষ্টি বলে ধারনা করা হয়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই কাহিনীগুলো পরিণত রূপ লাভ করেছে। সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবনে অভিব্যক্তি থেকেই গীতি অভিনয় উৎসারিত হয়েছে। লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো এই পালাগুলোও লোকমুখে রচিত ও প্রচলিত।

জনশ্রুতিমূলক কাহিনী বা কিংবদন্তীকে কেন্দ্র করেই 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র গাঁথাগুলো গড়ে উঠেছে। মৈমনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালাসমূহ এভাবেই রচিত হয়েছে। তবে পালাগুলোর রচনাকাল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলার অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে এবং মতানৈক্য থাকাই স্বাভাবিক। ডঃ আহমদ শরীফ মৈমনসিংহ গীতিকার সময়কাল নির্ধারণ করেছেন পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। পালাগুলোর সময়কাল নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে কঠিন। পালাগুলো কবে কখন থেকে রচিত হয়ে জনমুখে প্রচলিত হতে হতে বর্তমান রূপ লাভ করেছে-সে সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে এসব পালায় চিত্রিত জনজীবন ও সমাজ ব্যবস্থার রূপ দেখে বলা যায় যে, পালাগুলোতে আদিম, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব প্রত্যক্ষ। এ প্রভাব থেকে পালাগুলোর প্রাচীনত্ব সম্পর্কেও নিঃসন্দেহ নিশ্চিত হওয়া যায়।

www.pathagar.com

'মৈমনসিংহ গীতিকা'র বিভিন্ন পালায় কাহিনীর যে পরিণত রূপ পাওয়া যায়, তা অনেক দিনে সৃষ্ট হয়েছে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করেই পালাগুলো পরিণত রূপ পরিগ্রহ করেছে। মৈমনসিংহ গীতিকায় শ্রমজীবী মানুষের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ঐতিহ্য সংস্কার ও বিশ্বাস ও উঠে এসেছে পালাসমূহে। কৃষিজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবন পালাগুলোতে স্পষ্ট হয়েছে উঠেছে। পালাগুলোতে শাসকশ্রেণীর প্রণয় বাসনায় আন্তরিকতার অভাব, হৃদয়ের গভীরতার পরিবর্তে ইন্দ্রিয়জ আকাঙ্খাই প্রবল হয়ে উঠেছে। আজকাল নারী অধিকার এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা নিয়ে নানাবিধ গবেষণা, দেশে, বিদেশে সেমিনার, কনফারেন্স করে সর্বস্তরে গনসচেতনার নানামূখি উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। অথচ নারী চরিত্রের দৃঢ়তা, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের ভূমিকা এবং বঞ্চনাকে নিয়ে ময়মনসিংহ গীতিকা চারশত বৎসর আগেই অত্যন্ত সাবলীল ভাবে রূপায়িত করা হয়েছে ।

মৈমনসিংহ গীতিকায় গ্রামবাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও তাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে। নারীর মুক্ত জীবনাকাঙ্খা ও স্বাধীন প্রণয়বাসনার প্রকাশও ঘটেছে। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরা পুরুষের দ্বারা যে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও নিগৃহীত-এর সত্যটিও বিভিন্ন পালায় ওঠে এসেছে। বিবাহোত্তর জীবনেও পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি যে নারীর জীবনকে দুর্বিসহ, করুণ ও মর্মান্তিক করে তোলে-এটিও গীতিকায় ওঠে এসেছে। মৈমনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্রগুলো বিশেষত্ব লাভ করেছে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্যে, প্রেমের একনিষ্ঠতায়, নারীধর্মের প্রত্যয়ে চারিত্রিক দৃঢ়তায়, প্রেম-নিষ্ঠায়, ব্যক্তিত্বময়তায়, প্রাত্যহিক জীবনাচরণে, ত্যাগ-তিতিক্ষায় ময়মনসিংহ গীতিকায় নারী চরিত্রগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠেছে।

নারী জীবনে প্রেমকাহিনী প্রধান বিষয় হলেও আপামর মানুষের বিচিত্র অনুভূতি ও অভিব্যক্তি প্রকাশের মধ্য দিয়ে পালাগুলো সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। হিংসা, ঈর্ষা, রাগ, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা মানুষের প্রবৃত্তির কুৎসিত অথচ বাস্তব দিকই ফুটে উঠেছে মৈমনসিংহ গীতিকায়।

মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলো কখনোই সামাজিক প্রেক্ষাপটের বাইরে নয়। এগুলো জনবিচ্ছিন্ন কাহিনী হিসেবেও গড়ে উঠেনি। পালাগুলোতে তৃণমূল পর্যায়ের সর্বস্তরের জনসাধারণের জীবন চিত্র ফুটে উঠেছে। আর তাই কৃষি নির্ভর সামন্তবাদী সমাজ জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রায় সর্বস্তরের জনসাধারণের চিত্রই এখানে ফুটে উঠেছে। একজন নারী বা পুরুষ তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ও প্রেক্ষাপটে যতোগুলো ভূমিকা গ্রহণ করে, গীতিকার পালায় তার সবগুলোই বাস্তব জীবনের প্রতিফলন বলে পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যায়, 'ময়মনসিংহ গীতিকা' সকল স্তরের জীবন সম্বলিত বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। একই সঙ্গে এটি জাতীয় সম্পদ। বিচিত্র শ্রেণীর জনজীবনকে ঘিরে মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলো বিন্যস্ত হয়েছে। সকল স্তরের মানুষের পরিচয়ও মৈমনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালায় দেখা

www.pathagar.com

যায়। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-চন্ডাল, শিকারী-জেলে, দাস-দাসী সর্বস্তরের মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় মৈমনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালায়। পেশাজীবী বিচিত্র মানুষের ও তাদের জীবনাচারণের পরিচয়ও এখানে বিধৃত হয়েছে প্রানবন্ত করে। স্বাভাবিকভাবেই কৃষি নির্ভর জীবনে কৃষিজীবী মানুষের ছবি এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। লক্ষ্যণীয় এই যে, সামন্তবাদী সমাজ জীবনের এক স্তরে রয়েছে কৃষিজীবী সাধারণ মানুষ, অন্য স্তরে রয়েছে শাসক শ্রেণী ও বণিক শ্রেণী। প্রত্যেকের কথাই পালাগুলোতে ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন পালার প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রগুলো গ্রাম বাংলার শাশ্বত মানব-চরিত্র, দোষে-গুণে ভরপুর সহজ সরল জীবনাচারণে অভ্যস্ত বলেই তাদের জীবনের স্বাভাবিক সৌন্দর্যও সকলকে আকৃষ্ট করেছে।

নারী জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে কেন্দ্র বিন্দু তা অত্যন্ত পরিস্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র জনজীবনে নারীর ভূমিকাই প্রধান। গীতিকার অধিকাংশ পালাই নায়িকা কেন্দ্রিক। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, নায়িকারা পতিব্রত্যে, ত্যাগে, ধৈর্য্যে, সহিষ্ণুতায়, সরলতায় চিরন্তন বাঙালি নারীর প্রতিনিধি হিসেবেই চিত্রিত হয়েছে। যা চির শ্বাশ্বত নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট। মহুয়া ছাড়া মলুয়া, মদিনা, লীলা একেবারেই গ্রাম-বাংলার শাশ্বত বাঙালি নারীর স্বরূপে ও মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'মহুয়া' ছাড়া মদিনা লীলা একবারেই গ্রাম বাংলার শ্বাসত বাঙালী নারীর স্বরূপে ও মহিমায় উজ্জল দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। 'মহুয়া' পালায় দেখা যায় 'নদের চাঁদ' সুখী স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনে অভ্যস্থ। জীবিকার জন্যে তার কোনো ভাবনা কিংবা সংগ্রাম নেই। এদিক থেকে অন্যদের তুলনায় সে ব্যতিক্রম। নদের চাঁদ তার সামাজিক অবস্থান ও পদমর্যাদার কারণেই অনেকটা নির্বিরোধ আবেগতাড়িত চরিত্র। কোনো ব্যাপারেই গভীর চিন্তার বহিঃ প্রকাশ নেই তার চরিত্রে। সব কিছুই সে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করে। নাদের চাঁদ সামাজিক বৈষম্যেও বিশ্বাসী নয়। নদের চাঁদ সুখী, নিশ্চিত জীবনের প্রতিনিধিত্ব করেছে। নদের চাঁদের জীবনাচারণ, আবেগতাড়িত জীবনধারা সব কিছুই স্বসমাজের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। প্রেম বিশ্বস্ততা এবং প্রেমের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগের মহিমা নায়কের কাছে তার মর্যাদা উন্নীত ও মহৎ করেছে। এ ভাবেই বৃহত্তর ময়মনসিংহের ও নেত্রকোণা অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মহৎ চরিত্রের রূপায়ন করা হয়েছে বিভিন্ন চরিত্র চিত্রনের মাধ্যমে ।

গীতিকাসমূহের নাট্যরস (Dramatic Element) সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংঘাতময় নানা অভিব্যক্তি ব্যক্ত হয়েছে এসব গাঁথায়। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় সাধারণ গরিব পরিবারগুলোর গৃহ ও গৃহপারিপার্শ্বিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে গীতিকাসমূহে। 'মহুয়া' গাঁথায় জমিদার নদের চাঁদ বেদে দলকে বসবাসের জন্য ভূমি দিলে, সেখানে তারা গৃহ ও বাসোপযোগী পরিবেশ রচনা করে। নেত্রকোণার গ্রামাঞ্চলে ভূমিজোতদারদের পতিত বাড়িতে ভূমিহীনদের থাকতে দেয়া এবং তাদের ক্ষেত খামারে কাজ করার সুযোগ সুবিধা

www.pathagar.com

ইত্যাদি ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক চিত্র। স্বচ্ছল কৃষক জীবনের পাশাপাশি গরিব অর্ধাহারী-অনাহারী-বস্ত্রহীন কৃষকজীবনের চিত্রও মৈমনসিংহ গীতিকায় দেখা যায়। 'মহুয়া' গাঁথায় চন্দ বিনোদ হত দরিদ্র কৃষক। অবস্থাটা এমন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শস্যহানি হলে তাকে অনাহারে থাকতে হয়, ছিন্নবস্ত্রের কারণে শীতে কষ্টকর জীবন নির্বাহের পাশাপাশি অর্থাভাবে ধর্মকর্ম থেকে নিবৃত থাকতে হয় তাকে ;

'উত্তরিয়া শীতে পরান কাঁপে থরথরি
ছিড়া বসন দিয়া মায় অঙ্গ রাখে মুরি॥
ঘরে নাই সে লক্ষ্মীর দানা লক্ষ্মী পূজার তরে'॥
(মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃষ্ঠা-৪৭)

বিষয়বস্তু ও ভাবগত- উভয়দিক থেকেই ময়মনসিংহের গীতিকাগুলো বাংলা সাহিত্যের এক ঐশ্বর্যময় সম্পদ। চরিত্রগুলোর মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। লোক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হওয়ার সুযোগ নেই। মৈয়মনসিংহ গীতিকায় অভ্যন্তরীণ জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য যথার্থভাবে উপলব্ধির জন্যে বিভিন্ন গীতিকায় রচনার সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় জীবনের চরিত্র ধর্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসম্পর্কে সৈয়দ আজিজুল হক মন্তব্য করে বলেছেন- 'সংগ্রামশীল মানবগোষ্ঠীর 'ঘটনাধীন বিবর্তনশীল জীবনধারার সকল সৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করেই লোকসাহিত্য পৃথিবীর সর্বত্র বিকশিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে। ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহও এর ব্যতিক্রম নয়'।

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে প্রণয়াবেগের স্বাধীনমনস্কতা যেমন পরিলক্ষিত হয়, তেমনি আরো প্রত্যক্ষ করা যায় ধর্মীয় অনুশাসনের উর্ধ্বে হৃদয়াবেগের প্রাধান্য। সবকিছু মিলে সম্প্রদায়-উর্ধ্ব মানবীয় ঔদার্যগুণের পরিচয়ই ফুটে উঠেছে।

'মৈমনসিংহ গীতাকা'য় প্রকৃতির ভূমিকা সকল গাঁথায়ই রয়েছে। কেবল মহুয়া গাঁথায় নয়, ময়মনসিংহ গীতিকার সর্বত্রই প্রকৃতির এই ভূমিকা ভীষণভাবে লক্ষ্যনীয়। এসব গাঁথায় জীবন ও সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে প্রকৃতিকে আহ্বান করা হয়েছে। বিপদকালে তাই প্রকৃতির সান্নিধ্য কামনা করা হয়েছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রকৃতিকে ভালোবাসা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিধাতার অমোঘ বিধান যে অলঙ্ঘনীয় তাও ফুটে উঠেছে এ ক্ষেত্রে ।

'রাজা রঘুর পালা' মৈমনসিংহ গীতিকার একটি বিশেষ পালা। এ পালায় লক্ষ্য করা যায়-গাঁথার আখ্যানভাগ স্বল্প পরিসরের হলেও এর রয়েছে দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে আমরা দেখি 'ধার্মিক রাজা' তার স্ত্রী বিয়োগের ফলে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে অসহায় ও দুঃখকাতর। এ পর্বে দেখা যায় জানকি কর্তৃক প্রয়াত রানী কমলাকে স্বপ্ন-দর্শন, শিশুপুত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে রানীর পরামর্শ দান এবং প্রতি রাতে মৃত রানী কর্তৃক পুত্রকে দুগ্ধদান প্রভৃতি ঘটনা লোকাতীত ও অতি প্রাকৃত। এ ক্ষেত্রে পরিবারের এবং সন্তান লালন পালনে পরিবারে মায়ের

www.pathagar.com

অপরিহার্য ভুমিকার কথাই আলোচিত হয়েছে, যা চিরন্তন ও শ্বাশত । এ ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সমাজের দু'টি গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; আদর্শ পরিবার গঠনে ও সম্প্রসারণে মায়ের অপরিহার্য গুরূত্বের কথা; আদর্শ সমাজ গঠনে মায়ের অনস্বীকার্য ভূমিকার কথা। যেমন বলা হয়ে থাকে একজন আদর্শ মা একটি অদর্শ সমাজ উপহার দিতে পারেন।

দ্বিতীয় অংশে দেখা যায় পিতার মৃত্যুর পর শিশুপুত্র রঘুনাথকে অমাত্যবর্গ রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। অন্যদিকে, ঈশা খাঁ তাঁর চিরশত্রু তাঁর 'ধার্মিক রাজা'র মৃত্যু সংবাদ শুনে এবং অসহায় পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে রঘুনাথের রাজ্য আক্রমণ করে এবং শুধু আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, সম্পদ লুটপাট করে এবং শিশু রাজাকে অপহরণ করে। রাজা শিশু হোক আর বৃদ্ধ হোক, রাজা রাজাই। শিশু রাজাকে অপহরণের পর রাজার অনুগত আদিবাসী প্রজাগণ তাঁকে উদ্ধার করে ঈশা খাঁর নৌকাতেই দ্রুত চলে আসে সুসং। প্রজাগণের রাজা উদ্ধারের মধ্য দিয়ে কাহিনীরও শেষ হয়।

এখানে গাঁথায় গারো জনগণের পরম রাজভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। চেক গবেষক দুসান ঝাভিতেল ঐতিহাসিক গ্রন্থের উদ্বৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, রঘুনাথ রাজার বিরুদ্ধে গারো জনগণ বিদ্রোহে মেতে উঠেছিলো এবং সেই বিদ্রোহ দমনের জন্যে রাজাকে দিল্লির বাদশাহের শরণাপন্ন হতে হয়েছিলো ঃ

'.... the famous chronicle Ain-i-Akbari informs us that king Raghunath Singh paid a yer's tribute to the Mughal Sultans in Delhi as a recompense for the military help he got when suppressing the revolt of his unloyal subjects from the Garo Hills.'

মৈমনসিংহ গীতিকার পালাসমূহ কোনো সামাজিক প্রেক্ষাপটের বাইরে জনবিচ্ছিন্ন কাহিনী হিসেবে গড়ে উঠেনি। নারী ও পুরুষের সামাজিক, ধর্মীয় ও রক্তের বন্ধনসূত্রে গড়ে ওঠা সম্পর্কের আওতাভুক্ত সবই এখানে এসেছে। বিচিত্র শ্রেণীর জনজীবনকে কেন্দ্র করেই মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলো বিন্যস্ত হয়েছে। সামন্তবাদী সমাজের একদিকে এসেছে শাসক শ্রেণী, অন্যদিকে বণিক শ্রেণী। সমাজের উঁচু শ্রেণীর বা অভিজাত শ্রেণীর বা অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ময়মনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালার চরিত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে জীবন-তৃষ্ণা ও জীবন-আকাঙ্খার ব্যাকুলতা। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় যে চিত্র জনজীবন, তাদের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্খার যে ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে, তা একান্তভাবেই গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের, মানবীয় জীবনতৃষ্ণায় উজ্জীবিত পালার প্রতিটি চরিত্র।

www.pathagar.com

মৈমনসিংহ গীতিকার চরিত্রসমূহের আত্মবিসর্জন বা আত্মত্যাগের পিছনেও কাজ করে পারলৌকিক মিলনাকাঙ্খা বা পূর্ণ প্রত্যাশা। মৈমনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন চরিত্র আত্মবিসর্জন করলেও সব কিছুর মূলে রয়েছে জীবনের প্রতি তৃষ্ণা, অতৃপ্ত বাসনা ও বেঁচে থাকার আকাঙ্খা। মহুয়া, মলুয়া, মদিনা, লীল-তাদের কেউই প্রেমাস্পদকে মর্ত্যজীবনের বাইরে প্রত্যাশা করেনি। পরলোকে কিংবা অন্য কোনো জগতে তারা মিলনাকাঙ্খী নয়। এ থেকেই বোঝা যায় যে, তাদের জীবনতৃষ্ণা বিপুল।

ছড়া গান ও সাহিত্য সংস্কৃতি

ময়মনসিংহের লোকসাহিত্যের মধ্যে আরো রয়েছে-ছাড়া, কবিগান, ঘাটু গান, যাত্রা, লাঠিখেলা, পুতুল নাচ, নৌকা বাইচ, বাইন্যার গীত, জারিগান, সারিগান, মুর্শিদী গান, মারফতী গান, পুঁথি পাঠ, শোক গাঁথা ইত্যাদি। চিরন্তন মানবিক বৃত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই রচিত হয়েছে লোকসাহিত্য। রচনার বহিরাঙ্গগত কাঠামো আধুনিকতার বিচারে ব্যক্তি-অপরিশীলিত। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত ভাবের সর্বজনীন আবেদনকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। লোকসাহিত্য কোনো ভাবেই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমনের সৃষ্টি নয়। এতে সামষ্টিক এবং সমাজ জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। সংগ্রামশীল মানবগোষ্ঠীর ঘটনাদীর্ণ বিবর্তনশীল জীবনধারার সকল স্পষ্ট স্বাক্ষর নিয়েই লোকসাহিত্য পৃথিবীর সবখানে বিকশিত হয়েছে এবং আমাদের ময়মনসিংহের লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। লোকসাহিত্য-কাঠামোর সঙ্গে সমাজের সর্বমুখী আবেগ-অভ্যাস-আচরণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের যে যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে; তা-ও অমূলক নয়।

নেত্রকোণা অঞ্চলের লৌকিক খেলাধূলা ছড়া ও গীতে বাংলার স্বরূপ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। হা-ডু-ডু, বৈচিত্রসহ অনেক খেলায় ব্যবহৃত:

এই ঘরতঅ
হেই ঘরঅ যাই-
নানুরেএ এট্টু
চুন দিয়া আই।

উপরোক্ত ছড়াটি আজো গ্রামে গ্রামে প্রচলিত আছে। উক্ত ছড়ার অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে লোকসমাজ বিন্যাসের মানবিক মূল্যবোধের চেতনা। পারস্পারিক সহযোগিতার স্বরূপ। ছন্দ ও বাক্য বিন্যাসে বাংলা ভাষার আদি রূপ। চর্যাগীতির আদি রূপের ভিত্তি মূল। এই লোকজ চিত্র হলো এদেশের জাতি সত্তার উৎস। সম্প্রীতির এক অপূর্ব স্বর্গরাজ্য।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ কাঠামোর ভিতর উৎপাদনশীলতার বাস্তব গতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে এর অস্তিত্বের ভিত্তি। আর এই অস্তিত্বের মূল হলো সমাজের সংস্কৃতি। সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় ব্যতীত জাতিসত্তার উপলব্ধি একেবারেই সম্ভব নয়। জাতিসত্তার বিকাশ

www.pathagar.com

ধারা সম্পর্কে ও সম্যক জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। তাছাড়া জাতীয় পরিমন্ডল চেনা ও অসম্ভব। জাতীয় পরিমন্ডলের এই পরিপূর্ণতার মানদন্ডে স্বাধীন রাষ্ট্র চিন্তার উদ্ভব। স্বাধীন জাতি ও রাষ্ট্র গঠনে এদেশের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ভূমিকা ছিল খুব তাৎপর্যপূর্ণ। নেত্রকোণা অঞ্চলের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অতীত ঐতিহ্য রয়েছে। চর্যাগীতিকার সময়কাল থেকে নেত্রকোণা অঞ্চলে সাহিত্য চর্চা শুরু বলে অনুমান করা হয়। চর্যাপদে ব্যবহৃত ভাষার সংগে নেত্রকোণার আঞ্চলিক শব্দ লাং, আইছইন, খাইছইন, ফাউ ইত্যাকার শত সহস্র শব্দের সামঞ্জস্য তার দৃষ্টান্ত। সর্বোপরি মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগীতি সমূহ নেত্রকোণার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অতীত ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে। কবিগান মূলতঃ গীতিকাব্য। এই কবিগানের চর্চার ক্ষেত্রেও নেত্রকোণার অতীত ঐতিহ্য রয়েছে। অনেকের মতে কলিকাতার পূর্বে নেত্রকোণায় কবি গান চালু হয়। আর কাব্য চর্চায় সুসং রাজ পরিবারের ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত।

মহারাজ রাজকৃষ্ণ সিংহ একজন খ্যাতিমান কবি ছিলেন। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত মনসা মঙ্গল, ভারতী মঙ্গল, রাগমালা কাব্যগ্রন্থের কথা জানা যায়। অষ্টদশ শতাব্দীতে তিনি কবি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে রাজা কমল সিংহ "সঙ্গীত শতক ও পদ্মপূরাণ রচনা করেন। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা কমল সিংহের অসংখ্য কবিতা প্রকাশিত হয় বলে জানা যায়। সুসং রাজ পরিবারের সাহিত্যিক ঐতিহ্য বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল। তাছাড়া মদন থানার কাইটাইল গ্রামের শক্তি সাধক কবি পূর্ণানন্দ পঞ্চদশ শতকে সংস্কৃত ভাষায় তত্ত্বচিন্তা মণি, তত্ত্বানন্দ তরঙ্গিনী, যোগচিন্তা মণি, শ্যামা রহস্য নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করে পন্ডিত সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। মধ্যযুগের "বিদ্যা সুন্দর" রচয়িতা কেন্দুয়া থানার বিপ্র গ্রামের কৃতিপুরুষ কবি কঙ্ক নেত্রকোণার গর্ব।

সুসং এর হেমন্ত বালা দত্ত নেত্রকোণার নারী কবিদের পথিকৃৎ। সৌরভ ও পল্লীশ্রী পত্রিকার তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক। কবিয়াল বিজয় নারায়ণ আচার্য, শুধু কবিয়াল নন, সৌরভ পত্রিকা পাঠে জানা যায় তিনি ছিলেন একজন সৃজনশীল প্রাবন্ধিক চন্দ্র কুমার দে শুধু সংগ্রাহক নন, একজন লেখকও বটে।

সুসং দূর্গাপুরের-মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্র নাথ তর্কবেদান্ত সংখ্যতীর্থ শুধু সংস্কৃত পন্ডিত নন, বাংলা ভাষায় রচিত তার "ভারতীয় দর্শনের সমন্বয়, ভারতীয় দর্শনের বিচার, প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি ছিল তাঁর অমর গ্রন্থ, নেত্রকোণার বাংলা গ্রামের শ্রী যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ বঙ্গীয় অধ্যাপক জীবনী গ্রন্থ রচনা করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। কেদার নাথ মজুমদারের সৌরভ পত্রিকা পাঠে সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে নেত্রকোণার অবস্থান উপলব্ধি করা যায়।

নেত্রকোণার কবিয়ালদের মধ্যে বেতাটীর কালি কুমার ধর, আবুল হোসেন, ঝাউলার মোঃ মধু সরকার, হাফানিয়ার মোঃ সাধু সরকার, বুড়ীজুরীর আলী হোসেন সরকার এবং বাংলা

www.pathagar.com

গ্রামের মদন আচার্যের নাম উল্লেখ্যযোগ্য। বৃটিশ ভারতে এবং তার আরো অনেক পূর্ব থেকে নেত্রকোণার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন ছিল গৌরবময়। সর্বশেষ পর্যায়ে পাক শাসনামলের কিছু পূর্বে মধ্য চল্লিশের দশকে খালেকদাদ চৌধুরী, সিরাজ উদ্দিন কাশিমপুরী, রওশন ইয়াজদানী, নাট্যকার খালিলুর রহমান সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। উণসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের কবি নির্মলেন্দু গুণ ও হেলাল হাফিজ নেত্রকোণার গর্ব।

নেত্রকোণা অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে কবি, ঘাটু, গুরমা, ভক্তিয়া, বাই, ভাষাণ, খুব অত্যন্ত জনপ্রিয় আমোদপ্রদ ছিল। কেন্দুয়ার বাই সর্বত্র পরিচিত ছিল। কেন্দুয়ার বাই ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলাতেও পরিচিত ছিল। সঙ্গীত পরিবেশনে সাধারণত সারেন্দা, বেহালা, খোল, করতাল, মন্দিরা ও ঢোলক ব্যবহার করা হতো।

সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি নেত্রকোণার সাংস্কৃতিক অঙ্গনও ছিল ঐতিহ্য মন্ডিত। লোক সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভান্ডার নেত্রকোণা। পালাগীতি, মেয়েলীগীত, ছড়া, বাউলগীতি, শিলুক, গল্প কথার স্বর্গ রাজ্য নেত্রকোণার মাটি। বাউলগীতি অঙ্গনের দিকপাল ছিলেন রশিদ উদ্দিন, জালাল খাঁ, উকিল মুন্সি, পীতাম্বর, চাঁন খাঁ, দ্বীন শরত, মিরাজ আলী, তৈয়ব আলী, ইদ্রিচ মিয়া, চাঁন মিয়া, আব্দুল মজিদ তালুকদার, বাউল প্রভাত এবং উকিল মুন্সির পুত্র বাউল আব্দুস সাত্তার ত্রিশের দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত রাজনৈতিক অঙ্গনের দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রেক্ষাপটে এই সব ব্যক্তিত্বের বিচরণ ছিল সমাজ কাঠামোর মৌলিকত্ব রক্ষার পরশ পাথর হিসেবে।

সর্বোপরি আধুনিক ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও নেত্রকোণার একটি উন্নত অবস্থান ছিল। বৃটিশ শাসনকাল থেকে একাত্তর পর্যন্ত আধুনিক ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে নেত্রকোণার একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

নেত্রকোণা সাহিত্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান হলো "নেত্রকোণা সাধারণ গ্রন্থাগার" জনাব আলী ওসমান সিদ্দিকী সাহেবকে সম্পাদক করে ১৯৫৭ সালে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে নেত্রকোণার সাহিত্যাঙ্গনের তৎকালীন মধ্যমণি জনাব খালেকদাদ চৌধুরী প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আলী ওসমান সিদ্দিকী সাহেবের "সিদ্দিক প্রেস" থেকে প্রকাশিত হয় উত্তর আকাশ পত্রিকা। খালেকদাদ চৌধুরী সাহেব ছিলেন উত্তর আকাশের সম্পাদক। নেত্রকোণা সাহিত্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনে উত্তর আকাশ ও সিদ্দিক প্রেস দু'টি স্মরণীয় নাম। জনাব খালেকদাদ চৌধুরী, সিরাজ উদ্দিন কাশিমপুরী, রওশন ইয়াজদানী, খুরশেদ আলী তালুকদার (পাগড়ীওলা মাষ্টার সাহেব), বাউল জালাল খাঁ প্রমুখ ব্যক্তিত্বের পাক শাসনামলে প্রধান মিলনস্থল ছিল সিদ্দিক প্রেস (গোলাম এরশাদুর রহমান, ১৯৯৫)।

www.pathagar.com

বাংলাপেডিয়া ২০০৬ এর তথ্যনুসারে নেত্রকোণায় পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী দৈনিক বাংলার দর্পণ; সাময়িকী: অক্ষর, চেতনা, স্পন্দন, স্মৃতি-৭১, বিজয়, সৃজনী, মাটির সুবাস, জানিরা ইত্যাদি। অবলুপ্ত : আর্য্য প্রদীপ (১৮৭৫), কৌমুদী (১৮৭৫), মহৎ উদ্দেশ্য (১৯৩০), প্রান্তবাসী (১৯৩০), জুলফিকার (১৯৫০), আর্য্যপ্রভা (১২৮৭ বঙ্গাব্দ), উত্তর আকাশ (১৩৬৮ বঙ্গাব্দ)।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ক্লাব ১৮, পাবলিক লাইব্রেরি ৬, মুক্ত মঞ্চ ১, নাট্যদল ৫, যাত্রাপার্টি৭, সার্কাস দল ১, সাহিত্য সমিতি ৬, মহিলা সংগঠন ৪, সিনেমা হল ১৫, মিলনায়তন ২, শিল্পকলা একাডেমী ১, উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী ১, সাংস্কৃতিক সংগঠন ৭৬, ক্রীড়া সংগঠন ৪৩।

বাংলাদেশের বিপন্ন আদিবাসী

বাংলাদেশের মানচিত্রে বৃহত্তর ময়মনসিংহের নেত্রকোণা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী জেলা হিসেবে পরিচিত লাভ করে আসছে সেই অনাদিকাল থেকেই। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা ব্রহ্মপুত্রের পলিজ অবক্ষয়ের দ্বারা গঠিত (বলা যেতে পারে গ্রোইং লেয়ার)। উর্বর মৃত্তিকার এই অঞ্চল বহু নদ-নদী ও খাদকে পরিবর্তন ঘটিয়ে টিকে আছে। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে গারো পাহাড় ও আসামের গোয়ালপাড়া জেলা, পশ্চিমে টাঙ্গাইল, দক্ষিণে ঢাকা ও গাজীপুর জেলা এবং পূর্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলা এলাকায় আজ থেকে প্রায় পাঁচ/সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিলো বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। শুধুমাত্র ভাওয়াল ও মধুপুর বনাঞ্চল ছাড়া আদিম মানুষজন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-অঞ্চলে বসবাস করতো। মেগাস্থিনিস খ্রিস্টপূর্ব ৩০২ অব্দে ইন্ডিক গ্রন্থের মানচিত্রে দেখিয়েছেন এ জেলা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বভাগ তখন কামরূপ রাজ্যের অধীন ছিলো। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে মাটির স্তর নিরীক্ষায় দেখা যায় ভারতের ভূমন্ডলের তুলনায় আমরা নবীন। মজার ব্যাপার হলো আর্যবর্তকালীন উত্তর সীমান্তে হিমালয়ের পাদমূলে আদিম মানুষের বসতি ছিলো-এ কথার কোন প্রমাণ নেই। যে সকল প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে সেগুলোর সবকটিই বাংলার সমতল ক্ষেত্রগুলোতে আবিস্কৃত। আলোচিত হয়েছে প্রস্তরযুগের সর্বাপেক্ষা ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে শুনিয়া পাহাড়ে। বর্তমান সময়ে যেসকল নিদর্শন বাংলাদেশের দিনাজপুর, বগুড়া ও নরসিংদী জেলার ওয়ারী বটেশ্বর গ্রামে খনন কাজে প্রাপ্তি ঘটেছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে বাংলার ইতিহাসে নতুন সংযোজন ঘটাবে। কেননা সি-১৪ কার্বন টেস্টের মাধ্যমে গাঙ্গেয় সভ্যতার নির্মল প্রাপ্তি শিরোনাম মিলে এভাবে ডঃ দাস বলেন- "Recently Dasgupta Reports (1968) the findings of animal fossil of elephants, horses, cattle, deers etc, from Susunia hill area. These animal remains have been attributed to the later phase of Pleistocene.

www.pathagar.com

But it has been reported again C-15 analysis attributes 40,000 B.C as the date of these fossil remains." নব্য প্রস্তরযুগের পরে মানুষ পাথরের ব্যবহার ত্যাগ করে ধানুর সাহায্য নেয়। কিন্তু দুঃসাধ্য। তবে এ ধারণা গ্রাহ্য যে হয়ত বিভিন্নস্থানে ইহার প্রারম্ভ" (বাঙ্গলার ইতিহাস ১ খন্ড রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পৃষ্ঠা-১৪)।

গারো

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের উপজাতি বস-বাস করে। উপজাতিদের বলা হয় আদিবাসী। আদিবাসীদের মধ্যে গারো উপজাতি বর্তমানে শিক্ষা-দীক্ষায়, ধনে-মানে, চিন্তা-চেতনায়, কর্মে, সম্পদে, সংস্কৃতিতে অনেক দূর অগ্রসর। আমাদের জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের রয়েছে মূল্যবান অংশগ্রহণ। বাংলা ভাষাভাষী না হয়েও বাঙালিদের সঙ্গে সমতল ভূমির মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতি, পেশা, রাজনৈতিক-সামাজিক সচেতনতার ধারাবাহিকতায় অগ্রসর হচ্ছে গারো উপজাতি। পাশাপাশি তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকেও ভুলে যায়নি।

গারোদের নামকরণ গারো হয়েছে গারো পাহাড়ের নামকরণ অনুসারে। গারো সম্প্রদায়ের মধ্যেও রয়েছে শ্রেণী বিভাজন। দুই শ্রেণীর গারোদের নামকরণ হচ্ছে আচ্ছিক ও লামদানী। আচ্ছিক ও লামদানী উভয়েই গারো সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের অবস্থানগত, চেতনাগত ও জন্মগত পার্থক্য রয়েছে। গারো পাহাড়ের ভেতরের দিকে যারা বস-বাস করে অর্থাৎ গহীন অরণ্যে যাদের বস-বাস, সেই সব গারোদের আচ্ছিক শ্রেণীর গারো নামে অভিহিত করা হয়। অন্যদিকে, গারো পাহাড়ের পাদদেশে বস-বাস করে, তাদেরকে লামদানী শ্রেণীর গারো হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। লামদানী শ্রেণীর গারোরা ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট, নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর, শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী, শ্রীবর্দী প্রভৃতি অঞ্চলে বস-বাস করে। টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর পাহাড়ী অঞ্চলে অনেক গারো বস-বাস করে। গারো ভাষায় মানুষকে বলা হয় মান্দি। আর একারণেই গারোরা মান্দি নামেও অভিহিত হয়।

পাহাড়ী গারো ও সমতল ভূমির গারোদের জীবনাচরণ, শিক্ষা-দীক্ষা, পেশা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মিশনারীদের কল্যাণে এবং আধুনিক জীবন চেতনার তাগিদে গারো জীবন প্রবাহে ইতিবাচক ধারা প্রবাহিত হতে দেখা যায়। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে সমতল ভূমির গারোরা ইতোমধ্যেই অনেক দূরের পথে এগিয়ে গেছে। এখন আর তাদের পিছন ফিরে তাকানোর অবকাশ নেই। কিন্তু, তাই বলে পাহাড়ী গারোদের সঙ্গে সমতল ভূমির গারোদের যোগাযোগের সূত্র একেবারেই ছিন্ন হয়ে গেছে এমনটি মনে করার কোনো কারণ নেই। কারণ, সমতল ভূমির গারোদের মধ্যে শেকড়ের টান এখনো রয়ে গেছে। ময়মনসিংহের গারো সম্প্রদায় মেঘালয় অন্তর্ভুক্ত গারো পাহাড় ও তার পাদদেশের আদি বাসিন্দা।

www.pathagar.com

আগেই বলা হয়েছে যে, গারো সম্প্রদায়ের একটি অংশ টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর পাহাড়ী অঞ্চলে বস-বাস করে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই জেলার সবচেয়ে উঁচু অঞ্চল গারো পাহাড়ই ছিলো অষ্ট্রো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর একমাত্র প্রধান বাসস্থান এবং কর্মক্ষেত্র।

F.A. SACHSE এর মন্তব্যের আলোকে বলা যায় পাহাড়ী গারোরা সম্ভবত দানীপুরের কাছাকাছি কাছারীর পথে তিব্বত থেকে আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্টাব্দে আসামে এসেছিলো। যুদ্ধে এই গারোরা আসামীয়দের সঙ্গে পরাজিত হয়েছিলো। পরাজিত হওয়ার পর জীবন রক্ষার্থে পালিয়ে তারা ব্রহ্মপুত্র নদ পাড়ি দিয়ে ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশ করে। এখানে আসার পর স্বাভাবিকভাবে পূর্বসূরিদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ কমে যেতে থাকে। আর একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ময়মনসিংহের কোচদের সঙ্গে আসামের গারোদের তুলনায় এ জেলায় আগত গারোদের যোগাযোগ ভাল, সম্পর্ক উষ্ণ এবং আন্তরিক। এর পিছনে যে কারণ রয়েছে, সেটি হচ্ছে কোচরাই ছিলো গারো অভিযানের আগে সমগ্র গারো পাহাড়ের একমাত্র বাসিন্দা। পাশাপাশি, এ কথাটিও বলা হয়ে থাকে যে, সম্ভবতঃ কোচেরা আসাম থেকে আগত প্রাচীন বোড়ো জাতির উত্তরসূরী।

গারোরা এই দেশের ভূমিপুত্র। নৃতত্ত্ববিদগণ মনে কারনে যে, ভারত উপমহাদেশের যারা অধিবাসী, তারা অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে এই দেশে এসেছে। ভাষাতাত্ত্বিকগণও এ ক্ষেত্রে নৃতত্ত্ববিদদের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন আদিম জাতির ভাষা বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। গারোদের আদি নিবাস যে আসাম ছিলো এ প্রসঙ্গে আগেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্যার হার্বার্ট রিজলী মনে করেন যে, গারোদের আদি নিবাস আসামই ছিলো নতৃতাত্ত্বিক তথা চেহারাগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আসামের খাসিয়া, নাগা ও মনিপুরিদের উত্তরাধিকারী। এছাড়াও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় রীতি-নীতির দিক বিশ্লেষণ করলে গারোদের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়। Doctor J.H. Hutton এসব কারণ বিবেচনায় এনেই গারোদের মঙ্গোলীয় বলে অভিহিত করেছেন।

বিরল শ্মশ্রু, আরোমশ, ভারী ভুরু, চ্যাপ্টা নাক, ফর্সা গায়ের রং ইত্যাদি মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠির লক্ষণ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই বৈশিষ্ট্যগুলো গারোদের মধ্যে স্পষ্টরূপে দেখা যায়। অবশ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, লুসাই, মগ, কুকিদের মধ্যেও এসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে Doctor R. Brown এর মন্তব্য সামনে আনা যায়। তিনি বললেন – "The facial and other charateristics of our tribe are as various amongst the other hill clans. Occassionally and almost purely Mongolian Caste of Countenance will be observed to be succeeded by one closely approaching the Aryan type."

www.pathagar.com

গারোদের মধ্যে গোত্র বিভাগ বা গোষ্ঠী বিভাগ রয়েছে। আচিক গারোদের গোত্র বিভাগ করলে তিন শ্রেণীর গারো পাওয়া যায়। যথাঃ আয়, আবেং ও দোয়াল, লামদানী শ্রেণীর গোত্রবিভাজনে পাওয়া যায় তিন শ্রেণীর গারো। তথা-মমীন, মারাক ও সাংমা। লামদানী শ্রেণীর গোত্রবিভাগ কেউ কেউ আচিক শ্রেণীর গোত্রবিভাগের সমার্থক বলে বিবেচনা করেন। 'Major A. Playfair'- ও এ সম্পর্কে একমত পোষণ করেন।

গারো রীতি অনুযায়ী গোত্রবিয়ে নিষিদ্ধ এবং রীতি বিরুদ্ধ। সমাজের প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে এই যে, স্ত্রী গ্রহণ করতে হলে গোত্রের বাইরে থেকে গ্রহণ করতে হয়। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে যে, অন্যান্য পাহাড়ী জাতির মতো গারোরাও শ্বশুর বাড়ীতে আশ্রয় পায়। অবশ্য সেখানে তাদের খেটে খেতে হয়। আসামীরা খাসিয়াদের মতো গারো সমাজেও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। এ প্রসঙ্গে আমরা খাসিয়াদের একটি প্রবাদের কথা মনে করতে পারি। প্রবাদটি হচ্ছে 'লং জেইদ না কা কিনথেই' অর্থাৎ মেয়েদের থেকেই মানবগোষ্ঠীর উৎপত্তি। আর তাই মায়ের সূত্রেই মানুষের বংশ পরিচয় হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে, বাবার সূত্র বংশ পরিচয় হওয়া কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়। গারোদের ক্ষেত্রেও এটি পুরোপুরিভাবে প্রযোজ্য। খাঁটি মাতৃপ্রধান অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো গারো সম্প্রদায়েরও উত্তরাধিকার সূত্র হচ্ছে এই যে, মায়ের অর্থ সম্পত্তি, সম্পদ মেয়েরা পায়। এই সম্পত্তিতে ছেলেদের বা পুরুষদের অধিকার থাকে না। আর তাই বিয়ের পর ছেলেরা বাবার বাড়ী ছেড়ে শ্বশুরবাড়ীতে চলে আসে। শ্বশুর বাড়ীতে এসে স্বামী-স্ত্রীর সম্পত্তি ছাড়া আর যে সব অর্থ সম্পত্তি অর্জন করে, তার উপরও অধিকার বর্তায় স্ত্রীর। শ্বশুর বাড়ীতে স্বামীর অবস্থানকে গারোদের আঞ্চলিক ভাষায় 'নোকরাম' বলা হয়ে থাকে।

গারোদের ধর্ম নিয়েও অনেক কথা। তাদের ধর্মকে ভূতপূজা বা প্রেতবাদ, জড়োপরসনা বলা হয়ে থাকে। তবে যে কথাটি এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে এই যে, 'Animism' বলতে যা বোঝানো হয়, তা হিন্দু সমাজে বহু গোত্রে ধর্মাচারণের সঙ্গে মিল দেখা যায়। হিন্দু সমাজে ভূতপূজক আছে, আছে নিরাকারবাদী। পন্ডিতগণের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, হিন্দু সমাজের মধ্যে একেশ্বরবাদীদের অবস্থানও রয়েছে। তবে, গারোদের ঠিক হিন্দু বলে অভিহিত করার সুযোগ নেই। এ প্রসঙ্গে হাবার্ট রিজলীর মন্তব্য উদ্বৃত্ত করা যেতে পারে। তিনি বলেন- 'হিন্দু ধর্ম এবং জড়োপাসনার মধ্যে কোন স্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় মোটেও সম্ভব নয়। উপজাতীয় লোকেরা (Tribal people) ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। কাজেই ঠিক কতখানি এবং কি পরিমাণ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলে একজন উপজাতিকে হিন্দু বলা সমীচীন হবে, সে সম্বন্ধে প্রশ্নের অবকাশ আছে।' Doctor J.H. Hutto এ প্রসেঙ্গ বলেন ঃ উপজাতীয়দের মধ্যে অনেকগুলো ধর্ম পরিদৃষ্ট হয়। তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট একটা ধর্ম খুঁজে বের করা যায় না।

www.pathagar.com

গারো পুরাকাহিনীকে ধর্মের অঙ্গ বলে বিবেচনা করে। গারোরা ব্রহ্মপুত্র এবং তুরা পর্বতকেও দেবতাজ্ঞানে পূজা করতে অভ্যস্থ। গারো মেয়েরা বিয়ের আগে গৃহকর্ম ও যাবতীয় রন্ধনক্রিয়ায় বাবা-মা থেকে অনেক শিক্ষা পেয়ে থাকে। এটি তাদের সমাজে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে। গারোদের পূজা-পার্বন ও রীতি-নীতি হিন্দু ভাবাপন্ন। গারোদের পূজায়ও হিন্দুদের মতো ঠাকুর বা ধর্মযাজক থাকে। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে 'দোয়ালগোই' সামাজিক মর্যাদায় উঁচু আসনের অধিকারী। দোয়ালগোত্র থেকেই কমল বা ধর্মযাজকগণ উদ্ভূত হয়ে থাকে। ধর্ম পুরোহিতদের খামাল বলে ডাকে ।

গারোদের ধর্ম-কর্মের সঙ্গে অনেক আচার অনুষ্ঠান জড়িত। প্রসঙ্গক্রমে এখানে দু'টি পুজা-পার্বনের কথা বলা যেতে পারে। জীবহত্যা নৃত্যানুষ্ঠান গারোদের ধর্মাচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মদ্যপান করাও গারোদের ধর্ম-কর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ওয়ানগালা পূজার উদ্দেশ্য দু'টি। একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে ফসলকে কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা করা। অন্যটি হচ্ছে ব্যাধি-মহামারী ও রোগ-শোক থেকে নিজেদের মুক্ত করা। ওয়ানগালা পূজা কালে বিশেষ এক অদৃশ্য শক্তির কল্পনা করা হয়। এই অদৃশ্য শক্তি হচ্ছে-অসংহতি। এই আসংহতির আড়ালে থেকে গারোদের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে বলে গারোদের বিশ্বাস। এই পূজার কিছু নিয়ম রয়েছে নিয়মগুলো হলোঃ প্রথমতঃ বাঁশ দিয়ে একটি ঘোড়ার মূর্তি তৈরি করা। মূর্তিটি তৈরি করে গ্রামের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে রাখা হয় তারপর পাঁঠা, বানর কিংবা ইঁদুর থেকে পছন্দসই যে কোনো একটি নিয়ে তার গলায় ধরা বেঁধে পুরোগ্রাম ঘুরিয়ে আনা হয়। শেষমেষ দা দিয়েই প্রাণীটিকে হত্যা করা হয়। তারপর বর্ণিত ঘোড়ার পাশে বাঁশবিদ্ধ করে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। গারোরা মনে করে এই প্রাণিহত্যা দেখে রোগ মহামারী ভয়ে আর তাদের ধারে কাছে ভিড়বে না।

গারোদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শুরুতেই বলা হয়েছে যে, গারোরা এসেছে আসাম থেকে। কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকায় অবস্থিত ময়মনসিংহের গারোরা দক্ষিণ পশ্চিম জীন থেকে এসেছে। এ প্রসঙ্গে ডঃ আলি নওয়াজ মন্তব্য করেনঃ 'আসমা নামে একটি পালার উল্লেখ মৈমনসিংহ গীতিকার ভূমিকায় পাওয়া যায়। পালাটি অন্য দু'একটি পালার মতো অপ্রকাশিত। একই নামে একটি ঐতিহ্যশীল পালাগান দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের 'এন্নান' প্রদেশের পাহাড় ও বিস্তীর্ণ জলাময়ঘেরা দুর্গম অঞ্চল অধ্যুষিত বাদ্য, নতৃত্য ও সঙ্গীতপ্রিয় 'শনি' প্রদেশের পাহাড় ও বিস্তীর্ণ জলাশয়েঘেরা দুর্গম অঞ্চল অধ্যুষিত বাদ্য, নৃত্য ও সঙ্গীতপ্রিয় 'শনি' উপজাতিদের 'ঈ' নামক উপশাখা থেকে সংগৃহিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বৈচিত্র্য, জীবন জিজ্ঞাসা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই উপজাতীয় এলাকাটির পূর্ব ময়মনসিংহের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এবং সাম্প্রতিক কালেও ছিল। চীন পালা গান 'আসমা' তেও ময়মনসিংহ গীতিকার কোন কোন কাহিনী ও প্রেক্ষাপটের মিল পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

গারোদের সম্পর্কে স্পষ্টভাবে ড. আশু দত্ত বলেছেন ঃ 'ইতিহাসবিদদের মতে গারো জাতির পূর্ব-পুরুষেরা তিব্বত থেকে ভূটানের পথে সঙ্কোশ নদী ও শাখা নদীর তীর বেয়ে বিভিন্ন পথে অগ্রসর হয়। এদের এক গোষ্ঠী পাহাড় অতিক্রম করে এ জেলার উত্তর প্রান্তে বাস করতে থাকে এবং পরবর্তী কালে একে একে হাজং, হদি, কোজ, ডালু, রাজবংশী প্রভৃতি উপজাতিরাও তাদের সাথে তাঁরা যায়।' গারোদের অধিবাস ও জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'Julius Marak' Zvi 'Goro customary laws and practices' গ্রন্থে বলেছেন- 'Garos live in the hills and plains of the district alike, besides all parts of north-east India going as far as west Bangal including Bangladesh in the west. A good number of non-Garos too live in the Garo Hills district. The customs, culture and socioeconomic conditions of otehr people have ahd their impact on the Garos particularly in the areas outside the district. A large number of Garos have embraced Christianity. But on the whole, they have adhered to their customary laws, although the christians among them do not practice polygamy and the religious rites and practices of the non-christian Gaors'.

Julius Marak গারোদের ১২টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এই শ্রেণীগুলো হচ্ছে- (1) The Chisak (2) The Matchi (3) The Matabeng or Matiangche (4) The Ambeng (5) The dula or Matchi-Dual (6) The Along (7) The Gara-Ganching (8) The chibol (9) The Rung (10) The Megam (11) The A'wes or Akawes, (12) The koch ir kotchu or kochus. [The Garo customary laws and practices. Julius Marak, page-2, 3]

'Chisak' গারোরা গারো পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব অংশে বসবাস করে। তাদের অধিবাস সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে। তারা সুমেশ্বরী নদীর উত্তর তীরে বসবাস করে। তারা খাসিয়া পাহাড় এবং সুমেশ্বরী নদীর দক্ষিণে বিভক্ত হয়ে বসবাস করে। 'Matchi' গারোরা গারো পাহাড়ের মধ্য অংশে বসবাস করে। 'Matabeng' গারোরা তুরা পাহাড়ের কাছাকাছি থাকে। যা নেত্রকোণা জেলার উত্তর দিকে অবস্থিত। 'Ambeng' গারোরা গারো পাহাড়ের পশ্চিম অংশের বাসিন্দা। অবশ্য তাদের কেউ কেউ গারো পাহাড়ের ঠিক দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বস-বাস করে। তারা গারো সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ। 'Dual এবং মাচি ডুয়েল' গারোরা সুমেশ্বরী নদীর উত্তর-পূর্ব অংশে সীমান্ত জুড়ে অবস্থান করে।

www.pathagar.com

'Along' গারোরা গারো পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে বসবাস করে। তারা সুমেশ্বরীর বুকে বসবাস করে। স্বাধীনতা পূর্ব কালেই তারা ময়মনসিংহের অন্য অঞ্চল থেকে এসে এখানে গড়ে তোলে তাদের অধিবাস। এসময় তারা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করে তাদের ভাগ্যোন্নয়নে সুযোগ পেয়ে যায়।

'Gara-Ganching' গারোরা গারো পাহাড়ের দক্ষিণ অংশে বসবাস করে। তারা বোগী নদীর কাছাকাছি বসবাস করে।

'Megam' গারোরা পশ্চিম খাসিয়া পাহাড়ী জেলার সীমান্তে অধিবাস গড়ে তুলেছে।

'A'wes' গারোরা গারো পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বসবাস করে। সমতল ভূমি কামরূপ এবং গোয়াল পাড়ার প্রান্ত জুড়ে তাদের অবস্থান।

কোচ গারোরা গারো পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে নদীর প্রান্ত জুড়ে বসবাস করে। গারো পাহাড়ে বসবাস করে বলে এবং গারো পাহাড়ের নাম অনুসারেই গারোদের গারো নামকরণ হয়েছে। তবে গারোদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ নিয়ে ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ জরুরী। গারোরা অষ্ট্রো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত বলেই তাদের সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান দরকার। এ প্রসঙ্গে নিশীত রঞ্জন রায় বলেন ঃ "ভৌগোলিক পরিবেশের দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, সিন্ধু এবং গঙ্গা যমুনার তটভূমি জুড়ে যেমন গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ সভ্যতার ধারা, তেমনি স্বকীয়তার উজ্জ্বল একটি বিশেষ সংস্কৃতির ধারা পুষ্টি লাভ করেছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল আর্য-পূর্ব যে সব জাতি, উপজাতি, কৌম, বর্ণ, নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল পূর্ব-ভারতের একটি বিরাট জনসমাজ, তাদের সঙ্গে আর্যাবর্ত এবং মধ্যদেশের অধিবাসীদের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের যতো মিল তার চেয়ে কোন কোন বিষয়ে হয় তো বেশী মিল খুঁজে পাওয়া যাবে ময়মনসিংহের সীমান্তের চতুষ্পার্শে অবস্থিত জনপদবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে।"

গারোরা দেব-দেবীর পূজা করে। তাদের ঈশ্বরের নাম তাতারাবাবুগা। গারোরা তাতারাবাবুগা'র পূজাই বেশী করে। তাদের বিশ্বাস এই তাতারাবাবুগার কারণেই, এমনকি তার আদেশে নস্ত্র নুণ্ডত্র এবং মাচি পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। গারোদের প্রচলিত সমাজে সালজং (সূর্যদেব), ছোদ্দুম (চন্দ্র), গোয়েরা (বজ্র), নোরোচিত কিমরী বোক্রী (বৃষ্টি, নোরিংগ্রো নোজিংজু (তারকারাজি), মেন (মাটি বা পৃথিবী), চোরাবুদি (শস্যদেবতা), আছিমা দিংগছিমা (ছোদ্দুম বা চন্দ্রের মা), মিসিয়াগ্রাং সোলজাং সংগ গিটাংগ (ধানের তত্ত্বাবধায়ক); কালকেম (গোয়েরা বা বজ্রের ভাই) প্রভৃতির বেশ-প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

গারোরা বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে দেব-দিবীর পূজা করে থাকে ঘটা করে। তারা পাহাড়-পর্বত, নদ-নদীকেও দেবতাজ্ঞান করে পূজা করে। এসব পূজা-পার্বনের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই

www.pathagar.com

সম্পৃক্ত নানা সংস্কার। গারো সমাজে সংস্কার 'দুরাসুংগা সংদুমঙ্গ দাকগ্রীকা' (ব্রহ্মপুত্র ও তুরা পর্বতের লড়াই) নামক পুরাকাহিনীটি বিশেষভাবে প্রচলিত।

গারোদের পুজার সঙ্গেও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ওয়ানগালা পূজার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়।। ওয়ানগালা পূজার উদ্দেশ্য হচ্ছে শস্য তথা ফলসলাদিতে কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে কৃপা প্রার্থনা করা। তাছাড়া গারোরা মনে করেন যে, মানুষ যদি ওয়ানগালা পূজা করে, তারও রোগ-ব্যাধি মহামারী থেকে রক্ষা পেতে পারে। আর তাই স্বাভাবিক কারণেই ওয়ানগালা পূজার সময় অদৃশ্য শক্তির কল্পনা করা হয়ে থাকে। এই অদৃশ্য শক্তি হচ্ছে-আসংতাতা। গারোদের মধ্যে যারা আসংতাতা শক্তির প্রতি বেশী নিবেদিত, তারা জীবেন বেশী উন্নতি করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা যেতে পারে যে, গারোরা মনে করতো যে, প্রাণী হত্যা দর্শনে কোনো রোগ-মহামারী ভয়ে মানুষের কাছে আসতে পারে না।
গারোদের মধ্যে প্রস্তরপূজা বা প্রস্তর-উত্তোলন পূজা অনেক আগে থেকেই প্রচলিত রয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, লৌকিকতা বা ধর্মাচারের পেছনে অবশ্যই দার্শনিক ভিত্তি কাজ করে। জনৈক পাশ্চাত্য পন্ডিত তাই মন্তব্য করেছেন- 'Erecting of stone is a religous belief in almost all hill tribes.' আদিম সমাজের মানুষের ধারণা ছিলো মৃতব্যক্তির আত্মা-বস্তু (soul matter) পাথরেই আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। মৃত ব্যক্তির আত্মা যদি কোন উপায়ে ধরে রাখা যায়, তাহলে তাদের সামাজিক মর্যাদা কোনো ভাবেই শিথিল হবে না। এই বিশ্বাস থেকেই গারোরা প্রস্তর-পূজা করে থাকে। তারা এ-ও মনে করে যে, মৃত ব্যক্তির আত্মাকে আশ্রয় দানের জন্যেই প্রাচীনকাল থেকে সমাধির উপর পাথর স্থাপন করা হয়ে থাকে। তারা এ-ও মনে করে যে, আত্মা-পাথর ক্রমে আত্মা-মূর্তির (soul figure) রূপ পরিগ্রহ করে।

গারোদের ধর্মবিশ্বাসে পৃথিবী সৃষ্টির কাহিনীটি চমকপ্রদ। তাদের বিশ্বাস-আদিতে চারদিকে পানি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। ভূমির কোনো চিহ্ন কিংবা রেখা ছিলো না। চারদিকে ছিলো কেবল অন্ধকার।
গারোরা পুনঃজন্মে বিশ্বাসী। গারোদের সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনী গারোরা তাদের চেতনায় ধারণ করে। তাদের সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনীর সঙ্গে মধ্যভারতের গড় উপজাতীয়দের সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনীর অধিক সামঞ্জস্য রয়েছে। গারোরা বিশ্বাস করে যে, অসৎকর্ম করলে তার আত্মা মানুষ হিসেবে আর জন্মলাভ করতে পারবে না। তাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে পশু-পাখি বা জীব-জন্তু রূপে।

www.pathagar.com

গারোদের আহার্য এবং পানীয়ও অন্যান্য পাহাড়ী জাতির মতোই। তারা গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, শূকর ইত্যাদির মাংস খায়। তাদের অপরিহার্য পানীয়ের মধ্যে রয়েছে মদ। এই মদ তারা নিজেরাই তৈরি করে। আঞ্চলিক ভাষায় এই মদকে 'পচু' বলা হয়।
গারোদের ভাষা মৌখিক। এর কোনো লিখিত রূপ নেই। গারোদের ভাষা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এর একটি হচ্ছে-মান্দি কুচিক (সকল মানুষের ভাষা), অন্যটি হচ্ছে আচিক কুচিক (পাহাড়ীদের ভাষা)। ময়মনসিংহ জেলার গারো পাহাড় সংলগ্ন এলাকার গারোদের মধ্যে আচিক ভাষার প্রচলনই বেশী দেখা যায়। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও রয়েছে।

গারো লোক সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে নৃত্যগীত। সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই নৃত্যগীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। গারোদের ওয়ানগালা পূজা অনুষ্ঠানে যে সব নৃত্যগীতের উৎসব চলে, তা সত্যিই হৃদয় গ্রাহী।

গারোদের মধ্যে প্রেমমূলক গীতি পরিবেশনের বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। প্রণয় গীতিগুলো সাধারণত ভাবী দম্পতির মুখেই গীত হয়ে থাকে অরণ্য অভ্যন্তরে পরস্পরের মিলনের মুহূর্তে। এসব গানে পরস্পরের আত্মনিবেদনের চিত্রটিই ফুটে ওঠে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে-

'দো দা গিতা বিদালিং অম্ব,
রাউ গিতা পিনারেং ডংব।'
এর বাংলা অর্থ হচ্ছে-
'তুমি দেখতে যেন নিটোল ভেকী-মুরগীর মতো,
অথবা তুমি একটি সুন্দর আকৃতির কচি লাউ।'

'কোচিল মন্ডল বিবালিন ডংগ সংবা।
মিকগিল ওয়াতরে রিজাকিন রাজ্যে সাংবা।'
বাংলা অর্থ-
'তোমার ঠোঁট দু'টি যেন মন্ডল ব্রুরে ফুল;
তোমার চোখের মণি যেন কচি বাঁশের পাতার মত নীলাভ।'

'সুকমে কিমকারোং মিতিং অমসংবা
জাপিং গাম্বারী বিকগিং ডংগসংবা'
বাংলা অর্থ-
'তোমার বুক ছোট ডেফলের মত সুন্দর;
তোমার উরুদেশ গাম্বারী ব্রুরে শুঁড়ির মত শাদা-মসৃণ।'

www.pathagar.com

গারোরা জুম চাষের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। পাহাড়ী জাতি মাত্রই জুম চাষের উপর অনেকটা নির্ভর করে। মাঠের কাজ কেবলমাত্র পুরুষেরাই করে না, গারো মেয়ে-পুরুষ সকলেই মাঠে কাজ করে। যাদুতন্ত্রের প্রভাব গারো সমাজে বেশ দৃষ্টিগোচর হয়। গারোরা গভীর ভাবে বিশ্বাস করে যে, আত্মবস্তু কমে গেলে রোগ, মৃত্যু ফসলের কমতি, অনাবৃষ্টি, সন্তান না হওয়া কিংবা সন্তান হয়েই সাথে সাথে মারা যাওয়ার মতো ঘটনা দেখা দেয়। আর তাই যেখানে আত্ম-বস্তুর অভাব সেখানে মন্ত্র খাটিয়ে আত্মাবস্তুর আবির্ভাব ঘটানো যাদুর কাজ।

গারোদের গার্হস্থ্য জীবনও আমাদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় ও তাৎপর্যমন্ডিত। তারা কুসংস্কারে বিশ্বাসী এবং যাদুতন্ত্রীই প্রকারান্তরে গারোদের চিকিৎসক বা ডাক্তার। রোগ নিরাময়ের জন্যে তারা মন্ত্রতন্ত্র ও গাছগাছড়ার শিকড়পাতা ব্যবহার করে। গারোদের নিত্যদিনের জীবন ও পোশাক-পরিচ্ছদ একেবারেই সাদামাটা। মেয়েরা কাপড় পরিধান করে ব্লাউজ ও লুঙ্গির মতো করে টুকরো করে।

গারোদের আবাসিক গৃহ পার্বত্য চট্রগ্রামের আদিম অধিবাসীদের মতো মাচাং পর্যায়ে নির্মাণ করা হয়। গারোদের ঘরগুলো নির্মিত হয় সমতল ভূমির বাঙালিদের মতোই। গারোরা সাধারণতঃ ছন দিয়ে তৈরি ঘর নির্মাণ করে। অবশ্য যারা সম্ভ্রান্ত এবং অবস্থাসম্পন্ন তাদের বাড়িতে চারচালা টিনের ঘরও দেখা যায়। কয়েকটি ঘর নিয়ে গঠিত আবাসিক ভূমিকে বলা হয় গারো বাড়ি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাড়ি শব্দটি খাঁটি বাংলা শব্দ। দেখা গেছে অবস্থাসম্পন্ন গারোদের বাড়িতে তিন-চারটি বাসগৃহতো থাকেই, এছাড়া বাংলাঘর (বৈঠক খানা), ধানের গোলা, গোয়াল ঘর ও দেখা যায়।

আকৃতিগত দিক থেকে গারোরা সাধারণতঃ বেঁটে হয়। তারা খুব পরিশ্রমী এবং শক্তিশালী। গারোরা এক সময় আসামের অধিবাসী ছিলো। আর তাই গারোদের ভাষার মধ্যে বাংলা আসামী ভাষার সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই মিশ্রভাষাই গারোদের গোষ্ঠীগত ভাষা হয়ে গেছে। তাছাড়া তাদের মধ্যে দ্বিভাষিতাও দেখা যায়। বাংলা ভাষা-ভাষীদের সঙ্গে কথা বলার সময় তারা বাংলা ভাষা ব্যবহার করে এবং নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় তারা গোষ্ঠীগত ভাষা ব্যবহার করে।

মৃত্যুর পর গারোদের মৃতদেহের সামনে অনেক ধরনের খাদ্যসামগ্রী উৎসর্গ করা হয়। এ ক্ষেত্রে, খাসীয়াদের সঙ্গে গারোদের মিল রয়েছে। কারণ, গারো এবং খাসিয়া উভয় উপজাতি আসাম থেকে আগত। গারোরা বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পর আত্মা মংগ্রো সংগ্রাম (আত্মার বাসস্থান) নামক স্থানে আশ্রয় নেয়। গারোরা মনে করে উৎসর্গীকৃত খাদ্য দ্রব্য মিসাং মিসাল চারম নামক স্থানে জমা থাকে এবং আত্মা তা গ্রহণ করে। তার পর পাপ-পূণ্যের বিচার হয়।

www.pathagar.com

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গারোরা মাঠে কাজ করে। তারা কৃষিকাজের পাশাপাশি কাঠ কেটে সেই কাঠ বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। কাঠ পুড়িয়ে তারা কয়লাও তৈরি করে। পরবর্তীতে, সেই কয়লা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। বাজার সওদা এবং পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমানভাবে কাজ করে। জীবন যাপনে গারো মেয়েরা খুবই সহনশীলতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে থাকে। সন্তান পালনে তারা খুবই ধৈর্যের পরিচয় দেয়। পিঠে সন্তান বেঁধে গারো মেয়েরা মাঠে কাজ করে এবং গহীন অরণ্যে গিয়ে কাঠ কাটে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের গারোরা দেব-দেবী বলে মনে করে এবং তাদের সেভাবে সম্মান করে।

শিশু সন্তানের মৃত্যুতে গারো মেয়েরা শোক-গীত পরিবেশন করে থাকে। এই শোকগীতি শোকাবহ স্মৃতি বহন করে ।

ময়মনসিংহ জেলায় গারোরা সংখ্যায় একেবারে কম নয়। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারী অনুযায়ী ময়মনসিংহ জেলায় উপজাতিভুক্ত মানুষের সংখ্যা হচ্ছে ৮৩ হাজার। এর মধ্যে ৩৮ হাজার ছিলো গারো (খ্রিস্টান গারোসহ) সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এ সংখ্যা আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি। গারোরা শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতিতে ইতোঃ মধ্যেই অনেক বেশী যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে।

হাজং

ময়মনসিংহ জেলা গেজেটিয়ারে হাজংদের সম্পর্কে লেখা আছে, এই মঙ্গোলীয় জাতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুদূর অঞ্চল থেকে এসে বঙ্গদেশের ভিতর দিয়ে ভারতের আসাম অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। আসামের কামরূপ জেলা থেকে এরা জীবিকার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে ময়মনসিংহের গারো পাহাড় অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়। এই জনজাতির বাস আসামের গোয়ালপাড়ায়, গারো পাহাড় জেলা, ময়মনসিংহের উত্তর ভাগে এবং রংপুর জেলার একাংশে বিস্তৃত। কষ্টসহিষ্ণু, নির্ভীক, পরিশ্রমী ও আনন্দপ্রিয় এই জাতি পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত। এরা একান্তভাবে বিশ্বস্ত, সরল, বন্ধুবৎসল ও অথিতিপরায়ণ।

এই সহজ-সরল আমোদপ্রিয় মানুষগুলোও একদিন বিদ্রোহ করেছিল জমিদারী নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে। গারো পাহাড় অঞ্চলের সুসং জমিদার হাতি ধরার কাজে হাজংদের বাধ্য করতো। হাজংরা ছিল এ কাজে অত্যন্ত দক্ষ। হাজংরা নিজেদের চাষাবাদ বন্ধ রেখে জীবন বিপন্ন করে জমিদারের জন্য হাতি ধরে দিতো। এই হাতি ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, দিল্লি প্রভৃতি জায়গায় বিক্রয় করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতো সুসং জমিদার। কিন্তু প্রতি বছর হাতি ধরতে গিয়ে হাতির পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মারা যেতো অনেক হাজং। হাজং কৃষকগণ এই পাহাড় অঞ্চলের গভীর অরণ্যের মধ্যে গাছের খুঁটি দিয়ে দেয়ালের মতো তৈরি করে, তার মধ্যে হাতির প্রিয় খাদ্য কলাগাছ ও ধানের চাষ করতো। বন্যহাতির দল এই চার দেয়ালের মধ্যে

www.pathagar.com

প্রবেশ করলে 'খেদা'র পথ বন্ধ করে দেয়া হতো। তারপর হাজংদের গৃহপালিত অন্য হাতির সাহায্য নিয়ে বন্য হাতিকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলা হতো।

হাজং বিদ্রোহঃ জমিদার হাজংদের জন্য বেগার প্রথা চালু করেছিল। হাজংরা এ প্রথার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করলে তাদের ওপর নেমে আসে জমিদার বাহিনীর নির্যাতন। অবশেষে জমিদার বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মনা সর্দারের নেতৃত্বে হাজং জনজাতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহের আগুন অতি দ্রুত সুসং পরগনার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। জমিদার বাহিনী কৌশলে এ বিদ্রোহের নায়ক মনা সর্দারকে হত্যা করে। এই হত্যাকান্ডের খবর পেয়ে হাজং জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আদিবাসী গারোরাও হাজংদের সঙ্গে বিক্ষোভে যোগ দেয়। পরে সুসং দুর্গাপুরের বারোমারী নামক স্থানে বিশাল জমিদার বাহিনীর সঙ্গে হাজং-গারোদের যুদ্ধ হয়। জমিদারের হাজং মাহুতগণও হাজংদের পক্ষ নিয়ে হাতিগুলোকে উন্মত্ত করে জমিদার বাহিনীর ওপর ছেড়ে দেয়। ফলে জমিদারের বহু পাইক বরকন্দাজ হাতির পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মারা যায়। এরপর হাজং ও গারোদের মিলিত বাহিনী জমিদার বাড়ি আক্রমণ করলে প্রাণভয়ে সুসং জমিদার নেত্রকোনা জেলায় পলায়ন করে। জমিদারের অত্যাচারের প্রতিশোধ স্বরূপ হাজং ও গারো জনগণ দুর্গাপুরের ফারাংপাড়া, বিজয়পুর. চেংগ্নী, ভরতপুর, আড়াপাড়া প্রভৃতি স্থানের 'হাতি খেদা'র খোঁয়াড় ধ্বংস করে দেয়। 'পাঁচ বৎসর পর্যন্ত এই বিদ্রোহ ও সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল। এই হাতিখেদা বিদ্রোহ বেতগড়ার রাতিয়া হাজং, ধেনকির মঙ্গলা, লেংগুরার বিহারী, হদিপাড়ার বাঘা, ফান্দা গ্রামের জগ, বিজয়পুরের সোয়া হাজং প্রমুখ নিহত হয়। বাগপাড়ার গয়া মোড়লকে জমিদারগণ ধরে নিয়ে যায়। সে আর গৃহে ফেরেনি। মলা ও তংলু নিখোঁজ হয়। সুসং পরাগনার এই খেদা বিদ্রোহের পর আর বাধ্যতামূলকভাবে হাতি খেদার কাজ হয়নি। এই হাতি খেদার বিরুদ্ধে এই অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহের বিভিন্ন কাহিনী আজও আদিবাসীদের গ্রামে গ্রামে উপকথার মতো ছড়িয়ে আছে। হাতি খেদা বিদ্রোহের পর ত্রিশের দশকে টংক প্রথার বিরুদ্ধে আবারও আন্দোলনে নেমেছিল হাজং জনজাতি।

হাজংদের জীবন জীবিকা

বাংলাদেশে বসবাসকারী "হাজংগণের" জীবন ও জীবিকা বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিতে ভরপুর। তারা জীবন চলার পথে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, বাধা-বিপত্তি, চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে অদ্যাবধি নিজেদের ঐহ্যিবাহী কৃষ্টি-সংস্কৃতিগুলো যতদূর সম্ভব ধরে রেখেছে। তবে সব কিছুই যে হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে পেরেছে তা নয়, এর অনেকাংশই লুপ্ত হয়েছে এবং কতকগুলো বিলুপ্তির পথে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে।

হাজংগণ বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহের সুসং দুর্গাপুর, কমলাকান্দা, ধোবাউড়া, নালিতাবাড়ি, শ্রীবর্দি এবং সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ, বিশ্বম্ভরপুর, তাহেরপুর ও ধরমপাশা থানায় বসবাস করে। রাজ্যের গারো হিলস্, খাসিয়া হিলস, আসামের নওয়াগাঁও, কামরূপ হোজাই, গোয়ালপাড়া, দরং, অরুণাচল, নেফার বিস্তীর্ণ এলাকায় এদের বসবাস রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, শান্তিপুর, খরদেও ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেও এদের অবস্থান রয়েছে বলে জানা যায়।

www.pathagar.com

হাজংদের আগমন ও পরিচয়

হাজংদের আগমনের উৎস সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। বিভিন্ন নৃ-তত্ত্ব বিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও সচেতন অনুরাগীরা উল্লেখ করেছেন যে, হাজংরা আসামের গৌহাটির অন্তর্গত হাজো অঞ্চল থেকে আগত। শ্রী ধনেশ্বর বর্মণ উল্লেখ করেছেন যে, হিমালায়ের পাদদেশে 'অবন্তিনগর' (মালব) হাজংদের আদি নিবাস। সেখান থেকে প্রতিকূল আবহাওয়া ও পরিবেশের কারণে জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য তারা প্রাজ্যোতিষপুরের (গৌহাটি) হাজো প্রদেশে এসে জায়গা করে নেয়। হাজং ইতিহাস লেখক শ্রী প্রফুল্লরঞ্জন সরকার উল্লেখ করেছেন যে, বিভিন্ন প্রতিকুল পরিবেশের কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে হাজংগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে ১০০১ সালে আসামের টুরা নামক স্থানের পশ্চিমাংশে 'কড়াইবাড়ি' নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এই কড়ইবাড়ি কম্পনদী বা কালনদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থানটি কাশ্যপ বর্মণের নামানুসারে গন্না নামে পরিচিতি লাভ করে। আজো উক্ত কড়াইবাড়ি নামক স্থানে বিপুলসংখ্যক হাজংয়ের বসবাস রয়েছে। এই কড়াইবাড়ি বারহাজারী ছিল হাজংগণের সংযোগস্থল। এখান থেকে হাজংগণ দলবল নিয়ে কৃষিকার্যের যোগ্য স্থানের সন্ধান পেয়ে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের শ্রীবর্দী থানার "লাউচাপরা" নামক স্থানে বাংলাদেশে পদার্পণ করেন এবং এই স্থান থেকে পশ্চিমে রংপুর, দিনাজপুর, ঢাকায় বিস্তৃতি লাভ করে বলে জানা যায়।

তবে এক কথায় উল্লেখ করা যায় যে, হাজংগণ তিব্বত থেকে অবন্তিনগর, অবন্তিগর থেকে কামরূপের হাজোনগর, হাজোনগর থেকে বারহাজারীর কড়ইবাড়ি, কড়ইবাড়ি থেকে শ্রীবর্দির লাউচাপরা নামক স্থান এবং অবশেষে সেখান থেকে হাজংগণ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে।

হাজো থেকে হাজং শব্দের উপত্তি হয়েছে। কর্নেল ডালটন, এইচ. বি. রাওনী (Rowney), ওয়াডেল (Waddle) প্রমুখের মতে, কাছারী শব্দ হাজই থেকে হাজং শব্দের উৎপত্তি। হাজাই শব্দের অর্থ সমতলবাসী। তারা মনে করেন কাছারীরা দু'টি দলে বিভক্ত। একটি হচ্ছে সমতলবাসী, অপরটি হচ্ছে পর্বতবাসী। হাজংগণ কাছারীদের একটি শাখা বলে মনে করেন। হডসন সাহেবেও হাজো থেকে হাজং শব্দের উৎপত্তি বলে মত দিয়েছেন। সপ্তদশ শতকে মুসলিম শাসকদের ক্রমাগত আক্রমণে কাছারীদের এ হাজো শাখাটি বর্তমান গোয়ালপাড়া কজেলা থেকে গারো পাহাড়ের পশ্চিমাংশে ও ময়মনসিংহ জেলায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে বলে উল্লেখ করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, শাস্ত্রীয়ক বর্ণনায় একবিংশতিবার ত্রিয় নিধনকারী নায়ক পরশুরামের ভয়ে আত্মরক্ষার্থে ত্রিয় বংশধরগণ যখন বনেজঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে জীবনযাপন করতে থাকে, তখন বিভিন্ন দল বিভিন্ন পরিবেশে আচার-বিচারহীন হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে দল বিভিন্ন নামধারী

www.pathagar.com

কাছারীও ও আদিবাসীগণ একই দলের হতে পারে। অনেকের মতে হাজং, গারো, কোচ, বানাই, ডালু, হদি, কাছারী, টিপরা, চাকমা প্রভৃতি আদিবাসী উপজাতিগণ সকলেই ত্রিয়ত্বের দাবীদার এবং প্রত্যেকটি সম্প্রদায় আচার-বিচারহীন অবস্থায় বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে, সমতলে জীবনযাপন করে পরবর্তীতে পৃথিবীর নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছে। প্রত্যেক গোষ্ঠিই আদি সনাতন ধর্মপন্থী ছিল; কিন্তু তা হিন্দু সনাতন ধর্ম ছিল না। হয়তো পরবর্তীতে তা গ্রহণ করা হয়েছিল। শাস্ত্রে এ সকল আদিবাসীরাই "ব্রাত্য ক্ষত্রিয়" নামে পরিচিত। যার অর্থ আচারহীন "পতিত ক্ষত্রিয়" হাজংগণ সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়।" নামে পরিচিত। যার অর্থ আচারহীন "পতিত ক্ষত্রিয়।" হাজংগণ সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীদার।

যোগিনী তন্ত্র শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, "পরশুরামের ভয়াৎ ক্ষত্র সুকুচা কোচে উচ্চতের, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় নিধন পরশুরামের যে সকল ত্রিয় সঙ্কোচ (ভয়) প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই সংস্কোচপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয়গণই 'কোচ' হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। এই সঙ্কোচ বা ভয়প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়গণই আচারহীন অবস্থায় ব্রাত্য ত্রিয় হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে।

গৃহপালিত পশুপালন

হাজংদের জীবিকা প্রধানত কৃষিভিত্তিক। তাই প্রতি পরিবারই গরু প্রতিপালনে অভ্যস্ত। অবস্থাসম্পন্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ পশুপালন করে থাকে। গরুর বলদ ও মহিষ দিয়ে হাল চাষ করে থাকে। গাভী দিয়ে হাজং সামাজে হাল চাষ করতে পারে না এবং সামাজিকভাবে তা নিষিদ্ধ। চাষ করলে সামাজিকভাবে দন্ডনীয় হতে হয়, ভাদ্র মাসে কেউ কোন গরু-বাছুর বিক্রি করতে পারে না। ভুলবশত বিক্রি করলে সামাজিকভাবে প্রায়শ্চিত্তসহ জরিমানা দেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

হাজংগণ গরু, মহিষ ছাড়া ছাগল, হাঁস, কবুতর প্রতিপালন করে থাকে। পাকিস্তান আমলে মুরগীপালন ও খাওয়া সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ ছিল। পালন করলে বা খেলে সামাজিক বিচারে তাকে প্রায়শ্চিতসহ দণ্ড প্রদান করা হত। শূকরের মাংস খাওযা যায়, কিন্তু প্রতিপালন করার নিয়ম নেই। বরং সামাজিকভাবে বিধি নিষেধ আছে। প্রায় বাড়িতে বিড়াল, কুকুর পোষা হয়। তবে কুকুরকে ডাংরঘর ও রান্নাঘরে ঢুকতে দেয়া হয় না। কোনক্রমে ঢুকলে ঘর লেপে শুদ্ধ করে নিতে হয়। গরু প্রতিপালনে হাজংগণ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সারা বছর গরু পরিশ্রম করে বাড়ির কর্তার উপকার করে থাকে। তাই তাকে দারুণভাবে যত্ন করা হয়। গাভীর দুধ ও গোবর হাজং সমাজে পবিত্র। তাই চৈত্র-সংক্রান্তিতে গরুকে স্নান করিয়ে সিঁদুর আবির মাথায় দিয়ে শরীরে তেল মর্দন করে দেয়। পিঠা, ভাত, চিড়া প্রভৃতি দিয়ে ধূপ প্রদীপ জ্বালিয়ে নিবেদন করে ও প্রণাম জানায়।

www.pathagar.com

খাদ্য ও পানীয়

ভাতই হচ্ছে হাজংদের প্রধান খাদ্য। হাজংদের বাসন-কোসনের মধ্যে নতুন কিছু নেই। তবে হাজংগণ ঢালাই লোহার কড়ায়ে ভাত, তরি-তরকারী রান্না করতে অভ্যস্ত। মাটির হাড়ি, এলুমিনিয়াম, তামা, কাসার বাসনও রান্না-বান্না ও আহার্যের জন্য ব্যবহার করে থাকে। মাছ, ডাল, শুটকী, হিদল, শাকসব্জি হাজংগণের নিত্যদিনের খাদ্য। তা ছাড়া হাঁস, মুরগী, পাঠা, কবুতর, শূকর, বন্যশুকর, হরিণ, খরগোশ, কাছিম, কুচিয়া প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করে থাকে। নদী-নালা, খাল-বিল থেকে প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরে, পরিষ্কার করে রৌদ্রে শুকিয়ে, শুকনো মাছকে সোডা মিশ্রিত করে ঢেঁকিতে কুটে পরিষ্কার বাঁশের চুঙ্গায় করে মুখ আটকে রেখে ১০ থেকে ২০ দিন পর ঐ শুটকি তরকারী করে খেতে পারে। এই চুঙ্গার শুটকিকে হাজংগণ চুঙা হিদুল বলে থাকে। কাছিম, কুচিয়া, হিদল হাজংদের প্রিয়। হাজংগণ বিভিন্ন ধানের চালের ভাত দারুণ পছন্দ করে। বিন্নি ধানের চাল সারা রাত ভিজিয়ে রাখার পর একটি পানিভর্তি ডেকচির ওপর ছিদ্রওয়ালা কড়াই বসানো হয়। ছিদ্রের ওপর ছোট ছোট ছিদ্রবিশিষ্ট একটি ঢাকনা দিয়ে কড়াইয়ের মধ্যে সেই ভেজান চাল ঢেলে দেয়। আগুনের জ্বালে ডেকচির জল উত্তপ্ত হবার ফলে বাষ্প সৃষ্টি হয় এবং সেই বাষ্পের সাহায্যে বিন্নি চাল ফুটে আঠালো হয়ে জমাট বাঁধে। এই ভাতকে হাজংরা 'বিশি' ভাত বলে। হিদল ও কাছিমের মাংস দিয়ে বিশি ভাত খেতে হাজংগণ ভালবাসে। এই বিন্নি চালকে সারা রাত ভিজিয়ে রেখে ডালু বাঁশ অথবা মলি বাঁশের চুঙ্গায় ঢুকিয়ে আগুনে চুঙ্গাটি পুড়িয়ে যে ভাত পাওয়া যায় তাকে হাজংগণ 'চিং' বলে। এই চিং হিদল দিয়ে সকালের নাস্তা করতে ভাল। তাই আদিবাসী মুক্তিযুদ্ধের লেখক প্রথম গুপ্ত হাজংদের খাদ্যের ওপর ছন্দ রচনা করে বলেছেন :

"কাছিম মাংস বিশি ভাত
হিদুল পুঁতা লেবাহাক আর
গোষ্ঠিবাড়ির বকনি ভাত। ইত্যাদি

বকনি হচ্ছে বিন্নি ধানের ভাতের সঙ্গে গোজা ওঠা ধানের চাল দিয়ে পিটুলি করে মিশ্রিত করে একটি পাত্রে রেখে একদিন পর রস ওঠা ভাতকে 'বকানি' বলে। এই বকানি ভাত হাজংরা আষাঢ়ের অম্বাবিধি তিথিতে আত্মীয়স্বজন নিয়ে পাতি খৈ দিয়ে খেতে ভালবাসে। আষাঢ় মাসের ৭ তারিখে যে অম্বাবিচি অনুষ্ঠান হয়, তাকে হাজংগণ 'সাতাযুগ' বলে থাকে। এই তারিখ থেকে সাতদিন হাজংগণ কোন কাজকর্ম করে না। হালকর্ষণ থেকে শুরু করে মাটির যে কোন কাজ থেকে তারা বিরত থাকে।

খাড়পানি ও লেবাহাক

হাজংদের আলাদা বৈশিষ্ট্যের একটি খাবার তরকারী। লবিহীন ক্ষার ও বিলাতি সোডামিশ্রিত যে তরকারী তা হচ্ছে খাড়পানি। যেমন লাউ কেটে কড়াইয়ে দিয়ে নিজেদের প্রস্তুতকারী খাড় অথবা বিলাতী সোডা পরিমাণমত দিয়ে সেদ্ধ করে যে তরকারী হয় তাই হচ্ছে লাউ খারপানী।

www.pathagar.com

লেবাহাক হচ্ছে উনুনের ওপর পানি গরম করে মরিচ, লবণ, পরিমাণমত খড় ও শুটকি অথবা হিদল দিয়ে জ্বাল দিতে থাকে। জ্বালের পরিমাণে ঢেঁকিতে কোটা চালের পিটুলি ঢেলে দিয়ে যে হারুয়ার অনুরূপ আঠালো হয় তাই হচ্ছে লেবাহাক। এই লেবাহাকে কচি বাঁশের কেড়ইল কুঁচিকুঁচি করে কেঁটে দিয়ে দেয়া যায়। এই কেড়ইল মিশ্রিত করলে তাকে "গাজা লেবাহাক' বলা হয়।

আতপ চাল ও মাংশ একত্রে মিশিয়ে কড়া করে খাবার তৈরি করলে হাজংগণ তাকে 'খিসকী' বলে থাকে। এই 'খিসকী' হাজংদের বিবাহে বরযাত্রীদের মাঝে পরিবেশনের প্রথা ছিল। খিসকী অথবা আংসা ভাত পরিবেশিত না হলে বরযাত্রীরা রাগ করে বরকে রেখে চলে যেত। "আংসা ভাত" মাংসের বদলে কলিজা দিয়ে চালের সাথে মিশ্রিত ভাত।

হাজংগণ আনন্দ উৎসবে পঁচুই মদ ব্যবহার করে থাকে। যেমন- বিবাহে, পূজা পার্বণাদির উৎসবে, বিশেষ কোন পর্ব, অতিথি আপ্যায়ন প্রভৃতিতে পঁচুই মদ পরিবেশন করে থাকে। তবে পূজা-পার্বণে অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত - কেউ পঁচুই স্পর্শ করতে পারে না। করলে সামাজিকভাবে জবাবদিহিসহ জরিমানা দিতে হয়। কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর যার যত খুশী ব্যবহার করতে পারে। হাজং গৃহস্থরা বিশেষ করে প্রথম রোয়া রোপণ, শেষ রোয়া রোপণ, প্রথম আমন ধান কাটা, শেষ ধান কাটা, নয়া-খাওয়া, বাস্তুপূজা, সংক্রান্তি -, বিবাহ উৎসব এবং দেউলী অনুষ্ঠানে পঁচুই মদ ব্যবহার করে থাকে।

হাজং রমণীরা পৌষ সংক্রান্তি ও চৈত্রসংক্রান্তিতে বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরি করে পরিবারের প্রিয়জনদের পরিবেশন করে থাকে। এই পর্বকে হাজংগণ পুষি হংরানী ও চৈতহঙরানী বলে থাকে। নয়া খাওয়াতে পিঠা চিড়ার ব্যবস্থা করা হয়। হাজংদের প্রিয় পিঠা হচ্ছে- ছি পিঠা, পুলি পিঠা, পাত পিঠা ইত্যাদি।

সমাজ ব্যবস্থা

হাজং সমাজ পরিচালনার এবং এ সমাজের নিয়মনীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কতগুলি ধাপে বিভক্ত। পরিবার ও সমাজ পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। পিতা অথবা বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য পরিবারের প্রধান কর্তা। হাজংগণ একজনের নেতৃত্বে দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে অভ্যস্থ। গ্রামের অধিকর্তাকে গাওবুড়া বলা হয়। এই গাওবুড়া একজন জ্ঞানী প্রতিপত্তিশালী প্রবীণ ব্যক্তি হয়ে থাকেন। কয়েকটি পাড়া নিয়ে একটি গ্রাম। কতগুলো গ্রাম নিয়ে একটি 'চাকলা'। আবার কতগুলো চাকলা নিয়ে একটি 'পরগণা' গঠিত হয়। গ্রাম প্রধানকে মোড়ল বলা হয়। গাওবুড়া গ্রামের মোড়লের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। চাকলা প্রধানকে 'সাহমড়ল' বলা হয় পরগণার প্রধান রাজা। সামাজিক কার্য পরিচালনার জন্য 'গাওবুড়া' ও 'সাহমড়ল'-এর ভূমিকা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের উন্নতি-অবনতি, আচার-অনাচার, শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলা সার্বিকভাবে গাওবুড়া ও সরমড়লের বিচক্ষণ নেতৃত্বের

www.pathagar.com

ওপর নির্ভর করে। পাড়া বা গ্রামের কোন ব্যক্তি অন্যায় বা অসামাজিক কাজে অপরাধী সাব্যস্ত হলে গাওবুড়া চূড়ান্ত- নিষ্পত্তির জন্য চরম ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত- দিতে পারেন।

কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় গিয়ে বসবাস করতে পারে না। সে জন্য গ্রামে বসবাস করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে উক্ত গ্রামের গাওবুড়ার অনুমতি বা সমর্থন লাভ করতে হবে। গাওবুড়া একাই অনুমতি দিতে পারে না। গ্রামের দশজনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে অনুমতি দিতে পারেন। অনুমতি পাবার পর ঐ ব্যক্তিকে পূর্ব গ্রামের গাওবুড়ার নিকট এই গ্রামের মাটি না দাবী জন্য একটাকা চার আনা অথবা পাঁচ টাকা দিয়ে আশ্রিত গ্রামের গাওবুড়ার নিটক ঐ একই হারে টাকা দিয়ে গ্রামের সদস্যপদ লাভ করে নেয়।

সদস্যপদ বা 'গাওহামা' টাকা পরিশোধ না করলে সে স্থায়ী বাসের যেমন অধিকার পায় না, তেমনি সামাজিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতাও পেতে পারে না। অসামাজিক কাজে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি পাড়া বা গ্রাম ও চাকলার সিদ্ধান্ত মেনে না নিলে, সমাজ তার সাথে সমস্ত-যোগসূত্র ছিন্ন করে তাকে সামাজিক জীবন থেকে খারিজ করে দেয়। এ ধরনের খারিজ ব্যক্তি বা পরিবারকে 'গাও বাইহ্মা' বলা হয়। তাই হাজং সমাজব্যবস্থা পরিচালনায় বেত্রাঘাত, প্রায়শ্চিত্ত ও অর্থ অথবা জ্ঞাতি বিভাজনের মাধ্যমে জরিমানার প্রচলন আছে।

জীবিকা

হাজং পরিবারগুলো মূলতঃ যৌথ পরিবারে পরিচালিত। কিন্তু বর্তমান যুগে আর্থিক চাপের মুখে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারে রূপান্তরিত হচ্ছে। পরিবারের সকল সদস্যই বাড়ির কর্তার নির্দেশে পরিচালিত হয়। হাজংগণ পিতৃতান্ত্রিক শাসিত পরিবার।

হাজংগণ সূর্য ওঠার আগেই শয্যা ত্যাগ করে এবং গৃহিণী বা যে কোন মহিলা অবশ্যই সর্বাগ্রে উঠে উঠোনে গোবর দিয়ে সান সরা দিয়ে থাকে। অতঃপর উঠান ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নেয়। এটা মহিলাদের নিত্যদিনের একটি পবিত্র কাজ। থালা, বাসন-কোসন মাজাঘষা শেষে রান্নাঘর লেপন করে স্নানের কাজ সেরে নিয়ে রান্নাবান্নার কাজ হাতে নেয়। মেয়েরা গৃহের কাজে ব্যস্ত থাকে আর পুরুষেরা বাইরের কাজে চলে যায়। প্রয়োজনবোধে মেয়েরা ঘরের কাজ সেরে, মাঠে পুরুষের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে কাজে অংশগ্রহণ করে। হাজংগণের জীবনপ্রবাহ কৃষিভিত্তিক; তাই কৃষির ওপর নির্ভর করেই তাদের আর্থিক সঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত। মূলত এদের জীবন উন্নয়ন প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। হাজংগণ কৃষিভিত্তিক বিধায় মহিলারা অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক। কৃষিক্ষেত্রে মহিলারা হালকর্ষণ ছাড়া শস্য বপন, রোপা ফসল কর্তন, লওয়া, তোলা প্রভৃতি কাজ করে থাকে। তা ছাড়া অবসর সময়ে মেয়েরা নিজ হাতের কাপড় বোনে। পুরুষেরা সুনিপুণভাবে বাঁশ-বেতের কুটির শিল্পের সামগ্রী তৈরি করে নিজেদের চাহিদা পূরণ করে। অতীতে হাজংগণ দক্ষতার সাথে

www.pathagar.com

স্বর্ণ ও রৌপ্যের কাজ করত এবং হাজংগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় লোহালক্কর সামগ্রী নিজেদের মধ্যেই কার্যকর ছিল।

হাজং রমণীগণও স্রোতস্বিনী নদী-নালা খাল বিলে বিভিন্ন ফাঁদ দিয়ে মাছ ধরার কাজে পটু ছিল। জাখা, হেঙা, জুলপি প্রভৃতি দিয়ে তারা মাছ ধরত। জাখা, হেঙা, জুলপি প্রভৃতি বেত বাঁশের তৈরি এক প্রকার ফাঁদ। ৪০ থেকে ৫০ জন রমণীর সম্মিলিত জাখা দিয়ে মাছ ধরার অভিযান সত্যিকারভাবে আকর্ষণীয় ছিল। আজ আর সে ধরনের খাল-বিল নেই, জাখা মারার প্রচলনেও চরমভাবে ধস নেমেছে।

হাজংদের মধ্যে গরীব আছে বটে, তবে ভিক্ষুক বা ভিক্ষাবৃত্তি নেই বললেই চলে। হাজংদের মধ্যে মৎস্যব্যবসায়ী, পালকীবাহক, ধোপা-নাপিত, মালি, মেথর ও মুটে নেই। এদের সামাজিক প্রথানুযায়ী এ সমস্ত পেশা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

হাজং সমাজে ধর্ম

হাজংগণ ধর্মে হিন্দু সনাতনপন্থী। হিন্দু সনাতনপন্থী হলেও এদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অপরাপর বাঙালী হিন্দু সনাতনপন্থীদের আচার-আচরণ ও ধর্মীয় ব্যবস্থা থেকে তা সম্পূর্ণ আলাদা। হাজংগণ কখন হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়েছে তার কোন উৎস পাওয়া যায় না। কিংবা সনাতন হিন্দুধর্মই এদের প্রাথমিক ধর্ম ছিল কিনা তারও কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে হাজংগণ আদিকাল থেকে আদি সনাতনধর্ম পালনে অভ্যস্ত। হাজং, গারো, কোচ, ডালু প্রভৃতি আদিবাসীগণ আদিকাল থেকে আদি সনাতনধর্ম পালন ও আদি দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করে এসেছে এবং সেই সঙ্গে আদি দেবদেবীরা হিন্দু সনাতন ধর্মে স্থান করে নিয়েছে।

অনেকে মনে করে থাকেন, আদিশুরের আমলে এই সকল আদিবাসীরা হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। মাঝে বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হলে হিন্দু ধর্মকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষার জন্য বঙ্গেশ্বরাজ আদিশুর কান্যকুজ থেকে পাঁচ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। স্বরাজ্যের হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠান দ্বারা গৌড় দেশবাসীগণকে শিক্ষাদান এবং কামরূপের অন্তর্গত হাজো নগরেশ্বর কুমার ভাস্কর বার্মা, মিথিলা প্রভৃতি দেশ থেকে শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ এনে ধর্ম সংস্কারমূলক কাজে যথাযথ মনোযোগ দেয় বলে জানা যায়। তাই হাজংগণ দাবী করে যে, আর্য পণ্ডিতগণের দীক্ষা শিক্ষা লাভ করে তারা সনাতন হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।

হাজংগণ যদিও আদি দেবী কামাক্ষা'র উপাসক তথাপি আজো বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিতদের সংখ্যাই বেশী। আসামে শঙ্কর দেব নামে এক বৈষ্ণব আচার্যের আবির্ভাব ঘটে। তার ভক্তিধর্মের নাম ছিল 'শবন ধর্ম' এবং এ ধর্ম বৈষ্ণব ধর্মে প্রভাব বিস্তার করে। সম্ভবত রাজা নরনারায়ণের আমলে শ্রীবৈতন্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম হাজং সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার

www.pathagar.com

করেছে। হাজংগণ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। উপাসনা ভেদে তারা দু'শাখায় বিভক্ত। শাক্ত ও ভক্ত বা বৈষ্ণববাদী। শাক্তদল পুরোহিত দিয়ে পূজার কার্য সম্পাদন করে। ভক্তদল বা বৈষ্ণব পন্থীরা যাবতীয় পূজার কাজ অধিকারী দিয়ে সম্পন্ন করে থাকে। উভয় দলের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধের আদান-প্রদান চলে। শাক্ত ও ভক্তপন্থী উভয় দলই কামাক্ষা, কালী, মনসা, লক্ষ্মী, সরস্বতী যাবতীয় দেবীর পূজা-অর্চনা করে থাকে। তবে ভক্তদল কামাক্ষা, কালী, মনসাপূজায় কোন ছাগ বা মেষ বলি হিসেবে উৎসর্গ করে না। বৈষ্ণবপন্থী হাজংগণ যে কোন দেবীর নিকট বৈষ্ণব সত্যানুসারে তাত্ত্বিক মতে সাধারণত নৈবেদ্য হিসেবে ফুল দিয়ে পূজা ও আরাধনা করে থাকে। তারা কপালে তিলক, মাথায় টিকি ও গলায় তুলসীর মালা পরিধান করে থাকে। মন্ত্রপ্রাপ্ত ভক্তগণ তিন বেলা উপাসনা করে থাকেন। হাজংদের প্রতি বাড়িতে ঠাকুরঘর ও তুলসীগাছ থাকে। হাজংদের যে ঠাকুরঘর আছে ঐ ঠাকুর ঘরকে অনেকে তুলসীঘর বলে থাকে।

বৈষ্ণবপন্থী হাজংগণের ধর্মীয় পুরোহিত হচ্ছে অধিকারী; তবে অধিকারী শুধুমাত্র বৈষ্ণবপন্থী হাজংদের পুরোহিত বললে ভুল হবে। তিনি সমগ্র হাজং সমাজের পুরোহিত– যেহেতু অবৈষ্ণব হাজংগণ রাজা জমিদারদের নিকট পূজা-অর্চনার জন্য ব্রাহ্মণ গ্রহণের প্রার্থনা করেন, তখন হাজংগণ খুব সহজে ব্রাহ্মণ লাভ করেনি। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সামাজিক দেবদেবীর পূজা-পার্বণাদির জন্য গ্রামের নির্বাচিত এক শুদ্ধাচারী ব্যক্তি থাকতো, তাকে হাজংগণ 'নংটাং' বলে। 'নংটাং' অর্থ পূজারী পুরোহিত। তিনি একজন সৎ, পবিত্র, নিষ্ঠাবান এবং শুদ্ধাচারী ব্যক্তি।

বাস্তুপূজা : প্রত্যেক হাজংগ্রামে বাস্তু দেবতার মন্দির থাকে এবং প্রতিগ্রামেই বাস্তু দেবতার নামে সম্পত্তি থাকে। মূলত প্রতি হাজং গ্রামে কামাক্ষা মন্দির থাকে। বাস্তু পূজার নামে সত্যিকার অর্থে ঐ কামাক্ষা দেবীকেই অর্চনা করা হয়। হাজং সমাজে কালী, দুর্গাদেবীর চেয়েও উল্লেখযোগ্য প্রিয় দেবী কামাক্ষা।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে হাজং সমাজে সর্বপ্রথম জিগাতলা নিবাসী গৌর চাঁদ মোড়লের বাড়িতে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে কোথাও দুর্গা পূজা হয়েছিল কিনা এবং হয়ে থাকলে কিভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তার কোন তথ্য জানা যায় না।

অতএব হাজংগণের একমাত্র সত্যিকারের উপাস্য দেবী 'কামাক্ষা'। হাজংব্যতিরেকে এই দেবীর পূজা-অর্চনা করতে পারে না। অপরাপর হিন্দু সমাজের দেব-দেবীর পূজা অর্চনা থেকে হাজং সমাজের দেব-দেবীর পূজা-অর্চনার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা। তাই হাজং সমাজে কামাক্ষাদেবী আদি সনাতনধর্মের মুল প্রতীক। বাংলাদেশে কামাক্ষা দেবীর বিখ্যাত পীঠস্থান রয়েছে। এরমধ্যে ধোবাউড়া থানায় ঘোষগাঁও কামাক্ষা বাড়ী অন্যতম।

www.pathagar.com

উপসংহার

কোন জাতির পুষ্টি ও খাদ্যাভ্যাস তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা ও সরবরাহের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে। এদেশের খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ে প্রচলিত প্রবাদ হল- মাছে ভাতে বাঙ্গালী। যা পূর্ব ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের জন্য ভীষণভাবে প্রযোজ্য। কারণ এ এলাকার জমি ছিল বিস্তর ও অত্যন্ত উর্বর। তার সাথে সস্তা পুষ্টির সরবরাহ ছিল সুলভ ও সহজলভ্য। যেমন অতীতে পূর্ব ময়মনসিংহের বিভিন্ন প্রকার মাছের সরবরাহ দেশের পূর্বাংশের অধিকাংশ চাহিদা মিটাতে সক্ষম ছিল। শারিরীক কস্‌রত ও বিনোদনের জন্য গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন প্রকারের খেলাধূলার আয়োজন ছিল। চিত্ত বিনোদনের জন্য বিভিন্ন প্রকার ছড়া,গান,জারি ও ভাওয়াইয়া গানে মাতিয়ে রাখতো রাখালেরা।

পূর্ব ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলে গারো পাহাড় ও তৎসংলগ্ন বিভিন্ন আদিবাসিদের বাসস্থান। তাদের ভিন্ন কৃষ্টি ও আচার অনুষ্ঠান রয়েছে। বিবর্তনের ধারায় সভ্যতার আদি সংস্কৃতি যা একেবারেই নিজস্ব ছিল তা আজ হারিয়ে যাচ্ছে। আদিবাসীসহ স্থানীয় জনগোষ্ঠির নিজস্ব স্বকীয়তা ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ না করলে বহিঃসংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে এ দেশের সভ্যতা ও উন্নয়ন কখনই টেক্‌সই হতে পারে না। এসব সংক্ষরণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কৌশল প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

সহায়ক পুঞ্জি

আশুতোষ পাল (১৯৮৭), ময়মনসিংহের পোষাক পরিচ্ছদ ও খাদ্যাভাস;
ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা, ময়মনসিংহ জেলা দ্বিশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ
গোলাম এরশাদুর রহমান (১৯৯৫), মুক্তিসংগ্রামে নেত্রকোণা
শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন রায় বাহাদুর (১৯৫৮), পূর্ব বঙ্গঃ মৈমনসিংহ গীতিকা
আঃ সাত্তার (ঢাকা ১৯৭৭), আদিবাসী সংস্কৃত ও সাহিত্য
আলতাফ হোসেন (২০০৫) বিপন্ন আদিবাসী গারো ও হাজং, প্রথম আলো
বাংলা পিডিয়া, ২০০৬, এশিয়াটিক সোসাইটি ঢাকা।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক বিবর্তন, শাসন ও শোষণের ইতিহাস

সার সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে পূর্ব ময়মনসিংহের প্রাচীন সামাজিক বিবর্তনের অবস্থা পর্যালোচনা করতে গিয়ে বৈদিক কাল-আর্য্যাবর্ত, সংহিতার কাল, রামায়ণের কাল, মহাভারতের কাল, লৌহিত্য সাগরের অবস্থা, রঘুবংশে বর্ণিত বঙ্গ শাসন এবং আধুনিক ভূতাত্ত্ববিদগণের মতামতের বিবরণী দেয়া হয়েছে। ভূতাত্ত্বিকগণের মতানুসারে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বয়ে আনা কাদা ও পলি থেকেই বঙ্গদেশের উদ্ভব। বৌদ্ধযুগের অবস্থা বর্ননা করতে গিয়ে পৌরাণিক কাল, মেগেস্থিনীস, হিউ-এন্‌থ-সঙ্গ, ব্রহ্মপুত্র নদ, পৌন্ড্রবর্দ্ধন, কামরূপ ও কামরূপের সীমানার বর্ননা দেয়া হয়েছে। তাতে দেখা যায় পূর্ব ময়মনসিংহ এক সময় কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। হিন্দু শাসনামলে এ দেশে পাল ও সেন বংশ, রাজা ভগদত্ত ও বল্লালসেন (পশ্চিম ময়মনসিংহে বল্লালসেন) রাজত্ব করেন। পূর্ব ময়মনসিংহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাজ্য ছিল, যে গুলি বৈশ্যগারো ও সোমেশ্বর পাঠকরা শাসন করেছিলেন। পাঠান শাসনকাল পর্যালোচনায় বঙ্গ-বিজয়, কামরূপে মুসলমান শাসন, তুঘলক খাঁ, সোনারগাঁ ও মজলিস খাঁ, হুমায়ুন ও হুসেন শাহ, পূর্ব ও পশ্চিম ময়মনসিংহে হুসেনশাহের স্মৃতিচিহ্ন, মুয়াজ্জমাবাদ, নছরৎসাহ ও নছরৎসাহির বিবরণ দেয়া হয়েছে।

মোঘল শাসনকাল আলোচনায় মোগল বংশের প্রতিষ্ঠা, আকবর সাহ, বাজুহার সরকার, ঈশা খাঁ, মানসিংহ, বাইশ পরগণা, "মুলকে সুসঙ্গ", জনসমাগম, প্রাচীন চিহ্ন, ঈশা খাঁ বংশের অধঃপতন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া ঢাকা রাজধানী স্থাপন, ব্রহ্মপুত্র তীরে আসাম রাজ্য, ব্রহ্মপুত্র তীরে কুচবিহার রাজ্য, রাজস্ব বিভাগের পুনর্বিন্যাস এই সব বিষয়ে আলোপাত করা হয়। ইংরেজ শাসনামলে ভূমি প্রশাসন, জমিদারী শাসন প্রবর্তন ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ করা হয়। তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, জেলা স্থাপন ও ভূমি বন্দোবস্ত। কালেক্টর মি. রটন ও ময়মনসিংহে নুতন জেলা স্থাপন, জেলায় ভূমি বন্দোবস্ত, বন্দোবস্তের ও মহাল সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। ইংরেজ দুশাসনের নির্যাতনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে রয়েছে "বৈকুন্ঠ বাসু, রাজস্ব আদায়ের নিয়ম, জমিদার সৃষ্টি, জমিদারের প্রতি অত্যাচার-সূর্য্যনারায়ণ চৌধুরী, ইন্দ্রানারায়ণ চৌধুরী ইত্যাদির বিবরণ। ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে এ দেশের জনগোষ্ঠী প্রতিরোধ ও প্রতিবাদী হয়ে উঠেছি। এই সবের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে রয়েছে সন্ন্যাসীবিদ্রোহ, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, নিম্ন বঙ্গে সন্ন্যাসী, ময়মনসিংহে সন্ন্যাসী, ময়মনসিংহ ও আলাপসিংহে সন্ন্যাসী, জামালপুরে সেনানিবাস স্থাপন ইত্যাদি।

www.pathagar.com

বৃটিশ আমলে জেলা কালেক্টর একাধারে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন করতেন। অন্য দুটি পদের চেয়ে রাজস্ব আহরণে তারা বেশী আগ্রহী ছিলেন। প্রথমত, এক্ষেত্রে কোন বিনিয়োগের প্রয়োজন ছিল না, দ্বিতীয়ত, কালেক্টরগন বেতন নয় কমিশন পেতেন। ফলে এদেশের অবারিত প্রকৃতিক সম্পদ ইজারা দিয়ে রাজস্ব আদায়ে তাদের বেশী আগ্রহ ছিল।

ভু-বিবর্তন ও সভ্যতার বিকাশ

আদিযুগ ঃ অতি প্রাচীনকালে আর্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করেছিল। তাঁদের পূর্বে ভারতবর্ষে অসভ্য আদিম অনার্যগণের বসবাস ছিল। আর্যদিগের বাহুবল ও ধর্মবলে অনার্যগণ বন বনান্তরে প্রস্থান করতে লাগল। আর্যগণ ক্রমে পশ্চিমে সুলেমান গিরিপুঞ্জ হতে পূর্বে গঙ্গা-যমুনার পুণ্য সঙ্গম, উত্তরে হিমালয় হতে দক্ষিণে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বাস স্থাপন করে। আর্যগণের অধিকৃত এই ভূমিখণ্ড আর্যাবর্ত নামে পরিচিত হয়।

বঙ্গদেশ উপর্যুক্ত ভূমিখণ্ডের পূর্বদিকে অবস্থিত। বেদে বঙ্গদেশের উল্লেখ না থাকায় তা অনুমান করা হচ্ছে যে সেই সুদূর প্রাচীন কালে এই অঞ্চল বহু অরণ্যানীসঙ্কুল ও অনার্যগণের আবাসস্থল ছিল, অথবা বর্তমান বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জিত ছিল। বেদে বঙ্গদেশের উল্লেখ না থাকায় এর অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করা যেতে পারে না। তবে সম্পূর্ণ বঙ্গদেশ তার পরবর্তী সময়েও ছিল না এ বিষয়ে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

সংহিতার কালঃ বৈদিক প্রভাবের পর সংহিতার আবির্ভাব ঘটে। মনুসংহিতায় উত্তর ভারত বা আর্যাবর্তের সীমানা এভাবেই দেয়া হয়েছে। কেদারনাথ মজুমদার তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে “পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র এবং উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত এর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে পণ্ডিতেরা আর্যাবর্ত্ত বলেন।”

মনুসংহিতায় বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখা যায় না। তবে অনুমানের উপর যদি বঙ্গভূমির অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়া যায়, তবে বঙ্গদেশ তৎকালে আর্যাবর্তের অংশ মধ্যে পরিগণিত ছিল এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে। কিন্তু তথায় আর্যধর্ম প্রচলিত ছিল এমন অনুমান করা যায় না। যাহোক, তৎকালে বঙ্গদেশের অস্তিত্ব থাকুক আর নাই থাকুক, আর্যাবর্তের পূর্বসীমায় মহাসাগরের অবস্থিতি কোনরূপেই অস্বীকার করা যায় না। মহাসাগর তখন আর্যাবর্তের পূর্বসীমা রূপে হিমালয়ের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

রামায়ণের কাল ঃ রামায়ণেও বঙ্গের বহু বিষয়াদির উল্লেখ রয়েছে। রামায়ণের সময় বঙ্গদেশ একটি সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীকে বলেছিলেন, ‘অঙ্গ, বঙ্গ,

www.pathagar.com

মগধ, কোশল প্রভৃতি দেশের রাজারা তার শাসনাধীন ছিল। রামায়ণে বারংবার 'বঙ্গের' উল্লেখ থাকলেও তৎকালীন সময়ে এর ভৌগোলিক অবস্থান কিরূপ ছিল তা সবিশেষ অবগত হওয়া সম্ভব ছিল না। মহাভারত পাঠে এই ভৌগোলিক অবস্থা বিশেষ অবহিত হওয়া যেতে পারে।

মহাভারতের কাল ঃ মহাভারতের লিখিত বর্ণনায় অবগত হওয়া যায় যে, যযাতি রাজার চতুর্থ পুত্র অনুর অধস্তন দ্বাদশ বংশধর বলি রাজার পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে আদিত্যতুল্য তেজস্বী পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। সেই পুত্রগণের নাম অনুসারে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই পাচটি পৃথক পৃথক রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই পাঁচ ভাই রাজ্য শাসন করিতে থাকেন।

এরপর বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ সভাপর্বে দেখা যায়। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প, মহাবীর ভীমসেন পূর্বদিক জয় করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি পুণ্ড্রাধিপতি মহাবল বাসুদেব ও কৌশিকী-কৃছ নিবাসী পরাক্রান্ত মহৌজা (মনৌজা) এই দুই বীরকে যুদ্ধে পরাজিত করে বঙ্গরাজের বিরুদ্ধে ধাবিত হয়েছিলেন। মহীপতি সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপি কিকটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি ও পর্বতবাসী নরপতিগণকে জয় করে সমুদয় ম্লেছদিগকে পরাভূত করলেন। অতঃপর লৌহিত্যদেশে উপস্থিত হন এবং সাগর-তীর প্রভৃতি জল- প্রধান দেশবাসী সমস্ত ম্লেছ নরপতিদিগকে কর প্রদান করতে বাধ্য করলেন।

মহাভারতের উপর্যুক্ত বর্ণনা হতে সাধারণত কতিপয় বিষয় অবগত হওয়া যায়। প্রথমত; ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তে বঙ্গদেশ নামে একটি জনপদ ছিল; দ্বিতীয়ত; সেই সময় বঙ্গদেশ সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন প্রভৃতি রাজাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল; তৃতীয়ত; তাম্রলিপি (বর্তমান তমলুক) সেই সময়েও বর্তমান ছিল এবং তা একটি ক্ষুদ্র রাজার রাজ্য বলে পরিচিত ছিল; চতুর্থত; বঙ্গদেশ অতিক্রম করে পূর্বদিকে লৌহিত্য প্রদেশ ও এর পূর্বে লৌহিত্র সমুদ্র বিস্তৃত ছিল।

অশ্বমেধ পর্বে উল্লেখ রয়েছে যে অর্জন যজ্ঞ তুরগের অনুগমন করে পূর্বদিকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ এদেশে আগমন করেন এবং তা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে বঙ্গরাজ্য অতিক্রম করে ক্রমে সমুদ্র তীর মণিপুরে উপস্থিত হয়। এই বর্ণনা অনুসারে প্রাগজ্যোতিষকে বঙ্গরাজ্যে উত্তরসীমা স্থির করা অযৌক্তিক নয়। মণিপুর মহেন্দ্র পর্বতের দক্ষিণ, উত্তর সরকারের মধ্যে, সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল।

লৌহিত্য সাগর ঃ মহাভারতের স্থুল আলোচনায় বঙ্গরাজ্যের সীমানা সন্ধানের বিষয় অবহিত হওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের গৌরবস্থল, শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমির কারণ ব্রহ্মপুত্র

www.pathagar.com

তখন প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে হিমালয়ের পাদ প্রালিত সাগর তরঙ্গে মিলিত হয়েছিল। সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা "গঙ্গাসাগর" নামে পরিচিত হয়ে আসছিল। ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্যও তখন সঙ্গম-স্থলে লৌহিত্য সাগরের স্ফীত বক্ষে লুক্কায়িত ছিল এবং উত্তর বঙ্গের পূর্বাংশ লৌহিত্য দেশে উপনীত হয়েছিল।

যদি উপস্থিত সিদ্ধান্তই স্থির বলে গ্রহণ করা হয়, তবে বর্তমান বঙ্গদেশের কোন্ কোন্ স্থল লৌহিত্য সমুদ্রের পশ্চিম তলদেশ বলে পরিচিত ছিল। এবং বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার কোন অংশের অস্তিত্ব ছিল কি না এই দুইটি বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। মহাভারত বিরাট গ্রন্থ। সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে এই গ্রন্থে নাই এমন কোন বিষয় প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না। মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে করতোয়া ও বৈতরণী নদীর উল্লেখ রয়েছে। তাম্রলিপিও অতি প্রাচীন স্থান; সুতরাং করতোয়া তাম্রলিপি ও বৈতরণীর অস্তিত্ব রক্ষা করে প্রাগজ্যোতিষের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত হতে বৈতরণীর দিকে রেখাপাত দ্বারা লৌহিত্য সাগরের অবস্থিতি সহজে অনুমিত হতে পারে এবং তা মহাপ্রস্থানিক পর্বের বর্ণনার সাথেও মিলে যায়। বাস্তবিক মহাভারতীয় যুগে বর্তমান ময়মনসিংহ জেলা ও নেত্রকোণা নিয়ে বঙ্গদেশের তিন চতুর্থাংশ লৌহিত্য সাগরের অনন্ত জলরাশির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল।

রঘুবংশে বঙ্গ ঃ মহাকবি কালীদাস বিরচিত রঘুবংশে বঙ্গদেশের পূর্বভাগের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা পাঠেও, পূর্ববঙ্গের অস্তিত্বের চিহ্ন উপলব্ধি হয় না। মহাকবি রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় লিখেছেন, "এইরূপে রঘু পূর্বদিকের রাজাগণকে জয় করে তালবন সমাকীর্ণ মহাসাগর তীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন।" অন্যত্র– রঘু রণতরীকৃত সজ্জিত সময়ে প্রবৃত্ত বঙ্গদেশীয় রাজন্যগণকে স্বীয় বলে পরাভূত করে গঙ্গাস্রোতের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপসমূহে স্বীয় কীর্তি স্তম্ভ স্থাপিত করেছিলেন। রঘুবংশের বর্ণিত বঙ্গদেশের এই ভৌগোলিক অবস্থা মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব কালের পূর্ববর্ত্তী সময়ের। কালিদাসের আবির্ভাব সময়ে বঙ্গদেশ ও কামরূপ ক্রমে সমুদ্রগর্ভ শয্যা থেকে উত্থিত হয়েছিল।

আধুনিক ভূতত্ত্ববিদগণের মত ঃ ভূ তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণও উপর্যুক্ত মতের পোষকতা করেছেন। তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, অতি প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের অস্তিত্ব ছিল না। হিমালয়ের পাদদেশ হতে ভারতবর্ষের পূর্বসীমা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। অদ্যাপি হিমালয়ের স্থানে স্থানে সামুদ্রিক জন্তুর কঙ্কালরাশি দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহের কর্দ্দম থেকেই বঙ্গভূমির উদ্ভব বলে অনুমান করেন।

বৌদ্ধযুগ

পৌরাণিক কাল: মহাভারতীয় যুগ ও বৌদ্ধ যুগের মধ্যে তিন সহস্র বৎসর ব্যবধান। এই ব্যবধানকালের অবস্থা পুরাণ পাঠে অবহিত হওয়া যায়। পুরাণ-প্রভাব বলে, ব্রহ্মপুত্র নদ, তীর্থরাজ আখ্যা পেয়ে বঙ্গদেশে প্রবেশ করতেছিল। তখন ক্রমে পূর্ববঙ্গ জলদি-গর্ভ থেকে

www.pathagar.com

উত্থিত হচ্ছিল এবং অসভ্য বন্য অধিবাসীগণ ক্রমান্বয়ে আগমন করে আবাস স্থাপন করতেছিল। এই সময়ে পূর্ববঙ্গ ও প্রাগজ্যোতিষের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং প্রাগজ্যোতিষ কামরূপ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

মেগেস্থিনীস ও কামরূপঃ এই সময়ে মেগেস্থিনীস নামক গ্রীকদূত, গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার কর্তৃক প্রেরিত হয়ে, তদানীন্তন মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্রে (বর্ত্তমান পাটনা) অবস্থান করতেছিল। কথিত আছে, মেগেস্থিনীস খ্রিস্টপূর্ব্ব ৩০২ অব্দে এ দেশে আগমন করে বহুস্থান ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর লিখিত ভ্রমণ কাহিনী 'ইন্ডিকা' নামে পরিচিতি ছিল। এই ইণ্ডিকা গ্রন্থে প্রকাশিত মানচিত্রে কামরূপ রাজ্যের সীমা সমগ্র পূর্ববঙ্গ সহ পশ্চিম-উত্তরে মিথিলা ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মগধ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। বর্দ্ধমানের দক্ষিণ ও বর্তমান তমলুকের পূর্ব ভাগকে গঙ্গাহৃদয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ থেকে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে বর্তমান ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা জেলার সমগ্র ভূভাগ বিস্তৃত কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হিউ-এনৃথ-সঙ্গ এর চোখে কামরূপ ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ঃ খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে (৬২৯-৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) পরিব্রাজক হিউ-এনৃথ-সঙ্গ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ করেন। তিনি ভারতবর্ষের পূর্বাংশে আগমন করে, ব্রহ্মপুত্র নদ্ অতিক্রম করেছিলেন। ব্রহ্মপুত্র তখন সুবিশাল নদরূপে প্রবহমান ছিল। হিউ-এনৃথ-সঙ্গ লিখেছেন, তিনি পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন হতে একটি বিশাল নদ অতিক্রম করে কামরূপ রাজ্যে আগমন করেছিলেন। কামরূপ সেই সময়ে একটি ক্ষমতাপন্ন রাজ্য বলে পরিগণিত ছিল। এর পরিধি দুই সহস্র মাইল বিস্তৃত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত এই বিস্তৃত ভূভাগকে আধুনিক আসাম, মণিপুর, কাছাড়, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের সমষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন।

হিউ-এনৃথ-সঙ্গের বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এ প্রদেশের ভূমি তখন অতিশয় উর্ব্বরা ও শস্যপূর্ণা ছিল। এ দেশে প্রচুর নারিকেল ও ধান উৎপাদন হতো। নগরের চারিদিকে পয়-প্রণালী দ্বারা জল প্রবাহিত হত। জলবায়ু ও সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল ছিল; এবং দেশের জনগোষ্ঠীর চরিত্র উন্নত ও সৎ ছিল। কামরূপ রাজ্য তৎকালে কুমার ভাস্কর বর্ম্মণ নামক রাজা কর্তৃক শাসিত হচ্ছিল।

হিউ-এনৃথ-সঙ্গের বর্ণনা হতে আরো অবগত হওয়া যায় যে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম ভাগে সেই সময়ে কামরূপের অধিকার পরিব্যাপ্ত ছিল না। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বদিকস্থিত ভূভাগ, বর্তমান পূর্ব ময়মনসিংহ নেত্রকোণা কামরূপের অধীনে ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম দিকস্থিত ভূভাগ, পশ্চিম ময়মনসিংহ, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রও

www.pathagar.com

ব্রহ্মপুত্রকে কামরূপ ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সীমা বলে নির্দেশ করে গিয়েছেন। হিউ-এন্‌থ-সঙ্গ এখান থেকে সমতটে আগমন করেন। ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের দক্ষিণ, ঢাকা ও ফরিদপুর প্রভৃতি সমতট বলে পরিচিত ছিল। সমতট তৎকালে সমুদ্র তীরে অবস্থিত ছিল। সমতটের শাসনভার তখন কার হাতে ন্যস্ত ছিল, ভ্রমণকারী তার উল্লেখ করেন নাই। হিউ-এন্‌থ-সঙ্গের ভ্রমণকাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বঙ্গভূমি তৎকালীন সময়ে ছয়টি প্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। (১) পৌণ্ড্র (উত্তর বঙ্গ, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম ভাগ) (২) কামরূপ (ময়মনসিংহের পূর্বভাগসহ (নেত্রকোণা-কিশোরগঞ্জ) পূর্ববঙ্গ ও আসাম), (৩) সমতট, (ঢাকা, ফরিদপুর) (৪) কমলাঙ্গ (ত্রিপুরা ও কুমিল্লা), (৫) তাম্রলিপি (দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গ) ও (৬) কর্ণসুবর্ণ (পশ্চিম বঙ্গ)। এই বিভাগ অনুসারে অনুমান করা হয় ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম ভাগ বর্তমান পশ্চিম ময়মনসিংহ, পৌণ্ড্র ও পূর্বভাগ, পূর্ব ময়মনসিংহ নেত্রকোণা কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তন্ত্রের কাল ও কামরূপের সীমা ঃ বৌদ্ধধর্ম খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বিপ্লব বিস্তার করে তন্ত্রাদির অভ্যুদয় ও হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের কালে ভারতবর্ষ থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। এই সময়ে কামরূপের সীমানা, কোন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহা যোগিনীতন্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়।

যোগিনীতন্ত্রে লিখিত হলো ঃ

"করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিকর বাসিনী।
উত্তরস্যা কঞ্জগিরি করতোয়াত্তু পশ্চিমে॥
তীর্থ শ্রেষ্ঠা দিক্ষু নদী পূর্ব্বাসাং গিরিকন্যাকে!
দক্ষিণে দিক্ষু নদী লায়াঃ সঙ্গমাবধি॥
ত্রিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণং দীর্ঘেন শত যোজনম।
কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকার মুত্তমম॥"

অর্থাৎ করতোয়া থেকে দ্দিকরবাসিনী পর্যন্ত কামরূপ বিস্তৃত। এর উত্তরে কাঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়া নদী, পূর্বে তীর্থ শ্রেষ্ঠা দিক্ষু নদী এবং দক্ষিণে লাক্ষা (শীতল লক্ষী) ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থল যা ত্রিকোণাকার ।

ব্রহ্মপুত্র-আড়ালিয়া-লাক্ষাঃ ব্রহ্মপুত্র আড়ালিয়া নাম গ্রহণ করে ঢাকা জিলাস্থ মহেশ্বরদি পরগণার মধ্য দিয়ে সুপ্রসিদ্ধ এক্‌ডালার বাঁকের নিকট স্বীয় কন্যা লাক্ষার (শীতল লক্ষীর) সাথে মিলিত হয়েছে। যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের দক্ষিণ সীমা এই আড়ালিয়া ও লাক্ষার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত নির্দ্ধারিত হয়েছে। কিন্তু আইন-ই-আকবারি-প্রণেতা আবুল ফজল বর্তমান

www.pathagar.com

টুকচান্দপুরের নিকট লাক্ষার উৎপত্তিস্থানকেই কাম-রূপের দক্ষিণ-সীমানা বলে নির্দেশ করেন। ডাক্তার টেইলার আবুল ফজলের মত উদ্বৃত করে বলেছেন, যেস্থানে লাক্ষা ব্রহ্মপুত্র হতে উৎপন্ন হয়েছে, কামরূপের সীমানা সেই পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

উৎপত্তি ও মিলনের হিন্দুশাস্ত্রানুগত প্রভেদ লক্ষ্য না করে মুসলমান পণ্ডিত আবুল ফজল ও ইংরেজ ঐতিহাসিক টেইলার উভয়েই ভুল সীদ্ধান্তে উপনিত হয়েছিলেন। বাস্তবিক যোগিনীতন্ত্র আড়ালিয়া ও লক্ষার মিলন স্থানকেই সঙ্গমস্থল নির্দেশ করিতেছেন। হিন্দুশাস্ত্রকারগণও এই সঙ্গম অবৈধ বলে ব্রহ্মপুত্রের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে নিয়েছেন।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী প্রত্নতত্ত্ববিদগণ কর্তৃক তন্ত্রাদির অভ্যুদয়কাল বলে বর্ণিত হয়েছে। যোগিনীতন্ত্র সেই সময়ে বা তৎপরবর্ত্তী সময়ে রচিত হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যোগিনীতন্ত্রে সময়ে, খ্রিস্টীয় ৮ম হতে ১০ম শতাব্দীর মধ্যে ময়মনসিংহের অংশ ৭ম শতাব্দীতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধণের অন্তর্ভুক্ত ছিল পুনরায় কামরূপের অধিকারভুক্ত হয়েছিল (কেদার নাথ মজুমদার, ১৯০৭)।

হিন্দু শাসনামল

হিন্দু শাসন, পাল ও সেন বংশঃ খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাঙ্গালায় সেন ও পাল রাজবংশের আবির্ভাব হয়। এই উভয় বংশীয় নৃপতিগণ বাঙ্গালার বিভিন্নস্থান শাসন করতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে কামরূপেও তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবে পরিবর্তনের পর পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই অনুচেছদে কেদারনাথ মজুমদারের গ্রন্থের আলোকে সংক্ষেপে বাঙ্গালার ও কামরূপের ইতিহাস পর্যালোচনা করে ময়মনসিংহের ও নেত্রকোণার তৎকালীন শাসন ব্যবস্থার বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে।

ভাওয়াল ও মধুপুরের পালরাজগণঃ খ্রিস্টীয় দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত অনুমান ১২০ বৎসর কাল পাল রাজগণ বঙ্গদেশ শাসন করেছিলেন। এই সময়ে ময়মনসিংহের দক্ষিণ অংশে বর্তমান কাপাসিয়া, রায়পুরা ও ধামরাই নামক স্থানত্রয়ে শিশুপাল, হরিশ্চন্দ্র পাল ও যশোপাল নামক পাল বংশীয় তিনজন ক্ষুদ্র নৃপতির রাজ্য ও পশ্চিমাংশে মধুপুরে পালরাজ ভগদত্তোর ক্ষুদ্ররাজ্য অল্পে অল্পে প্রসারিত হয়েছিল। সেন রাজবংশের অভ্যুদয় হলে এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়। আজ পর্যন্তও ভাওয়ালের অরণ্য মধ্যে শিশুকালের বিশাল দীর্ঘ ও বিরাট রাজধানীর ভগ্ন কঙ্কাল প্রচলিত প্রবাদের সত্যতা প্রমাণ করছে।

রাজা ভগদত্ত ও বারতীর্থঃ মধুপুরে প্রবাদ প্রচলিত ভগদত্তের গৃহভগ্নাবশেষ, পুষ্করিণী– 'বারতীর্থ' দীঘি, দেবালয়– মদন গোপালের বাড়ি প্রভৃতির চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রয়েছে। ভগদত্তের প্রতিষ্ঠিত বারতীর্থ ক্ষেত্রে এখনও প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে "মেলা" হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

প্রবাদ রয়েছে যে, রাজা ভগদত্ত[১] স্বীয় পুণ্যশীলা জননীর আজ্ঞামতে বারতীর্থের পুন্যোদক এনে নিজ রাজধানীকে 'বারতীর্থাশ্রম' করেছিলেন। সেই "বারতীর্থাশ্রমের" পুণ্যনাম আজও বিলুপ্ত হয় নাই।

আদিশূরঃ খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে, পাল বংশের রাজত্বকালেই, সেন রাজবংশের অভ্যুদয়। সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বীরসেন বা আদিশুর দশম শতাব্দীর শেষভাগে সমতট প্রদেশস্থ বিক্রমপুরে (আধুনিক রামপাল) স্বীয় রাজধানী স্থাপন করে সমতট প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন এবং ক্রমে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করেন। আদিশূরের প্রপৌত্র বিজয়সেনের সময় সেন বংশের রাজত্ব সমগ্র বঙ্গ দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এতদ্ব্যতীত বিজয়সেন মদ্র, কলিঙ্গ এবং কামরূপেও অধিকার বিস্তার করেন। সুতরাং বর্তমান ময়মনসিংহ তখন কামরূপ রাজ্যের সাথে সেন রাজবংশের শাসনাধীনে আনা হয়। ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার পাল রাজাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি সম্ভবত এই সময়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বল্লালসেনঃ পরবর্তীতে বিজয়সেনের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ বল্লালসেন রামপালের শাসনভার গ্রহণ করেন। বল্লালসেন তাঁহার শাসনাধীন বঙ্গদেশকে পাঁচভাগে বিভক্ত করেন। যথা– রাঢ়, বাগড়ি, বারেন্দ্র, মিথিলা ও বঙ্গ। প্রাচীন লেখক হেমিলটন সাহেবের গ্রন্থে এই পাঁচ বিভাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

(১) রাঢ় : হুগলি নদী ও পদ্মানদীর মধ্যবর্তী স্থান। (২) বাগড়ী : পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্য প্রদেশ। (৩) বারেন্দ্র : পশ্চিমে মহানন্দা, দক্ষিণে পদ্মা ও পূর্বে করতোয়া, এদের মধ্যবর্তী ভূভাগ। (৪) মিথিলা : পূর্বে মহানন্দা ও গৌর রাজ্য, পশ্চিমে ও দক্ষিণে ভাগীরথী এই ভূমি খণ্ড। (৫) বঙ্গ-করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী স্থান। বঙ্গের স্থান নির্দেশ করে হেমিলটন সাহেব লিখেছেন, বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী এই বঙ্গের অধীন ঢাকা নামক স্থানের সন্নিকটে বহুপূর্বে ও পরে অবস্থিত ছিল।

কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন ও পূর্ব ময়মনসিংহে জনসমাগম আরম্ভ : আনন্দভটের কৃত সুপ্রসিদ্ধ বল্লালচরিত গ্রন্থে বল্লালসেনের অসবর্ণা রমণীয়র পানিপীড়ন সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে। এই অসবর্ণা কন্যা গ্রহণ সম্বন্ধীয় গোলযোগের সাথে পূর্ব ময়মনসিংহের ইতিহাস অল্পাধিক পরিমাণে সংশ্লিষ্ট। বল্লালসেন শাসনভার গ্রহণ করে নিজরাজ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। এই কৌলিন্য সৃষ্টি হতেই দেশের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণের মধ্যে এক ঘোর বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। দেশের আদিম ব্রাহ্মণ, বৈদ্ধ, কায়স্তগণ ক্ষোভে ও দুঃখে

[১]কেহ কেহ এই ভগদত্তকে মহাভারতোক্ত ভগদত্ত বলিয়া পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন। এ কল্পনা তিনি পাল রাজা ভগদত্ত না হইয়া কোচ রাজা বা হাজং জাতীয় রাজাও হইতে পারেন। এতদবিষয়ে প্রচলিত কিংবদন্তি ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই (কেদারনাথ, ১৯০৭)।

www.pathagar.com

দেশত্যাগ করেছিল। তাঁরা জাতি রক্ষার্থে সর্বস্ব পরিত্যাগ করে কেবল স্ত্রীপুত্রসহ ভিন্ন রাজ্যে চলে যায় এবং বল্লালের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ঠিক সেই সময়ে বল্লালসেন তার নবপরিণীতা ডোম কন্যার অন্ন গ্রহণের জন্য সমগ্র সমাজকে বাধ্য করতে চেষ্টা করেন। যাঁরা বল্লালের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, সেই জাতিচ্যুতি-ভয়বিহ্বল ব্যক্তিগণ চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও পূর্ব ময়মনসিংহ প্রভৃতি বল্লাল-শাসন বহির্ভূত প্রদেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে বাস করতে লাগে।

পূর্ব ময়মনসিংহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যঃ এই গোলযোগে কামরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন ভূগ্রারাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব ময়মনসিংহের নেত্রকোণার অরণ্য ভূমিতে এই সুযোগে কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি অসভ্য কোচ, হাজং, গারো প্রভৃতি দ্বারা শাসিত হত। কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ীতে, নেত্রকোণার অন্তর্গত খালিয়াজুরি, মদনপুর ও সুসঙ্গে এবং ময়মনসিংহ সদরের অন্তর্গত বোকাইনগরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়ে বিক্রমপুরে বল্লাল সেনের পূর্ণ প্রভাব।

অনন্ত দত্তঃ শ্রীমান অনন্তদত্ত বল্লাল ভয়তাড়িত হয়ে গুরু শ্রীকণ্ঠ দ্বিজসহ এই সময়ে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করে কামরূপে বসবাস স্থাপন করেন। বলাবাহুল্য এই গুরু শিষ্যই পূর্ব ময়মনসিংহের সর্ব প্রথম ভদ্র উপনিবেশী। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হতেই পূর্ব ময়মনসিংহ অল্পে অল্পে কামরূপের শাসন-শৃঙ্খল পরিহার করিতেছিল।

সুসঙ্গ ও সোমেশ্বর পাঠকঃ খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব ময়মনসিংহের উত্তর ভাগ সুসঙ্গ "পাহাড় মুল্লুকে" বৈশ্য গারো নামক এক গারো রাজত্ব করতেছিল। সোমেশ্বর পাঠক নামক জনৈক পরাক্রান্ত ভ্রমণকারী বহু অনুচর সমভিব্যাহারে এসে বৈশ্যগারোকে পরাস্ত করে সেই প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করে। এই সোমেশ্বর পাঠকই সম্মানিত সুসঙ্গ রাজবংশের আদি পুরুষ। তিনি ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে (৬৮৬ বঙ্গাব্দে মাঘ মাসে) কান্যকুব্জ হতে এদেশে আগমন করেছিলেন। এইরূপে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই পূর্ব ময়মনসিংহের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ অসভ্যদিগের হাত হতে মুক্ত হয়ে যায়।

ভাটী রাজ্যঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জিতারী নামক জনৈক ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী কর্তৃক কামরূপের তৎকালীন রাজধানী 'ছাটী' আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ মেঘনা নদীর পশ্চিম তট-ভূমিকে 'ভাটী' বলে নির্দ্দেশ করেছিলেন। ময়নমনসিংহের পূর্ব প্রান্তে খালিয়াজুরিকে ভাটী নামে অভিহিত হতে অনেক প্রাচীন কাগজ পত্রে দেখা যায়। খালিয়াজুরি পরগণার প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কয়েক শতাব্দী পূর্বে লম্বোদর নামক একজন ত্রিয় সন্ন্যাসী এদেশে আগমন করে ভাটীর শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সন্ন্যাসীর বংশ এখনও বর্তমান আছে। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর বাদশাহ হতে এদের পূর্বপুরুষেরা "ভাটী মুল্লুকের" যে "পাঞ্জাফরমান" পেয়েছিলেন এতে তাঁহাদিগকে ভাটীর শাসনকর্তা বলেই অভিহিত করা হতো। সুতরাং এই সময় হতে পূর্ব ময়মনসিংহের পূর্বভাগের সাথে কামরূপের

www.pathagar.com

কোন সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু এই সময়েও জঙ্গলবাড়ী, মদনপুর, বোকাইনগর, গড়দলিপা প্রভৃতি স্থানে অসভ্য কোজ হাজংদিগের শাসন পরিচালিত হচিছল।

পাঠান শাসনকাল

বঙ্গ-বিজয়ঃ বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা বল্লাল বংশোদ্ভব লাক্ষ্মণেয় সপ্তদশ পাঠানের হাতে পরাস্ত হলে, বাঙ্গালায় পাঠান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বখতিয়ার খিলজি বাঙ্গালা জয় করে দখলকৃত অংশকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বাগড়ির কিংদংশ ও বরেন্দ্র ভূমির রাজধানী দেবকুটে এবং মিথিলার অংশ ও রাঢ়ের রাজধানী লক্ষ্মণাবর্তীতে স্থাপিত হয়। বঙ্গ এবং কামরূপে তখনও মুসলমানগণ প্রবেশ করতে পারেন নাই।

কামরূপে মুসলমানঃ বখতিয়ার বাঙ্গালা জয় করে কামরূপ জয় উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন ও ব্রহ্মপুত্রের অপ্রতিহত প্রভাবে বিপন্ন হয়ে প্রত্যাগমন করেন ।

তুগল খাঁঃ বখতিয়ারের পর, ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন উজবেগ তুগল খাঁ পুনরায় কামরূপ আক্রমণ করেন। তিনিও রাঙ্গামাটির দিক হতেই আক্রমণ করেছিলেন। এই আক্রমণে কামরূপরাজ পলায়ন করে প্রাণে রক্ষা পায়; কামরূপ রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এই সুযোগেই গারো, পর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগে বা বর্তমান পূর্ব ময়মনসিংহে সুসঙ্গ, মদনপুর, বোকাইনগর, গড়দলিপা, ভাটী, জঙ্গলবাড়ী প্রভৃতি স্থানে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত হয়।

অতঃপর পলায়মান কামরূপাধিপতি, তুগলখাঁকে হত্যা করে রাজ্য পুনরুদ্ধার করে নেয়; কিন্তু, গারো পর্বতের দক্ষিণ ভাগ আর কামরূপের অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ রইল না। কামরূপরাজ দক্ষিণ দিকে দুর্ভেদ্য গারো পর্বত অতিক্রম করেনি বটে, কিন্তু পশ্চিম দিকে সেই সময়েও, ত্রিহুতের পশ্চিম গণ্ডক নদী পর্যন্ত কামরূপ রাজ্যোন্তর্ভূক্ত রয়ে গেল। তুগলখাঁর হত্যার পর, যখন পূর্ব-ময়মনসিংহে পূর্ব্বোক্ত কতিপয় স্থানে, কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসনকর্তা নিজ নিজ সাতন্ত্র রক্ষা করছিলেন, সেই সময়ে পশ্চিম ময়মনসিংহ সেন রাজাদিগের শাসনাধীন থেকে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের অস্তিত্ব ঘোষণা করছিল।

মজলিসখাঁ হুমায়ুন ও গড়দলিপাঃ ১৪৯১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ফিরোজ খাঁ বাঙ্গালার স্বাধীন সিংহাসনে আরোহণ করে, ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করতে প্রয়াস পান ও তাঁর সেনাপতি মজলিসখাঁ হুমায়ুনকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। মজলিসখাঁ ময়মনসিংহের উত্তর ভাগে প্রবেশ করে, সেরপুর প্রদেশ আক্রমণ করেন। সেরপুরের অন্তর্গত গড়দলিপায় তখন দলিল সামন্ত নামক জনৈক কোচরাজা রাজত্ব করছিলেন। হুমায়ুন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়ে দলিপ পরাজিত ও নিহত হন। এভাবে সেরপুরে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই ময়মনসিংহে মুসলমান প্রবেশের প্রথম সূত্রপাত।

www.pathagar.com

পূর্ব ময়মনসিংহে হুসেনশাহের স্মৃতিচিহ্ন : হুসেনশাহ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বদিক জয় করে, ত্রিপুরা পর্যন্ত দখল করেন ও খোয়াজ খাঁকে শাসন করার কর্তৃত্ব প্রদান করেন। খোয়াজখাঁ পূর্ব ময়মনসিংহের অন্তর্গত মুয়াজ্জমাবাদে থেকে, এই পুর্ব প্রদেশ শাসন করতে থাকেন। খোয়াজ খাঁর নামাঙ্কিত একখণ্ড প্রস্তর-লিপিও এসিয়াটিক সোসাইটির যত্নে আবিস্কৃত হয়েছে।

মুয়াজ্জমাবাদঃ লিপির উল্লেখিত মুয়াজ্জমাবাদের নাম বর্তমান সময়ে বিলুপ্ত হয়ে গিয়াছে। সুপণ্ডিত ব্লকম্যান তাঁর প্রবন্ধে মুয়াজ্জমাবাদের অবস্থান নির্ণয় সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তের উপনীত হতে পারেননি। পরবর্তী বৎসর তাঁর অন্য প্রবন্ধে এই মুয়াজ্জমাবাদকে তিনি বর্তমান পূর্ব-ময়মনসিংহ বলেই উল্লেখ করেছেন। সুতরাং হুসেনশাহ ময়মনসিংহের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় ভাগই যে হস্তগত করেছিলেন, এর প্রমাণও পাওয়া যায়।

নছরৎসাহ ও নছরৎসাহিঃ হুসেনশাহ কর্তৃক কামরূপ বিজয়ের পর নছরৎসাহ কামরূপের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু, অল্পকাল পরেই, বর্ষা-সমাগমে, যখন দুর্গম গিরিকান্তার ভীষণ ভাব ধারণ করিল– পথ-ঘাটে চলাচল বন্ধ হয়ে গেল, তখন সেই দুর্যোগে পলায়মান রাজগণ এসে সদলবলে তাঁদের পরিত্যক্ত রাজ্য অধিকার করে নিলেন। নছরৎ পালিয়ে গারো পর্বত অতিক্রম করে রক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গীয় সৈন্য সামন্তগণ অরণ্যে বিপদাপন্ন হয়ে জীবন হারায়। নছরৎ পালিয়ে মুয়াজ্জমাবাদ (বর্তমান পূর্ব ময়মনসিংহ) আগমন করেন ও পূর্ব-ময়মনসিংহের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহার অধিকৃত কামরূপের অংশ, তাঁর হস্তচ্যুত হয়ে যায়। এদিকে নছরতের নতুন শাসিত প্রদেশ "নছরত ও জিয়াল" নামে পরিচিত হতে থাকে। তাঁর শাসনান্তর্গত সমগ্র প্রদেশকে "নছরৎসাহি" নামেও অভিহিত করেছিলেন। বর্তমান ময়মনসিংহ জেলা এই নছরৎসাহির নামান্তর। এই নছরৎসাহি আকবর বাদশাহের সময়ে সরকার বাজুহা ও ইংরেজ শাসন সময়ে জেলা ময়মনসিংহ বলে পরিচিত হয়।

মোগল শাসনকাল

মোগল বংশঃ বাঙ্গলায় যখন নছরৎসাহ স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতেছিলেন সেই সময়ে ইব্রাহিম লোদীর দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের ভীষণ যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোগলশাসনামলের অভ্যুদয় ঘটে। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর চার বৎসর মাত্র রাজত্ব করে কালগ্রাসে পতিত হলে, তাঁর পুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুমায়ুনের সময়ে সেরসাহ বাঙ্গালা অধিকার করে ক্রমে মোগল সিংহাসন কেড়ে নেয়। সম্রাট হুমায়ুন পলায়ন করে পরিত্রাণ লাভ করেন। সেরসাহ সিংহাসন গ্রহণ করলে পরবর্তীতে একবার বাঙ্গালার ভূমি বন্দোবস্ত হয়। সেরসাহ বঙ্গদেশকে কয়েক

www.pathagar.com

বিভক্ত করে বাঙ্গালার রাজকর ও ভূমি বন্দোবস্ত করেন ও প্রদেশে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁর সময়ে ব্রহ্মপুত্র তীর থেকে সিন্ধুতীর পর্যন্ত একটি সুবৃহৎ রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়।

মুলকে সুসঙ্গঃ ঈশাখাঁ জঙ্গলবাড়ীতে রাজধানী স্থাপন করে দিল্লীশ্বরের অধীনে এই বাইশ পরগণা শাসন করতেছিলেন। সেই সময়ে সরকার বাজুহার উত্তর প্রদেশে সুসঙ্গের রাজা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেছিলেন। দশকাহনীয়া সেরপুরের উত্তর ভাগ, করৈবাড়ী পাহাড় হতে সুসঙ্গের পাহাড়ের পূর্ব সীমা পর্যন্ত, এই বিশাল পাহাড় রাজ– "মূলকে সুসঙ্গ" নামে অভিহিত ছিল। সুসঙ্গে তখন রঘুনাথ সিংহের রাজত্ব। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর রঘুনাথ মোগল সিংহাসনের অধীনতা স্বীকার করেন ও সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। মসনদ আলী ঈশাখাঁ ও রঘুনাথসিংহ ব্যতীত সেই সময় সরকার বাজুহায় অন্য কোন শাসন কর্তা ছিলেন, এর কোন প্রমান পাওয়া যায় না।

১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত ঢাকায় বাঙ্গালার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর মুর্শিদকুলী খাঁ নবাব হয়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন মুসকদাবাদে। মুর্শিদকুলী খাঁর সময় ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে বাঙ্গালার ভূমির তৃতীয় বার বন্দোবস্ত হয়, এই বন্দোবস্তে বাঙ্গালা দেশ ১৩ চাকলা ৩৪ সরকার ও ১৬৭০ মহালে বিভক্ত হয়। এর মধ্যে পদ্মার পূর্ব তটভূমি ৬টি চাকলায় বিভক্ত হয়। বাঙ্গালায় এই প্রদেশ বা চাকলাগুলি ২৫টি জমিদারী বিভাগে বিভক্ত ছিল। সরকার বাজুহার মহালগুলি নতুন চারি চাকলায় বিভক্ত হয়ে গেলেও জমিদারী বিভাগ অনুসারে এই বিভিন্ন চাকলার অধিকাংশ মহালগুলিই রাজস্ব সম্পর্কে জমিদারী ঢাকা জালালপুরেরদিগের বা ঢাকা নেয়াবতের অন্তর্গত ছিল। সুসঙ্গ, ত্রিপুরা, মুচা, তেলিয়াজুরী প্রভৃতি চার জন প্রতি অন্তনৃপতির জন্য ৪৯,৭৫০ টাকা রাজস্বে দুটি পরগণা জায়গীর নির্দিষ্ট ছিল।

বৃটিশ শাসন ঃ ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা

ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক ব্যবস্থা ও ঢাকা অধিকার : যে দিন রাজস্ব বাকীর জন্য সুসঙ্গের নাবালক জমিদারদ্বয়কে তোপাগ্নিতে, অতি নৃশংস ভাবে হত্যা করার দিন নির্ধারিত ছিল, সেই দিন অতি প্রত্যুষে ইংরেজের ভীষণ তোপধ্বনি মাধ্যমে বুড়িগঙ্গার প্রশস্ত হৃদয় আলোড়িত করে ঢাকা নগরীতে নূতন বিপ্লব জাগিয়ে দেয়। সেই শুভ দিনে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের বিজয় ঢাকানগরীতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

কুঠি স্থাপন: ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে ইংরেজ ঢাকা অধিকার করেন। ইংরেজ শাসকগণ ঢাকানগরী অধিকার করেই শাসন কার্যে মনোযোগ প্রদান করেননি। তাঁরা পর্তুগীজ প্রভৃতি বৈদেশিক বণিকদিগের বাণিজ্য কুঠিগুলি অধিকার করেন ও কোম্পানির বাণিজ্য চালাতে থাকেন। তাঁরা এই সময় ময়মনসিংহে অগ্রসর হয়ে বেগুনবাড়ীতে এক কুঠি স্থাপন করেন এবং কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুর প্রভৃতি স্থানের পর্তুগীজ ও ফরাসীগণের কুঠিগুলি হস্তগত করে নেয়।

www.pathagar.com

জেলা স্থাপন ও বন্দোবস্ত: ময়মনসিংহ জেলার অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, প্রশাসনিক সকল সংস্কারের মূলে ছিল জনগণকে শোষণ করা ও মাত্রাতিরিক্ত ভূমি রাজস্ব আদায়। লজ সাহেব এ প্রদেশে এসে কেবল সন্ন্যাসী দমনেই নিযুক্ত ছিলেন না। রাজস্ব আদায়ও করেছিলেন। তিনি জমিদারদিগকে কয়েদে রেখে ও খাজনাদি আদায় করতে আরম্ভ করেছিলেন। রেভিনিউ বোর্ড জমিদারদের কয়েদ রাখতে নিষেধ করায় তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে কাননগুর কার্যালয় পুনঃস্থাপনের অনুমতি হলে স্থানে স্থানে কাননগুর আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়।

কালেক্টর মি. রটন ও নূতন জেলা স্থাপন: ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় সন্ন্যাসীর উপদ্রব সূচিত হলে রেভিনিউ বোর্ড অনন্যোপায় হয়ে ১৭৮৭ সনে ময়মনসিংহ জেলা স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং সেই সনের ১০ এপ্রিল বেলুহার কালেক্টরকে ময়মনসিংহে এসে নূতন জেলার ভার গ্রহণ করতে অনুমতি প্রদান করে। অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে বেলুহার কালেক্টর মি. ডবলিউ রটন এ জেলার শাসন ভার গ্রহণ করেন। তৎকালে এই জেলার কতকাংশ ঢাকার কালেক্টরের অধীন ছিল ও অবশিষ্ট অংশ মি. ডাউসন, লজ ও চ্যাম্পিয়নের অধীনে শাসিত হতো। মি. রটন তাঁদের নিকট হতে কাগজ পত্র গ্রহণ করে নূতন জেলা স্থাপন করেন। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ১লা মে ময়মনসিংহ জেলা স্থাপিত হয়। রাজচন্দ্র রায় নামক কোন ব্যক্তি কালেক্টরের দেওয়ান নিযুক্ত হন। মি. রটনের সামরিক সাহয্যের জন্য মি. ওয়াল্টেয়ার মেগুয়ার ও মি. প্লাইডেন নামক দুই জন সহকারী কর্মচারীও প্রেরন করা হয়।

প্রাচীন জমিদার ও জমিদারী শাসন ঃ সম্রাট আকবরের সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশ মোগল সম্রাটের শাসনাধীন হয় নাই। জাহাঙ্গীর বঙ্গদেশ কেবলমাত্র শাসনাধীনে আনয়ন করে মৃত্যুবরণ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে শাহ সুজা রীতিমত বাঙ্গালার কর আদায় করতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে দেশ শাসনের ভার গ্রাম্য সমিতি ও গ্রাম্য মন্ডলদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ঢাকায় নায়েব সুবাদারের বাসস্থান ছিল। সরকার বাজুর সম্পূর্ণ ভার সুবাদারের হাতে ছিল।

রাজস্ব আদায়ের জন্য কাননগুর কার্যালয় : রাজস্ব ও জমা জমির বন্দোবস্তের জন্য স্থানে স্থানে কাননগুর কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। দশকাহনীয়ার (সেরপুর) অন্তর্গত দর্শা, মমিনসাহির (ময়মনসিংহ) অন্দর্গত বোকাইনগর ও বড়বাজুর অন্তর্গত নালিপা নামক স্থানে তিনটি প্রধান কাননগুর কার্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। অন্যান্য বিচার আচার পরগণার চৌধুরী (জমিদার) দিগের দ্বারাই সম্পাদিত হত। জমিদারদিগের সানন্দেও তাঁদের প্রতি এইরূপ ক্ষমতা দেয়া হত। সেই সানন্দ বলে জমিদার, প্রজা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারিদিগের বিচার করতেন এবং দস্যু ও তস্করের শাস্তি প্রদান করতেন। জমিদারদিগের বিচারের উপর দেওয়ানী আদালত ছিল। জমিদারের এইরূপ কার্যের জন্য পারিশ্রমিক স্বরূপ জায়গীর ভূমি নির্দিষ্ট ছিল। মোগল শাসন সময়ে আইন কানুনের বিশেষ প্রাদুর্ভাব থাকলেও কার্যত তাহা অতি অল্প পরিমানেই কার্যকর হত। এই সময়ে দেশে অত্যাচারের পরিসীমা ছিল না। রাজকর্মচারীরা স্ব স্ব উপার্জ্জনের চিন্তায় বিব্রত থেকে প্রতি মুহূর্তে প্রজার কষ্টোপার্জিত অর্থ শোষণে লিপ্ত থাকতো। প্রজা প্রাণ রক্ষার জন্য যথা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতো।

www.pathagar.com

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন: ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা মে তারিখের চিঠি দ্বারা রেভিনিউ বোর্ড মি.রটনকে এই জেলার ভূমিবন্দোবস্তের দায়িত্বভার প্রদান করেন। জনাব রটন উপর্যুক্ত আদেশ অনুসারে জেলার বন্দোবস্ত করে যে রিপোর্ট প্রদান করেছিলেন, অতিঅল্প পরিবর্তনের সাথে তা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়েছিল। অতীত ইতিহাস পর্যালোচনান্তে যে সত্য এবং তথ্য বেরিয়ে আসে তা হ'ল সকল শাসকের শাসনের মূলে ছিল এ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং নিজেদের ভাগ্যোন্নোয়ন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালের পাকিস্তানের জন্ম হলেও মুক্তি মিলেনি এ দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর। পাকিস্তানী শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণ এ দেশের মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে জাতি গর্জে উঠেছিল ১৯৭১ সালে, অর্জিত হ'ল স্বাধীনতা, কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক বৈষম্য দূর হয়েছে কি না এ প্রশ্ন বিশ্লেষণ করার বিরাট অবকাশ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রধান দুইটি বিবেচ্য বিষয় হ'ল; প্রথমত, টেক্সই উন্নয়ন তথা উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার যা অর্জনের অপরিহার্য শর্ত হলো প্রাকৃতিক সম্পদের দীর্ঘ মেয়াদি টেক্সই ব্যবস্থাপনা করা। যে প্রাকৃতিক সম্পদ, কাঁচামাল, খাদ্য, বাসস্থান সহ অন্যান্য সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে থাকে; দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদের সুষম বন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। আমাদের দেশে গণতন্ত্রের উত্তরণ হলেও উপর্যুক্ত বিষয় দুইটি অবস্থা নিশ্চিত করতে সময় লাগবে। দ্রুত অগ্রগামী পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদের সম্পদের স্টক ও এর চাহিদার নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা করতে না পারলে এ জাতির বিপর্যয় অনিবার্য এ কথা বলা যায় নির্দ্বিধায় ।

সুসঙ্গ: নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর (সুসঙ্গ) প্রাকৃতিক সম্পদের অত্যন্ত সমৃদ্ধ ভাণ্ডার, বর্তমান দূরাবস্থা দেখলে তা কেউ বিশ্বাস করতে নাও পারে। তবে কেদারনাথ মজুমদারের গ্রন্থে বর্ণিত এ এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এ সম্পদ সংরক্ষণ না করলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য হীনতা ও দারিদ্র আমাদের ক্রমেই বাড়বে। তালুক- লক্ষীবারদি- রাজস্ব ছিল ৩০১/- টাকা যা সুসঙ্গের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র বনভূমি। পূর্বে তা সুসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজেদর ও দীনমণি চান্দ (Rajeder Dunamanny Chand) (রাজেন্দ্র ও দীনমণি চন্দ) এই ভূমি আবাদ করে পৃথক বন্দোবস্ত করেন। পরবর্তিতে তাঁদের পাঁচজন উত্তরাধিকারীর কাছে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছিল।

পরগণা খালিয়াজুরী: রাজস্ব ১৭০০/- টাকা। রামশঙ্কর চৌধুরী, অনুপনারায়ণ চৌধুরী, মোহনরাম চৌধুরী, জয়প্রসাদ চৌধুরী, মাণিকরাম চৌধুরী, আবুলওয়াল্লা চৌধুরী, মহম্মদ গহুর, মহম্মদ রসন ও মহম্মদ রঞ্জি এই মহালের মালিক। এ মহাল পূর্বে বর্তমান আয়তন অপেক্ষা অনেক বড় ছিল। কাসিমআলী খাঁর সময়ে এই মহালের রাজস্ব তিন হাজার পাচশত এক টাকা পনের আনা এক গণ্ডা ছিল। অতঃপর অনেক তালুক পৃথক হয়ে যাওয়ায় মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব হ্রাস করে এক হাজার চৌত্রিশ টাকা তিন আনা ছয় কড়া ধার্য করেন। তারপর ক্রমে বৃদ্ধি হয়ে ১৭০০ টাকা হয়। এই মহলের ভূমিতে ধান অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। জলকর ও মৎস্য বিক্রয়ের আয়ই এই মহালের প্রধান আয় এবং তা দ্বারাই রাজস্ব দেয়া হত। উপর্যুক্ত বর্ননা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে সমাজকে নিয়ন্ত্রন ও শাসনের প্রধান উপকরণ হল ভূমি। শাসক গোষ্ঠি শাসনের নামে জনগণকে শোষণ ও নির্বিচারে অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে নিজেদের সুবিধা হাসিল করতো। সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সুশাসন বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর দ্রুত উন্নতি প্রবৃদ্ধির ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং দ্রুত বর্ধনশীল জন গোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন করতে হলে প্রাকৃতিক সম্পদের টেক্সই ব্যবস্থাপনার কোন বিকল্প নেই।

www.pathagar.com

বৃটিশ শাসন ও শোষণের ইতিবৃত্তঃ ব্রিটিশ বিচার ও শাসন প্রতিষ্ঠা

শাসন, বিচার ও রাজস্ব বিভাগ : মোগল শাসনের সময় এ অঞ্চলের শাসন ও বিচার ক্ষমতা কাননগু ও কাজিগণের হাতে ছিল। যে সকল স্থানে কাজি বা কাননগুর কার্যালয় ছিল না, পরগণার জমিদারগণ সে সকল স্থানের শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। জমিদারগণের রাজস্ব প্রদানের ক্রটির বিচার রাজধানীতে হতো। রাজস্ব প্রদানের ক্রটি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে ক্রটি হলে জমিদারগণকে প্রায়ই কোন শাসন করা হতো না। প্রজা-সাধারণ নীরবে জমিদারের অত্যাচার সহ্য করিত।

ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভকালেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। জমিদারগণ স্বীয় রাজস্ব ঢাকার কালেক্টরীতে প্রদান করিতেন। রাজস্ব প্রদানের ক্রটি হলে, কোম্পানীর লোক, জমিদার বা তাদের আমলাদেরকে ধরে নিয়ে যেত । প্রজা-সাধারণের সাথে কোম্পানীর কোনো সম্পর্ক ছিল না। প্রজাদের অভিযোগের বিচার জমিদারগণই করিতেন। ১৭৮৭ সনের ১লা মে ময়মনসিংহ জেলা স্থাপিত হয়।[২] জেলা স্থাপিত হলে জেলার কালেক্টরের হাতে বিচার শাসন বিভাগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়। এইরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হলেও কালেক্টর রাজস্ব সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে মনোনিবেশের সুযোগ ও ইচছা কোনটাই তাদের ছিলনা। কারণ রাজস্ব আদায় ছিল বেশী লাভজনক পেশা।

দশশালা বন্দোবস্তের সময় জমিদারীর আওতায় অনেক মহাল পৃথক হয়ে যাওয়ায়, ব্যয়বহুল কালেক্টর খাজনা আদায়ের জন্য তহসীল কাছারীর মঞ্জুরী আনয়ন করেন। এর পর ১৮৭৩ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলে পৃথক জজ নিযুক্ত হয়ে, কালেক্টরের কাছ থেকে বিচারভার গ্রহণ করেন। এই সময় ময়মনসিংহ জেলার আয়তন অত্যন্ত বৃহৎ ছিল। শ্রীহট্ট জেলার তরফ, ত্রিপুরা জেলার মেহের, সরাইল, বরদাখাত প্রভৃতি নোয়াখালী জেলার ভেলুয়া, পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ, আসামের তুরা প্রভৃতি বহুদূরবর্তী স্থান ময়মনসিংহের কালেক্টরের শাসনাধীন ছিল।

মিঃ রটন–জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর : ময়মনসিংহে জেলা স্থাপনের ফলে অত্র এলাকায় অরাজকতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিতারিত হয়নি। মিঃ রটন জজ, ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টর এই তিন পদেরই ক্ষমতা পেয়েছিলেন। তাঁহার মাসিক বেতন নির্দিষ্ট ছিল না। তিনি বাৎসরিক আদায়ী রাজস্বের উপর হাজারে ১০ টাকা কমিশন নিতেন, তাঁহার অধীনে একজন মাত্র দেওয়ান কর্মচারী ছিল। চাপরাসী, পিয়ন, পাইক, রীতিমত কিছুই ছিল না। প্রয়োজনে জমিদারেরা সৈন্য সামন্ত, পাইক, পেয়াদা যোগাতেন। এই সমস্ত পাইক, পেয়াদা যোগানোর জন্য জমিদারগণকে নানা প্রকার জমিদারী সুবিধা দেয়া হত। এ কমিশন পদ্ধতির ফলে জনগণের উপর শোষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের মাত্রা আরো বেড়ে গিয়েছিল।

---

[২] Board of Revenue's letter of the Collector of Belluah. No Dated 24-4-1787.

www.pathagar.com

রাজস্ব বাকির পরিনাম : জমিদারদের খাজনা আদায়ের মাসিক কিস্তি ছিল। প্রতি মাসেই মাসের খাজনা প্রদান করতে হতো। ১৭৯০ অব্দে ময়মনসিংহ পরগণায় বহু টাকা বাকি পড়ে যায়। বেয়ার্ড সাহেব ময়মনসিংহ পরগণার জমিদারগণ কারারুদ্ধ করেন ও তাঁদের নিজ তালুক (Private property) বাজেয়াপ্ত করেন এবং মফস্বলে আমিন প্রেরণ করে তাঁদের ভূমি অধিকার করে নেন। এভাবেও কোন টাকা আদায় না হলে জমিদারগণ মুক্তি দিয়ে একজন আমিনকে মহাল তদন্তে নিযুক্ত করেন। আমিন ময়মনসিংহ ও জফরসাহি পরগণাদ্বয় তদন্ত করে জমিদারগণের অত্যাচারের কাহিনী উপস্থাপন করলে বেয়ার্ড সাহেব জমিদারগণের সমস্ত জমিদারী খাস করে ফেলেন ও মহালে সরকারী কাছারী স্থাপন করে নিজ হাতে খাজনা উসুল তহশীলের ভার গ্রহণ করেন।[৩]

এভাবে বাকি রাজস্বের জন্য সে সময় আটীয়া পরগণার বার আনা জমিদারীও বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু মহালের মালিকগণ নাবালক থাকায় তাঁদের তিনজন কর্মচারীকে কারারুদ্ধ করা হয়। সুসঙ্গের দুই আনা অংশও রাজস্ব বাকির জন্য বেয়ার্ড সাহেব নিজহস্তে গ্রহণ করেছিলেন।

রাজস্ব আদায়ের নিয়ম : জমিদারগণের রাজস্বের টাকা সুবাদারের দেওয়ান খানায় কিস্তিবন্দি মতে প্রদান করতে হতো। দেওয়ানখানা পূর্বে ঢাকা ও পরে মুর্শিদকুলিখাঁর সময়, মুর্শিদাবাদে স্থাপিত হয়। প্রতি কিস্তিতে জমিদারের পক্ষ হতে একজন বা দুইজন আমলা কাগজপত্র ও টাকা নিয়ে রাজধানীতে যেতেন ও কিছুকাল সেখানে অবস্থান করে দেওয়ান বক্সী ও মোহরের হতে আরম্ভ করে, দপ্তরী, এমনকি খানসামাদের উদর পূরণ করে আসতেন। রাজস্বের ক্রটির জন্য জমিদারদের আমলাদের উপরও সময় সময় অত্যাচার করা হতো। মুসলমান শাসনকর্তাদের মধ্যে মুর্শিদকুলীখাঁই অত্যধিক অত্যাচারী বলে ইতিহাসে পরিচিত। তাঁহার শাসন প্রভাবে ত্রিপুরা, কোচবিহার প্রভৃতি রাজ্যের প্রতাপশালী রাজারাও তাঁকে উপঢৌকন প্রদানে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

জমিদার সৃষ্টি : মুর্শিদকুলিখাঁর পূর্বে এ দেশে জমিদারী অপেক্ষা ইজারার প্রচলন অধিক ছিল। তিনি শাসন কার্যে হস্তক্ষেপ করে ইজারা প্রথা বিলুপ্ত করে দেন, জমিদারদের হাতে রাজস্ব প্রদানের ভার অর্পণ করেন। এইভাবে তিনি বঙ্গে জমিদারের পদ সৃষ্টি করেছিলেন। মুর্শিদকুলি অনেককে জমিদার করেছিলেন, কিন্তু জমিদারদের মান সম্ভ্রমের প্রতি কিছুই দৃষ্টি রাখেননি। জমিদারদের জীবনের সাথে অর্থের তুলনায়, তিনি অর্থকেই সমধিক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করতেন। সুতরাং রাজস্ব অনাদায়ে অত্যাচারের মাত্রা তাহার সময়ে অত্যধিক ছিল। বর্তমান ময়মনসিংহ অঞ্চলে সে সময়ের বহু জমিদার বৈকুণ্ঠ-বাসের ভয়ে প্রাণের বিনিময়ে জমিদারী এবং এমনকি জাতি ত্যাগেও বাধ্য হয়েছিলেন।

মফস্বলের বিচার ও শাসন ব্যবস্থা: ১৭৯২ সালে অতিরিক্ত তহশীল কাছারী প্রতিষ্ঠিত হলে, কালেক্টর বিচার ও শাসন কার্যে মনোযোগ দিতে অবকাশ পান। ইতোপূর্বে বিচার ও শাসন বিভাগের কার্য জমিদার, ইজারাদার এবং সিজুয়াল দ্বারাই পরিচালিত হতো। সাধারণ বিচার গ্রাম্য পঞ্চায়েত দ্বারা সম্পাদিত হত। কালক্টরের হাতে তখন ম্যাজিস্ট্রেট ও জজের ক্ষমতা

[৩] Collector's Report to the Board of Revenue Dated. 20/5/1791

www.pathagar.com

থাকলেও তিনি তা পরিচালনা করতে তার সুযোগ ছিল অত্যন্ত কম, তাছাড়া অবকাশও পেতেন না। গ্রাম্যলোক "কিল খাইয়া কিল চুরি করিত' তথাপি বিদেশে বিপাকে মরতে যেতো না। সেকালে সকল জমিদারের উপরই বিচার ক্ষমতা ছিলনা; যে সকল জমিদার রীতিমত রাজস্ব প্রদান করতে পারতেন, সাধারণত তাদের উপরেই বিচার ও শাসনের ক্ষমতা দেয়া হতো।

জমিদারদের অত্যাচারের নমুনাঃ ১৭৯০ সালে রাজস্ব বাকি পড়ে যাওয়ায় কালেক্টরকে রেভিনিউ বোর্ডের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হয়। রেভিনিউ বোর্ড কালেক্টর রেয়ার্ড সাহেবের কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হয়ে তাঁকে মফস্বলে গিয়ে প্রজা ও জমিদারের অবস্থা পরিদর্শন ও রাজস্ব বাকীর কারণানুসন্ধান করতে উপদেশ দেন। কালেক্টর বেয়ার্ড সাহেব রেভিনিউ বোর্ডের আদেশানুসারে, আমিন নিযুক্ত করে মফস্বলের সার্বিক অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হন। তিনি রিপোর্টে উল্লেখ করেন, "ময়মনসিংহ পরগণার জমিদারদের অত্যাচারে ময়মনসিংহ ও জফরসাহি পরগণার ৮০৪৯ জন গ্রাম্য মাতব্বর প্রজার মধ্যে ১০০৫ জন বাড়ীঘর ফেলে পলায়ন করেছিল। জমিদারী খাসে আনার পর, অভয় পেয়ে প্রজাগণ তাদের পরিত্যাক্ত বাড়ীঘরে ফিরে আসে। পরবর্তীতে ৬৪০ জন নিজ গৃহে ফিরে এসেছিলেন বলে তথ্য পাওয়া যায়।[৪]

অত্যাচারের কৌশলঃ সূর্যনারায়ণ চৌধুরীঃ ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে, দশকাহনীয়ার (শেরপুর) জমিদারের পক্ষে রাজস্বের হিসাব নিয়ে তাঁদের কর্মচারী কৃষ্ণপ্রসাদ নাগ মুর্শিদাবাদে যান। হিসাব নিকাশে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে কৃষ্ণপ্রসাদ কারারুদ্ধ হন। পরিশেষে জমিদার সূর্য্য নারায়ণ চৌধুরীকেও মুর্শিদাবাদে নেয়া হয়। তাকে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য করা হয়। এই অমানবিক উৎপীড়নের ফলে সূর্য্যনারায়ণ জমিদারী ইস্তফা প্রদান করে জীবন ভিক্ষা গ্রহণ করেন। বাকী রাজস্ব প্রদান করে জমিদারী বিনোদ-নারায়ণ নামক অপর এক ব্যক্তি গ্রহণ করেন।

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীঃ কাগমারীর জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীও রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হয়ে মুর্শিদ কুলীখাঁর ভীষণ অত্যাচারে পৈত্রিক ধর্ম পর্যন্ত বিসর্জন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ "বৈকুণ্ঠ বাসের" ভয়ে পৈত্রিক নাম ও ধর্ম পরিত্যাগ করে ইনাতুল্যা চৌধুরী নাম গ্রহণ করে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে কুলীখাঁর অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার যে কেবল মুর্শিদকুলী খাঁর সময়েই হতো তা নয়, শাসনকর্তা, তার সভাসদ ও পরিষদগণের চরিত্রের তারতম্যানুসারে অত্যাচারের মাত্রার হ্রাস ও বৃদ্ধি করা হতো। মুসলমান রাজত্বের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এইরূপ পাশবিক অত্যাচার বঙ্গীয় জমিদারগণকে অহরহ চিন্তাকুল করে রেখেছিল এবং পরে ইংরেজ শাসনও কলঙ্কিত করেছিল।

বৃটিশ আমলে ময়মনসিংহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থা :

মানুষ অতি উচ্চাভিলাষী হয়ে, ভোগবাদে নিমজ্জিত হয়ে গেলে তাদের সামাজিক স্বকীয়তাকেও হারিয়ে ফেলে। প্রতিষ্ঠা করতে চায় নতুন নিয়ম। সমাজ স্বাভাবিকভাবেই আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে তা প্রতিরোধ করে। তারপরও সামাজিক গতিধারার পরিবর্তন

[৪]Rayats almost extinguished by oppression. of 8049 principal Rayats in the parganas (Mymensingh and Jaffersahi) 1005 had deserted their habitations and taken refuge elsewhere. Since the mahals have been under my superintendence 640 have returned and are now industriously exerting themselves to repair past misfortune."

www.pathagar.com

অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ দেশের মানুষের জন্যে কোম্পানি আমল একটি চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল। তাঁরা এ চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবিলা করেছিলো, তা অনেকটাই অজানা রয়ে গেছে।

ইংরেজ শাসক, বুদ্ধিজীবী, লেখক-সাংবাদিক, পরিব্রাজক ও ব্যবসায়ীগণ এই মর্মে একমত পোষণ করেন যে, বাঙলার জন্যে ইংরেজ শাসন কল্যাণ বয়ে নিয়ে এসেছিলো। শান্তি ও প্রগতির অগ্রপথিক হিসেবে ইংরেজ শাসকদের মুল্যায়ন করা হয়েছে। তাঁদের শোষণ-জুলুম-নির্যাতন এবং এ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও ধ্বংসের মতো বিষয়গুলি এক্ষেত্র বিবেচনায় আনা হয়নি। শাসিত বাঙালি ইংরেজ শাসকদের সম্পর্কে কি অভিমত করেন, এক্ষেত্রে এটিও বিবেচ্য বিষয়। শাসকগণ তাঁদের শোষণকে আড়াল করে নিজ শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে নানা ধরনের অপচেষ্টা চালায়। শাসক-শাসিত ও শোষিতদের অভিমতের দিকে না গিয়েও বস্তুনিষ্ঠভাবে যদি কোম্পানি আমলকে বিবেচনা করা হয়, তাহলে একথাটি সহজেই বলা যায় যে, কোম্পানির রাজত্বের প্রথম দু'দশকে শাসকগণ শাসন নয়, দুঃশাসন চালিয়ে ছিলেন। অরাজকতা সৃষ্টি করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। রাজস্বনীতি বলে কিছুই ছিলো না। রাজস্ব আদায়ে সীমাহীন জুলুম-নির্যাতন চালানো হয়েছিলো।

তাছাড়া অর্থনৈতিক বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিলো। সহায়-সম্বলহীন মানুষের সংখ্যা তখন বাড়ছিলো আশংকাজনক হারে। সে সময়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহের অবস্থাও ছিলো করুণ। ময়মনসিংহের অনেক সম্পদ লুটপাট ও পাচার হয়েছিলো। চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো চারদিকে। মৃত্যু বিভীষিকার করাল ছায়া দেখা দিয়েছিলো ময়মনসিংহের আকালে। কাজেই বাংলার অন্য সব এলাকার সাধারণ মানুষের মতো ময়মনসিংহের সকল স্তরের মানুষের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কারণে ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানানো সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে কর্ণওয়ালিস থেকে বেন্টিং এর আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত নতুন করে ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ভূমিভিত্তিক সামাজিক কাঠামো বদলে যায়। বদলে যায় জনজীবনের প্রেক্ষাপট ও দৃশ্যপট। প্রবর্তিত হয় নতুন শাসন ব্যবস্থা, পাল্টে যায় বিচার ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট। মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। প্রথা প্রতিষ্ঠানেও পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়। বিচারের নামে চলে অবিচার।

সামাজিক প্রশাসনিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহ ভাঙাগড়া ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। জনজীবনে, সামাজিক অনাচার, চুরি, ডাকাতি ও দস্যুবৃত্তি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। সামাজিক দুর্বৃত্তায়নের নানামুখী প্রক্রিয়া চলতে থাকে। দুর্বৃত্তরা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে প্রাকৃতিক রাজ্য ধ্বংস করে। তাতে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো ময়মনসিংহের মানুষও উদ্বাস্তু ও উন্মুল হয়ে পরে। সহায় সম্বলহীন এসকল মানুষ স্বাভাবিকভাবে প্রমাদগুণতে থাকে। ময়মনসিংহবাসী স্বভাবিকভাবেই কোম্পানি শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে পরে। বেন্টিংকের

www.pathagar.com

আমল থেকে সংস্কারের নামে দুঃশাসন চলে, জনদুর্ভোগ বাড়ে। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের নামে মানুষকে জোরপূর্বক ধর্মহীন ও ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টা চলে। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারের নামে মানুষের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুভূতিকে আহত করার চেষ্টা চালানো হয়। লাখেরাজ জমি নির্বিচারে বাজেয়াপ্ত করা হয় সামাজিক আভিজাত্যও এতে ক্ষুণ্ণ হবার ফলে ক্ষুব্ধ হয় সাধারণ জনগোষ্ঠী। অবাধ বাণিজ্যনীতির নামে বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভয়াবহ সংকট তৈরি করা হয়। ব্রিটেনের কল-কারখানা থেকে বিভিন্ন জাতের সস্তা পণ্য আনার ফলে দেশীয় পণ্য মার খেতে থাকে, শিশু শিল্প কারখানাগুলি মুখ থুবড়ে পড়ে। এর দীর্ঘ মেয়াদি মারাত্মক বিরূপ প্রভাব দেখা দেয় এ দেশের অর্থনীতিতে।

সামাজিক শোষণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক শোষণ কায়েমের ফলে জনজীবনের দুর্ভোগ বেড়ে যায়। ময়মনসিংহের সাধারণ মানুষও এতে অসহায় হয়ে পরে, নেমে আসে দারিদ্র ও সামাজিক বৈষম্য। স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দেয়। সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে নীলকরদের অত্যাচার বেড়ে যায়। নীলকরেরা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। শাসকগণ এজন্যে নানা ধরণের অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাঙালির সামাজিক সত্তা, স্বকীয় ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কোম্পানি শাসন ছিলো বড় রকমের চ্যালেঞ্জ। শাসনের প্রথম পর্বে দুঃশাসন, নিপীড়ন, নির্যাতন, দ্বিতীয় পর্বে সমাজ বিন্যাসের উলট-পালট, তৃতীয় পর্বে পুরাতনকে ভেঙে দিয়ে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির আদলে নতুন ভারত গড়ার পরিকল্পনা সবই ছিলো বাঙলার সামাজিক জীবন ও ইতিহাস বহির্ভূত বিষয়। এটি যেকোনো বিবেচনায়ই অগ্রহণীয় ও নিন্দনীয়।

কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণী শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলো এমনটি মনে করার কোনো কারণ নেই। এর ঐতিহাসিক গুরুত্বকেও আমাদের স্বীকার করে নিতে হয়। কোম্পানি আমলের ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণে স্বাভাবিকভাবেই সকলেরই সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। এ সম্পর্কে শাসকের পক্ষ থেকে বক্তব্য এনে কোম্পানি আমলকে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে, শাসিতের বক্তব্যকে বিচার-বিশ্লেষণের আওতায় আনেনি ঐতিহাসিকগণ। নিঃসন্দেহে এটি একটি, ঐতিহাসিক সংকট। ব্রিটিশদের শাসনের বিরুদ্ধে এদেশের জনগোষ্ঠীর বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ছিলো, তা ব্রিটিশ উৎস থেকেই জেনে নেওয়া সম্ভব। যদিও এ সম্পর্কে তথ্য উপাত্তের যোগান খুব বেশি নেই। ইংরেজদের প্রভাব-বলয়কে অকার্যকর করে দেওয়া সম্ভব হয়নি বলেই ইংরেজ দুঃশাসন থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি বাঙালিরা।

ইংরেজদের রাজনৈতিক ও প্রভাববিস্তার ছিলো ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী। এ থেকে বাঙালিরা রেহাই পায়নি। অধিকন্তু, কোম্পানির কর্মচারী ও গোমস্তাগণ বেআইনী ব্যবসা পরিচালনা করতে থাকে। কোম্পানির কর্মচারীরা কোম্পানির স্বার্থে যতোটা কাজ করেছে, তার চেয়েও বেশি কাজ করেছে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে। বিদেশীদের চাপের মুখে দেশী বণিকগণ

www.pathagar.com

অধিকহারে শুল্ক দিতে বাধ্য হতো বলে দেশী বণিকগণ বিপাকে পরে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ক্লাইভের সুচতুর কুট কৌশলের কাছে চরম মূল্য দিয়েছে বাংলা তথা ময়মনসিংহের সকল স্তরের মানুষকে। ময়মনসিংহের ব্যবসায়ীদেরও এ জন্যে চরম মাশুল গুণতে হয়েছে। কোম্পানির মনোনীত এজেন্টও ছিলেন কোম্পানির তাঁবেদার। মুৎসুদ্দির উৎপাতও কম ছিলো না।

ঔপনিবেশিক শাসনকে প্রতিরোধ করার জন্যেও বাঙলার বিভিন্ন জনপদের মানুষের মতো পূর্ব ময়মনসিংহের তথা নেত্রকোণার সতেচন অনেক মানুষ কাজ করেছিলেন। এ জন্যে অনেকে প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু, সেই সংগ্রামী বীরদের সম্পর্কে ইতিহাসে তেমন কিছুই বলেননি ঐতিহাসিকগণ। বাংলার ইতিহাসের এই দুর্ভাগ্যজনক শূন্যতা স্বাভাবিকভাবেই অন্তর্জ্বালা রয়েছে সকলের। সরকারি নথিপত্র ও বিবরণে এ সম্পর্কে প্রাপ্ত সীমিত আকারের তথ্যই একমাত্র ভরসা। এ সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায়, তার উপর ভিত্তি করেই বলা যায় ইংরেজ শাসন শোষণ তথা কোম্পানি শাসনকে বাংলার মানুষ কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। কোম্পানি শাসন বাংলার ইতিহাসে দুর্ভাগ্যজনক এক অধ্যায়। শোষনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও প্রতিকারের বর্ননা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সমকালীন বাঙালি সমাজ মারাত্মকভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত ও বর্ণাশ্রয়ী ছিলো। বাঙালি সমাজকে স্বাভাবিকভাবেই বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছিলো। এক্ষেত্রে, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণীগত চ্যালেঞ্জ কমছিলো না। ধর্ম, বর্ণ ও অঞ্চল ভেদ করে কোনো আন্দোলনই তাই দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। জমিদার, রায়ত, বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের অনুসারীগণ চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, কারিগর, সেনাবাহিনীর সদস্যগণ সকলেই ব্রিটিশ শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে কোনো না কোন সময়ে ব্রিটিশ শাসন প্রতিরোধ করেছে। কিন্তু সমন্বয়হীনতার কারণে এই প্রতিরোধ সর্বাত্মক জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ নিতে পারেনি। এটি নিঃসন্দেহে দুঃখজনক।

বোর্ড অব রেভিনিউ : ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী কলিকাতাতে রাজস্ব আদায়ের নূতন বন্দোবস্ত উদ্ভাবিত হয়। ৫ জন সদস্য নিয়ে গভর্ণর জেনারেল বোর্ড অব রেভিনিউ নামক সভার সৃষ্টি হয় । প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার প্রেসিডেন্টকে প্রাদেশিক কমিশনারের পদে স্থাপন করা হয় ও প্রদেশ কালেক্টর নিযুক্ত করা হয়। এ কালেক্টরগণ কোথাও Resident কোথাও Chief এবং কোথাও বা Collector পদে পরিচিত ছিলেন। এ সময় বিচার কার্যের জন্য স্থানে স্থানে জজের পদেরও সৃষ্টি করা হয়। এই প্রক্রিয়াতেই এদেশের শোষণ ভিত্তিক ভূমি ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

ঢাকার চিফ : ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে মি. ডে (Day) ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর ও মি. ডানকেনসন (Duncanson) জজ নিযুক্ত হয়ে আসেন। তিনিই ঢাকার প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর ও জজ। সে সময়ে ঢাকা কালেক্টর চিফ নামে (Chief of Dacca) অভিহিত হতেন। ময়মনসিংহের রাজস্ব বিভাগ তখন প্রধানত ঢাকার চিফের অধীন ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম দিকের কোন কোন স্থান যথাক্রমে শ্রীহট্ট ও সেলবরসের অধীন ছিল। বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি স্থান সেলবরসের অধীন ছিল। এ সময় বাঙ্গালার ভীষণ সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ময়মনসিংহ জেলায় বিস্তৃত হয়।

www.pathagar.com

তৎকালীন সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমিত সুযোগ, শিক্ষার নিম্নহার, জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা বেগবান না হওয়া ও মানসিক প্রস্তুতিসহ সকল ধরণের প্রস্তুতিও ছিলো কম। এসব বৈশিষ্ট্য ও প্রস্তুতিগত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারলে বৃহত্তর ময়মনসিংহের মানুষও ইংরেজ শাসন প্রতিরোধে আন্দোলনে তাঁদের সাফল্যের খাতায় নতুন নতুন অনেক কিছু যোগ করতে সক্ষম হতো। দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সামাজিক অনাচার এবং বৈষম্যের বিরূদ্ধে এ অঞ্চলের মানুষ কতটুকুই বা সমন্বিত হতে পারছে তা বিশ্লেষণ করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে ।

তবে এ দেশের মানুষের ইংরেজ শাসন প্রতিরোধের চেতনাবোধ ছিলো না এটি কোনোভাবেই বলা যায় না। এটুকুক বলা যায় যে, চিন্তা চেতনার উজ্জীবন যেভাবে হওয়ার দরকার ছিলো, সেভাবে হয়নি। মানুষের চেতনাবোধ স্থানীয় আচার-প্রথা-কর্ণভিত্তিক হওয়ার কারণে ইংরেজবিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনা তেমনভাবে সঞ্চারিত ও বিকশিত হতে পারেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপারে জনগণ যে খুব একটা আগ্রহী ছিলো, তেমন বলারও কোনো সুযোগ নেই। স্থানীয় আচার, প্রথা-প্রতিষ্ঠান নিয়েই তাঁদের ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে বলে ঐতিহাসিকগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মোগল সরকারও স্থানীয় আচার, প্রথা-প্রতিষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করতেন না। কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় প্রথা-প্রতিষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করলে জনগণ তা প্রতিহত করতে উদ্যোগী হতেন। এ কারণেই মোগল সরকারকে মেনে নিতে জনগণের কোনো কারণেই আপত্তি ছিলো না কিন্তু উপনিবেশিক স্বার্থে স্থানীয় ব্যাপারে কোম্পানি সরকার হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন বোধ করতেন। বাঙালিরা সে হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করে মরিয়া হয়ে সে প্রতিরোধ আন্দোলনে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

এ কথাটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শাসন ব্যবস্থায় জমিদারগণই ছিলেন আঞ্চলিক প্রভু। জমিদারদের পুলিশী ও বিচারক ক্ষমতাও ছিলো। কেবলমাত্র রাজস্ব সংগ্রহই তাঁদের কাজ ছিলো না। সোজা কথায় তাঁরা ছিলেন সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধি। সরকার জমিদারদের রায়তের প্রতিনিধি হিসেবেই বিবেচনা করতেন এবং সেভাবেই তাদেরকে নিযুক্ত ও পরিচালনা করা হতো। জমিদারদের উপরে কেন্দ্রীয় সরকার ও নিচে রায়তশ্রেণী। ফলে, জমিদারদের মাপা পায়ে পথ চলতে হতো। উভয় শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কসূত্র রচনা করে তাঁদের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করতে হতো। জমিদাররা কোনো কোনো রায়তদের স্বার্থও বিবেচনা করতেন এ জন্য যে, রায়তগণ ক্ষেপে যেতে পারে এজন্যে তাঁদের মনে রাখতে হতো। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা মনে না রাখলে সামাজিক অসন্তোষ দেখা দিতে পারে বলে জমিদারদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও গুরুত্ব দিতে হতো।

www.pathagar.com

বৈকুণ্ঠবাস : সে সময় যে কেবল প্রজারই দুর্দশার সীমা ছিল না, তা নয়, জমিদারদের নির্ধারিত সময়ে খাজানা পরিশোধ না করলে "বৈকুণ্ঠবাস" করতে হতো। কষ্ট ও দুর্দশার তুলনায় প্রচার অদৃষ্ট জমিদার অপেক্ষা শত সহস্র গুণে উত্তম ছিল। অনেক স্থলে প্রজা সর্বস্ব হারিয়েও স্ত্রী পুত্র নিয়ে স্বাধীন ভাবে যথা তথা গতর খাটিয়ে দিনাতিপাত করিতে হতো। জমিদারদের পক্ষে সেরূপ সম্ভবপর ছিল না। জমিদার দেশের শাসনকর্তা হলেও, রীতিমত খাজানা চালাতে ব্যর্থ হলেই সুবাদার-কিঙ্করগণের লৌহশৃংখলে আবদ্ধ করো ঢাকা বা মুর্শিদাবাদে নেয়া হতো এবং রাজস্ব প্রদান না করা পর্যন্ত অনাহারে, অল্পাহারে গ্রীস্মকালে প্রখর রৌদ্রে, শীতকালে মারাত্মক শীতল জলে, উর্দ্ধদিকে পদদ্বয় বন্ধন অবস্থায় ভীষণভাবে প্রহার করা হত। দুর্গন্ধময় আবর্জনাপূর্ণ গর্তে রাখা হত। রেজাখাঁ হিন্দুদিগের প্রতি অবজ্ঞাচ্ছলে এই পূতিগন্ধপূর্ণ নরককেই "বৈকুণ্ঠ" নামে অভিহিত করেছিলেন। "বৈকুণ্ঠ বাসের" গুপ্ত যন্ত্রণাতেও টাকা আদায় না হলে প্রকাশ্যরূপে তাঁহাদের অশেষ লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো। এই জীবনান্ত কষ্ট ও লজ্জাতেও টাকা প্রদান করতে অসমর্থ হলে হিন্দু জামিদারদের মুসলমান বাবুর্চির প্রস্তুত পোলাও অন্নের আস্বাদও গ্রহণ করতে হতো। এই অবাধ অত্যাচারের নিকট পদমর্যাদার বিচার ছিল না। বর্ধমান, সুসঙ্গের ন্যায় রাজদিগকেও এই অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, প্রতাপদিত্য সীতারামের ন্যায় লোকও এ অত্যাচার সহ্য করেছেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদের কথা তো বলাই বাহুল্য।

সরকার ও বায়তদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসেবে জমিদারদের কাজ করতে হতো। ফলে, তাঁদের দায়িত্ব ছিলো ঐতিহাসিক। কিন্তু, কোম্পানি সরকার প্রবর্তিত হওয়ার ফলে জমিদারদের ঐ ভূমিকার আমূল পরিবর্তন ঘটে। মোগলদের ন্যায় ইংরেজ সরকার জমিদারদের প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে এবং তাঁদের বর্ধিত হারে রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করা হয়। বর্ধিত হারে রাজস্ব দিতে না পারলে জমিদারি নিলামে ইজারা দেয়া হতো। ইংরেজ সরকারের এ নীতি জমিদারদের ক্ষুব্ধ করে। তারা কোনোভাবেই এটি মেনে নিতে পারেনি। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই জমিদারগণ কোম্পানি শাসনকে রুখে দাঁড়ায় এবং প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। তবে সে প্রতিরোধ ছিলো সীমিত। ব্যক্তি ও অঞ্চল কেন্দ্রিক ছিলো সে প্রতিরোধ। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েও এ প্রতিরোধ কখনো কখনো স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছিলো। আবার কখনো কখনো সে প্রতিরোধ ছিলো নিরস্ত্র আইন অমান্যের আন্দোলন। পরাক্রান্ত এই বৃহৎ জমিদার গোষ্ঠীর কেউ কেউ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তবে জমিদারদের মধ্যে যারা দুর্বল এবং অপোকৃত ক্ষুদ্র তাঁরা তাঁদের আঞ্চলিক প্রভাব প্রয়োগ করে ইংরেজ শাসনকে অচল করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন।

সশস্ত্র জমিদারদের বিদ্রোহী আন্দোলনেরও সূত্রপাত করতে হয়। ডালভূম রাজাদের বিদ্রোহ সশস্ত্র প্রতিরোধকারী জমিদারদের সশস্ত্র প্রতিরোধরই ফলশ্রুতি। পশ্চিম মেদেনীপুরের বিদ্রোহের এই প্রভাব ময়মনসিংহেও পড়ে। কোম্পানি নানা ধরণের নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে। দেওয়ানী লাভের ফলে প্রতি বছর রাজস্ব বাড়তে থাকে। এর ফলে জমিদারগণ অতিরিক্ত চাপের মখোমুখি হন। এই চাপের মুখেই ডালভূমের রাজা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। রাজা তাঁর সুরতি ঘাটশিলা দূর্গ থেকে একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রদান

www.pathagar.com

করেন। ঘোষণায় তিনি বলেন যে, কোম্পানি শাসকদের অমানুষিক ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা তিনি কোনোভাবেই মেনে নেবেন না। এটি তাঁর মর্যাদা ও নিজস্ব অস্তিত্বের প্রতি সরাসরি হস্তক্ষেপ এবং আঘাত। আরোপিত হস্তক্ষেপ, আঘাত ও বিধি ব্যবস্থা অন্ধভাবে মেনে না নিয়ে রাজা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, তার মধ্য দিয়ে কোম্পানি শাসনের স্বরূপই উপস্থাপিত হয়েছে। এর মাধ্যমে জমিদারদের বিদ্রোহী মনোভাবের পুঞ্জিভূত ক্ষোভই প্রকাশিত হয়েছে। এ কথাটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রায়তদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে জমিদরাদেরই যদি এ ধরণের রোষানলে পড়তে হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কতটা চরমে পৌঁছেছিলো-তা সহজেই অনুমেয়।

কোম্পানি শাসন আসলে ইংরেজদের আধিপত্যবাদ ও বাণিজ্যসুলভ কর্মকান্ডের অমানবিক উপাখ্যান। কোম্পানি শাসন আগের যে কোনো শাসন থেকেই জনস্বার্থ বিরোধী এবং নিবর্তনমূলক। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে জমিদারগণ আসলে জনগণের মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। রাজা ঘাটশিলা দুর্গ থেকে এইমর্মে ঘোষণা করেন যে, কোনো অবস্থাতেই তিনি ফিরিঙ্গিরাজ মেনে নেবেন না। শুধু তাই নয়, ফিরিঙ্গি রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের জন্যে তিনি সকলকে আহবান জানান। বিদ্রোহ দমনের জন্যে সরকারও সচেষ্ট হন এবং অভিযান প্রেরণ করেন। বিদ্রোহের দাবানল এক পর্যায়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। রাজা জগন্নাথের নেতৃত্বে এই সশস্ত্র প্রতিরোধ দীর্ঘ পাঁচ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সরকার জগন্নাথের সব দাবি দেওয়া মেনে নিতে বাধ্য হন, এবং তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা বজায় রেখে তাঁর স্থলে নতুনভাবে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে জমিদারদের মনোবল বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণেরও মনোবল বেড়ে যায়।

হেস্টিংসের রাজস্ব ব্যবস্থাপনাঃ রেজাখাঁর রাজস্ব বন্দোবস্ত পরিত্যাগ করে হেস্টিংস রাজস্বের নতুন হিসাব প্রস্তুত করে। তাঁর আদেশ অনুসারে রাজস্ব কর্মচারী মিডলটন নতুন বন্দোবস্ত ধার্য করেন। মিডলটনের বন্দোবস্তে বহু জমিদার নিরুপায় হয়ে পড়েন। যাঁহারা খাজনা বৃদ্ধি স্বীকার করে জমিদারী রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁহারা জমিদার থাকতে পারলেন, যারা ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁদেরকে জমিদারী ছেড়ে দিতে হয়েছিল। বর্ধিত ডাকে এদের পৈত্রিক জমিদারী অপরে গ্রহণ করেছিল।

ইজারা বিলি ও সামাজিক প্রতিক্রিয়াঃ ওয়ারেণ হেস্টিংসের উপদেশ ও শাসন নিয়মানুসারে কমিটি পাঁচ বৎসরের জন্য মহাল বন্দোবস্ত দিতে লাগল। মহাল ডাক হতে লাগল। যে বৃদ্ধিহারে রাজস্ব স্বীকার করিল, সেই মহাল গ্রহণ করতে পারলো। এভাবে রামের লক্ষ টাকা রাজস্বের পৈত্রিক জমিদারী, শ্যাম লয়ে উপর বিংশতি মুদ্রা অধিক ডেকে নিতে লাগল। বহু জমিদার পৈত্রিক জমিদারী হতে বঞ্চিত হয়ে অত্যাচারী, রেজাখাঁর প্রভুত্ব গ্রহণ করে নীরবে অশ্রুপাত করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলনা। এইরূপ ডাক বিলিকে "ইজারা বিলি" বলা হত। এইরূপ বন্দোবস্তে সরকারী খাতায় রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি হল বটে, কিন্তু কিস্তির সময়ে উশুল আশানুরূপ হল না।

ইজারাদারগণ মহালে প্রবেশ করেই জমিদারের সাথে বিবাদ সৃষ্টি করতে শুরু করে। অনেকেই প্রজার উপর পীড়ন শুরু করেছিল; অনেক প্রজা জমিদারের ইঙ্গিতে বাড়ী ঘর ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়।

www.pathagar.com

ভূমি পতিত পড়ে থকে। এই ভাবেই শুরু হয়েছিল এ অঞ্চলের ভূমি ভিত্তিক শোষন ব্যবস্থা। বর্তমানে পদ্ধতিগত কিছুটা পরিবর্তন এসেছে মাত্র । মূলত কৃষি নির্ভর জনগোষ্ঠীর তেমন কোন ভাগ্যোন্নয়ন সম্ভব হয়নি আজো।

জমিদারদের সনদ : ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস জমিদারদের যে সনদ প্রদান করেন তাহাতে জমিদারদের প্রতি এইরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। নিম্নে নমুনাস্বরূপ একখানা সানদের অনুলিপি উদৃত করা হল।

"পরগণে ময়মনসিংহের আট আনা হিস্যার অর্দ্ধেক চার আনা হিস্যাতে চৌধুরাই পদে নিযুক্ত হইলেক। জাহাঙ্গীর নগরের মোতালক বৈকুণ্ঠতুল্য বাঙ্গালাদেশের পরগণে ময়মনসিংহ ও জফরসাহি সরকার বাজুহার ও গয়রহ চাকলে ঘোড়াঘাটের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কার্য্য নির্ব্বাহের দেওয়ান, মুন্সী ও চৌধুরীয়ান, কাননগুয়ান ও প্রজাগণ জিরাতিয়ান মোজাক অর্থাৎ খাজনা বেশী করার ক্ষমতাপ্রাপ্তগণ অবগত হয় যে কাউন্সিলের আদেশ হয়েছে যে উপরোক্ত পরগণা জাতের আট আনী হিস্যার অর্ধেক চার আনী হিস্যা কৃষ্ণকিশোর রায়ের দখলে যে ছিল তাহাতে তৎস্ত্রীদ্বয় (১) রত্নমালা (২) নারায়ণী হকদার সাব্যস্ত হওয়াতে তাহার সনদ উল্লিখিত রত্নমালা ও নারায়ণীকে দেয়া যায়"।

ইংরেজ শাসন ও শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে জমিদারগণ বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠিত হতে থাকেন। ময়মনসিংহের জমিদারগণও কম-বেশি সংগঠিত হয়েছিলেন। এ সময় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জমিদারদের সশস্ত্র প্রতিরোধ বাড়তে থাকে। সন্দীপ জমিদারদের বিদ্রোহ কোম্পানি শাসনকে আর একবার ঝাকুনি দেয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কলকাতার প্রভাবশালী বানিয়া জয়নারায়ণ ঘোষাল ও তাঁর ভাইপো গোকুল ঘোষাল ইংরেজ প্রভুদের দাবি মিটিয়ে সন্দিপের ইজারা লাভ করেন। পরবর্তীতে, সরকার থেকে তিনি জমিদারি লাভ করেন। এ দেশের কৃষকগণও জমিদারদের এই প্রতিরোধী ভূমিকাকে সমর্থন জানায়। ঘোষালদের নিয়ন্ত্রণে আসার জন্য কৃষদের উপর নানা ধরনের নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং তাঁদের উপর সীমাহীন অত্যাচার চালানো হয়। কৃষকদের উপর মাত্রাতিরিক্ত কর আরোপ করা হয়। সে কর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়ে আদায় করা হতো। বঞ্চিত জমিদারগণ কৃষকদের সহযোগিতা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। কৃষকদের উপর আরোপ করা হয় অত্যাচারমূলক কর। এই কর সংগ্রহে অবলম্বন করা হয় নির্মম পন্থা। বঞ্চিত জমিদারেরা নির্যাতিত কৃষককুলের সহেযাগিতায় ১৭৬৯ সালে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিকার ও প্রতিরোধ

বৃটিশ সরকার বিদ্রোহ ঠেকাতে দমন এবং দলননীতি অনুসরণ করেছিল। কয়েক দফা সিপাহী পাঠায় সরকার। বিদ্রোহীদের নিরস্ত্র করতে সরকারি বাহিনীকে বেগ পেতে হলেও বাহিনীর সদস্যগণ শেষ পর্যন্ত তা করতে সক্ষম হন। জমিদারদের ও ফিরিয়ে দেয়া হয় তাঁদের অধিকার। ১৭৮৬ সালে কালেক্টর রাউটন এই মর্মে রিপোর্ট প্রদান করেন যে, জমিদারদের দমন করার ফলে সন্দিপের জমিদারগণ ১৭৮৭ সালে সম্মিলিতভাবে সরকারের অত্যাচারমূলক 'লবণনীতি'র বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং লবণ কারখানায় নিয়োজিত কর্মচারীদের এলাকা থেকে বহিস্কার করেন। লবণ শ্রমিক, যারা 'মুলঙ্গী' নামে

www.pathagar.com

পরিচিতি, তাদেরকে হাতিয়া ও সন্দীপের জমিদারগণ লবণ ইজারাদারদের নানা প্রকারের অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে মুক্ত করেন। এর প্রভাব ময়মনসিংহেও পড়ে। জমিদারগণ বিদ্রোহ করেছেন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে। তাঁদের সামনে বিকল্প কোন পথ খোলা ছিলো না। জমিদারগণের উপর অন্যায়ভাবে মাত্রাতিরিক্ত রাজস্ব কর ধার্য করা হয় এবং সরকারি রাজস্বের চাপ সহ্য করতে না পেরেই জমিদারগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠেন এবং সশস্ত্র প্রতিরোধে অংশ নেন। সশস্ত্রপন্থা অবলম্বনকারী জমিদারদের সংখ্যা অবশ্য সীমিত। অধিকাংশ জমিদারই ব্রিটিশ বিরোধীতা করলেও চরমপন্থা অবলম্বন না করে অন্যভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

এক পর্যায়ে জমিদারদের প্রতি কোম্পানি আস্থা হারিয়ে ফেলে। এ প্রসঙ্গে আমরা ১৭৭২ সালে দেওয়ানী নিজ হাতে নেয়ার পর কোম্পানি নতুন রাজস্বনীতি অবলম্বন করেছিলো। জমিদারদের স্বাধীনতা, ক্ষমতা ও অধিকার ক্ষুন্ন করার জন্যে কোম্পানি বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে জেলায় জেলায় ইউরোপীয় কালেক্টর নিয়োগের ব্যাপারটি। এর ফলে জমিদারদের স্বাধীনতা অনেকটা কমে আসে এবং পাঁচসনা নিলামি বন্দোবস্তের ফলে অধিকাংশ জমিদারি জমিদারদের হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং তা ফটকাবাজদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এই ফটকাবাজ ইজারাদারগণ অনেক ক্ষেত্রে জমিদারদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। জমিদারদের তখন প্রাপ্য ছিলো কেবল মাসোহারা। জমিদারদের সম্পদ যাচাই করার জন্যে ১৮৮৬ সালে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি 'আমিনি কমিশন' নামে পরিচিতি লাভ করে।

জমিদারদের উপর মাত্রাতিরিক্ত রাজস্ব চাপিয়ে দেয়াই ছিলো এই তদন্ত কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য। দিনে দিনে বেশি রাজস্ব আদায়ের জন্যে কোম্পানি বারবার তার রাজস্বনীতি পরিবর্তন করে। দেখা গেলো যে মোগল আমলে জমিদারদের যে ক্ষমতা ছিলো, কোম্পানী আমলে এসে তা আর থাকলো না। জমিদারদের সমূলে উৎখাত করাই ছিলো কোম্পানির উদ্দেশ্য। কোম্পানি সরকার জমিদারদের উৎখাত করার হীন ও সংকীর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে এই মর্মে প্রচার অভিযানে অবতীর্ণ হয় যে, জমিদার মালিক জমিদারগণ নন, জমির মালিক সরকার। জমিদারগণ তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই এর বিরোধিতা করেন। অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ ও জমিদারদের উৎখাত করার অঘোষিত নীতি অবলম্বন করে কোম্পানি। এই নীতির যাতে সফল বাস্তবায়ন না ঘটতে পারে, সেজন্য জমিদারগণ গ্রহণ করতে থাকেন প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এ জন্যে জমিদারগণ বিভিন্ন অজুহাতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। জমিদারগণের বিভিন্ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্যে ছিলো নানা অজুহাতে সরকারি রাজস্ব বাকী রাখা।

www.pathagar.com

জমিদারগণ তাঁদের উপর চরম চাপ প্রয়োগের আগ পর্যন্ত রাজস্ব বাকী রাখতেন। জমিদারগণ ইজারাদারদের রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রেও বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে থাকেন। এ ক্ষেত্রে, জমিদারগণ ইজারাদারদের উপর আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার করার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে ছিলেন না। অযাচিত ইজারাদারদের বিরুদ্ধে রায়তদেরকে উস্কিয়ে দিতেও জমিদারগণ কার্পণ্য করতেন না। জমিদারগণ রায়তের পক্ষে সক্রিয়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করেন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে জমিদারগণ সরকারকে কোনো প্রকার সহযোগিতা প্রদান করতেন না। বরং, আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর ক্ষেত্রে জমিদারগণ বিভিন্নভাবে ভূমিকা রাখেন। সরকারি রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করে তাদেরকে হয়রানি করার ক্ষেত্রেও জমিদারগণ ভূমিকা পালন করেন।

জমিদারগণ দেওয়ানী ও ফৌজদারি মামলা-মোকদ্দমার প্রয়োজনে ভূমি জরিপ, ভূমিদখল, বাটোয়ারা ইত্যাদি ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়েও সরকারকে সহযোগিতা করা থেকে দূরে থাকেন। কারণ সরকারকে অসহযোগিতা করাই ছিলো তাঁদের ব্রত। এ ছাড়াও সরকারকে অসহযোগিতা করে জমিদারগণ তাঁদের দাবি আদায়ে সক্ষম হন। সরকার এ সত্যটি অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, জমিদারদের বাদ দিয়ে কোনো ভূমিনীতি সফল করা সম্ভব নয়। ১৭৮৪ সালের বৃটিশ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট জমিদার অধিকার স্বীকার করে নয়। এদিকে, কোর্ট অব ডাইরেক্টস কলকাতা সরকারকে ১৭৮৬ সালে ভূমি নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দেয়। জমিদারদের অধিকার মেনে নেবার কথা বলে। জমিদারগণ যাতে চিরস্থায়ীভাবে ভূমি বন্দোবস্ত পায় সেজন্যেও সরকারকে নির্দেশ দেয়া হয়।

এক পর্যায়ে কোম্পানির সরকার অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, জমিদারদের স্থানীয় প্রভাব খুব বেশি এবং স্বল্প সংখ্যক ইউরোপীয় অফিসার তাঁদের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া বিশাল রাজ্য শাসন করতে পারবে না। কোম্পানি সরকার উপায়ান্তর না দেখে ১৭৯৩ সালে জমিদারদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিতে বাধ্য হয়। অন্য এলাকার জমিদারদের মতো ময়মনসিংহের জমিদারগণও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের জন্যে বিরাট এক আশীর্বাদ। কারণ, এই বন্দোবস্ত দেয়ার ফলে জমির উপর জমিদারদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। চিরকালের জন্যে একই হারে রাজস্ব দেবার সুযোগ লাভ করে। তাঁদের জন্যে সুযোগ সৃষ্টি হয় অপরিবর্তনীয় রাজস্ব দেবার। অবশ্য এ ক্ষেত্রে জমিদারদের বক্তব্য ছিলো ভিন্ন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যতম শর্ত ছিলো যে, জমিদারদের নিয়মিত রাজস্ব পরিশোধ করতে হবে। সরকারি রাজস্ব কোনো ভাবেই বাকি রাখা যাবে না। রাজস্ব বাকি পড়লে জমি নিলামে চড়িয়ে রাজস্ব আদায় করা হবে। জমিদারগণ এই কঠিন শর্ত মেনে নিতে পারেননি। এক্ষেত্রে, তাঁদের বক্তব্য হলো এই যে, বাংলাদেশের মতো একটি মৌসুমী বৃষ্টি নির্ভর কৃষি অর্থনীতির দেশে এ ধরণের শর্ত কঠিন বললেও কম বলা হয়, বরং বলা যায় মারাত্মক।

www.pathagar.com

খরা, বন্যা তথা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই ভূখন্ডের প্রতি বছরের নিয়তি। এটি এমন একটি দেশ, যেখানে খরা ও প্লাবন আসে পালাক্রমে। সরকার যদি এই শর্ত বজায় রাখে, খাজনা অনাদায়ে জামিদারি নিলামে ওঠা বিচিত্র কিছু নয়। জমিদারগণ রাজস্ব মওকুফের জন্যে বিভিন্ন ধরণের যুক্তি উপস্থাপন করেন। তাঁরা বলেন যে, মোগল আমলে ফসল নষ্ট হলে রাজস্ব মওকুফ করে দেয়া হতো। পরবর্তীতে, ফসল ভালো হলে বাড়তি হারে রাজস্ব আদায় করা হতো। জমিদারদের জন্যে এটি ছিলো একটা সুযোগ। কোম্পানি সরকার রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কঠিন শর্ত আরোপ করার সে সুযোগ আর থাকলো না। মোগল আমলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে রাজস্ব আদায় বাকি থাকলে সেজন্যে জমিদারি নিলামে চড়তো না। কিন্তু, কোম্পানি আমলে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কঠিন ও কঠোর শর্ত আরোপ করায় সে সুযোগ জমিদারগণ পেতো না।

ফলে জমিদারগণ স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাজনৈতিক বিদ্রোহের অপরাধ ছাড়া অন্য কোনো কারণে জমিদারদের মোগল আমলে উচ্ছেদ করা হতো না। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কোম্পানি সরকারের মাত্রাতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপকে জমিদারগণ সরকারের নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা হিসেবেই বিবেচনা করলেন। জমিদারগণ এই মর্মে যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, মৌসুমী বৃষ্টি যেহেতু সব সময় হয় না, সেহেতু জমিদারদের পক্ষে সব সময় নিয়মিত সরকারকে রাজস্ব প্রদান করাও সম্ভব নয়। এ দিকে, 'সূর্যাস্ত আইনের' প্রতিবাদে জমিদারগণ জেলায় জেলায় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। পূর্ব ময়মনসিংহের নেত্রকোণা জেলাও এই প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভ থেকে বাদ পড়েনি।

জমিদারগণ 'সূর্যাস্ত আইনের' প্রতিবাদে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রহণেও অস্বীকৃতি জানান। বৃহত্তর ময়মনসিংহের ও নেত্রকোণার জমিদারগণও এই অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে বাধ্য হন। কোনো কোনো জিম্মাদার কালেক্টরের চাপে জমিদারী গ্রহণ করেন নিজেদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। জমিদারগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে আরো বেশি ক্ষুব্ধ হন এজন্যে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে রায়তদের উপর জমিদারগণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন। কেননা নতুন আইনে রায়তের উপর কোনা ধরণের অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের সুযোগ থাকলো না। রায়তদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা, বলপূর্বক খাজনা আদায় করা, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রোক করা কিংবা অন্য কোনো প্রকারে রায়তদের উপর জুলুম করা নতুন আইনে দন্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষিত হয়। জমিদারগণ এই মর্মে আরো অভিযোগ করেন যে, নতুন আইনে রায়তদের কাছ থকে খাজনা আদায় করা জমিদারদের জন্যে কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে তালুকদারদের জন্যে আলাদা বন্দোবস্তের বিধান রাখা হয়েছিল। তালুকদারদের উপর থেকে কর্তৃত্ব হারিয়ে জমিদারগণ হতাশ ও ক্ষুব্ধ হন। উল্লেখিত আইনের বিরুদ্ধে জমিদারগণ রুখে দাঁড়ান এবং প্রতিরোধে উদ্যোগী হন। জমিদারদের প্রতিরোধ আন্দোলনের মুখে সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন সংশোধন করতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

প্রজাদের উপর জমিদারদের সর্বময় ক্ষমতা দান করা হয়ে ছিলো ১৭৯৯ সালে পঞ্চম আইনে এবং ১৮১২ সালের পঞ্চম আইনে।

ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনে জমিদারি প্রক্রিয়া পদ্ধতিতে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। জমিদারদের প্রতিক্রিয়া-পদ্ধতি ও পাল্টে যায়। আগের প্রতিক্রিয়া ছিলো আঞ্চলিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কিন্তু এবারও ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ায় কোনো প্রকার অসন্তোষ দানা বাঁধতে পারেনি। অর্থাৎ দাবি-দাওয়ার জন্যে কোনো প্রকার কাঠামো তখনো পর্যন্ত রচিত হয়নি। সেজন্যে ব্যক্তির অসন্তোষ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ারও কোনো সুযোগ ছিলো না।

ত্রিশের দশকে এসে পাল্টে যায় প্রেক্ষাপট, বদলে যায় দৃশ্যপট। জমিদারদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা জেগে উঠতে থাকে এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের জমিদারদের মধ্যেও শ্রেণীচেতনা সে সময়ে প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায়। জমিদারগণ বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীচেতনা সংগঠনের প্রায়োজনীয়তা অনুভব করেন। কয়েকটি সমস্যাই জমিদারদের মধ্যে এই উপলব্ধির জন্ম দেয়। সরকার ১৮২৮ সাল থেকে লাখেরাজ ভূমি বাজেয়াপ্ত করার জন্যে এক অভিযানের গোড়াপত্তন ঘটায়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মোগল ভূমিব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতির কারণে বলতে গেলে দেশের এক-তৃতীয়াংশ ভূমি লাখেরাজ বা নিষ্কর হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শিক্ষা, দরগা, পীর, মন্দির, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির প্রতিপালনের জন্যে ভূমি লাখেরাজ দেয়ার ব্যবস্থা ছিলো। কোম্পানি সরকারও এই লাখেরাজ জমির বৈধতা স্বীকার করে নিয়েছিলো।

কিন্তু, সরকার ১৮১৮ সালে লাখেরাজ ভূমি বাজেয়াপ্ত করার জন্যে বৃটিশ শাসকরা আইন পাশ করেছিলো। উল্লেখ করা যেতেপারে যে, বেন্টিংকের আমলে সেই আইন ব্যাপকভাবে কার্যকরিও হয়। স্বাভাবিকভাবেই জমিদারগণ ব্যাপক ক্ষতির মুখোমুখি হন। কেননা সব জমিদারের দখলেই কম-বেশি লাখেরাজ বা নিষ্কর জমি ছিলো। জমিদারগণ তাঁদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই উল্লেখিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ জানায়। এজন্যে জমিদারগণ ১৮৩৮ সালে 'Landholder's society' নামে একটি সংগঠনও করেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শ্রেণীস্বার্থ রক্ষাই ছিলো এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার আসল উদ্দেশ্য।

দেশীয় জমিদারদের পাশাপাশি ইউরোপীয় জমিদারগণও এই সংগঠনে যোগ দেন। কেননা ইউরোপীয় জমিদারদের স্বার্থও এতে নিহিত ছিলো। মূলতঃ ইউরোপীয় জমিদার ও নীলকরেরাই দেশীয় জমিদারদের এই সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে। খ্রিস্টান মিশনারীদের কর্মকান্ড দেশীয় জমিদারদের সঙ্গে ইউরোপীয় জমিদারদের আঁতাতের অন্য

www.pathagar.com

একটি কারণ। মিশনারীরা এক পর্যায়ে রায়তের পক্ষ নেয়। এদিকে, আবার জমিদারদের শোষণ-নির্যাতন ও উৎপীড়নের স্বরূপ সরকার ও ইংল্যান্ডের জনগণের কাছে মিশনারীরা তুলে ধরেন। তাঁরা দেশী-বিদেশী জমিদারদের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে রায়তদের রক্ষা করার জন্যে বিভিন্নভাবে প্রচারকার্য চালাতে থাকে। এলক্ষ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন জমিদারগণ। এলক্ষ্যে জমিদারদের পরিচালিত সংগঠন এবং পত্র-পত্রিকারও কাজ করতে থাকে। এভাবে জমিদারদের সাংগঠনিক শক্তিও বাড়তে থাকে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টও জমিদারগণ সরকারি নীতির বিরুদ্ধে তদবির করার জন্যে ডেলিগেশন পাঠায় এবং এর প্রতিকার দাবি করে। বাধ্য হয়েই জমিদারদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে বাধ্য হয়। ১৮৪৩ সালে এসে সরকার লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত বন্ধ করে দেয়।

বৃটিশ শাসনের ইতিহাস পর্যলোচনান্তে এ-ও লক্ষ্য করা যায় যে, বিষ্ণুপুর বিদ্রোহে রায়তশ্রেণী দস্যুদের সঙ্গে আঁতাত করতেও সংকোচবোধ করেনি। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ব্রিটিশ রাজস্বনীতি রায়তদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিলো। বৃহত্তর শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামের কৌশল হিসেবে রায়তগণ বিভিন্ন কর্মকান্ডে জড়িত হয়েছিলেন। এমনও লক্ষ্য করা গেছে যে, সরকার যখন জনগণের দাবি-দাওয়া মেনে নিলো, তখন জনগণ রায়তগণকে দস্যু হিসেবে চিহ্নিত করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়। প্রকৃতপক্ষে, রায়তগণ আত্মরক্ষার্থে ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন। যে কোনা বিদ্রোহেই অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে জনগণ ও রায়ত শ্রেণীর অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও সমর্থন লক্ষ্য করা যায়।

সায়র জলকর খালিয়াজুড়িঃ আইন-ই-আকবরী হতে জানা যায়, এ পরগণাটি দু'ভাগে বিভক্ত। মসনদে আলার মৃত্যুর পর এটি মজলিশ বংশের হাতে চলে যায় ও পরে আস্তে আস্তে হোমবংশের অধিকারে আসে। এ সময় মুর্শিদকুলী খাঁ রাজস্ব অনাদায়ে এ মহালটি খাসভুক্ত করেন এবং পরে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কে জায়গীর দান করেন। বাংলা ১২০৪ সালে জমিদারগণ ঋণের দায়ে সম্পত্তির অর্ধেক অংশ খাজা ওয়ালেস নামক এক আর্মেনিয়ান বণিকের কাছে ৫,০০০/- বিক্রি করেন। বাকী অর্ধেক নয়বছর মেয়াদী লিজ প্রদান করেন। লিজ প্রদানের কিছুদিন পর লিজদাতাগণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করেই শুধু ক্ষান্ত হননি, জমিদারি রক্ষার জন্য মদন থানার কদমশ্রী গ্রামের আখতারজামান চৌধুরী ও শিবচরণ দত্তের নামে বেনামীয় কাওলা সম্পাদন করিয়ে নেন। এদিকে দায়েরকৃত মামলায় ওয়ালেসের পক্ষে ডিক্রি জারী ও মহালক্রোক করা হয়। মূল মালিকগণ এবারও দূরভিসন্ধির ফন্দি এটে ১২১৫ সনে মানিকগঞ্জের ধানকুড়ার জমিদার রামকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণের নিকট বিক্রয় করে দেন। বাকী অংশ আখতারজামান আদালতের মাধ্যমে প্রাপ্ত হন। তিনিও পরে কিশোরগঞ্জের নিকলী নিবাসী দামপাড়ার বজলুর রহমানের নিকট হস্তান্তর করেন। এদিকে মিঃ ওয়ালেসের মৃত্যুর পর তাঁর দু'কন্যা এক অংশ করোটিয়ার জমিদার সাদত আলী খাঁ পন্নির কাছে ২২,০০০/- টাকায় এবং অপর অংশ ৩২,০০০/- টাকায় বিক্রয় করেন-ধানকুরার জমিদারগণের নিকট। যার পরিমাণ ফল ৪৩০.৬১ বর্গ মাইল।

www.pathagar.com

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে এ দেশের জনগোষ্ঠী যে বৃটিশ শাসনের ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল এবং এ বিরূদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ছিল তা নিচে আলোচনা করা হল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর: বাঙ্গালার যখন বড় দুর্দিন, "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" যখন বাঙ্গালার শস্য-শ্যামলক্ষেত্র শ্মশানে পরিণত করেছিল; বাঙ্গালার চঞ্চল সিংহাসনে বসে যখন নাম মাত্র "নবাব গুলি খায় আর ঘুমায়, ইংরেজদের টাকা আদায় করে ও ডেসপাচ লেখে, বাঙ্গালী কান্দে আর তাদের উৎপাদিত পণ্যেও সুবিধা ভোগ করে ইংরেজ শাসকরা, সেই ভীষণ দুর্দিনে উত্তর বঙ্গে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ শুরু হয়। বাঙ্গালার সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, ইংরেজ শাসন আরম্ভ কালের একটি ভীষণ সামাজিক বিপ্লব ছিল।

সন্ন্যাসী সম্প্রদায়: সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না, এবং তাদেরকে স্ত্রী পুত্র পরিবারও প্রতিপালন করতে হত না। তারা এক অভিনব ধর্মমত প্রচারের ছলনায় দস্যুতা করতো। দেখতে দেখতে দেশের নিরন্ন ভিক্ষুক দলে দলে এই সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে জীবিকা নির্বাহের উপায় করে নিতে শুরু করে। এতে দেশে অত্যাচারের খরস্রোত প্রবাহিত হলো। এরা কেবল দস্যুতা দ্বারা ধন রত্ন ও শস্য লুট করেই ক্ষান্ত থাকত না; নরহত্যা, গৃহদাহ এবং মানুষ চুরিও এদের ব্যবসা ছিল। অসহায় অবস্থায় বলবান বালক বা যুবক দেখিলেই তারা কৌশলে ধরে নিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসী-মন্ত্রে দীক্ষিত করিত।[৫] এইভাবে অতি অল্পকাল মধ্যেই তাদের দল বৃদ্ধি করে এবং সমস্ত বঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।

নিম্নবঙ্গে সন্ন্যাসী : ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের বর্ষা ঋতুতে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র সন্ন্যাসী নিম্নবঙ্গের গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করে অধিবাসীদিগের সর্বস্ব লুট ও বাড়ীঘরে আগুন দিতে থাকে। এ অবস্থায় গভর্নমেন্ট প্রতিকারপরায়ণ হয়ে ওঠে। Captain Thomson সৈন্য নিয়ে সন্ন্যাসী দমনে অগ্রসর হন, সন্ন্যাসীরা ক্যাপ্টেনকে হত্যা করে ইংরেজ সৈন্যদের ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে ও বিজয় গৌরবে উল্লাসিত হয়ে অত্যাচারের মাত্রা আরো বৃদ্ধি করে। ১৭৭৩ সনে ওয়ারেন হেষ্টিংস পুনরায় আর একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। পরবর্তী সেনাপতিও সন্ন্যাসীদের হাতে নিহত হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস চিন্তিত হয়ে পড়লেন; সন্ন্যাসীরা অবসর ও উৎসাহ পেয়ে কোম্পানীর চালানী রাজস্ব পর্যন্ত লুট করতে শুরু করলেন।

সন্ন্যাসীদের ভীষণ বিপ্লবে, প্রজার করুণ আর্তনাদে, রাজকোষের অর্থের অনটনে ওয়ারেন হেস্টিংস ভীত হয়ে পড়লেন। হেস্টিংস তিন দিক হতে তিন দল সৈন্য সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। Captain Edward, Captain Stewart, Captain Jones উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ হতে সন্ন্যাসী দমনে অগ্রসর হলেন।

[৫] Hasting's letter to joseas Du pre-9th. March 1773.

www.pathagar.com

ময়মনসিংহে সন্ন্যাসী: এ ভীষণ বিপ্লব ময়মনসিংহ জেলার অস্থি, মজ্জা শোষণ করতে অগ্রসর হয়। সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় এ প্রদেশে এসে মধুপুরের নিবিড় অরণ্যে ও সন্ন্যাসীগঞ্জে আড্ডা স্থাপন করে ও ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করতে চেষ্টা করে। সন্ন্যাসীরা ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করছে শুনে হেস্টিংস একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন।[৬] কিন্তু যখন শুনলেন, তারা এ সুবিশাল নদ অতিক্রম করার চেষ্টায় সফল হয়নি। তখন তিনি বিপুল বিক্রম ও উৎসাহের সাথে তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করলেন। অভিযানের অভিনব ঘটা বুঝে সন্ন্যাসীরা কিছুদিন গুপ্তস্থানে লুকিয়ে থাকলেন। হেস্টিংস নিশ্চিন্ত হলেন। কিছুদিন পর সন্ন্যাসীরা আবার উপস্থিত হলো। হেস্টিংসও যথাযোগ্য প্রতিকারের চেষ্টা করতে লাগলেন। এভাবে বহুদিন চেষ্টা করেও ওয়ারেন হেস্টিংস সন্ন্যাসী দমনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেন। তাঁর শাসনকাল সন্ন্যাসী বিপ্লবের চরম অরাজকতায় কলঙ্কিত ছিল।

ময়মনসিংহে ও আলাপসিংহে সন্ন্যাসী : ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে সন্ন্যাসীরদল আলাপসিংহ ও জফরসাহি পরগণায় প্রবেশ করে জমিদার ও প্রজার অর্জিত শস্য, ক্ষেত হতে কেটে নেয়। জমিদারগণ অনন্যোপায় হয়ে ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ শে জানুয়ারি রেভিনিউ বোর্ড সমীপে প্রতিকারের আবেদন করেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারি রেভিনিউ বোর্ড হতে ঢাকার চিফের (Chief of Dacca) উপর সৈন্য প্রেরণ করে ও সাধ্যানুসারে সাহায্য করে জমিদারদের রক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। ঢাকার Chief জাফরসাহি অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করেন। সৈন্যগণ বিপন্ন হয়ে ঢাকা প্রস্থান করে। সন্ন্যাসীদের উলঙ্গ অত্যাচার খরস্রোতে প্রবাহিত হতে থাকে। মার্চ মাসে সন্ন্যাসীরা মালঞ্চার কাছারী লুট করে। জমিদারগণ পলায়ন করে বাসাবাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভবিষ্যৎ ভেবে জুন মাসে পরগণার ইজারাদার রামজীমাল পুনরায় রেভিনিউ বোর্ডে এই ভীষণ অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা করেন। রেভিনিউ বোর্ড রামজীমালের আবেদন পেয়ে বেলুহার (বর্ত্তমান ভুলুয়া) রেসিডেন্টকে এ প্রদেশে এসে নতুন জেলা স্থাপন করতে আদেশ দেন। সন্ন্যাসীরা ইতোমধ্যে দলে দলে এসে চারিদিক হতে লুট করতে থাকে। পরবর্তীতে ৪ জুলাই পুনরায় শেরপুর, জফরসাহি, ময়মনসিংহ ও আলাপসিংহের জমিদারগণ রেভিনিউ বোর্ডে অত্যাচার দমনের জন্য আবেদন করেন। এইবার রেভিনিউ বোর্ড মি. হেনরী লজকে সন্ন্যাসী দমনের জন্য ময়মনসিংহে প্রেরণ করেন।

ইংরেজ-সন্ন্যাসী যুদ্ধ : লজ সাহেব সেই বছর তাঁর অল্প সংখ্যক অনুচর নিয়ে সাহামজরদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়। দুই পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সন্ন্যাসীদল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। অনেক সন্ন্যাসী হতাহত হলে, দস্যু দলপতি সাহামজরদ দলবলে বনের মধ্যে আত্মগোপন করে। লজ সাহেব জয়লাভ করে ভবিষ্যতের গুরুতর আক্রমণের ভয়ে ঢাকায় পুনরায় সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করে।

---

[৬] Sir George Colebrooke wbKU Hastings- লিখিত ১৭৭৩ সনের ৩১ মার্চ তারিখের চিঠিতে Warren Hastings-এর মনের ভাব কতকটা প্রকাশিত হইয়াছে। চিঠির সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "In my last I mentioned that we had every reason to suppose Sennassie Fakeers had entirely evacuated the company's possession. Such were the advice I then received and their usual progress made this highly probable. But it seems they were either disappointed in crossing the Brahmaputra rive &."

www.pathagar.com

টিপু পাগলার বিদ্রোহ: ১৮২৫ সনে শেরপুর অঞ্চলে দেশপ্রসিদ্ধ টিপু পাগলের ভীষণ বিদ্রোহের সূচনা হয়। সুসঙ্গ পরগণার অন্তর্গত লেটিরকান্দা গ্রামে টিপুর জন্মস্থান। টিপু গারো, প্রথমত, একজন সাধারণ গৃহস্থ ছিল। ক্রমে ধর্মমত প্রচার করতে প্রবৃত্ত হয় ও "পাগলপন্থী" প্রচারক হয়ে দাঁড়ায়। সুসঙ্গ ও শেরপুর পরগণায় তাহার শিষ্যের সংখ্যা ছিল অনেক।

বিদ্রোহের কারণ : ১৮২০ সনে শেরপুরের জমিদারী বাটওয়ারা হয়ে আলাদা হয়ে গেলে, পরগণার জমিদারগণ প্রজা হতে বাটওয়ারার খরচ আদায় মানসে বর্ধিতহারে খাজনা ধার্য করেন। জমিদার প্রজা সাধারণের নিকট আবওয়াব, খরচ, মাথট প্রভৃতি বহুবিধ ট্যাক্স ধার্য করে প্রজাদের উপর বিভিন্নভাবে উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। এই উৎপীড়ন সহ্য করতে না পেরে বহু প্রজা জমিদারের বিরুদ্ধে রূখে দাঁড়ায়।[৭] তাহারা কুড় প্রতি চারি আনা খাজানার অধিক দিতে পারিবে না বলে মত প্রকাশ করে। ধর্ম প্রচারক টীপু সময় বুঝে বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এবং স্বীয় অভিনব সাম্য সত্যের প্রচার দ্বারা শেরপুরে ভীষণ বিপ্লব জাগিয়ে তোলে।

বিদ্রোহীদের আক্রমণ : বিদ্রোহী প্রজাগণ জমিদারের কাছারী আক্রমণ করে লোটপাট চালায়; জমিদারের বরকন্দাজ, গভর্ণমেন্টের পিয়ন ও পুলিশকে প্রহার করে। জমিদার বিদ্রোহী প্রজাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তৎকালীন গুমানু সরকার কলিকাতা হতে একজন আইন ব্যবসায়ীকে এনে নাসিরাবাদ শহরে থেকে জমিদারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা পরিচালনা করেন।

নীলকরের অত্যাচার : এই সময়ে নীলকরদের ভীষণ অত্যাচার এ জেলায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কৃষকগণ অনেক সময়ে অত্যাচারে নিপীড়িত হয়ে রাজদরবারে অভিযোগ করতে সাহস পেত না। অভিযোগ করলেও প্রতিকারের প্রত্যাশা অতি হতাশা ব্যঞ্জক ছিল। সুবর্ণখালি, কাগমাইর, ঘোল কাহনীয়া, তেঁতুলিয়া, দড়িনগর, রসিদপুর, ভাবনীগঞ্জ, দুল্লাবাড়ী, নওয়াপাড়া, বাগুনবাড়ী, বেতাল প্রভৃতি স্থানে নীলকরদিগের কুঠি ছিল। এই সকল কুঠিতে প্রতি নিয়ত অত্যাচার স্রোত প্রবাহিত হতো। রাজপুরুষগণ অধিকাংশ স্থলেই নীলকরদিগের পক্ষ সমর্থন করতেন। নীলকরেরা কৃষকের অজ্ঞাতে তাদের নামে জাল কবুলিয়ত সম্পাদন করে তাঁদের নীলের চাষ করতে বাধ্য করতো। কৃষক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রাজদ্বারে উপস্থিত হলে নীলকর জাল দলিল দাখিল করে বিচারকের অনুগ্রহে প্রজার উদ্যম বিফল করে দিত।

---

[৭] "It was admitted that oppression and the leveying of illegal imposts denominated kharcha, mathots and abwabs on the part of the zaminders were the orginal causes of the distrubances which occurred on 1825." History of disturbances submitted by J. Dunbar Magistrate of Mymensingh of the Commissioner dated 5/9/1833.

www.pathagar.com

এইরূপ অত্যাচার ও অরাজকতায় অনেক স্থলে প্রজা ও ভূমধ্যধিকারীর সমবেতশক্তি নীলকরের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। একপক্ষে রাজপুরুষ নীলকর অপরদিকে দেশীয় ভূমি অধিকারী ও প্রজা, ঘোরতর বিরোধে প্রবৃত্ত হয়ে পড়েন। এই পর্যায়ে নীলকরদের এইরূপ একটি অত্যাচার ও তাহার পরিণামের বিবরণ উল্লেখ করা গেল।

অত্যাচারের নমুনা : ১৮৪৩ সনে কাগমারীর নীলকুঠির অধ্যক্ষ কিং সাহেব কতকগুলি প্রজাকে আটক করেন ও তাদের নীলের দাদনে বাধ্য করিতে চেষ্টা করেন। প্রজারা নীল বুনিতে অস্বীকার করায়, একজন প্রজার মাথা মুড়ে তাতে কাদা মেখে নীলের বীজ বুনে দেয়া হত ও অপর একজনকে বৃহৎ সিন্ধুকে করে বেলকুচির কুঠিতে পাঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতো। কয়েকজন এই ভীষণ অত্যাচার ও অপমান প্রত্যক্ষ করে নীলের দান নিয়ে পরিত্রাণ লাভ করে। যথাসময়ে প্রজাগণ গোলকনাথ রায়ের নিকট কিং সাহেবের অমানুষিক অত্যাচারের কথা অবগত করলে, গোলকনাথ সদলবলে কিং সাহেবের কুঠি আক্রমণ করেন ও কিং সাহেবকে ধরে নিয়ে গোপন করে রাখেন। উভয় পক্ষই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিচারপ্রার্থী হয়। এদিকে কিং সাহেব ও গোলকনাথ কাহারও তত্ত্ব পাওয়া যায় না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গোলকনাথকে গ্রেপ্তার করার জন্য পাবনার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট, রাজশাহীর ম্যাজিস্ট্রেট ও মালদহের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখে পাঠালেন। গোলকনাথকে কোথাও পাওয়া গেল না। বহুদিন পরে পাকুল্যা থানার দারোগার সাহায্যে কিং সাহেব পরিত্রাণ লাভ করলেন। অনেক স্থলেই প্রজা অত্যাচার সহ্য করে নীল বুনিতে স্বীকৃত না পেলে তাকে সিন্ধুকে বা বাক্সে পুরে অন্য কুঠিতে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করা হত। নীলকরের এইরূপ বীভৎস অত্যাচার এ জেলায় অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল যাবত চলছিল।

খালিয়াজুরী : খালিয়াজুরী পরগণা এক সময়ে "ভাটী" নামে পরিচিত ছিল। এই স্থানে কামরূপের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীতারি নামক কোন ত্রিয় সন্ন্যাসী কর্তৃক এই প্রদেশ অধিকৃত হলে, তাহা কামরূপরাজ্যের শাসনচ্যুত হয়। আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে ঈশা খাঁকে এই "ভাটী" অঞ্চলের অধীশ্বর বলে লিখিত ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর এই পরগণা ঈশা খাঁর পারিষদ মজলিসদের হস্তগত হয়। অল্পকাল পরে মজলিসদের হাত থেকে হোমবংশের শাসনাধীন হয়। সেই সময় থেকে বিগত উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভকাল পর্যন্ত এই পরগণা তাঁদের হাতেই শাসিত হয়েছিল। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে জেলা বন্দোবস্তের সময় এই পরগণা রামশঙ্কর চৌধুরী, জয়প্রসাদ চৌধুরী, অনুপনারায়ণ চৌধুরী, মোহনরাম চৌধুরী, মাণিকরাম চৌধুরী, আবুলওয়াল্লা চৌধুরী, মহম্মদ গফুর, মহম্মদ রুশন ও মহম্মদ রঞ্জি, এই কয়েকজন ব্যক্তির নামে লিখিত ছিল। এই হিন্দু ও মুসলমান মালীকগণ একই পূর্বপুরুষের সন্তান। ১২০৪ বঙ্গাব্দে তৎকালীন মালিকগণ ঋণগ্রস্থ হয়ে, পরগণার আট আনা হিসা খাজে ওয়ালীস নামক একজন আর্মেনীর নিকট ৫০০১/- টাকা মূল্যে বিক্রয় করেন ও অবশিষ্ট আট আনা তাঁর নিকটেই ৯ বৎসর মেয়াদে ইজারা পত্তন করেন। কিছুদিন পরে উক্ত সাহেব, ইজারা মহালের তর্কে মালিকগণের নামে ক্ষতিপূরণের নালিশ করেন। মালিকগণ জমিদারী রক্ষার জন্য ঐ আট আনা, হিস্যা শিবচরণ দত্ত ও আক্তরজমা খাঁ নামক দুই ব্যক্তির "বিনামীতে" এক কাওলা সম্পাদন করেন। এই সময় আর্মেনীয়, ওয়ালীসের দাবির ডিক্রির জন্য, মহাল ক্রোক হয়। মালিকগণ আনোণ্যপায় হয়ে ১২১৫ সনে এই আট আনা জমিদারীও ধনকূড়ার রামকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ রায়ের নিকট বিক্রয় করেন। ওয়ালীসের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই কন্যা আট আনা জমিদারীর মালিক হন। এই কন্যাদ্বয়ের এক কন্যার চার আনা অংশ, করটিয়ার জমিদার সাদাত আলি খাঁ ২২০০০/- টাকায় ক্রয় করেন, ও অপর কন্যার চার আনা উপর্যুক্ত রামকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ রায়ের উত্তরাধিকারী গিরী বাবু ও

www.pathagar.com

গোবিন্দ বাবু ৩২০০০/-টাকায় ক্রয় করেন। এইরূপে ধানকুড়ার জমিদারগণ, বার আনা ও করটিয়ার জমিদার চার আনা প্রাপ্ত হন। ধানকুড়ার জমিদারগণের হিস্যা থেকে পূর্ব মালিক কদম্বশ্রীর আকন্মজমা খাঁ আদালত যোগে চারি গন্ডা এক কড়া দুই কাগ অংশ পৃথক করে নিয়েছিলেন। সার্ভে নক্সায় জমির পরিমাণ ১,৭১,১৭৩ একর। আয়তক্ষেত্র ২৬৭.৪৬ বর্গমাইল ও গ্রামসংখ্যা ১৬৪ দেয়া হয়েছিল।

উপসংহার

এ অধ্যায়ে পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলের সামাজিক বিবর্তন সভ্যতা বিকাশের বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে । পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠন ও শোষণের ইতিহাস পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে এ অঞ্চলের ইতিহাস ছিল শোষণের এবং প্রতিবাদের। কিন্তু বিজয়ের মালা সবসময়েই শোষক গোষ্ঠীর হাতেই ছিল। বর্তমানে আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এর চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা হচ্ছে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উনয়নের। যা আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন। শোষণের সমাজনীতি পরিহার করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে এজেন্ডা ২১ তৈরী করে প্রতিটি অঞ্চলের সকল সম্পদের ইনভেন্টরি তৈরী করে এর সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা ও সল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন কৌশল তৈরী করতে হবে। তাছাড়া সম্পৃক্ত করতে হবে তৃণমূল পর্যায়ে সকল জনগোষ্ঠীকে, এ জন্যে থাকতে হবে সুস্থ রাজনৈতিক অঙ্গীকারও।

সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি

গোলাম এরশাদুর রহমান, ১৯৯৫, মুক্তি সংগ্রামে নেত্রকোণা
কেদারনাথ মজুমদার, ১৯০৭, ময়মনসিংহের ইতিহাস

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

নেত্রকোণা ঃ উপজেলা ভিত্তিক পর্যালোচনা

সার সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ের নেত্রকোণা জেলার দশটি উপজেলার বিভিন্ন বিষয়ে পরিচিতি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আয়তন, জনসংখ্যা, শিক্ষার হার, কর্মক্ষম জনসংখ্যা এবং প্রতিটি উপজেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য। তাছাড়া রয়েছে উপজেলা নামকরণের ইতিকথা এবং কিভাবে সেখানে ক্রমান্বয়ে জনবসতি গড়ে উঠেছিল এসবের গোড়ার কথা। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষ ও লোভী হয়ে উঠে। এরই ধারাবাহিকতায় জমিদারদের স্বেচছাচারিতার উন্মেষ ঘটে। এই জেলার মানুষ আদিকাল থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে বেশ সচেতন ছিল। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে জেলার মানুষ অত্যন্ত সোচ্চার ও সুসংগঠিত ছিল বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা সেকেল বলেই এ এলাকার মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন হয়নি আজো। এক্ষেত্রে কলমাকান্দা, দুর্গাপুর, পূর্বধলাসহ ভাটি এলাকার প্রায় প্রতিটি উপজেলারা অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এ জেলায় রয়েছে অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন মোহনগঞ্জ, ভাটি এলাকায় সাগর থেকে উঠে আসা অত্যন্ত উর্বর ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ উপজেলা। বৃটিশরা তাদের শাসন, ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের সুবিধার্থে এবং আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এইসব থানা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পরবর্তীতে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠে ধীরে ধীরে। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এসব যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সময়োপযোগী করা সম্ভব হয়নি, ফলে উন্নয়নের আশা ও তিমিরেই রয়ে গেল। হাওর, বাওর ও মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্য উপজেলাগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মোহনগঞ্জ, কেন্দুয়াসহ অনেক উপজেলায় বহু বরেন্য ব্যক্তির জন্মস্থান যাদের অবদান জাতীয় পর্যায়ে ভীষণভাবে স্বীকৃত। বাংলাদেশের বহু গর্বিত সন্তানদের মধ্যে কেন্দুয়ায় রয়েছেন বিচারপতি শাহাবুদ্দিন ও বাংলার এককালীন অস্থায়ী মূখ্যমন্ত্রী নালিনী রঞ্জন সরকার ও আরো অনেকেই ।

ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক দিক দিয়ে মদন, পূর্বধলা, বারহাট্টা ও খালিয়াজুরী বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনন্য। কেন্দুয়া উপজেলার ইতিহাস অতি প্রাচীন, নৈসর্গিক প্রাচুর্য ও অতি পরিচিত। দুর্গাপুর কলমাকান্দা সবুজ বনানী গারো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ও নৈসর্গিক দৃশ্যে অপূর্ব ও মনোরম এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্গম। যোগাযোগ অব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক সম্পদের লুটপাট যেমন গারো পাহাড়ের সাদা মাটি, সোমেশ্বরীর সাদা বালু ও কয়লা গারো পাহাড়ের কাঠ। এ উপজেলাদ্বয়ের দুর্ভাগ্য, এ

www.pathagar.com

এলাকার এসব সম্পদ আহরণ রাজনৈতিক ও মাসলম্যানদের হাতে বন্দী। এ জেলায় তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের জন্য মাসলম্যানদের হাত থেকে রাজনীতি ও প্রশাসনকে তাদের মুক্ত করা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন সময়োপযোগী নীতি ও কৌশল গ্রহণ। সর্বোপরি উন্নয়নের সকল স্তরে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার ও আবশ্যকতা রয়েছে।

নেত্রকোণা জেলা (ঢাকা বিভাগ)

নেত্রকোণা জেলার আয়তন ২৮১০.৪০ বর্গ কি.মি.। উত্তরে মেঘালয়ের গারো পাহাড় (ভারত), দক্ষিণে কিশোরগঞ্জ জেলা, পূর্বে সুনামগঞ্জ জেলা, পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলা। বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ তাপামাত্রা ৩৩.৩ সে. এবং সর্বনিম্ন ১২ সে.। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২১৭৪ মিমি। প্রধান নদী : সুমেশ্বরী, কংস, মগরা, ধুন, ধলা, তেওরখালী। নেত্রকোণা মহকুমা সৃষ্টি করা হয় ১৮৮২ সালে এবং এ মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৪ সালে। এ জেলার উপজেলা ১০টি, পৌরসভা ৪টি, ওয়ার্ড ৩৬টি, মহল্লা ১০২টি, ইউনিয়ন ৮৫টি, গ্রামের সংখ্যা ২২৮১টি। উপজেলাসমূহ: আটপাড়া, বারহাট্টা, দুর্গাপুর, খালিয়াজুরী, কলমাকান্দা, কেন্দুয়া, মদন, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা সদর ও পূর্বধলা। পৌরসভা : বারহাট্টা, দুর্গাপুর, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা সদর।

নেত্রকোণা সদর

২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী এ উপজেলার আয়তক্ষেত্র ৩৪০.৩৫ বর্গ কিলোমিটার। এ উপজেলার একুশটি ইউনিয়ন, ৩০২ টি মৌজা, ৩৪৬ টি গ্রাম, মোট ৬৬,৯০০টি খানা রয়েছে। মোট জনসংখ্যা ৩২৯,৫৪০ জন, তম্মধ্যে পুরুষ ১৭০,০৬০, মহিলা ১৫৯,৪৮০ জন। শিক্ষিতের হার ৩১.৯৫% এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যা ১৭৫,৬৮০ (১৮+ উর্ধ) যা মোট জনসংখ্যার ৫৩.৩ শতাংশ মাত্র ।

পূর্বধলা

পূর্বধলা উপজেলা পূর্ব ময়মনসিংহের বৈচিত্রময় সুসং পরগনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। অসংখ্য নদী-নালা খাল-বিলে পরিপূর্ণ ছিল বলেই জমিদার শাসনামলেই পূর্বধলার নামকরণ করা হয়। পূর্বধলা নামকরণের সংগে অপর আর এক জলাভূমি রাজধলার সংগে সম্পর্কযুক্ত রয়েছে। রূপালী ঢেউ এ ঝকঝক করা রাজধলা বিলের তীরে সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করে ঘাগড়া জমিদারদের একাংশ পূর্বধলার জমিদারগণ। এ বিলের নামানুসারেই এ উপজেলার নামকরণ করা হয়েছে পূর্বধলা।

রাজধলা বিলের জন্মকথা এখন কিংবদন্তিরূপে মানুষের মুখরোচক কল্প কাহিনী হিসাবে বিরাজ করছে। আশ্চর্য হলেও সত্য যে ঐ বিলে পূর্ব থেকে এখন পর্যন্ত কোন কচুরিপানা বা আবর্জনা জন্মায় না; তাই গ্রামের লোকজন আঞ্চলিক ভাষায় একে ধলী বিল বলতো। গ্রামীন ভাষায় ধলী শব্দের অর্থ স্বচ্ছ বা পরিস্কারকে বুঝায়। স্বচ্ছ বা পরিস্কারকে কেউ কেউ ধলা

www.pathagar.com

শব্দে আখ্যায়িত করেন। তাই ঐ ধলী বিল রূপান্তরিত হয়ে লোকমুখে ধলা বিল নামে পরিচিতি লাভ করে। কালের চক্রে লোক বসতি বাড়তে থাকলে প্রশাসনিক কারণে প্রজাদের সংগে সরাসরি যোগাযোগের প্রয়োজনে খাজনা আদায় শাসক শ্রেণীর শোষণের পর্যায়কে কাছে টেনে আনার লক্ষ্যে ও দক্ষিন দিকে বসতি স্থাপন করে। ধলা নামে পরিচিত বিলের জল ও পরিবেশ সংরক্ষণের কারণে বা কৌলিন্যতা রক্ষার্থে জমিদারদের স্বেচ্ছাচারিতা ছিল প্রকট। প্রজা সাধারনের ঐ বিলের পানি ব্যবহার ছিল নিষিদ্ধ। তাই ধলা শব্দের সংগে এই সুসং জমিদার পরিবারের বৈবাহিক সূত্রে প্রাপ্ত রাজা উপাধিটি সংযোজিত হয়ে বিলের নামকরণ হয় রাজধলা। বিলটি এখন পর্যন্ত রাজধলা বিল নামেই পরিচিত।

পূর্বধলা পুলিশী শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত ছিল সুসং দুর্গাপুর কেন্দ্রিক। পরে নেত্রকোণা সদর থানার আওতায় পুলিশ ফাঁড়ি হিসেবে কাজ চলত। ১৯১৭ সালের ২১শে আগষ্ট সেক্রেটারী গভর্ণমেন্ট বেঙ্গল এইচ, জে টিনাম এর আদেশক্রমে পূর্বধলার পার্শ্বে নয়াপাড়া মৌজায় প্রথম একটি মাত্র চৌচালা ঘরে পূর্ণাঙ্গ থানা হিসেবে কার্য শুরু হয়। ১৮৬৪ সালে পুলিশ কোয়ার্টার নির্মাণে কোন না কোন ব্যক্তির প্রদত্ত ভূমি হতে হবে, এই মর্মে আদেশ জারি হলে মুক্তাগাছার জমিদারীর ৪ (চার) বিঘা ভূমি মহারাজ এস, কে আচার্যী পূর্বধলা পুলিশ কোয়ার্টার নির্মাণার্থে প্রদান করেন। পূর্বধলায় পুলিশ প্রশাসন কার্যক্রম ১৯১৭ সালের অনেক পূর্বেই সুসং দুর্গাপুর ও নেত্রকোণা সদর থানার ফাঁড়ি থানা হিসেবে শুরু হয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৯৯ সালের ২০শে জানুয়ারী এস.বি বিশ্বাস নামক জনৈক দারোগা কর্তৃক দায়েরকৃত একটি চুরি মামলার রেকর্ড থেকে।

অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে এ উপজেলার কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তাহল এ অঞ্চলের মানুষ বহুকাল থেকেই বিপ্লবী। লেটিরকান্দা গ্রামের পাগলপন্থী করম শাহর আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব, পাগলপন্থী টিপু শাহ্ নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন, পাগলপন্থী ছপাতিশাহর স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা ইত্যাদি ঘটনা প্রবাহ এ অঞ্চলের মানুষের বিপ্লবী চেতনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। কালের প্রতিস্তরে স্বাধীন চেতা পুরুষের জন্ম হয়েছে এই পূর্বধলায়। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে ১৯৩০ সালের ১৪ইং মার্চ ১২ বছরের কিশোর নিখিল রাবগচী পূর্বধলা রেল স্টেশনে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করে ১ বছরের কারাভোগ করে।

২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী এ উপজেলার আয়তন ৩১২.৩ বর্গ কিলোমিটার। এই উপজেলার এগারটি ইউনিয়ন, ২২৯ টি মৌজা, ৩৩৪টি গ্রাম, মোট ৫৮,৫৬০ টি খানা রয়েছে । মোট জনসংখ্যা ২,৮০,৪৬০ জন, তম্মধ্যে পুরুষ ১,৪২,৬২০, মহিলা ১,৩৭,৮৪০ জন। শিক্ষিতের হার ৩১.২৭% এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যা ১,৪৩,২৮০ (১৮+ উর্ধ্ব) যা মোট জনসংখ্যার ৫১.০ শতাংশ মাত্র। এই উপজেলার লোকজনের পেশা মূলত কৃষি, প্রধানত তারা বোরো আবাদ করে বেশী। এখানে অনেক বড় বড় হাওর বাওর রয়েছে। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত, মূল রাস্তার একটি ময়মনসিংহ থেকে শ্যামগঞ্জ হয়ে নেত্রকোণার দিকে গিয়েছে। অন্য রাস্তাটি শ্যামগঞ্জ হয়ে দুর্গাপুর পর্যন্ত গিয়েছে।

www.pathagar.com

রেললাইনটি ও অনুরূপ দুইটি ধারায় বিভক্ত হয়ে একটি জারিয়া ঝাঞ্জাইল এবং অন্যটি নেত্রকোণা হয়ে মোহনগঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছে ।

মোহনগঞ্জ

খালিয়াজুরী ও গারোপাহাড় অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামন্ত রাজসহ অনেকের শাসন এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মোহনঞ্জের অনেক অতীত ঐতিহ্যে রয়েছে। বর্তমান মোহনগঞ্জ অঞ্চলের বেথাম গ্রামের প্রাচীন দূর্গ, শেখের বাড়ীর মসজিদ, দৌলতপুরের মন্দিরটি সেই প্রাচীন ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কর্তৃক নির্মিত বেথাম দূর্গ, তার রাজ্যকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রার প্রাগ প্রস্তুতি। শেখের বাড়ীর মসজিদটি ও সমসাময়িক কালের এক স্থাপত্য কর্মবলে প্রত্মতত্ত্ববিদগণের ধারণা। দৌলতপুরের মন্দিরটি ৮৭৬ বঙ্গাব্দে নির্মিত বলে প্রাচীন লিপি পর্যালোচনায় জানা যায়।

সাগর থেকে সায়র, সায়র থেকে হাওর শব্দের যেমন উদ্ভব, তেমনি মানব বসতি গড়ে উঠার পূর্বে মোহনগঞ্জ যে সাগরের জলরাশির নিম্নভাগ থেকে জেগে উঠা তার স্পষ্ট প্রমাণ মোহনগঞ্জের হাওর এলাকা দেখেই বুঝা যায়। নেত্রকোণার অন্যান্য থানাগুলোর অবস্থানও পূর্বে জলমগ্ন ছিল এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপজেলা হলো, মদন, আটপাড়া, খালিয়াজুরীতে এখন পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয় মধুমাত্র হাওরগুলোর অবস্থানে। ফলে মোহনগঞ্জে মানব বসতি এক সময় অন্যান্য থানাগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম থাকলেও এখন আর তেমন কম নেই।

বহু আন্দোলন ও কিংবদন্তির অঞ্চল মোহনগঞ্জের নামকরণ বেশ চমৎকার ও বিতর্কহীন। দৌলতপুর গ্রামের দরিদ্র প্রজা মোহনসাহা বর্তমান মোহনগঞ্জ নামদেয় স্থানে এক বটগাছের নীচে বসে হাওরগামী পথিকদের কাছে খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করে পরিবার চালাত। সে সময়কার পরগণার জমিদার হয়বতনগরের দেওয়ান শরিফ খাঁ তার জমিদারী অঞ্চল পরিদর্শনে আসার সংবাদে মোহনসাহা তাকে তুষ্ঠ করার লক্ষ্যে কিছু খাদ্য সামগ্রীসহ দেওয়ান শরিফ খাঁর সম্মুখে হাজির হয়। এতে জমিদার শরিফ খাঁ মোহন সাহার আতিথেয়তায় খুশী হয়ে প্রশ্ন করলেন কি প্রয়োজন তোমার? মোহনসাহার মনের অভিলাষ যেখানে বসে সে ব্যবসা করে সেখানে একটি বাজার প্রতিষ্ঠার অনুমতি। দেওয়ান সাহেব তাকে বাজার প্রতিষ্ঠা লাভের সাথে মোহন সাহার নাম বিশেষভাবে পরিচিত। মোহন সাহার নামানুসারে স্থানের নামকরণ হয় মোহনগঞ্জ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এ অঞ্চল যখন ক্ষুব্ধ তখন বড় থানাগুলোকে ভেঙ্গে ময়মনসিংহের বিভিন্ন থানায় ফাঁড়ি থানা সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ফলে ১৯০৯-১০ সালে পুলিশ ফাঁড়ি থানা মোহনগঞ্জ নামেই স্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময় অর্থাৎ পুলিশ বিভাগের স্মারক নং ১০,৯২২ চ, তারিখ ২১শে আগষ্ট ১৯১৭ এবং স্মারক নং ১৬০৩ চ. তারিখ ৬ই এপ্রিল ১৯২০ মূলে এই ফাঁড়ি থানাকে পূর্ণাঙ্গ থানায় রূপান্তর করা হয়।

www.pathagar.com

১৯২৯ সালে ময়মনসিংহ-মোহনগঞ্জ রেলপথ স্থাপনের ফলে মোহনগঞ্জের গুরুত্ব অনেকাংশে বেড়ে যায়। ভাটী অঞ্চলের প্রবেশ পথ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকলে আমদানী রপ্তানীসহ মোহনগঞ্জের অনেক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পায়। ৬০,০৯২ একর আয়তনের থানাটি সাতটি ইউনিয়ন নিয়ে ১৯৬২ সালে সার্কেল অফিস পরিচালিত হয়। ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুলাই মোহনগঞ্জ সদর এ পৌরসভা স্থাপিত হয়। ১৯৮২ মোহনগঞ্জ থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়। অধুনা মোহনগঞ্জ নগর সভ্যতার আলোতে ভাটী অঞ্চলের আধুনিক নগর। এই মোহনগঞ্জের গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন বরীন্দ্র সংগীতের প্রবাদ পুরুষ, রবীন্দ্রনাথের স্নেহপুষ্ট, শান্তিনিকতনের সংগীত ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শৈলজা রঞ্জন মজুমদার, ইব্রাহিম খাঁ, বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোর মন্ত্রীসভার খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল মোমেন খান, শহীদ বুদ্ধিজীবী ডঃ ফজলুর রহমান, সাবেক স্বরাস্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরসহ অনেক দেশবরেণ্য ব্যক্তিবর্গ মোহনগঞ্জের ব্যাপক পরিচিতি ঘটিয়েছেন।

২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী এ উপজেলার আয়তন ২৪৩.২ বর্গ কিলোমিটার, ষোলটি ইউনিয়ন, ১৩৩ টি মৌজা, ১৬৩ টি গ্রাম, মোট ২৮,৬৮০ টি খানা, মোট জনসংখ্যা ১৪৫,১০০ জন, তম্মধ্যে পুরুষ ৭৪,৮৮০,মহিলা ৭০,২২০ জন। শিক্ষিতের হার ৩১.৯৫% এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যা ৭৭,৫৪০ (১৮+ উর্ধ) যা মোট জনসংখ্যার ৫৩.৪ শতাংশ মাত্র। মোহনগঞ্জ নিচু এলাকা এখানে বোরো ধানের আবাদ সবচেয়ে ভালো। বিরাট বিরাট হাওর এলাকা থাকায় এ এলাকায় প্রচুর মাছ পাওয়া যায় যা সারা বাংলা দেশেই সরবরাহ হয়ে থাকে। এই সমস্ত হাওর এলাকায় মৎস্য আহরণে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়ে থাকে। হাওর বাওরগুলিতে প্রতি বৎসর সাইবেরিয়ান অসংখ্য পাখি এসে এ দেশের জীববৈচিত্র্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

মদন

ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক পরিবেশে দিক বিবেচনায় মদন উপজেলা খালিয়াজুরী, আটপাড়া ও কেন্দুয়ার সাথে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও বৈচিত্র্যতায় অনেক ব্যবধান পার্থক্য রয়েছে। যেমন প্রাকৃতিক স্নিগ্ধতায় রঞ্জিত হাওর-বাওর ও মগড়া, চেলাই, কৈজানী প্রভৃতি নদী নালায় বেষ্টিত সুফী সাধক সৈয়দ আহাম্মদ বসরী (রঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত, ঐতিহাসিক সমৃদ্ধি নিয়ে মদন থানা এ জেলার অন্যান্য থানাগুলো থেকে স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছে।

বর্তমান মদন উপজেলা পূর্বাঞ্চল এক সময় পরগণায়ে খালিয়াজুরী ও পশ্চিমাঞ্চল নাসিরুজিয়াল পরগণাভুক্ত ছিল। বৃটিশ শাসনামলে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে দেশের আঞ্চলিক শান্তি শৃংখলা রক্ষার্থে ময়মনসিংহের জেলা কালেক্টর যে সকল স্থানগুলোতে থানা স্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন, তন্মধ্যে পরগণা নাসিরুজিয়ালের জন্য সের মদন অন্যতম। কিন্তু সেটি রেভিনিউ বোর্ড নামঞ্জুর করলে বর্তমান মদন থানাভুক্ত ফতেপুর নামক স্থানে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে থানা স্থাপনের প্রস্তাব প্রেরিত হয়। নিকলী, বাজিতপুর, ফতেপুর ও

www.pathagar.com

মাদারগঞ্জ এ চারটি থানা নিয়ে হোসেনপুর বা নিকলী মহকুমা স্থাপনের প্রস্তাব ছিল (MAGISTRATE'S LETTER TO UNDER SECY. TO THE GOVT OF BENGAL, DATES 11-3-45.)।

১৮৮৪ সালে কেন্দুয়ায় পুলিশ প্রশাসন কেন্দ্র স্থাপনের পর বর্তমান মদন থানা অঞ্চলে আখশ্রী গ্রামে কেন্দুয়ার একটি ফাঁড়ি থানা স্থাপিত হয়। মদন সম্পর্কে কথিত আছে, মদনা নামক এক সামন্ত ভূঁ-স্বামীর নামানুসারে মদন নামের উদ্ভব। এ নামকরণে অনেক মত দ্বৈততা রয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে পারস্যভাষীদের এ অঞ্চলে আগমনকালে মুদন বা মদন নামের উদ্ভব। ফার্সী শব্দ মুদন এর বঙ্গার্থ শহর বা নগর। সেই থেকেই মুদন, পরে শব্দের অপভ্রম্যতায় মদন নামে পরিচিত। অপরদিকে ফার্সী শব্দ মদন বলতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা দন্ডায়মান হওয়াকে বুঝায়। যে অর্থেই আমরা মদন নামকরণের সন্ধান করি না কেন ফার্সী শব্দ থেকেই যে এর উৎপত্তি তা সহজেই অনুমান করা যায়।

কালের প্রবাহে মদনের গুরুত্ব বাড়তে থাকলে যোগাযোগসহ শাসন প্রক্রিয়াকে কাছে টেনে আনার লক্ষ্যে নায়েকপুরের আখশ্রী থেকে কেন্দুয়ার পুলিশ ফাঁড়িটি উঠিয়ে ৯৯ বর্গ মাইল এলাকা নিয়ে খালিয়াজুরী, আটপাড়া ও কেন্দুয়া থানার মোট ১৩১টি গ্রাম নিয়ে ১৯১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মদন থানা প্রতিষ্ঠালাভ করে। NO. 417 P.J. DATED 29TH JANUARY 1918. AND NO. 3535 P.J. DATED 14TH DECEMBER 1918 প্রজ্ঞাপন মূলে মদন থানাকে পুলিশ বিভাগীয় অনুমোদন প্রদান করে। ১৯৬২ সালে ৮টি ইউনিয়ন নিয়ে মদনে সার্কেল উন্নয়ন ও রাজস্ব অফিস প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নিজস্ব কর্মোদ্দীপনায় নেত্রকোণা জেলার অন্যান্য থানাগুলোর ন্যায় গুরুত্ব লাভ করে। ১৯৮৩ সালে মদনকে মান উন্নীত থানা পরে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়।

২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী এ উপজেলার আয়তন ২২৫.৮৫ বর্গ কিলোমিটার, আটটি ইউনিয়ন, ৯৬ টি মৌজা, ১২২ টি গ্রাম, মোট ২৭,৫৬০ টি খানা, মোট জনসংখ্যা ১,৪১,১৬০ জন, তম্মধ্যে পুরুষ ৭১,৮৪০,মহিলা ৬৯,৩২০ জন। শিক্ষিতের হার ২৩.৮৭% এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যা ৭৩,৩৬০ (১৮+ উর্ধ) যা মোট জনসংখ্যার ৫১.৯ শতাংশ মাত্র ।

বারহাট্টা

পূর্ব-ময়মনসিংহের অবিচ্ছেদ্য অংশের অন্যতম উপজেলা বর্তমান বারহাট্টা। তাই বারহাট্টার আদি ইতিহাস নেত্রকোণা জেলার তথা পূর্ব-ময়মনসিংহের অপরাপর থানাসমূহের অনুরুপ। বারহাট্টা থানা এক সময় সিংধা ও মৈমনসিংহ পরগণাভুক্ত ছিল। কেদারনাথ মজুমদারের ময়মনসিংহের বিবরণ পুস্তকে ময়মনসিংহ জেলার যে ৩৯টি আদি পরগণার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সিংধা দরজি বাজুকের বিষয়ে ও উল্লেখ রয়েছে।

www.pathagar.com

বৃটিশ শাসন ও শোষণ বিরোধী আন্দোলনের বারহাট্টা অবদান সর্বজন স্বীকৃত। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ফকির আন্দোলনের সময়কালে ফকিরদের একটি অংশ পাগলপন্থীরা এ অঞ্চলে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে টিপু শাহ্র নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ চলাকালীন সময়ে অনেক আন্দোলকারী নেতা উক্ত অঞ্চলে প্রভাব ফেলে। তারা ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য কৃষকদের সংগঠিত করতে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে অভাবগ্রস্ত ও শাসক শ্রেণীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ কৃষকরাও সক্রিয় হয়ে উঠে। তন্মধ্যে বর্তমান মোহনগঞ্জ থানাধীন জিমটি গ্রামের নিয়াজ শাহ্ ইকর ও বর্তমান আটপপাড়া থানাধীন ক্রজশাহ্ ফকির ও নাজির শাহ্সহ অনেক আন্দোলনকারী ফকির নৌপথে এ অঞ্চলে প্রবেশ করে আন্দোলনকে যখন বেগবান করে তোলে, তখনই ইংরেজ শাসকদের দৃষ্টি পড়ে এ অঞ্চলের উপর। ফলে ইংরেজ সৈন্য বাহিনীর পদচারণায় ও সৈন্য শিবির স্থাপনে গ্রামগুলো হয়ে উঠে উষ্ণ। এতে করে ইংরেজ সৈন্য বাহিনীরাও নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বৌহাট্টী ও বরোহাট্টী গ্রামের অদূরে নৌ যোগাযোগের সুবিধার্থে বরোহাটী বা বৌহাটী গ্রামরে নামকরণের অনুকরণে গড়ে তোলে অপর জনপদ যা তৎকালে BRAHATTA নামে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে সেই BRAHATTA এখন বারহাট্টা নামে পরিচিত পেলেও বারহাট্টা রেলষ্টেশনের নামফলক খানার প্রাচীন BRAHATTA নামের স্মৃতি বহন করে চলছে। BRAHATTA নামকরণ ১৮শ শতকের প্রথম পর্যায়ে অথবা ১৭শ শতকের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ নাটেরকোণায় ইংরেজ সৈন্য বাহিনীর অবস্থানকালীন সময়ের বলে অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করেন। আঠারশ শতকের আন্দোলন শেষ হলেও তৎপরবর্তী সময়ে ইংরেজ ও ইংরেজপুষ্ঠ জমিদারশ্রেণীর অত্যাচার নিপীড়নের মাধ্যমে খাজনাসহ অন্যান্য কর আদায়ের চেষ্টা করলে কৃষক প্রজা বিদ্রোহভাবাপন্ন হয়ে উঠে ও অভাবগ্রস্থ শ্রেণীরা চুরিসহ নানা অবৈধপথে অর্থ সংগ্রহে এগোতে থাকলে, এলাকার শান্তিশৃংখলাসহ প্রজা সাধারণকে নিরুপদ্রব করার লক্ষ্যে পুলিশ প্রশাসনের প্রয়োজন দেখা দেয়। পূর্ববঙ্গ ও আসাম গেজেটের বিজ্ঞাপন অনুসারে প্রজ্ঞাপন নং ৬৬৭৬১ তারিখ ১৫ জুন ১৯০৬ মূলে বারহাট্টা থানা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। থানা কার্যালয় নির্মাণের জন্য স্থানীয় দানশীল ব্যক্তি রাধানাথ কর গং ভূমিদান করেন। তৎকালীন বারহাট্টা থানার আওতায় বর্তমান মোহনগঞ্জ ও কলমাকান্দা থানার অংশ ছিল। পঞ্চাশ দশকের সময়কাল পর্যন্ত বারহাট্টাতে INSPECTOR'S CIRCLE HEAD QUARTERS হিসেবে বারহাট্টাসহ আটপাড়া মোহনগঞ্জ, মদন, খারিয়াজুরী ও কলমাকান্দা এই ৬টি থানার সার্কেল কার্য সম্পাদিত হত। প্রশাসনিক সুবিধার্থে ১৯৬২ সালে সার্কেল (উন্নয়ন) ও রাজস্ব সার্কেল অফিস স্থাপিত হয। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত আটপাড়া থানার সার্কেল উন্নয়নের কাজ বারহাট্টা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালের ২রা জুলাই বারহাট্টাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়।

www.pathagar.com

২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী এ উপজেলার আয়তন ২২১.৫ বর্গ কিলোমিটার, সাতটি ইউনিয়ন, ১৪৯মৌজা, ২৩৯ টি গ্রাম, মোট ৩২,২২০ টি খানা, মোট জনসংখ্যা ১,৫৭,৬৬০ জন, তম্মধ্যে পুরুষ ৮২,২৮০,মহিলা ৭৫৩৮০ জন। শিক্ষিতের হার ৩৩.৮১% এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যা ৮৩৪৪০ (১৮+ উর্ধ) যা মোট জনসংখ্যার ৫২.৯ শতাংশ মাত্র।

খালিয়াজুরী

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত খালিয়াজুরী অঞ্চল ছিল কামরূপ রাজ্যের রাজধানী। চতুর্দশ শতাব্দীতেই জিতারী নামক এক ত্রিয় সন্ন্যাসী কর্তৃক কামরূপের তৎকালীন রাজধানী "ভাটী" রাজ্য নামে খ্যাত (বর্তমান খালিয়াজুরীসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল) অঞ্চল আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়। সেসময় বর্তমানের খালিয়াজুরী অঞ্চল ভাটী বলে চিহ্নিত করা হত। কিংবদন্তির উপর নির্ভর করে এক জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, এ অঞ্চলে খাসিয়াদের অবস্থান ছিল বিধায় এ উপজেলার নামকরণ হয় খাসিয়াজুরী। কালক্রমে শব্দটি রূপান্তর হয়ে খালিয়াজুরীতে রূপ নিয়েছে।

হাওর অঞ্চল বলে খ্যাত খালিয়াজুরীর পূর্বে মানব বসতি অযৌক্তিক বলে মনে করা হতো এ সকল অবসান ঘটে ১৯৬২ সালের খালিয়াজুরীর বিভিন্ন গ্রামের স্থানে স্থানে কালো রং-এর কয়লা জাতীয় পদার্থ পাওয়ার মাধ্যমে। প্রাকৃতিক সম্পদের এ সব দৃশ্য দেখে সকলেরই বিশ্বাস জম্মে যে এ অঞ্চলে পূর্বে জনবসতি ও বৃক্ষাদির অস্তিত্ব ছিল। কালে মাটি চাপা পড়ায় কয়লা বা কয়লা জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে।

কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত ময়মনসিংহের ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় "পরগণায়ে খালিয়াজুরীর রাজস্ব ছিল ১৭০০.০ টাকা। এই মহালের ভূমিতে ধান অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হত। জলকর ও মাছ বিক্রির আয়ই এই মহালের প্রধান আয় এবং তাহা দ্বারাই রাজস্ব প্রদত্ত হয়ে থাকে ।

কেদারনাথ মজুমদার ঐতিহাসিক ময়মনসিংহের বিবরণ গ্রন্থে উল্লেখ করেন– "খালিয়াজুরী এক সময় ভাটী নামে পরিচিত ছিল। এই স্থানে কামরূপের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জিতারী নামক কোন ত্রিয় সন্ন্যাসী কর্তৃক এই প্রদেশ অধিকৃত হলে তা কামরূপ রাজ্যের শাসনচ্যুত হয় আইন-ই আকবর-ই গ্রন্থে ঈশা খাঁকে এই ভাটি অঞ্চলের অধীশ্বর বলে লিখিত হয়েছে। এই ভাটি মহাল তৎকালে সরকার বাজুহা জলকর মহারের অন্তর্গত ছিল, ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর এ পরগণা ঈশা খাঁর পারিষদ মজলিশদের হস্তগত হয়। অল্পকাল পরে মজলিশদের হাত থেকে হোম বংশের শাসনাধীন হয়। সেই সময় হতে বিগত উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভকাল পর্যন্ত এ পরগণা তাহাদিগেরই হাতে শাসিত হতে থাকে।

www.pathagar.com

কালক্রমে বৃটিশ সময়কালে অর্থাৎ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শান্তি শৃংখলা ও শাসন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে খালিয়াজুরীতে কেন্দুয়ার আওতাভূক্ত এক পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়। কেদারনাথ মজুমদারের ময়মনসিংহের বিবরণ গ্রন্থে দেখা যায় ১৯০৬ সালের ১৬ই জুন পূর্ববঙ্গ ও আসাম গেজেটিয়ারের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ময়মনসিংহ জেলার যে ১১টি আউটপোষ্ট থানা স্থাপিত হয়েছিল NO. 6676 DATED 15.6.06), তম্মধ্যে বর্তমান নেত্রকোণা জেলার বারহাট্টা ও খালিয়াজুরীর কথা উল্লেখ রয়েছে। G.O. ১৬৮২ নং স্মারক মূলে ২৬শে মে ১৯১০ সালে কেন্দুয়ার ফাঁড়ি থানা খালিয়াজুরী বারহাট্টা সার্কেলের ফাঁড়ি হিসাবে নেয়া হয়। List of police-stations in the province of East Bengal (Corrected up to 1st Appril 1950) পুস্তকের ১২নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে- "Khaliajuri Police-Station-Notification No. 418 P.H. Dated 26th January 1918. সপ্তম পর্যায়ে খালিয়াজুরীকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়। মোট ৬টি ইউনিয়ন নিয়ে এই থানার কাজ শুরু হয় ১৯৮২ সালে।

২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী এ উপজেলার আয়তন ২৬৯.৬৪ বর্গ কিলোমিটার, ০৫টি ইউনিয়ন, ৬০টি মৌজা, ৬২টি গ্রাম, মোট ১৫৯২০ টি খানা, মোট জনসংখ্যা ৭৯২২০ জন, তম্মধ্যে পুরুষ ৪০৪৬০,মহিলা ৩৮৭৬০ জন। শিক্ষিতের হার ৩৫.৬৮% এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যা ৪২৪৪০ (১৮+ উর্ধ) যা মোট জনসংখ্যার ৫৩.৬ শতাংশ মাত্র।

আটপাড়া

জনশ্রুতি আছে কিশোরগঞ্জের পশ্চিমাংশে মোবারকপুর মৌজাতে কয়েকটি জেলে পরিবারের আবাস ছিল। কালে সে স্থানটি হাট পাড়া নামে আখ্যায়িত হয়। সেই হাট পাড়া থেকে আজকের আটপাড়া নামের উদ্ভব। কেননা এ অঞ্চলসহ সমগ্র নেত্রকোণা জেলার সাধারণ মানুষের ভাষা উচ্চারণে অনেকাংশে অস্পষ্টতা রয়েছে। যেমন মোবারকপুরকে তাদের ভাষায় মারাকপুর, একইভাবে পাহাড়পুরকে পাড়পুর, হাটকে আট। তাই হাটপাড়া থেকে আটপাড়া নামে পরিচিতি বিচিত্র কিছু নয়। অনুমিত হয় যে, বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভেই জমি বন্দোবস্তে স্থানীয়ভাবে উচ্চারিত 'আটপাড়া' নামটি সরকারী কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ হয়। এছাড়া তৎকালীন সময় যারা এরূপ লিপিকারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাদের এর অর্থগত দিক চিন্তা করার প্রশ্নই আসে না, কেননা তাদের ভাষা ছিল ইংরেজী। তাই যেরূপ শুনেছেন সেরূপ লিখেছেন।

একসময় আটপাড়া পুলিশ প্রশাসনসহ প্রায় সকল প্রশাসনিক কাজ নেত্রকোণা সদর থানার আওতাভুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে জনবসতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে পুলিশ প্রশাসনের নিজস্ব প্রয়োজনে EAST BENGAL INSPETOR-

www.pathagar.com

GENERL OF POLICE, NO. 1009 P. DATED 21ST AUGUST 1917. প্রজ্ঞাপন মূলে বর্তমান থানা কার্যলয়ের উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বে মগড়া নদীর তীরে একটি বাঁশের ঘরে প্রথম থানার কার্যক্রম শুরু হয়। পার্শ্বের জনবসতি আটপাড়া স্থানের নামেই বানিয়াজান মৌজায় স্থাপিত থানার নামকরণ হয় "আটপাড়া থানা"।

২৮শে আগষ্ট ১৯২৬ সালে পুলিশ ষ্টেশনের জন্য সরকার বানিয়াজান মৌজার পূর্ব সীমান্তে ৭ বিঘা, ৬ কাঠা, ৬ ছটাক ভূমিহুকুম দখল করে নেয় (প্রজ্ঞাপন নং ২৩১৪ মূলে)। আটপাড়া থানার পুলিশ রাজস্ব বিভাগের নিকট থেকে এই দখলকৃত ভূমি বুঝে নেয় ১২ই ডিসেম্বর ১৯২৬ইং সালে। ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে থানা ব্যারাক, মালখানা, পরিদর্শন বাংলো নির্মাণ করে (১৯২৯-৩০ অর্থবছর)। ১৯৫৯-৬০ অর্থ বছরে থানা ভবনের বর্ধিত কাজসহ সকল নির্মাণ কাজ শেষ হয় ২৫শে মে ১৯৬০ সালে।

১৯৬২ সাল থেকে থানাগুলোর সার্কেল উন্নয়নের কাজ চালু হলে আটপাড়া থানার সার্কেল উন্নয়ন কাজ চারহাট্টা ও রাজস্ব বিভাগের কাজ চালানো হয় নেত্রকোণা সদর থেকে। ১৯৬৪ সালে থানা কার্যালয় থেকে প্রায় ১০০ গজ পূর্ব-দক্ষিণে মোবারকপুর মৌজায় আটপাড়া সার্কেল অফিস স্থাপন করা হয়। ৭৪.৮ বর্গমাইল এলাকায় ৭টি ইউনিয়ন নিয়ে বর্তমান প্রশাসনিক কাজ চলছে। ১৯৮৩ সালের ২রা জুলাই সামরিক শাসনামলে আটপাড়াকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়।

২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী এ উপজেলার আয়তক্ষেত্র ১১৯.১৩ বর্গ কিলোমিটার, সাতটি ইউনিয়ন, ১৪৫টি মৌজা, ১৭৫ গ্রাম, মোট খানা ২৬৯০০, মোট জনসংখ্যা ১,৩২,৪৪০, তম্মধ্যে পুরুষ ৬৭,০৬০,মহিলা ৬৫,৬৮০। শিক্ষিতের হার ২৬.৭৫% এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যা ৬৯০৬০ (১৮+ উর্ধ)। যা মোট জনসংখ্যার ৫২.১৪ শতাংশ মাত্র।

কেন্দুয়া

কেন্দুয়ার ইতিহাস অতি প্রাচীন এখানকার ঐতিহ্য, নৈসর্গিক প্রাচুর্য অতি পরিচিত। শাসন-শোষণ, আনন্দ-বেদনায় ভরপুর এ অঞ্চলের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অতীত দিনের স্বাক্ষ্য বহন করে, স্মরণ করিয়ে দেয় বাংলার মাটিতে এক সময়কার শাসক শ্রেণীর প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা। ইতিহাস পর্যালোচনায় অবগত হওয়া যায় যে, প্রাক-জ্যোতিষ রাজত্বকালে পূর্ব-ময়মনসিংহ কামরূপ রাজ্যের অধীন ছিল। শাসক ছিল বর্মণ, সান্ন্যাসী, কোচ, গারোসহ বিভিন্ন উপজাতীয় শ্রেণীর নরগোষ্ঠী। ব্রহ্মপুত্র নদের শাখা নদীর বাঁকে রোয়াইলবাড়ীতে সুরতি দুর্গসহ সুরম্য প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ কেন্দুয়ায় অতীত শাসক শ্রেণীর অবস্থান ও যুদ্ধ পরিচালনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর রোয়াইল বাড়ীতে অবস্থানরত মসজিদ জালালের পরবর্তীতে নাসিরুজিয়াল পরগণার মালিকানা দ্রুত গতিতে বদলাতে থাকে এবং মসজিদ জালালের বংশধর ফতেইয়ার খাঁর সময় হতে দেওয়ানদের অবস্থার অবনতি দেখা দেয়। ফলে মহালের সাড়ে ছয় আনা হিস্যা দেওয়ানদের হাতের বাইরে চলে যায়। ঐ সাড়ে ছয় আনা সাড়ে চার আনা আধার মানিকের জমিদারী ও দু'আনা নওয়াপাড়ার চৌধুরীদের হস্তগত হয়। ১১৮৬ বঙ্গাব্দে দেওয়ান সাহেবগণ দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হন এবং মহালও হস্তান্তর শুরু হয়। ১১৮৮ বঙ্গাব্দে গভর্মেন্ট মালিকদের কাছ থেকে সমস্ত হিস্যা গ্রহণ করে ও রামগোপাল ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট ইজারা প্রদান করে এবং জমিদারগণ নির্দিষ্ট মালিকানা পেতে থাকে। অতঃপর ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মালিকগণের উত্তরাধিকারগণ তাদের পৈতৃক হিস্যা প্রাপ্ত হতে সমর্থ হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় মুক্তাহাগাছার নারায়ণ আচার্য, ধানকুড়ার গিরিশি গোবিন্দ রায় চৌধুরীসহ অনেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পৃথক করে নেয়। এরূপ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই উক্ত মহাল কুড়ি অংশে বিভক্ত হয়। আধার মানিকসহ নওয়াপাড়া, মুক্তাগাছা, কোরাটী, কৃষ্ণপুর, ভবানীপুর, আঠারবাড়ী, ধানকুড়া প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণ উক্ত পরগানার মালিক ছিল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বর্তমান মদন, খালিয়াজুরী ও আটপাড়া থানার একাংশ নিয়ে কেন্দুয়ায় ফাঁড়ি থানা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রজ্ঞাপন নং 416 P.J. DATE 26TH JANUARY, ১৯১৮ মূলে ঐ ফাড়ি থানাকে পূর্ণাঙ্গ থানায় রূপান্তর করা হয়।

বাবু মহিম চন্দ্র রায় কেন্দুয়া থানার স্থায়ী কার্যালয় স্থাপনের জন্য ৪ বিঘা ১৮ শতক ভূমি দান করলে, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে পুলিশ বিভাগ ৭ হাজার ১শ' ৩৯ টাকা ব্যয়ে আধা পাকা কার্যালয় গৃহ নির্মাণ করে। ষাটের দশকে কেন্দুয়া সার্কেল উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে ১৪টি ইউনিয়ন নিয়ে। থানাটি ১৯৮২ সালের ৭ই নভেম্বর উপজেলায় উন্নীত করা হয়।

বাংলাদেশের বহু গর্বিত সন্তানের জন্মভূমি হিসেবে কেন্দুয়া বিশেষভাবে পরিচিতি রয়েছে। এ উপজেলার গর্বিত সন্তানদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি, সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ, অবিভক্ত বাংলার এককালীন অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী নলিনী রঞ্জন সরকার, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাসিক ও নাট্যকার হুমায়ন আহমেদ, মৈমনসিংহ গীতিকার সংগ্রাহক চন্দ্র কুমার দে, লোক সাহিত্য সংগ্রাহক সিরাজ উদ্দিন কাশিমপুরী, কবি রওশন ইজদানী, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হাফিজুর রহমান ও প্রখ্যাত বাউল কবি জালাল উদ্দিন খাঁসহ অনেক গুণী ব্যক্তিত্বের জন্ম।

২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী এ উপজেলার আয়তন ৩০৩.৬ বর্গ কিলোমিটার, বাইশটি ইউনিয়ন, ২৫৫ টি মৌজা, ২৯১ টি গ্রাম, মোট ৫৯৬৮০ টি খানা। শিক্ষিতের হার ২৭.৯১% এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যা ১৪৩৮৮০ (১৮+ উর্ধ) যা মোট জনসংখ্যার ৫২.৭ শতাংশ মাত্র।

www.pathagar.com

দুর্গাপুর উপজেলা

নেত্রকোণার উত্তরে সবুজ বনানী ঘেরা গারো পাহাড়ের পাদদেশে দুর্গাপুর উপজেলার অবস্থান। প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্যে ভরপুর হলেও প্রায় সব ক্ষেত্রেই দুর্গাপুর অবহেলিত। দুর্গাপুরের উত্তরে ভারতে মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড়, দক্ষিণে নেত্রকোণা সদর ও পূর্বধলা উপজেলা, পূর্বে কলমাকান্দা উপজেলা, পশ্চিমে ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলা। প্রধান নদী রয়েছে ৩টি। নদীগুলো হলো– সুমেশ্বরী, কংশ ও আত্রাইখালী। বড় হাওর ও বিল রয়েছে ১৪টি। উপজেলায় মোট খাল আছে প্রায় ৭টি। একটি পৌরসভা ও সাতটি ইউনিয়ন নিয়ে এ উপজেলা গঠিত। উপজেলাটিতে মোট গ্রামের সংখ্যা ২১৬টি এবং মৌজার সংখ্যা ১৩৪টি। উপজেলার ইউনিয়নগুলো হচ্ছে ঃ কুল্লাগড়া, দুর্গাপুর, চন্ডিগড়, বিরিশিরি, বাকলজোড়া, কাকৈরগড়া ও গাঁওকান্দিয়া। দুর্গাপুর সদর এলাকাটি দুর্গাপুর পৌর সভার আওতাভূক্ত। মানচিত্রে উপজেলার ইউনিয়নগুলির অবস্থান দেখানো হ'ল।

চিত্র ৭.১ : দূর্গাপুর উপজেলার মানচিত্র

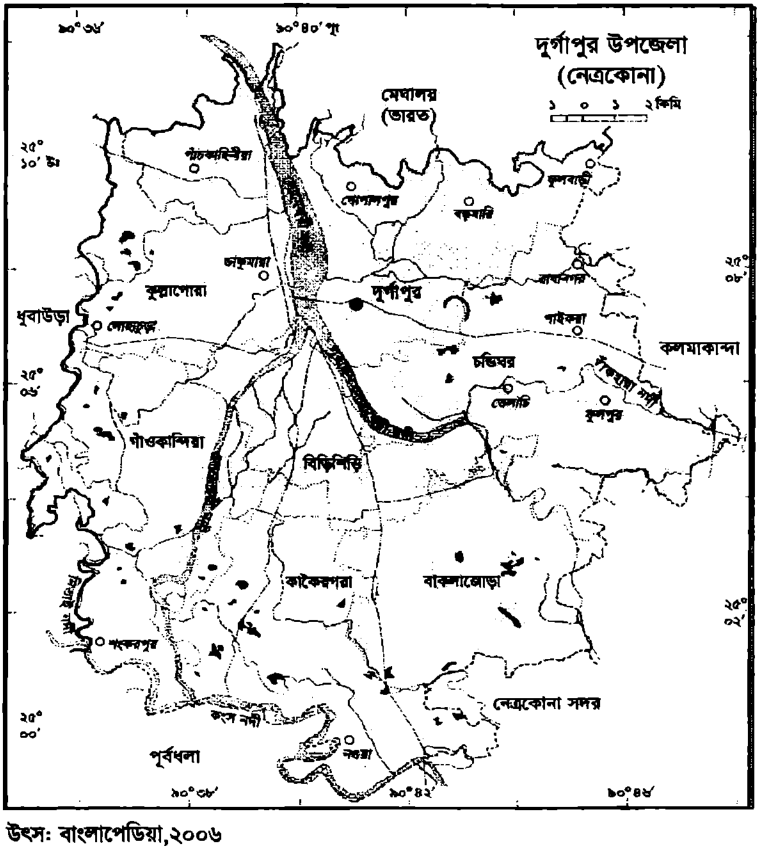

উৎস: বাংলাপেডিয়া,২০০৬

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক ঘটনাবলি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পএবট্ট হাজং এর হাতির খেদায় বিনা পারিশ্রমিএক কাজ করাএনার পন্থতিবাএদ হাজং নৈতা মনা সদট্টাএরর নৈতএেতঙ্গ হাজং বিএদত্তাহ সংঘটিত হয়। খোএন ১৯৪২-৪৩ সাএল কমএরড মণি সিংএহর নৈতএেতঙ্গ টংক আএক্টদালন পরিচালিত হয়। ১৯৪৬-৪৭ সাএল তৈভাগা আএক্টদালন স্টরূ হয়। পএর ৈ আএক্টদালন সারা পাবট্টবএব্দ ছড়িএয় পএড়।

১৮৭৪ সালে আইন শৃংখলা রক্ষার জন্য দূর্গাপুরে থানা স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তান আমল থেকে এ থানাকে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় অবকাঠামো ও উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে ১৯৮২ সালে দূর্গাপুরকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়। জনসংখ্যা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও প্রান্তিক কৃষক সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণী ৭.১ দেখানো হল।

সারণী ৭.১ দূর্গাপুর উপজেলার জনসংখ্যা ও প্রান্তিক কৃষক

বিবরণ	সংখ্যা ২০০১	সংখ্যা ১৯৯১	দশকের শিক্ষিতের হার ও জন্মহার	বাৎসরিক জন্মহার ও শিক্ষিতের হার
জনসংখ্যা	১৯৮৩২৬	১৬৯১৩৫	১৭.২৬	১.৬০
(ক) পুরুষ	১০০৬২৩ ৫০.৭৩%	৮৫৩৯৫ ৫০.৪৮%	১৭.৮৩	১.৬৫
(খ) মহিলা	৯৭৭০৩ ৪৯.২৬%	৮৩৭৪০ ৪৯.৫১%	১৬.৬৭	১.৫৫
জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি কি:মি:	৭১০	৫৭৬	২৩.৬	২.১১
শিক্ষিতের হার (%)	৫২.৩%	৪৭.৫%	৪৬.০৯	৩.৮০
		শতকরা		
কৃষক পরিবারের সংখ্যা	৪১৮২২	২১.৬১		
ক) বড় কৃষক ৭.৫ একর ও তদূর্ধ	১৮০০	০.৯৩		
খ) মধ্যম কৃষক ২.৫-৭.৪৯ একর	৭২০০	৩.৭২		
গ) ক্ষুদ্র কৃষক ১.৫-২.৪৯ একর	৪৩৫০	২.২৫		
ঘ) প্রান্তিক কৃষক ০.৫০-১.৪৯ একর	৯৫৫০	৪.৯৪		
ঙ) ভূমিহীন ০.৪৯ একর ও তার কম	১৮৯২২	৯.৭৮		

উৎস: উপজেলা প্রশাসন দূর্গাপুর ও ২০০১ সালের আদম শুমারী

www.pathagar.com

ভূমি ব্যবস্থাপনা

সারণী ৭.২ পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে দুর্গাপুর উপজেলায় এখনো বিপুল পরিমানে জলাভূমি ও বনভূমি রয়েছে যা এলাকা খাদ্যনিরাপত্তা, কর্মসংস্থানে এবং দারিদ্রবিমোচনে অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণকালে এ চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ ও হতাশাব্যঞ্জক বলে প্রতীয়মান হয়। বনভূমি মূলত গারো পাহাড় যা বর্তমানে বনশূন্য বলা চলে। যদি ও সম্প্রতি বনবিভাগ কিছু কিছু এলাকায় সামাজিক বনায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। জলাভূমিগুলির অবস্থাও ততইবচ। নদীগুলির উৎস স্থলে চর পড়ে নদীর গভীরতা মারাত্মক ভাবে কমে গিয়েছে। এ জন্যে অসময়ে নেমে আসে পাহাড়ী ঢল। সুমেশ্বরী নদীর গভীরতা কমে যাবার ফলে মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্য ও সেচ ব্যবস্থার সুযোগ হ্রাস পাচ্ছে ।

সারণী ৭.২ ভূমি শ্রেণী সংক্রান্ত তথ্য

সাধারণ তথ্য	
মোট এলাকা	২৭৯ বর্গ কিঃ মিঃ
জলাভূমি	১৯৩০ হেঃ
বনভূমি	৯১৭ হেঃ
শহর অঞ্চল	৮৪২ হেঃ
প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ এ লোক সংখ্যা	৭১০ জন

উৎস: উপজেলা প্রশাসন, দূর্গাপুর, ২০০৫

এলাকাটিতে উৎপাদিত ফসলের মধ্যে রয়েছে ধান, পাট, গম, আখ, সরিষা, চিনাবাদম, তরমুজ। উপজেলায় মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৪১,৬৯০ একর। আবাদী জমি এক ফসলীর পরিমাণ হলো ১১,৬৫১ একর এবং আবাদী জমি তিন ফসলী হলো ৮২১ একর। দুর্গাপুর উপজেলায় মোট কৃষি ব্লকের সংখ্যা হলো ২১টি। প্রধান ফসল-ধান, পা, গম, আখ, সরিষা, চিনাবাদাম।

কৃষির অবস্থা (একরে)

(ক) আবাদী জমি (একরে) ৪১,৬৯০

(খ) আবাদী জমি এক ফসলী ১১,৬৫১

(গ) আবাদী জমি দুই ফসলী ২৯,২১৮

(ঘ) আবাদী জমি তিন ফসলী ৮২১

www.pathagar.com

সেচ ব্যবস্থা ঃ উপজেলায় সেচ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য গভীর নলকূপ রয়েছে ২০টি এবং অগভীর নল কূপের সংখ্যা হলো ১,১১২ টি। পাওয়ার পাম্প রয়েছে ২১টি এবং ট্রেডল পাম্প রয়েছে ৩৫টি।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে পাকা পথ রয়েছে ১৮ কিলোমিটার, আধা পাকা পথ রয়েছে ২৫ কিলোমিটার, যাতায়াতের জন্য নদী পথ রয়েছে ২৫ কিলোমিটার। জনসাধারণের চলাচলের জন্য পাকা পুল রয়েছে ৩১টি, বেইলি পুল হলো ৬টি, বাঁশ বা কাঠের সাঁকো হলো ১৫টি এবং কালভার্টের সংখ্যা হলো ৯০টি। উপজেলা রাজস্ব ব্যবস্থাপনা তদারকির জন্য এখানে একটি উপজেলা রাজস্ব কার্যালয় ও ৭টি ইউনিয়ন রাজস্ব কার্যালয় রয়েছে। উপজেলাটিতে ৭টি বড় বাজার এবং ৭টি ফেরীঘাট রয়েছে। যা থেকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়ে থাকে। এ ছাড়া ইটের ভাটা রয়েছে তিনটি। উপজেলা সাব-রেজিষ্টার অফিসও রয়েছে উপজেলা সদরে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে। সাব পোষ্ট অফিস ১টি এবং ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসের সংখ্যা হলো ৮টি। ৩০০ লাইনের একটি ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রয়েছে। কার্ডফোন সেট আছে ১টি। তাছাড়া ফ্যাক্স ও চালু আছে দুর্গাপুর উপজেলায়।

যানবাহনঃ বাসের সংখ্যা-৭, ট্রাকের সংখ্যা-৩, অটোরিক্সার সংখ্যা- ৩০, রিক্সার সংখ্যা- ৬১২, ঠেলা/ভ্যানের সংখ্যা- ৬৫, জীপ গাড়ির সংখ্যা -২, গরু/মহিষের গাড়ির সংখ্যা- ৬৩, লঞ্চের সংখ্যা-৫, যান্ত্রিক নৌকার সংখ্যা-১০।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাঃ দুর্গাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে ৪টি। উপজেলায় ক্লিনিকের সংখ্যা ৩টি। এছাড়াও উপজেলা সদরে একটি যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র রয়েছে। জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সরকারী উদ্যোগে সরকারী নলকূপ স্থাপন করেছে ১৯৯৫টি। এর মধ্যে তারা নলকূপের সংখ্যা হলো ৪০৭টি। অন্যান্য নলকূপের সংখ্যা হলো ১৫৮৮টি আর বেসরকারী নলকূপের সংখ্যা হলো ১৬০৯টি। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরী কারখানার সংখ্যা সরকারীভাবে একটি এবং বেসরকারীভাবে ১টি রয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা : এই উপজেলার মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সরকারী ৫৮টি, বেসরকারী রেজিষ্টার ৪২টি, নন রেজিষ্টার ২৮টি, স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০টি, স্বল্পব্যয়ী ৬টি এবং এনজিও পরিচালিত হলো ২৮টি। ডিগ্রী কলেজ রয়েছে ১টি, মহিলা কলেজ হলো ১টি, পিটিআই বেসরকারী রয়েছে ১টি, সরকারী ১টি বালক ও ১টি বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে। একছাড়া বেসরকারী বালক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫টি, আর বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা হলো ৫টি। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় এখানে সিনিয়র মাদ্রাসা রয়েছে ৩টি,

www.pathagar.com

দাখিল মাদ্রাসা রয়েছে ২টি এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা হলো ২৩টি। দুর্গাপুর উপজেলায় ধর্মীয় উপসণালয়ের মধ্যে মসজিদ ১৮৫টি, মন্দির ৪৮টি, গীর্জা ৭টি ও পাদ্রী মিশন হলো ২টি। সার্বিক বিবেচনায় প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপর্যাপ্তই বলা চলে।

মৎস্য ও পশু সম্পদঃ সরকারীভাবে এ উপজেলায় মৎস্য খামার রয়েছে ১টি আর বেসরকারীভাবে মৎস্য খামার রয়েছে ৩টি। সরকারী পুকুর রয়েছে ৩টি এবং বেসরকারীভাবে পুকুর আছে প্রায় শতাধিক।

পশু সম্পদ সংরক্ষণের জন্য এখানে ১টি উপজেলা পর্যায়ে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে ও ২টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র আছে এ উপজেলায়। হাস-মুরগীর খামার আছে ৭টি।

পশু সম্পদ :
(ক) গরু/মহিষের সংখ্যা ৮৩,৯২০
(খ) ছাগল/ভেড়ার সংখ্যা ১৭,৪২১
(গ) হাস/মুরগীর সংখ্যা ১,৭৫,৩১২
(ঘ) গরুর খামার সংখ্যা ১
(ঙ) হাঁস-মুরগীর খামার ৭
(চ) পশু চিকিৎসা কেন্দ্র ১
(ছ) কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র ২

খনিজ শিল্প ঃ নূরী পাথর, নূর কয়লা ও চিনা মাটি

ক্ষুদ্র শিল্প : দুর্গাপুর উপজেলায় একটি অটোমেটিক স'মিলসহ প্রায় পাঁচটি স'মিল রয়েছে। সত্তরটি চাউল/আটাকলের, সত্তরটি বিস্কুট ফ্যাক্টরী, একটি আইসক্রীম কারখানা, একটি কার্পেট তৈরি কারখানা, পনেরটি ওয়েল্ডিং তৈরি কারখানা ও একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। চিত্তবিনোদনের জন্য একটি সিনেমা হল, দুইটি অডিটরিয়াম, একটি কালচারাল একাডেমী ও একটি পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। পর্যটকদের সুবিধার জন্যে একটি সরকারী ডাকবাংলো, একটি উপজাতীয় একাডেমীর আবাসিক হোটেল রয়েছে। দর্শনীয় উল্লেখযোগ্য স্থানের মধ্যে কমরেড মনি সিংহের স্মৃতিসৌধ, দূর্গাপুর রাজবাড়ী, রানীখং মিশন, বিজয়পুর বিডিআর ক্যাম্প। বিচার ও আইন-শৃংখলার জন্য মুন্সেফ কোর্ট, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, পুলিশ থানা, পাঁচটি বি,ডি,আর ক্যাম্প ও দশ প্লাটুন আনসার রয়েছে।

www.pathagar.com

সুসঙ্গের পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে কেদার নাথ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন যে মোগল শাসন আরম্ভের বহু পূর্ব হতে সুসঙ্গ-রাজগণ সুসঙ্গ পরগণার অধিপতি ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, রাজকুমার যাদবেন্দ্র অপুত্রক পরলোক গমন করলে, ৯০ আনা অংশ, তার দৌহিত্র পূর্ব্বধলার ভাদুড়ীদিগের হস্তগত হয়। ১৭৮৭ সনে এ দু'অংশের চৌদ্দ আনা অংশে রাজা রাজসিংহ ও দুই আনা অংশ পান শিবরাম সিংহের পৌত্রগণ। গোপীনাথের উত্তরাধিকারসূত্রে শঙ্করপুরের প্রাণদা ও বরদা রাজকুমারীদ্বয় পনের আনা অংশ হতে সে খাতের অংশ পৃথক করে নেন। রাজকুমারী প্রাণদা দেবীর অংশ তার দত্তক পুত্র ঈশানচন্দ্র লাহিড়ী প্রাপ্ত হয়ে ১৩১২ সনের চৈত্র মাসে সুসঙ্গ-মহারাজদিগকে পত্তনী দেয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সমগ্র জমিদারীর রাজস্ব ২০,৩৭৭ টাকা আট আনা নির্ধারিত হয়েছিল।

ব্যাংক বীমা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অগ্রণী, সোনালী, কৃষি ও জনতা ব্যাংকের শাখা রয়েছে। তাছাড়া প্রায় ১০টি বেসরকারী বীমা প্রতিষ্ঠান দুর্গাপুরে কর্মরত রয়েছে।

দুর্গাপুরের কৃষি

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ী অঞ্চল, পাহাড়তলীর পলল ভূমি ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র পলল ভূমি এ তিনটি ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল নিয়ে দুর্গাপুর উপজেলা গঠিত। এর উত্তরাংশে গারো পাহাড় এবং পাহাড়ের উপত্যকা নিয়েই পাহাড়ী অঞ্চল। পাহাড়ী অঞ্চলের ঠিক দক্ষিনে রয়েছে বিস্তীর্ণ পাহাড়তলীর পললভূমি। উপজেলার দক্ষিণ পূর্বাংশের উল্লেখ্যযোগ্য এলাকা এবং মধ্য পশ্চিমাংশের সামান্য অংশ নিয়ে ব্রহ্মপুত্র পললভূমি।

উপজেলার মোট কৃষি জমির সিংহভাগই (৯৬.১৫%) নীট ফসলী জমি। সামান্য পরিমানে স্থায়ী পতিত (১.০৫%) ও সাময়িক পতিত জমি রয়েছে। কৃষি জমির অধিকাংশই দো-ফসলী জমি। উপজেলার ফসলের নিবিড়তা ১৮৩.২%। ভূমিশ্রেণী বিবেচনা করলে দেখা যায় মধ্যম উচু জমিই সবচেয়ে বেশী। তাছাড়া মধ্যম নীচু জমি দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ। অপরদিকে উচু জমি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে।

উপজেলায় মোটামুটি ভাবে দশটি শস্য বিন্যাস উল্লেখ্যযোগ্য। এর মধ্যে বোরো- পতিত-রোপাআমন প্রধান শস্য বিন্যাস। রোপা আমনই এলাকার প্রধান ফসল। এর পরই বোরোর অবস্থান এছাড়া অন্যান্য উদ্যান ফসলও অত্র উপজেলায় উল্লেখ্যযোগ্য পরিমানে উৎপাদিত হয়। অত্র এলাকার কৃষকগণ ফসল উৎপাদনের নানা ধরনের সেচ যন্ত্র ব্যবহার করে। তার মধ্যে অগভীর নলকূপই সর্বাধিক। সেচ আওতাধীন জমির পরিমান ৬৯%। উপজেলার খাদ্য পরিস্থিতির বিবেচনায় অত্র উপজেলা খাদ্যে উদ্বৃত্ত। উল্লেখ্য খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার জন্য এখানে ১০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ১টি খাদ্যগুদাম রয়েছে। ২০০১-২০০২ সনের হিসেব অনুযায়ী উদ্বৃত্ত খাদ্যের পরিমান ছিল ৩৬৫৯১ মে. টন।

www.pathagar.com

উপজেলার গত কয়েক বৎসরের খাদ্য পরিস্থিতি সারণী ৭.৩ তে দেখানো হল ।

সারণী ৭.৩ খাদ্য পরিস্থিতি

বিবরণ/সন	২০০২-২০০৩	১৯৯৬-৯৭	১৯৯১-৯২
জনসংখ্যা	২০০৭৪	১৯২২৫৬	১৬১১৩৫
খাদ্য প্রয়োজন (জনপ্রতি দৈনিক খাদ্য চাহিদা ৪৫৩.৬০ গ্রাম হিসাবে) মেঃ টন	৩৩১৮৭	২৮৬৪৮	২৪১০
বীজ, গোখাদ্য ও অপচয় (খাদ্য চাহিদার ১১.৫৮% হিসাবে) মেঃ টন	৩৮৪৩	৩৩১৭	২৭৮০
মোট খাদ্য শস্য চাহিদা (২+৩) মেঃ টন	৩৭০৩০	৩১৯৬৪	২৬৭৯০
মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন (চাল ও গম) মেঃ টন উদ্বৃত্ত (+) ঘাটতি (-) মেঃ টন	৬৬৩৪৯	৫৭০২৫	৪৪১৮০
উদ্বৃত্ত (+) ঘাটতি (-) মেঃ টন	+২৯৩১৯	+২৫৬১৬	+১৭৩৯০

উৎস: উপজেলা প্রশাসন, ২০০৫

দূর্গাপুর উপজেলার কৃষি জমির পরিমান ও পরিস্থিতি সারণী ৭.৪ তে দেখানো হল ।

সারণী ৭.৪ কৃষি জমির পরিমান

কৃষি	জমি (হেঃ)	শতকরা
মোট জমি	১৯০০০	
স্থায়ী পতিত জমি	২০০	১.০৫
সাময়িক পতিত	৫৩০	২.৭৯
নীট ফসলী জমি	১৮২৭০	৯৬.১৬
এক ফসলী	১৫৩০	৮.০৫
দোফসলী	১৪৩৭০	৭৫.৬৩
তিন ফসলী	১০৬৬	৫.৬১
ফসলের নিবিড়তা (%)	১৮৩.২%	
উঁচু (বন্যা হয় না)	৭৮৫	৫৪.৮৪
মধ্যম উঁচু (০-৩)	১০৪২০	৩৬.২৩
মধ্যম নীচু (৩ -৬ পানি হয়)	৬৮৮৩	৪.৭৯
নীচু (৬ এর বেশী পনি হয়)	৯১১	০.০০
মাটির শ্রেণী		
এটেল	৪১৭০	১.০৫
এটেল দোআঁশ	৫৫৬০	২.৭৯
বেলে দোআঁশ	১২৫১০	৯৬.১৬
বেলে	৫৫৬০	

উৎস : নেত্রকোণা কৃষি বিভাগ, ২০০৫

www.pathagar.com

উপজেলার কৃষি উৎপাদনের সমস্যা

উপজেলায় কৃষির প্রধান সমস্যা হচ্ছে পাহাড়ী ঢল। এই পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ব্যাপক ফসল হানি ঘটে। বিশেষতঃ বোরো মৌসুমে। বোরো ফসল পুরোপুরি পরিপক্ক হওয়ার আগেই সৃষ্ট এই বন্যায় অনেক সময় কৃষকের ফসল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেয়। তাই অত্র এলাকার কৃষকগণ ফসল পরিপক্ক হওয়ার আগেই অর্থাৎ ১৫-২৫% ক্ষতি মেনে নিয়ে বন্যা (পাহাড়ী ঢলের কারণে) আসার আগেই ফসল কেটে নেয়। এছাড়া পাহাড়ী ঢল ফসল নষ্ট করা ছাড়াও সৃষ্ট বন্যার পানিতে নদীর তীরের বাধ ভেঙ্গে প্লাবিত জমিতে বালি পড়ে চাষাবাদের অনুপযোগী করে ফেলে।

তাছাড়া গতানুগতিক সমস্যার মধ্যে রয়েছে অত্র উপজেলার অত্যন্ত অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। রাজধানী এবং জেলা শহরের সংগে যোগাযোগের প্রধান রাস্তাটির অধিকাংশই জরাজীর্ণ অবস্থা। শুধু তাই নয় শুকনাকুড়ি ও সুমেশ্বরী নদীতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু বহু দিন যাবৎ অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় রয়েছে। যা অত্র এলাকার মানুষের চলাচলে তথা জীবন যাত্রায় ভোগান্তি ও সমস্যার সৃষ্টি করছে। বিশেষতঃ উৎপাদিত কৃষি পণ্য বিপননে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ফলে কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য হতে বঞ্চিত হচ্ছে। ভালো ও উন্নতমানের কৃষি উৎপাদনে তাদের কোন উৎসাহ নেই।

উপজেলায় কৃষি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উপায়

* জেলা ও রাজধানীর সংঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী একমাত্র সড়কটি আশু সংস্কার করা। ফলে মানুষে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে, কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পন্যের ন্যায্যমূল্য পাবে বহু কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠির দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হবে।
* সুমেশ্বরী ও 'শুকনাকুড়ি' ব্রীজ দু'টির অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সমাপ্ত করা। অবশ্য এ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।
* সুমেশ্বরী ও আত্রাখালি নদীর তীরের বাঁধগুলি এমন ভাবে সংস্কার করা যাতে বন্যার পানির চাপ সহ্য করতে পারে। বিরিশিরি ও দূর্গাপুরের মাঝখানে সুমেশ্বরী নদীর ক্যাচমেন্ট এরিয়াটি খনন করা প্রয়োজন। স্থানীয় প্রভাবশালী লোকদের সন্তানেরা এখানে অবৈধভাবে প্রমোদ ভবন তৈরি করেছেনে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে।
* উপজেলায় উৎপাদিত তরমুজ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে ।

www.pathagar.com

কলমাকান্দা উপজেলা

বাংলাদেশের মানচিত্রের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ঘেঁষে নেত্রকোণার উত্তরে সবুজ বনানী ঘেরা গারো পাহাড়ের পাদদেশে কলমাকান্দা উপাজেলার অবস্থান। পূর্বে এখানে কোন জনবসতি ছিল না। এলাকাটি ছিল জঙ্গলময় ও পাহাড়ী নদী সুমেশ্বরী ও উব্দাখালীর ঢলের স্রোতে ভেসে আসা বালি, পাথর ও পলি মাটি। ওই সকল কান্দায় তখন প্রচুর পরিমাণে কলমী গাছ ছিল, আর সে সময় এ স্থানকে কলমীরকান্দার বলা হতো ; কালান্তরে কলমাকান্দা নাম ধারণ করে। বর্তমান উপজেলা সদরটি ছিল মহিষাশুরা হাওড়ের অন্তর্ভূক্ত। ১৯১৭ সালের ২৩ জুলাই ৩৪৩টি গ্রাম নিয়ে কলমাকান্দা থানা স্থাপিত হয়। ১৯৮৩ সালের ২৪ মার্চ তারিখে উপজেলা (উন্নীত থানা) হিসেবে উন্নীত করা হয়।

সীমানা ও অবস্থান

উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড়। পশ্চিমে জেলার দূর্গাপুর উপজেলা। দক্ষিণে জেলার সদর ও বারহাট্টা উপজেলা। পূর্বে সুনামগঞ্জ জেলার ধরমপাশা উপজেলা। উপজেলাটি ২৪°৫৭´ ও ২৫°১২´ উত্তর আংশ এবং ৯০°৪৫´ ও ৯০°৫৯´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।

ঐতিহাসিক স্থান

অত্র উপজেলার ২ নং নাজিরপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস সংলগ্ন তিনরাস্তার মিলনস্থলে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক-বাহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে ৭ জন মুক্তিযোদ্ধা (শহীদ ইয়ার আহম্মদ, শহীদ নুরুল ইসলাম, শহীদ নুরুজ্জামান, শহীদ জীতেন, শহীদ মন্টু, শহীদ আজিজ ও শহীদ কামাল) শহীদ হন। এই ৭ জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধাকে লেংগুড়া ইউনিয়নের পাহাড়ের পাদদেশে ফুলবাড়ীয়া নামক গ্রামে সমাধিস্থ করা হয়। উল্লেখিত স্থানদ্বয় জাতীয় পীঠস্থান হিসেবে খ্যাত। নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে উপজেলার নাজিরপুরে এক স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া রংছাতী ইউনিয়নের চন্দ্রডিঙ্গা হরিপুরে টিলার গায়ে রয়েছে কয়েক হাজার বছর পূর্বের চন্ডডিঙ্গা বা চাঁদ সওদাগরের ডিঙ্গা। রংছাতী ইউনিয়নের চন্দ্রডিংগা হরিপুরে ও রংছাতি এই চারটি ইউনিয়নে গারো, হাজং উপজাতির বসবাস। উপজেলা পর্যায় থেকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে আদিবাসীদের সহায়তা করা হয়। একই ইউনিয়নের গারো পাহাড়ের টিলায় রয়েছে প্রাকৃতিক ঝর্ণা।

ভূ-প্রকৃতি

কলমাকান্দা উপজেলা উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ী অঞ্চল, পাহাড়তলীর পলল ভূমি, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র পললভূমি এবং সুরমা কুশিয়ারা পললভূমি এ চারটি ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এ চারটি অঞ্চল যথাক্রেমে শতকরা প্রায় ২, ৭৬, ২ ও ২০ ভাগ এলাকায় বিস্তৃত। এ

www.pathagar.com

উপজেলার সর্ব উত্তরাংশে গারো পাহাড়ের কিছু অংশ এবং এর কিছু উপত্যকা নিয়েই সামান্য পাহাড়ী এলাকাটি গঠিত। এ পাহাড় গুলো প্রধানত পাললিক শিলাস্তরে গঠিত। পাহাড়গুলো নিচু ও মৃদু ঢালু।

পাহাড়ী অঞ্চলের ঠিক দক্ষিণে রয়েছে বিস্তীর্ণ পাহাড়তলীর পলল ভূমি। মধ্যপূর্বাংশের উল্লেখযোগ্য এলাকা রয়েছে সুরমা কুশিয়ারা পলল ভূমি এবং সর্ব দক্ষিণে সামান্য অংশ নিয়ে ব্রহ্মপুত্র পললভূমি। এ অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি প্রায় সমতল থেকে অসমতল ডাংগা ও বিল নিয়ে গঠিত।

জলবায়ু

বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মত এ উপজেলা ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। এখানে ষড়ঋতুর মধ্যে প্রধানত তিনটি মৌসুম জোরালো ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়, শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ বর্ষণ এ সময় হয়। শীত কাল আরম্ভ হয় নভেম্বরে এবং শেষ হয় ফেব্রুয়ারীতে। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল, কখনও কখনও সামান্য বৃষ্টি হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়।

এ সময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত হয় এবং বাতাশে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে একে “কাল বৈশাখী” বলা হয়। এ সময় কিছু শিলা বৃষ্টিও হয়ে থাকে। তাপমাত্রার উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এখানে নিম্নতম তাপমাত্রা ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে পরিলক্ষিত হয়, যার গড় তাপমাত্রা ১২.৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

বৃষ্টিপাতের উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শীতকালে গড় বৃষ্টিপাত ৬১ মিলিমিটার যা এই সময়ে বর্ষা মৌসুমের পরিমানের চেয়ে অনেক কম। দীর্ঘ মেয়াদী পরিসংখ্যানে আরও দেখা যায় যে, বৎসরে শীত মৌসুমের ৪/৫ মাস প্রায় শুষ্ক থাকে। আবার বর্ষা মৌসুমে কোন কোন মাসে মাত্রাধিক বৃষ্টিপাত হয়।

নভেম্বর হতে মার্চ পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের মাসিক হার ৭৫ মিলিমিটারের কম বলে এ মাস গুলোকে শুষ্ক মাস বলা চলে। রবি মৌসুম (নভে-ফেব্রুয়ারি) ৫৯ মিলিমিটার, প্রাক-খরিফ মৌসুম (মার্চ-মে) ৪৬৫ মিলিমিটার এবং খরিফ মৌসুম (জুন-অক্টোবর) ১,৭৫১ মিলিমিটার।

আয়তন

এই উপজেলার মোট আয়তন-৩৭৭.৪১ বর্গ কিলোমিটার/১৪৫.৭২ বর্গ মাইল। মোট আবাদী জমি রয়েছে ৬৯৮০৯.৬১ একর। আবাদযোগ্য স্থায়ী পতিত জমি রয়েছে ১০৯১.৫৫ একর। আবাদযোগ্য সাময়িক পতিত জমি রয়েছে ২৪২০.৬০ একর। মোট

www.pathagar.com

বনভূমি পরিমাণ ৩২০ একর। জলাশয় রয়েছে অনেক। নদী বিস্তৃত রয়েছে ১৬৬ একর ব্যাপি। মাথাপিছু জমির পরিমান হল ০.৩৯৮ একর। মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমান রয়েছে ০.২৯৮ একর।

জনসংখ্যা অবস্থা

জনসংখ্যা ঘনত্ব ঃ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৬২১ জন (২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী), পরিবারের সদস্য সংখ্যা (গড়) ঃ ৫.৩ জন। স্থূল জন্ম হার ৪.৩০%, স্থূল মৃত্যু হার ঃ ২.১%। বাণিজ্য কেন্দ্র রয়েছে ৭টি। শিশু মৃত্যু হার ১.১৫%, মাতৃ মৃত্যুহার ০.৬৫%।

সারণী ৭.৫ জনসংখ্যা ও এর বৃদ্ধি প্রবণতা

বিবরণ	সংখ্যা ২০০১	সংখ্যা ১৯৯১	দশক জন্মহার	বাৎসরিক জন্মহার
জনসংখ্যা	২৩৪৩৯৮	২০৯৩৬০	১১.৯৬	১.৪
(ক) পুরুষ	১২০২৫৫	১০৬৭৫৩	১২.৬৫	
	৫১.৩ %	৫০.৯৯%	১১.২৪	১.২০
(খ) মহিলা	১১৪১৪৩	১০২৬০৭	১১.৮৯	
	৪৮.৬৯%	৪৯.০০%	৪১.১২	১.০৭
জনসংখ্যা ঘনত্ব প্রতি কি:মি:	৬২১	৫৫৫		১.১৩
শিক্ষিতের হার (%)	৩০.২	২১.৪		৩.৫০

উৎস: ২০০১ সালের আদম শুমারী

জনস্বাস্থ্য : কলমাকান্দা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের তথ্যানুসারে মোট পরিবার সংখ্যা ৩৫,৭২৩টি, তম্মধ্যে পায়খানা ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা ১২,৭৮৩টি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা ৪,৯০২টি, অস্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা ৭,৮৮১টি এবং খোলা জায়গায় পায়খানা ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা- ২২,৯৪০টি। কলমাকান্দা উপজেলার স্বাস্থ্যব্যবস্থা সারণী ৭.৬ দেখানো হল।

www.pathagar.com

সারণী ৭.৬ স্বাস্থ্যব্যবস্থা

বিবরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
হাসপাতাল	১টি	৩১ শয্যা
এফ.ডব্লিউসি	৭টি	
ডাক্তার	৯ জন	এমবিবিএস
ডিসপেনসারী	২৫	
নার্স	৬ জন	
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী	৬০ জন	
গ্রাম্য ডাক্তার	১০২ জন	
হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার	১৫ জন	
আয়ুর্বেদিক/ইউনানী ডাক্তার	৫ জন	
কমিউনিটি কিনিক	৩১টি	
ইপিআই-এর আওতায় শিশুসংখ্যা	৭৯৬৯ জন	

ও.আর.এস প্রাপ্তি স্থান উপজেলা স্বাস্থ্য স্থান কমপ্লেক্স, এফ.ডব্লিউ.সি কমিউনিটি ক্লিনিক আর্সেনিক আক্রান্ত তথ্য অতি অল্পসংখ্যক আর্সেনিক আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায়।
(সূত্র : উপজেলা স্বাস্থ্য অফিস,২০০৫)

রোগবালাই ও প্রাকৃতিক দুর্যোগঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে আকস্মিক বন্যা ও পাহাড়ী ঢল। রোগবালাইর মধ্যে রয়েছে ম্যালেরিয়া, কলেরা, কালাজ্বর ইত্যাদি। কমন ডিজিজেস আমাশয়, ডায়েরিয়া, নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া, চর্মরোগ, পেপ্‌টিক আলসার, টাইফয়েড, রক্ত স্বল্পতা, কৃমি, হাফানী ইত্যাদি।

জমির শ্রেণীবিভাগ

জমির পরিমান ৬৫৪৫.৭২ একর তন্মধ্যে কৃষি ৩৯,৭৪.৮৭ একর, অকৃষি ২,৫৭০.০০ একর, বাকী অন্যান্য শ্রেনীভূক্ত। বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমান, ১৮৫৯.৫১ একর কৃষি, ২৫৭০.০০ একর অকৃষি সর্বমোট ৪৪২৯.৫০ একর। মাটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বেলে, দো-আঁশ, এটেল। ভূমির শ্রেনীভেদ সারণী ৭.৭ দেখানো হল। ভূমির মালিকানার ধরণ সারণী ৭.৮ তে দেখানো হল।

www.pathagar.com

সারণী ৭.৭   ভূমির শ্রেনীভেদ

ভূমির প্রকার	আয়তন
উচ্চ ভূমি	৫,৪৫০.০০
মধ্যম উচ্চ ভূমি	১৩,৬৬৩.০০
মধ্যম নীচু ভূমি	৯০০.০০
নীচ ভূমি	৬,৭৩০.০০
অত্যান্ত নীচু ভূমি	১,৫২০.০০

ভূমির মালিকানার ধরণ সারণী ৭.৭ তে দেখানো হল ।

সারণী ৭.৮ ভূমির মালিকানার ধরণ

মালিকের ধরণ	জমির পরিমাণ	ভূমি মালিকের (চাষী সংখ্যা
ভূমিহীন চাষী	০.০৫ – ০.৪৯ একর	৬৮৮২ জন
প্রান্তিক চাষী	০.৫০ – ০.৯৯ একর	৪৪৮০ জন
ক্ষুদ্র চাষী	১.০০ – ২.৪৯ একর	৮০৬২ জন
মাঝারী চাষী	২.৫০ – ৭.৪৯ একর	৬২০৭ জন
বড় চাষী	৭.৫০ উর্ধ্বে	১,৪৪৪ জন

সেচ সুযোগঃ মোট আধুনিক সেচ এলাকা (ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ উৎসাহ) এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান সেচ অবস্থা সারণী ৭.৯ এ দেখানো হল।

সারণী ৭.৯ বর্তমান সেচ অবস্থা

সেচ যন্ত্রের নাম	সেচকৃত এলাকা (হেক্টর)
গভীর নলকূপ	৩৫৫
অগভীর নলকূপ	৯৯৫১
হস্তচালিত নলকূপ	২০
এলএলপি/পাওয়ার পাম্প	২৭৪০
ছড়া	৭৫০

www.pathagar.com

উপজেলার বিশেষ ঐতিহ্যসমূহ

* সীমান্তবর্তী লেংগুড়া, খারনৈ, নাজিরপুর ও রংজাতি ইউনিয়নে গারো ও হাজং আদিবাসীদের বসবাস।
* উপজেলার বেশ ক'টি ইউনিয়নের বেলে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে তরমুজ আবাদ হয়। এখানকার উৎপাদিত তরমুজ ঢাকাসহ সারা দেশে সরবরাহ হয়ে থাকে।
* নেত্রকোনার ভাটি অঞ্চল হিসেবে খ্যাত কলমাকান্দা, মধ্যনগর, তাহিরপুর ও সুনামগঞ্জ এলাকার মাছ শুঁটকি করে গরুর গাড়ি করে নাজিরপুর বাজারে ধানের মতো মণ ধরে বা বস্তা হিসেবে বিক্রি করা হয়। এখন সেই পরিমাণ মাছ না থাকলেও কিছু কিছু মাছ বর্ষাকালে পাওয়া যায়।
* কচ্ছপ, কাছিম, গুইসাপ প্রভৃতি বনজ ও জলজ প্রাণি উপজাতিদের খাবার হিসেবে নাজিরপুর বাজারে ব্যাপকভাবে সরবরাহ হতো। তা আজ বর্তমান প্রজন্মের জন্য কল্পনা মাত্র।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

বিভাগীয় সদর দপ্তর ঢাকা হতে যাতায়াত ব্যবস্থা পর্যলোচনা করলে দেখা যায যে সড়কপথে অথবা রেলপথে নেত্রকোণা জেলা সদরে পৌছে তারপর কলমাকান্দার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়। সড়ক পথে বাস যোগাযোগ: ঢাকা মহাখালী বাসস্ট্যান্ড হতে ঢাকা-নেত্রকোণা বাসযোগে নেত্রকোণা বাসস্ট্যান্ডে নেমে রিক্সায় রাজুরবাজার (কলমাকান্দা বাসস্ট্যান্ড) থেকে কলমাকান্দাগামী বাসে দশধার ঘাটে নেমে নৌকায়/ফেরীতে নদী পার হয়ে আরেক বাসে উঠে কলমাকান্দা উবদাখালী নদীর ঘাটে বাসস্ট্যান্ডে নেমে নৌকায় নদী পার হয়ে উপজেলা সদর দপ্তরে পৌঁছা যায়। সড়ক ও জনপথ বিভাগের পাকা সড়ক রয়েছে ১১ কি.মি, পাকা সড়ক ৪১.০৭ কি.মি., আধা পাকা সড়ক ৭.৯৫ কি.মি., কাঁচা সড়ক রয়েছে ৩৪২.৪৮ কি.মি.।

ট্রেন যোগাযোগ : ঢাকা কমলাপুর রেলস্টেশন হতে আন্তঃনগর (তিস্তা, একতা, অগ্নিবীণা ও যমুনা এক্সপ্রেস) ট্রেনযোগে ময়মনসিংহ রেলওয়ে জংশন স্টেশনে পৌঁছে মোহনগঞ্জ ট্রেনে নেত্রকোণা যেতে হয়। অতঃপর সড়ক পথে কলমাকান্দা উপজেলা সদরে পৌঁছা যায়।

ইউনিয়ন ও গ্রাম: মোট গ্রামের সংখ্যা - ৩৪৪টি (২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী), মোট ইউনিয়নের সংখ্যা - ৮টি সেগুলি হচেছ; ১নং কলমাকান্দা , ২নং নাজিরপুর, ৩নং পোগলা, ৪নং বরখাপন, ৫নং লেংগুড়া, ৬নং খারনৈ, ৭নং কৈলাটি, ৮নং রংছাতি ইউনিয়ন পরিষদ ।

www.pathagar.com

সারণী ৭.১০ উপজেলা পরিষদ হতে ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের যোগাযোগ ব্যবস্থা

ইউনিয়ন নাম	উপজেলা সদর হতে দূরত্ব কিঃ মিঃ	যোগাযোগের বিবরণ	রাস্তার ধরণ
১নং কলমাকান্দা	০.৫	রিক্সা	পাকা
২নং নাজিরপুর	১২	রিক্সা অথবা নৌকা	পাকা ও নদী পথ
৩নং পোগলা	১১	রিক্সা অথবা নৌকা	৫কিঃ মিঃ পাকা ও ৬ কিঃ মিঃ কাঁচা ও নদী পথ
৪নং বরখাপন	৮	নৌকা	নদী পথ
৫নং লেংগুড়া	১৭	রিক্সা অথবা নৌকা	পাকা ও নদী পথ
৬নং খারনৈ	১০	রিক্সা	পাকা
৭নং কৈলাটি	১৭	রিক্সা অথবা নৌকা	পাকা ও নদী পথ
৮নং রংছাতি	১০	রিক্সা অথবা নৌকা	কাঁচা ও নদী পথ

পুকুর ও জলমহাল

কলমাকান্দা উপজেলায় পুকুর সংখ্যা ২৯টি। তম্মধ্যে ২০ একরের নীচে ১৪টি যেগুলি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-এর ব্যবস্থাপনাধীন রয়েছে। ২০ একরের উর্ধ্বে ১৫টি তম্মধ্যে ২টি সিবিএফএম প্রকল্পভূক্ত, ৪টি নব্য নীতিমালাধীন মৎস্য, অধিদপ্তর-এর ব্যবস্থাপনাধীন এবং ৯টি জেলা প্রশাসন কর্তৃক ইজারা প্রদান করা হয়। খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে একটি বালু মহাল ও একটি পাথর মহাল ।

পরিবার পরিকল্পনা

সরকারী কার্যক্রমঃ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, কলমাকান্দা ভ্যাসেকটমী লাইগেশন সহ স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী সকল জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

এনজিও কার্যক্রমেঃ এফএইচডি, কলমাকান্দা ও জাতীয় তরুণ সংঘ, কলমাকান্দা খাবার বড়ি, কনডম ও ডিপো-প্রভেরা এর মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদী জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

দারিদ্র্যাবস্থা

২০০১ সালের আদম শুমারী অনুসারে ৭৭.৩৩ শতাংশ জনগোষ্ঠী কৃষি নির্ভরশীল। তাদের মধ্যে ৪৯.৪৯ শতাংশের আয়ের উৎস শস্য,পশুপালন, বনায়ন এবং মৎস্য চাষ। তম্মধ্যে ২৭.৮৪ শতাংশ কৃষি শ্রমিক। অকৃষি খাতে নিয়োজিত রয়েছে ৪.৭৩ শতাংশ, ব্যবসায়

www.pathagar.com

৮.৪৫ শতাংশ, নির্মানে নিয়োজিত রয়েছে ০.৫২ শতাংশ। ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত থেকে জীবিকা আহরণ করছেন ০.২৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী। এই উপজেলার মোট জনগোষ্ঠীর কাঁচা বাড়ীতে বসবাসকারী পরিবারের হার ৮৩.৫০ শতাংশ, ঝুপরি ঘরে বাস করা পরিবারের হার ১৩.২৬ শতাংশ, আধা পাকা বাড়ীতে বসবাসকারী পরিবারের হার ২.৮৯ শতাংশ এবং পাকা ঘরে বাসকারীর পরিবারের হার ০.৩৫ শতাংশ। ভূমিহীন পরিবার সংখ্যা মোট ৩০২৫টি। তম্মধ্যে ভিজিডি কার্ড ধারীর সংখ্যা ১০১৬টি, তাদের সকলই মহিলা।

শিক্ষা ব্যবস্থা :

এই উপজেলার মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সরকারী ৭৫টি, বেসরকারী রেজিষ্টার ৪০টি, কমিউনিটি ১৫টি, কিন্ডার গার্টেন -৪টি, মক্তব -৯০টি, এবতেদায়ী মাদ্রাসা - ৪০টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বালিকা) ১টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় (কো-এডুকেশন) ১৪টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (কো-এডুকেশন) ৮টি, দাখিল, ৮টি আলিম ২টি, পাবলিক লাইব্রেরী ১টি এবং ডিগ্রী কলেজ ১টি। সার্বিক বিবেচনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আরো সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

জনপ্রিয় খেলাধুলা ঃ ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট ও ষাঁড়ের লড়াই।

উপসংহার

উপজেলা ভিত্তিক নেত্রকোণা জেলার চিত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সামগ্রিকভাবে সর্বস্তরে তৃণমূল পর্যায়ে জেলাটির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন লক্ষনীয় অবস্থায় নেই। তবে এ জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠীর যোগ্যতা ও মেধা জাতীয় পর্যায়ের আস্থার চেয়ে কোন অবস্থাতেই পিছিয়ে নেই। অভাব শুধু স্থানীয় নিবেদিত নেতৃত্বের ও সরকারী উদ্যোগ ও তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণ। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচনে পরবর্তী পরিচালনায় গুরুত্ব দেয়া হবে বলে আশা রইল।

সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জী

আলী আহাম্মদ খান আইয়োর ১৯৯৭, নেত্রকোণা জেলার ইতিহাস

গোলাম এরশাদুর রহমান ১৯৯৫, মুক্তিসংগ্রামে নেত্রকোণা

জেলা প্রশাসন, নেত্রকোণা, ২০০৫

বিবিএস ২০০১ সালের আদমশুমারী

উপজেলা প্রশাসন, দূর্গাপুর

উপজেলা প্রশাসন, কলমাকান্দা

বাংলাপেডিয়া ২০০৬, এশিয়াটিক সোসাইটি ঢাকা।

www.pathagar.com

সংলগ্নি ক : দূর্গাপুর উপজেলার বিভিন্ন তথ্যাদি

সারণী ৭ক.১ সেচ যন্ত্র ও সেচ কৃত জমি (২০০২-২০০৩) ঃ

সেচ যন্ত্র	ব্যবহৃত সংখ্যা			সেচকৃত (হেক্টর)			গড় সেচকৃত জমি (হেঃ)
গভীর নলকুপ	ডিজেল	বৈদ্যুতিক	মোট	বোরো	অন্যান্য	মোট	২২.০০
অগভীর নলকূপ	১১	১	১২	২৬০	-	২৬০	৪.৪৯
পাওয়ার পাম্প	১৮১১	১১১	১৯২২	৮৬৩৯	-	৮৬৩৯	১২.০০
রোয়ার পাম্প	১৩৮	২৯	১৬৭	১৯৮৪	-	১৯৮৪	০.১৬
ট্রেডল পাম্প	-	-	৬০	-	১০	১০	০.২৫
ছাড়া	-	-	৪০	-	১০	১০	-
টিউবওয়েল	-	-	১১	১২২৭	-	১২২৭	-
অন্যান্য	-	-	৪৫০	১৪০	-	১৪০	০.৩১
মোট	১৯৬০	১৪১	২৬৬২	১২২৫০	২০	১২২৭০	-

সারণী ৭ক.২ সেচ খরচ (২০০২-২০০৩)

সেচ যন্ত্র	সেচ যন্ত্র ভিত্তিক খরচ হেক্টর প্রতি		ঘন্টা প্রতি মূল্যে (টাকায়) গড়ে
	ডিজেল	বিদুৎ	
গভীর নলকুপ	চালিত	চালিত	৩০.০
অগভীর নলকুপ	৫১৮৭	৪৪৪৬	৫০.০
পাওয়ার পাম্প	৫৬৮১	৪৬৯৩	৪০.০
	৫১৮৭	৩৭০৫	

www.pathagar.com

সারণী ৭ক.৩ নদনদী ও নদী হতে সেচের বিবরণ ঃ

নদীর নাম	দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)	গড় প্রস্থ (কিঃমিঃ)	নদীর এলাকা দৈর্ঘ্য প্রস্থ (বর্গ কিঃ মিঃ)	এ নদীতে বসানো পাওয়ার পাম্পের সংখ্যা	এ নদীর পানি দিয়ে সেচকৃত জমি (হেঃ)
সুমেশ্বরী	২০	০.৫	১০.০	৩০	৩৬০
কংশ	১৩	.০৫	৬.৫	৮০	৯৬০
গোলাইকালী	১০	০.২	২.০	১০	১২০
নিতাই	৫	০.১	০.৫	৩৩	৩৯৬

সারণী ৭ক.৪ জলমহালের বিবরণ ঃ

বিবরণ	সংখ্যা	আয়তন	সেচের জন্য ব্যবহৃত হয় (%)	রবি মৌসুমে এর কত অংশে চাষ হয় (%)
হাওর/বাওর	-	-	-	-
বিল	১৪	১২৩০	৫০%	৮৫%
দীঘি	২১৫৭	৩২০	-	-
অন্যান্য (নাম লিখুন)	৩	৮	-	-
মৎস্য খামার				

উৎস ঃ- উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, দূর্গাপুর।

সারণী ৭ক.৫ জমির বর্গা প্রথা/লিজ ঃ

বিবরণ	পরিমান (%)	
ফসল আধাআধি	বর্তমানে	১০ বৎসরের পূর্বে
জন-জমি-জল (১/৩ ভাগ প্রথা)	৪০%	(আনুমানিক)
এক বৎসর মেয়াদী টাকায়	৬০%	২৫-৩০%
একাধিক ০ বৎসরের জন্য টাকায়	২%	৮-১০%
এক মৌসুমের জন্য টাকায়	২০%	১০%
এক ফসলের জন্য নির্দ্দিষ্ট ফসলের বিনিময়ে		১৫-২০%

www.pathagar.com

সারণী ৭ক.৬ খাদ্যশস্যের জমির পরিমান ও উৎপাদন (চাউলে) ঃ

ফসল জাত	১৯৯৬-৯৭ সালে অর্জিত			২০০২- ০৩ সালে অর্জিত		
	আবাদ (হেক্টর)	হেক্টর প্রতি ফলন টনে	উৎপাদন (টনে)	আবাদ (হেক্টরে)	হেক্টর প্রতি ফলন টনে	উৎপাদন (টন)
১। আউশ উফশী	৮৭৫	২.১	১৮৩৮	৫৫০	১.৮	৯৯০
স্থানীয়	২৬৫০	১.০	২৬৫০	৬০	০.৮২	৪৯
মোট আউশ	৩৫২৫	১.১	২৬৫০	৬১০		১০৪৩
২। আমন						
(ক) বোনা আমন				৮	২	১৬
(খ) রোপা আমন						
উফশী	৫১৫০	২.১	১০৮১৫	৭৪০০	২.৩৮	+১৭৬১২
স্থানীয়	৬৪০০	১.৩	৮৩২০	৬৫০০	১.৭৮	+১১৫৭০
মোট রোপা আমন	১১৫৫০		১৯১৩৫	১৩,৯০০	–	+২৯১৮২
মোট আমন				১৩৯০৮	–	২৯১৯৮
৩। বোরো						
উফশী	৫৪৯৪	২০০০৫	১৬২০৭	১০,৫০০	৩.০৬	+৩২১৩০
স্থানীয়	২০৮৬	১.৭৫	৩৬৫১	১৭৭০	১.৯০	-৩৩৬৩
মোট বোরো	৭৫৮০	--	২২২১৮	১২,২৭০	–	+৩৫৪৯৩
মোট ধান (১+২+৩)	২২৬৫৫	--	৪৫৮৪১	২৬,৭৮৮	–	+৬৫৭৩৪
৪। গম	৩৬০	১৫৪৪	৫৫৫৬	২৬০	২.২৫	৫৮৫
মোট চাল ও গম	–	--	৫১৩৯৭	–	–	+৬৬৩১৯
৫। ভুট্টা	–	--	–	১২	২.৫	৩০
মোট খাদ্য শস্য	–	–	৫১৩৯৭	–	–	+৬৬,৩৪৯

সারণী ৭ক.৭ অন্যান্য ফসলের জমির পরিমাণ

সেচ যন্ত্র	১৯৯৬-৯৭ সালে অর্জিত			২০০২-২০০৩ সালে অর্জিত		
ফসল জাত	আবাদ (হেক্টরে)	(হেক্টর প্রতি	উৎপাদন (টনে)	আবাদ (হেক্টরে)	হেক্টর প্রতি ফলন টনে	উৎপাদন (টনে)
অন্যান্য দানাদার	-	ফলন টনে	-	-	-	-
শস্য	-	-	-	-	-	-
কাউন	-	-	-	-	-	-
জোয়ার	-	-	৮০	২৫	৯৯	+ ২২৫
বজরা	-	৮.০	৮	৫	৮.৫	+ ৪২৫

www.pathagar.com

যব	-	-	-	-	-	-
ঢেঁড়স	১০	৮.০	৮০	২৫	৯৯	+ ২২৫
ধুন্দল	১	৮.০	৮	৫	৮.৫	+ ৪২৫
পটল	১	-	-	-	-	-
পালংশাক	১	৭	৭	৫	৮	+ ৪০
পুঁইশাক	২	১৫	৩০	২০	১৬	+ ৩২০
ফুলকপি	৫	২০	১০০	১৪	২৪	+ ৩৩৬
বাটিশাক	-	-	-	-	-	-
বেগুন	১৮	৩০	৫৪০	৩৫	৩২	+ ১১২০
ব্রোকলি	-	-	-	-	-	-
বাঁধাকপি	১০	২৫	২৫০	২০	২৭	+ ৫৪০
বরবটি	২	৮	১৬	৫	৮	+ ৪০
মিষ্টিকুমড়া	৫০	১৭	৮৫০	১২৫	১৮	+ ২২৫০
লালশাক	২	৬	১২	১০	৭	+ ৭০
লাফাশাক	১	-	-	-	-	-
লাউ	২	২০	৪০০	৩০	২২	+ ৬৬০
লেটুস	৪	১০	-	-	-	-
শশা	১০	৮	৪০	১০	১১	+ ১১০
সীম	-	-	৮০	৩০	৮	+ ২৪০
স্কোয়াস	-	-	-	১	৮	৮
হেলেঞ্চা	-	-	-	-	-	-
অন্যান্য	-	-	-	-	-	-
মশলা						
আদা	৩	২২	৬৬	৫	২১	+ ১০৫
জিরা	-					
ধনিয়া (পাতাসহ)	১৫	১.৫	২২.৫	২৫	১.৭	+ ৪২৫
পিয়াজ	৫৬	৮.০	৪৪৮	৫০	৯	+ ৪৫০
বিলাতি ধনিয়া	-	-	-	১	০.৪	+ ০.৪
পাতা	১২০	১.৫	১৮০	১২১	১.৬	+ ১৯৪
মরিচ	৯২	৯.৫	৮৭৪	১৫০	১০	+ ১৫০০
রসুন	২৫	১৫	৩৭৫	৩০	১৬	+ ৪৮০
হলুদ	-	-	-	-	-	-

www.pathagar.com

পুঁদিনা পাতা	-	-	-	-	-	-
অন্যান্য	-	-	-	-	-	-
ফল	-	-	-	-	-	-
আম	১০০	৩০.০	৩০০০	১৫০	৩০	+ ৪৫০.০
আনারস	২৫	১৫	৩৭৫	৪০	১৬	+ ৪৬০
আঙ্গুর	-					
আমলকি	-				২৭	+ ২৭০০
কলা	৪০	২৫	১০০০	১০০		
কদবেল	-					
কমলা	-					
কাঁঠাল	৬০	৬০.০	৩৬০০	১২০	৬৫	+ ৭৮০০
কাজুবাদাম	-					
খেজুর	-					
পেঁপে	৪	২০.০	৮০	১০	২২	+ ২২০
লিচু	২	৫.০	১০	১০	৫	+ ১০
লেবু	৫	৮০.০	৪০০	২০	৮০	+ ২৭০
পেয়ারা	৪			১০	২৭	+ ২৭০
বেল	-					
তরমুজ/বাঙ্গী	৮০	৪০.০	৩২০০	২৩০	৪৮	+ ১১০৪০
নারিকেল	৫০	১০.০	৫০০	৮০	১০	+ ৮০০
অন্যান্য	-					
তৈলবীজ	-	-	-	-	-	-
ক্যাষ্টর	-	-	-	-	-	-
কুসুমফুল	-	-	-	-	-	-
গর্জন তেল						
তিসি	২৫	০.৮	২০	২০	০.৯	+ ১৮
তিল	১৫	০.৯	১৩.৫	৩০	১	+ ৩০
বাদাম	৭০	০.২	১৪০	১৯০	২.১	+ ৩৯৯
রাই ও সরিষা	১২০	০.৮	৯৬	১৫০	০.৯	+ ১৩৫
সয়াবিন						
সূর্যমুখী				১	১.২	+ ১.২
অন্যান্য						

www.pathagar.com

ডাল শস্য						
অড়হর	২	.৭৫	১.৫	১০	০.৭৭	+ ৭.৭
খেসারী	২	১	২	৫	১	+ ৫
ছোলা	৩	১.৬	৪.৮	৫	১.৭	+ ৮.৫
ফেলন						
মসুর	১০	১.২	১২	৬	১.৪	+ ৮.৪
মটর	২	০.৮৬	১.৭	-	-	-
মাসকলাই	১৩	০.৮	১০.৪	৩০	০.৯	+ ২৭
মুগ	২০	০.৭	১৪	৫	০.৮	+ ৪
মূল জাতীয় শস্য						
আলু (উফশী)	২৭	১০	২৭০	২৫	১১	+ ২৭৫
আলু (শ্থানীয়)	১২৫	৬.৫	৮১৩	৩২৫	৭	+ ২২৭৫
ওলকচু	-	-	-	১	২০	+ ২০
কাসাভা	১৫	১২	১৮০	১০	১৩	+ ১৩০
(শমুলআলু)	-	-	-	১	২৫	+ ২৫
গাজর	১২	২০.০	২৪০	২০	২০	+ ৪০০
পানি কচু	২৫	২৫.০	৬২৫	২০	২৭	+ ৫৪০
মান কচু	১০	৬০.০	৬০০	২.২	৬২	+ ১৩৬৪
মুখী কচু	১০	৬০.০	৬০০	২.২	৬২	+ ১৩৬৪
মূলা	-	-	-	-	-	-
বীট	-	-	-	-	-	-
শাখ আলু	-	-	-	-	-	-
শালগম	৫০	১৫	৭৫০	৬৫	১৮	+ ১৪৭০
মিস্টি আলু	-	-	-	-	-	-
অন্যান্য	-	-	-	-	-	-
শাকসজি	১	২০	২০	১	২১	+ ২১
ওলকপি	২	৩৫	৭০	১০	৩৭	+ ৩৭০
কলমি/ক্যাংককং	১৫	১০	১৫০	৫০	১১	+ ৫৫০
করলা/উচ্ছে	৩	১০	৩০	২৫	১২	+ ৩০০
কাকরোল	-	-	-	-	-	-
চাইনিজ বাঁধাকপি	২	৭	১৪	৫	৭	+ ৩৫
খিরা	১৫	১৫	২২৫	২৫	১৬	+ ৪০০

www.pathagar.com

চালকুমড়া	৫	১০	৫০	১০	১১	+ ১১০
চিচিঙ্গা	৪	৮	৩২	১০	৮	+ ৪০
ঝিঙ্গা	১০	২০	২০০	৩০	২১	+ ৬৩০
টমেটো	২০	২২	৪৪০	৪০	২৪	+ ৯৬০
ডাটাশাক						

সারণী ৭ক.৮ জনপ্রিয় এবং উল্লেখযোগ্য স্থানীয় জাত ঃ ২

ফসল	জনপ্রিয় এবং উল্লেখযোগ্য স্থানীয় জাত	জমির পরিমাণ (হেঃ)		(হেক্টর প্রতি ফলন (টনে)		অন্যান্য গুণাগুন/বিশেষত্ব
		বর্তমানে	১০ বৎসর পূর্বে	বর্তমানে	১০ বৎসর পূর্বে	
রোপা আমন	বিরই	-১১২০	২৫০০	২.০	১.৮	সুগন্ধী চিকন চাল ও বেশী পানিতে জন্মে
	পাইনল	-১১২০	২৩০০	+ ৩.০	২.৪	
	কুমরী	-৪৮০	১০০০	+ ২.৫	১.৮	
	কালজিরা	+ ৫৬০	৪০০	+ ১.৮	১.৪	
	তুলশী মালা	+ ৬৪০	৩৮০	+ ১.৫	১.৩	

সারণী ৭ক.৯ সার ও বীজ ডিলার/উৎপাদনকারী

বিবরণ	উপজেলা সদরে	সকল ব্লকে (উপজেলা সদর বাদে)	মোট
বিসিআইসি সার ডিলারের সংখ্যা	২	৮	১০
পাইকারী সার ব্যবসায়ীর সংখ্যা	-	-	-
খুচরা সার ব্যাবসায়ীর সংখ্যা	৫	১৫	২০
গুটি ইউরিয়া সার প্রস্তুতকারীর সংখ্যা	-	-	-
বীজ ডিলারের সংখ্যা	১	-	-
বীজ উৎপাদনকারীর সংখ্যা	-	-	-
পাইকারী বালাইনাশক ব্যবসায়ীর সংখ্যা	৩	-	-
খুচরা বালাইনাশক ব্যবসায়ীর সংখ্যা	৫	১৫	২০

www.pathagar.com

সারণী ৭ক.১০ কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ঃ

যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	ঘন্টায় কতটুকু জমি চাষ করে/জমির ধান মাড়াই করে	একর প্রতি ভাড়া (টাকা)
পাওয়ার টিলার	১৪০	১ একর	৪০০/-
প্যাডেল থ্রেসার	৩২	০.৫ একর	১০০/-

সারণী ৭ক.১১ প্রযুক্তি ভিত্তিক স্থাপিত প্রদর্শনীর সংখ্যা

ফসলের	ফসল	প্রযুক্তির বিবরণ	প্রদর্শনীর সংখ্যা	মন্তব্য
গ্রুপ/উপকরণ	ধান	মাটির উর্বরতা ও সার ব্যবস্থাপনা	২২	
দানা জাতীয়	গম	ঐ	৩	
সবুজ সার	ধৈঞ্চা	ঐ	৩	

সারণী ৭ক.১২ নার্সারী ও ফল বাগান

বিবরণ	সংখ্যা	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	কোন উপজেলায় সর্বাধিক
সরকারী নার্সারী	১	.০৪	১.০	
বেসরকারী নার্সারী	৫		১.০	
এনজিও এর নার্সারী	-		-	
বন বিভাগীয় নার্সারী	১		০.৫	
বাণিজ্যিক ভিত্তিক ফল বাগান	-		-	
আম	৫		০.০৮	
লিচু	-		.০১	
পেয়ারা	২		-	
নারিকেল	-		.০৫	
লেবু	৪০		.০৫	
কাঁঠাল	২০		.০৫	
কলা	১০		.০৫	
আনারস	১০	.৩২	১.৫	
অন্যান্য	-			
মোট	৯৪			

www.pathagar.com

সারণী ৭ক.১৩ কৃষি যন্ত্রপাতি বিক্রয় ও মেরামত কারখানা

বিবরণ ট্রাক্টর	বিক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা	মেরামতের কারখানার সংখ্যা	মন্তব্য
পাওয়ার টিলার	-	১০	
গভীর নলকূপ	-	-	
অগভীর নলকূপ	-	-	
পাওয়ার পাম্প	২	২০	
ট্রেডল পাম্প	২	২০	
রোয়ার পাম্প	-	-	
হ্যান্ড টিউব ওয়েল	২	-	
স্প্রে মেশিন	৪	-	
পেডেল থ্রেসার	২	-	
পাওয়ার থ্রেসার	-	-	
রিপার (কর্তন যন্ত্র)	-	-	
অন্যান্য	-	-	

সারণী ৭ক.১৪ কৃষি ভিত্তিক এনজিও এর তালিকা

এনজিও এর নাম	সদর দপ্তরের অবস্থান	কার্য এলাকা	কতদিন যাবৎ কাজ করেছেন	প্রধানতঃ কি কি কাজ করেন
ব্যাক দুর্গাপুর	দুর্গাপুর	উপজেলাধীন	২ বৎসর	বীজ, চারা বিতরণ
ওয়ার্ল্ড ভিশন	ঐ	ঐ	১ বৎসর	ঐ
ডি.এস.কে	ঐ	ঐ	১ বৎসর	সবজি বীজ বিতরণ

সারণী ৭ক.১৫ বৃক্ষ রোপন (২০০২-২০০৩)

ফলজ/কাঠ জাতীয়	রোপনকৃত রুরে সংখ্যা	এক বৎসর পর কতটি বেঁচে আছে (%)	প্রধান ৫ প্রকার গাছের নাম	মন্তব্য
ফলজ	৫৯৮০	৭০	আম, কাঠাল, পেয়ারা, জাম, লিচু,	
কাঠ জাতীয়	১১৮২৫	৮৫	লেবু, জলপাই, জাম্বুরা ও বেল	
অন্যান্য	২০৫৪	৯০	সুন্দরী, মেহগনি, রেইনট্রি, গামারী,	
মোট	১৯৮৬০		নিম, অর্জুন, আমলকী, হরিতকী	

www.pathagar.com

সারণী ৭.১৬ প্রধান প্রধান শস্য ও শস্য বিন্যাস ঃ

শস্য বিন্যাস	জমির পরিমান (হেক্টর)	শতকরা হার
বোরো-পতিত-পতিত	৯,৩২৬.০০	৩৩%
বোরো-পতিত-রোপা আমন	১১,৩০৫.০০	৪০%
সরিষা-বোরো-রোপা আমন	১,৯৭৮.০০	৭%
গম-পতিত-রোপা আমন	২,৮২৬.০০	১০%
গম-আউশ-রোপা আমন	২,৮২৬.০০	১০%
মোট-	২৮,২৬৩.০০	

সারণী ৭.১৭ প্রধান প্রধান ফসলের নাম, আবাদকৃত এলাকা, উৎপাদন, ফসলের নিবিড়তা, ফসলের মূল্য

ফসলের নাম	আবাদকৃত এলাকা (হেঃ)	উৎপাদন (মে.টন)	ফসলের মূল্য (প্রতি কেজি)	ফসলের
বোরো (উফশী)	১৩,৩০০.০০	২.৮৭	১৩.০০ টাকা	নিবিড়তা
বোরো (স্থানীয়)	৩,৬০০.০০	১.৫৩	১২.০০ টাকা	
রোপাআমন (উঃ)	৫,৫০০.০০	২.৬৭	১৩.০০ টাকা	
রোপা আমন (স্থাঃ)	৭,৫০০.০০	১.৪৬	১২.০০ টাকা	
আউশ (উফশী)	১,০৬০.০০	১.৯৫	১২.০০ টাকা	
আউশ (স্থানীয়)	৯৪৫.০০	১.১০	১১.০০ টাকা	
গম	৪০০.০০	১.৯৫	৮,০০ টাকা	
সরিষা	১,১০০.০০	০.৮৫	২০.০০ টাকা	
বাদাম	৪৪০.০০	১.৬০	২০.০০ টাকা	
আলু	১,৫০.০০	১০.০০	৮.০০ টাকা	
মিষ্টি আলু	৩০০.০০	৯.০০	৩.০০ টাকা	১৭৮%
তরমুজ	৫০০.০০	৪০.০০	৫.০০ টাকা	
পাট	৩৫০.০০	৬.০০	৭.৫০ টাকা	
মরিচ	১০০.০০	১.০০	৮০.০০ টাকা	
আনারস	৩০০.০০	২০.০০	৩.০০ টাকা	
মিষ্টি কুমড়া	২৮০.০০	১০.০০	২.০০ টাকা	
বেগুন	২০০.০০	২০.০০	১০.০০ টাকা	
কলা	৫০০.০০	১৫.০০	৮.০০ টাকা	
কাঁঠাল	২৫০.০০	১৫.০০	৫.০০ টাকা	

www.pathagar.com

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সারণী ৭ক.১৮ যোগাযোগ

পথের নাম	দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)	ঢাকা হতে সরাসরি সংযোগকৃত উপজেলার নাম		
		রেল পথ	বাস পথ	জল পথ
রেল পথ	-	-	-	-
পাঁকা রাস্তা	৩০	-	দুর্গাপুর	-
ইট বিছানো রাস্তা	৪০	-	-	-
কাঁচা রাস্তা	২০০	-	-	-
জল পথ	৩৫	-	-	-

উৎস : উপজেলা প্রশাসন, ২০০৫

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

ইংরেজ শাসন ও শোষণ বিরোধী আন্দোলন

সার সংক্ষেপ

এদেশের মানুষের অপূর্ব মুক্ত চেতনা ও দেশ প্রেম তাদেরকে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। দীর্ঘদিনের সুক্ষ্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে সুকৌশলে ইংরেজরা প্রথম ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী হিসেবে এ দেশে আগমন করে বাণিজ্য করার জন্য। পরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে ইংরেজরা এ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুট, ব্যবসা বানিজ্য, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে। ইংরেজদের প্রতিটি আচরণ ও দেশের সম্পদ লুটের বিষয় এদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠী অতি সহজেই উপলদ্ধি করতে পেরেছিল। যথাসময়ে সোচ্চারও হয়ে উঠেছিল। তাই ইংরেজ বেনিয়াদের সমুচিত জবাব ও শাস্তি দেয়ার জন্য সন্যাসী বিদ্রোহসহ বিভিন্ন সামাজিক অন্দোলন ও কঠোর বিদ্রোহের বিস্ফোরণ ঘটেছিল।

দেশের অন্যান্য এলাকার ন্যায় রাজস্ব আদায়ে জমিদারদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল নেত্রকোণা অঞ্চলের জনগোষ্ঠীও। এর প্রতিবাদে গড়ে উঠেছিল হাতি খেদা আন্দোলন, টংক আন্দোলনসহ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিরোধ। এমনকি প্রতিবাদে নারীরাও পিছিয়ে ছিল না। এসব সামাজিক আন্দোলনে অনেকে আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম সুসাদ দূর্গাপুরের সংগ্রামী নারী রাশমনি হাজং। জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার অপর নাম তেভাগা আন্দোলন ।

এদেশের শোষণের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনের পাশাপাশি রাজনৈতিক আন্দোলন ও ভীষণভাবে সংগঠিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক রাজনীতিগুলি কিভাবে সংগঠিত হয়েছিল এ বিষয়ে ও এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। নেত্রকোণা অঞ্চলের সর্বভারতীয় কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস, মুসলিম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি ও আওয়ামী লীগ সংগঠিত হবার ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। সর্বোপরি পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের মানুষ কিভাবে মুক্তি সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছিল এ বিষয়ে ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মুক্তি সংগ্রামে এ অঞ্চলের সরকারী আমলা, প্রশাসন ও সাধারণ জনগোষ্ঠীর সাথে সমভাবে, সোচ্চার ও প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেও এ অঞ্চলের নারী সমাজ সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিলেন। তারা দলে দলে কংগ্রেসে যোগ দেন এবং গোপনে বিপ্লবীদের সহায়তা করেন।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যার্জনে এদেশের মানুষের প্রাপ্তির বিষয় জরিপের ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে মানব কল্যাণের সকল অধিকার নিশ্চিত করার বিধান রয়েছে। শাসনতন্ত্রে শোষণমুক্ত সমাজ, কৃষক ও কৃষির অধিকার এবং মানুষের মৌলিক চাহিদা ও অধিকারগুলো সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত থাকলে বাস্তবে এর প্রতিফলন ঘটেছে সামান্যই। এ প্রসঙ্গে এই অঞ্চলের কৃতি ব্যক্তিত্বদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেয়া হয়েছে ।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও ফকির বিদ্রোহ

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও ফকির বিদ্রোহ বাংলার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার সূচনাপর্বে এইবিদ্রোহ-দাবানল সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিলো। ময়মনসিংহ উত্তপ্ত এবং প্রকম্পিত হয়েছিলো এই বিদ্রোহের কারণে। সন্ন্যাসী ও প্রাক্তন মোগল সৈন্যগণ বিদ্রোহী কৃষকদের দলে যোগ দিয়ে 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নামে এক সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত ও সম্পাদন করেন। বিহার ও বাংলাদেশের ফকির সন্ন্যাসীগণ ইংরেজ বেনিয়াদের শোষণ ও নির্যাতনে ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের প্রতিরোধ ও রুখে দাড়াঁবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ইংরেজ বেনিয়াদের সমুচিত জবাব ও শাস্তি দেওয়ার জন্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও ফকির বিদ্রোহ রুদ্ররোষে ফেটে পড়েছিলো।

সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে মীর কাসিমের মৃত্যুর পর ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহারের দেওয়ানী গ্রহণ করে চরম প্রজাশোষণ শুরু করে। তারা শোষণের নানা কলা-কৌশল প্রয়োগ করতে থাকে। ফলে, সর্বস্তরের মানুষের জীবনে চরম দুর্ভোগ ও নির্যাতন নেমে আসে। শুধু ইংরেজ বেনিয়াদের অত্যাচার নির্যাতন নয়, ইংরেজদের নির্যাতনের সঙ্গে যোগ হয় দেশীয় জমিদার ও মহাজনদের নির্যাতন। দেনার দায়ে মহাজনদের কাছে, জমিদারদের খাজনা না পাওয়ায় কৃষক ও কারিগরদের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো হয়। কৃষক ও কারিগরগণ সর্বস্বান্ত ও বাস্তভিটাহীন হয়ে পড়ে। কঠোর জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি কৃষক ও কারিগরগণ বাঁচার তাগিদে দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠনকার্যে লিপ্ত হতে বাধ্য হন। ফলে স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও ইংরেজ শাসকেদের সঙ্গে সংঘর্ষ বেঁধে যায় কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষদের। কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষগণ জমিদার ও মহাজনদের খাদ্যগুদাম ও সঞ্চিত অর্থভান্ডার লুট করতে থাকে। এতে করে, কৃষকদের সঙ্গে জমিদার, মহাজন ও ইংরেজদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এসব বাংলার ফকির সন্ন্যাসীগণ বিদেশী বেনিয়াদের শোষণ নির্যাতনের সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্যে এবং শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিশাল মোগল বাহিনীর বিধ্বস্থ- একটা অংশ বেকার অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল। জীবিকার কঠিন তাগিদে তারা নাশকতামূলক

www.pathagar.com

কার্যকলাপ ও হীনলিপ্সায় লিপ্ত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সশস্ত্র হামলা ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে তারা দিনাতিপাত করছিল।

সময়ের প্রয়োজনে সন্ন্যাসী ও প্রাক্তন মোগল সৈন্যগণ বিদ্রোহী কৃষকদের দলে যোগ দেন। এভাবেই ভিত্তি গড়ে ওঠে সশস্ত্র সংগ্রামের। এই সংগ্রাম 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নামে পরিচিতি লাভ করে। বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন জায়গায় এই সংগ্রাম দিনে দিনে ব্যাপ্তি লাভ করে। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে এই বিদ্রোহ ঘনীভূত হতে থাকে। ইংরেজ শাসকগণ স্বাভাবিকভাবেই শংকিত হয়ে পড়ে এবং অনেক যুদ্ধে তারা পরাজিতও হয়। জান-মালের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয়। কোনো কোনো জায়গায় রাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামো ভেঙ্গে যায়। বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে পাটনা। পাটনরার আশে-পাশের ইংরেজ কুঠিগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বন্ধকরে দেয়া হয় ইংরেজ শাসকদের রাজস্ব আদায়। জমিদারগণও কুপোকাৎ হয়ে পড়ে। লুটপাট করা হয় তাদের ধন-সম্পদ। বারবার পরাজিত হতে থাকে ইংরেজবাহিনী। স্বাভাবিকভাবেই বিচলিত হয়ে পড়েন গভর্ণর লর্ড হেস্টিংস। কয়েকটি দুর্গও বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায়। এদিকে বগুড়া ও দিনাজপুর জেলায় বিদ্রোহীদের দুটি ঘাঁটি স্থাপিত হলে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে। বিদ্রোহের স্বরূপ উপলব্দি করার জন্যে দিনাজপুরের বিদ্রোহীদের একটি বৃহৎ দলের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে পাঁচ হাজার বিদ্রোহীর সমন্বয়ে একটি দুর্ধর্ষ সন্ন্যাসী দল গঠিত হলে ইংরেজ সৈন্যগণ প্রমাদ গুণে। ভীতসন্ত্রস্ত- হয়ে পড়ে ইংরেজ সৈন্যগণ। দিনাজপুর মহারাজার অনুরোধে বিশাল ইংরেজবাহিনী কামানও অস্ত্রসহ দিনাজপুরে প্রবেশ করে। বিদ্রোহীগণ খণ্ড খণ্ড দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারা দাবানলের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে অত্যাচারী জমিদারগণ ভীতসন্ত্রস্ত- ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। বিদ্রোহীগণ জমিদার-মহাজনদের ধন-সম্পদ নির্বিচারে লুণ্ঠন করতে থাকে। এ সময়ই ময়মনসিংহ জেলার বিদ্রোহীদের সঙ্গে দিনাজপুর জেলার বিদ্রোহীদের একটি দল মিলিত হয়। ভাবের আদান-প্রদান হয় এবং রক্ষণকৌশল নির্ধারণ করা হয়। দিনাজপুর ও বগুড়ার বিদ্রোহীদের সঙ্গে নিয়মিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ময়মনসিংহের বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ এভাবেই আরও প্রবল আকার ধারণ করতে থাকে।

ময়মনসিংহে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ এক পর্যায়ে বিপ্লবে রূপ নেয়। প্রচুর রক্তক্ষয় হয়। জমিদারী-মহাজনী লুণ্ঠন ব্যবস্থায় ময়মনসিংহ এমনিতেই ত্রাসের রাজত্বে পরিণত হয়। বিদ্রোহ গণবিদ্রোহের পর্যায়ে রূপ নেয়। বিদ্রোহী টিপুশাহ পাগলের নেতৃত্বে বৃহত্তর ময়মনসিংহে বিশাল ফকির বিদ্রোহ শুরু হয় এবং স্বঘোষিত শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয় শেরপুর ও বৃহত্তর ময়মনসিংহের কোন কোন এলাকায়। এমনিতেই শেরপুরের জমিদারদের

www.pathagar.com

অত্যাচারে জনগণের প্রাণ ছিলো ওষ্ঠাগত। ফলে, টিপু পাগলের নেতৃত্বে ফকির বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে। শেরপুরের জমিদার ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের ধনসম্পদ নির্বিচারে লুণ্ঠিত হতে থাকে। শেরপুর ও বৃহত্তর ময়মনংিহের যে সব জায়গায় স্বশাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিলো, তা দু'বছর পর্যন্ত - চালুছিলো। এ প্রসঙ্গে শেরপুরের সে সময়ের উচ্চ কোটি গোষ্ঠির পন্ডিত রামনাথ বিদ্যাভূষণের রচনায় আলোচ্য অভিনব শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

'বকসু আদালত করে দ্বীপচান ফৌজদার কালেক্টর সরকার গুমানু সরকার'। ১৮২৫ সালের দিকে পন্ডিত রামনাথ বিদ্যাভূষণ এ মন্তব্য করেছিলেন। এ মন্তব্য থেকে সে সময়ের অবস্থা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়। এমনিতর পরিস্থিতিতে বৃহত্তর ময়মনসিংহের আইন-শৃংখলা এবং শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শেরপুরের গুরুত্ব স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে যায়। বিশৃংখল অবস্থা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে ইংরেজ সরকার অনেক আগেই দমননীতি অনুসরণ করে। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে কালীগঞ্জে (পুরাতন শেরপুর বাজার) ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট এবং বিদ্রোহীদের দমন ও ছত্রভঙ্গ করার জন্যে শেরপুরে সেনাছাউনী স্থাপন করেন। মিঃ ম্যাক্সওয়েল (মেকসুল) কালীগঞ্জে প্রথম জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।

কৃষকবিদ্রোহ তথা ময়মনসিংহে গণপন্থী ফকির বিদ্রোহের প্রধান নেতা টিপুশাহ পাগলকে ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রেফতার করা হয়। দেওয়ানী আদালতে তাঁর বিচার হয়। বিচারে টিপুশাহ পাগলকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, ১২৫৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে কারাগারে টিপুশাহ পাগলের মৃত্যু হয়।

গাজীপুর জেলার ভাওয়ালগড়ে ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্রোহীদের একটি শক্তিশালী আস্তানা গড়ে ওঠে। ফকির মজনুশাহ ছিলেন এই বিদ্রোহীবাহিনীর নেতা। এই আস্তানা থেকেই বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের অনেক জায়গায় ইংরেজ কুঠিগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অভিযান পরিচালিত হয়। বলাবাহুল্য, এ অভিযান ছিলো সাফল্যজনক। অভিযানে স্থানীয় জমিদারদের কাছারীগুলোও লুণ্ঠিত হয়। অত্যাচারী মহাজন ও জমিদারদের নিকট থেকে বলপূর্বক রাজস্ব আদায়ের কাজটিও চলতে থাকে এসময়। বিদ্রোহীগণ কোনো অবস্থাতেই সাধারণ মানুষদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে না। বরং, তাদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করে। তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারটিও সন্ন্যাসী-ফকিরগণ বিশেষভাবে নিশ্চিত করেন। ইংরেজ বণিকদের ও ইংরেজ সরকারের অনেক দেশীয় কর্মচারীদের সমর্থন লাভ করেন সন্ন্যাসী ও ফকিরগণ।

তখন ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দ। বগুড়ায় নিজস্ব ঘাঁটিতে বসে আছেন মজনুশাহ। এসময় খবর আসে যে, ইংরেজদের একটি বিশাল বাহনী লটবহরসহ আসছে। মজনুশাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ এড়ানোর ব্যাপারটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করলেন। এজন্যে তিনি করতোয়া নদী

www.pathagar.com

পার হলেন। ময়মনসিংহ জেলার সীমানা ছাড়িয়ে হাজির হলেন ভাওয়ালগড়ের নিকটবর্তী। স্থাপন করলেন ঘাঁটি ব্রহ্মপুত্রের তীরে। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে ১৪ নভেম্বর একটি ইংরেজ সৈন্যদল অতর্কিতে মজনুশাহের শিবিরের দিকে নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সদলবলে মজনুশাহ ভাওয়াল জঙ্গলে পালিয়ে যান। ইংরেজবাহিনীও মজনুশাহর পিছনে ধাওয়া করে এবং জঙ্গলে প্রবেশ করে। এবারে মজনুবাহিনী ঘুরে ও রুখে দাঁড়ায়। ইংরেজবাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় মজনুবাহিনী। এ লড়াইয়ে অনেক ইংরেজ সৈন্য মারা যায়। ইংরেজ সেনাপতি লেঃ রবার্টসন যুদ্ধে গুরুতর আহত হন এবং নিরুপায় হয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান। ইংরেজবাহিনীও পিছু হটতে বাধ্য হয়। দিশেহারা ইংরেজবাহিনীর এই বেহাল দশা মজনুশাহ ও তাঁর দলবলকে দারুণভাবে উদ্দিপ্ত করে। তবে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মনজুশাহও দলবল নিয়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করেন।

১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে মজনুশাহ এক হাজার সৈন্যসহ বগুড়া থেকে ময়মনসিংহ ও মধুপুর জঙ্গলে হাজির হন। মজনুশাহ মধুপুর গড় ও মধুপুরগড়ের নিকটবর্তী এলাকা ঘুরে এসে বিদ্রোহীদের সাথে মত বিনিময় করেন। এরপর উত্তরাঞ্চল হয়ে উত্তর বাংলায় গমন করেন।

ময়মনসিংহ তথা ভাওয়ালগড় অঞ্চলে মজনুশাহ এসেছেন শুনে গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস তাঁর সেনাপতি ও কালেক্টরকে উদ্দেশ্য করে মন্তব্য করেন ঃ
"আমরা আবার জাফরশাহী পরগণায় (ময়মনসিংহ) মজনুর উপস্থিতির সংবাদ পাচ্ছি। আমরা প্রতিবছর এ লোকটার উৎপাত আর সহ্য করতে পারি না। শুনতে পাচ্ছি লোকটা নাকি ব্রহ্মপুত্রের উপর বহাল তবিয়তে বসবাস করছে। আর প্রতিবছর কোম্পানীর জেলাগুলো পুড়িয়ে ভস্মিভূত করে দিচ্ছে। এ অঞ্চলের কেউ তাকে বাঁধা দিতে পারে না। লর্ড হেস্টিংসের এধরণের মন্তব্য শুনে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মজনুশাহ বাহিনীর প্রতি তাঁর মনোভাব কতোটা বিরূপ ছিলো। ইংরেজদের কয়েকটি সেনাদল মজনুশাহকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে অকুস্থলে এসে হাজির হয়। কিন্তু, এর আগেই অর্থাৎ ইংরেজ সেনাদল ময়মনসিংহে এসে পৌঁছার আগেই মজনুশাহ তাঁর দলবল নিয়ে মালদহে পৌঁছেন।

ময়মনসিংহে যে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ হয়, তা ইংরেজ শাসক-শোষক ও মজিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিলো। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, জনস্বার্থে এই বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিলো এবং এক পর্যায়ে তা বিপ্লবে রূপ নেয়। বাংলার মানুষের মধ্যে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার চেতনা সঞ্চারে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ যেমন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিলো, তেমনি ময়মনসিংহবাসীর স্বার্থেও সন্ন্যাসী এবং ফকির বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিলো এবং একপর্যায়ে তা বিপ্লবে রূপ নেয়।

www.pathagar.com

নেত্রকোণার সামাজিক প্রেক্ষাপট

চেতনা কোন বস্তু নয়। তাই চেতনা দেখা সম্ভব নয়, যা স্পর্শ করা যায় না, শুধু হৃদয় দিয়ে চেতনাকে উপলব্ধি করতে হয়। তবে বস্তু জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে আবার চেতনার অবস্থান হয়না। তাই পলাশীর যুদ্ধোত্তর ফকির বিদ্রোহ থেকে শুরু করে গণ-মানুষের সকল আন্দোলন-সংগ্রাম-লাড়াইয়ের ময়দান থেকে উপলব্ধি করতে হবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে। আর এই চেতনা বিষয়ক বাস্তব উপলব্ধি ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থহীন। চেতনার প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে বাঙালী জাতি সত্তার মৌলিক স্বরূপ নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন। বাঙালী একটি শংকর জাতি। অনার্য জনগোষ্ঠী ও মোঙ্গলীয় বংশোদ্ভুত আদি জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার কর্মপ্রবাহে কামরূপীয় তান্ত্রিক চিন্তা, বৌদ্ধ ধর্মীয় চর্চা, একাদশ শতকের গোড়ার দিকে পূর্ব ময়মনসিংহের উদার উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিমন্ডলে ইসলামের সুফীবাদ, বৈষ্ণব চেতনার প্রভাব ও বল্লালী কৌলিণ্যের যৌগিক প্রবাহে ও সংমিশ্রণে বাঙালী জাতিসত্তার অন্তর্ভূক্ত নেত্রকোণায় জনসমাজের বিকাশ। প্রকৃত অর্থে ইসলাম ও আর্য সমাজের বল্লালী কৌলিণ্যের আগমনের বহু পূর্বে আদি জনগোষ্ঠীর কর্ম প্রবাহের সংগে বৈষ্ণব ভাবাদর্শের ও বৌদ্ধ ধর্মীয় চিন্তা চেতনার সংগে কামরূপীয় তান্ত্রিকতার সংমিশ্রণে নেত্রকোণার জনগোষ্ঠীর শংকর জাতীয় ভ্রূণটির জন্ম। যার সত্যতা প্রমাণিত হয় ময়মনসিংহ গীতিকার পালাগীতি গুলোর ভাষায় ও চরিত্রে এবং বাংলা ভাষার স্বরূপ সন্ধান মূলক ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের দ্ব্যর্থহীন উক্তিতে। তাই বাঙালী জাতিসত্তার উপর ইসলামের শরীয়তি মতবাদ ও হিন্দু ধর্মের ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের কয়েকশত বৎসর পূর্বেই বাঙালী জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটে। ফলে এই সব বিচার বিশ্লেষণকে দূরে রেখে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বরূপ অন্বেষণ আদৌ সম্ভব নয়। আবার ইসলামের সুফী মতবাদের সংগে কামরূপীয় তান্ত্রিক মতবাদ একীভূত হয়ে চেতনার জগতে এক মানবতা বোধের জন্ম দেয়। মানবতাবোধের অমিয়ধারায় সৃষ্ট মহুয়া-মলুয়া-মদিনার চরিত্র। তাছাড়া আদি জনগোষ্ঠীর প্রকৃতির সংগে সহাবস্থানের প্রবণতায় সৃষ্ট প্রকৃতি পূজা ও প্রকৃতিকে বসবাস উপযোগী করে গড়ে তোলার নিরলস সংগ্রামের ধারবাহিকতা বাঙালী জনগোষ্ঠীর আদি ভ্রূণের জন্মের নিয়ামক শক্তি। তাই এই শংকর ধর্মীয় বাঙালী জাতিসত্তাকে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃষ্টান, আর্য, অনার্য, মোগল, পাঠান, শেখ, সৈয়দ হতে পৃথক করে চিন্তা করার অর্থ হলো জাতিসত্ত্বাকে অস্বীকার করার নামান্তর। প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন পূর্বক বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে মানুষের নামের সংগে যুক্ত ইত্যাকার উপাধি সমূহ বর্জন করা যেতে পারে। বিশ্ব ব্যবস্থার পরিবর্তনের সংঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তালুকদার, চৌধুরী, ভূঁইয়া, চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য, দত্ত, মজুমদার, রায়, বসু, মিত্র ইত্যাকার বিশেষণ বর্জন আজ জরুরী। ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর বিদায়ের দীর্ঘ সময়পরেও খান সাহেব, খান বাহাদুর, রায় সাহেব, রায় বাহাদুর উপাধি সমূহের সংরক্ষণ জাতির জন্য কলংক বৈ কিছু নয়। মনে রাখা উচিত মৌলবাদ শুধু ধর্মীয় গোড়ামীপনা নয়। (গোলাম এরশাদ, ১৯৯৫)

www.pathagar.com

অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন ১৯০৯ সনে নেত্রকোণার গনচেতনা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তখন ১৯০৯ সনে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের জন্য ময়মনসিংহের বিশেষ ব্যক্তিত্ব শ্যামাচরণ রায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। এই বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নেত্রকোণার রাজনৈতিক চেতনা প্রসার লাভ করে। কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় নেত্রকোণার সর্বত্র দ্রুত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু হয়। কংগ্রেস নেতৃত্ব অবশ্য এই দায়দায়িত্ব কখনো গ্রহণ করে কথা বলতে যায়নি। নেত্রকোণায় কংগ্রেস রাজনীতির প্রসারে আরো যাদের অবদান শ্রদ্ধার সংগে স্বীকার করতে হয় তারা হলেন উপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, ক্ষিতীশ চন্দ্র সরকার প্রমুখ। তাদের সবাই অসহযোগ আন্দোলনের জন্য দীর্ঘ সময় কারাবরণ করেন। নেত্রকোণার প্রায় অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা কর্মী গোপনে অনুশীলন নতুবা যুগান্তর সমিতির সংগে যুক্ত ছিলেন। নেত্রকোণা জেলার ফরোয়ার্ড ব্লক, কৃষক প্রজা পার্টি, স্বরাজ পার্টিও সকল নেতা কর্মী পূর্বে কংগ্রেসের সংগে কাজ করেন। অনুশীলন ও যুগান্তর দল থেকে অসংখ্য বিপ্লবী ১৯৩০ সনে নেত্রকোণা কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হলে, কমিউনিষ্ট পার্টিতে চলে যান। কংগ্রেস ছিল সকলের একটি প্ল্যাট ফর্ম।

নেত্রকোণা মহকুমা কংগ্রেস সম্পাদক খালিয়াজুরী থানার খলাপাড়া গ্রামের গৌরক্ষী প্রসাদ রায়ের পুত্র গিরিজা নাথ রায় ছিলেন এক কিংবদন্তীর নায়ক। আইন পেশা পরিত্যাগ করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিলেতী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করেন। তার নেতৃত্বে নেত্রকোণার সর্বত্র জুয়া, মদ বন্ধের আন্দোলন পরিচালিত হয়। তিনি দীর্ঘদিন মহকুমা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। গিরিজা নাথ রায় ১৯৬৫ সনে মৃত্যু বরণ করেন।

অমর চন্দ্র চক্রবর্তীও পর ১৯৩০ সনে শ্রী চন্দ্র ধর গুপ্ত মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। নেত্রকোণা মহকুমা কংগ্রেসের রাজনীতেতে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন বারহাট্টা থানার রায়পুর গ্রামের বনেদী সামন্ত পরিবারের সন্তান মহেন্দ্র চন্দ্র মজুমদারের পুত্র জ্ঞান মজুমদার। তিনি অলইন্ডিয়া কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের অন্যতম নেতা হিসেবে সর্বত্র বিচরণ করতেন। জ্ঞান চন্দ্র মজুমদার বিভিন্ন মেয়াদে ময়মনসিংহ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সনে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ফলে ত্রিশের দশক থেকে দীর্ঘ সময় ব্যাপী নেত্রকোণার কংগ্রেস রাজনীতিতে জ্ঞান চন্দ্র মজুমদারের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। ১৯৪৫ সনে ফরোয়ার্ড ব্লকের আত্ম প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত দলীয় রাজনীতিতে নেত্রকোণায় কংগ্রেসের রাজনীতির ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান ছিল। শ্রী জ্ঞান চন্দ্র মজুমদার ১৯৭০ সনে মৃত্যু বরণ করেন।

www.pathagar.com

নেত্রকোণা থানার ঠাকুরাকোণার প্রকৌশলী শ্রী কান্তি মজুমদার ময়মনসিংহের জেলা বোর্ডের চাকুরী ত্যাগ করে নেত্রকোণায় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং ১৯২১ সনের স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। কেন্দুয়া থানার মদনপুর ইউনিয়নের মনাং গ্রামের গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচর্য মহাশয়ের পুত্র প্রতুল চন্দ্র ভট্টাচার্য নেতাজী সুভাষ বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত কলিকাতা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ডেপুটি লিডার ছিলেন। তিনি জীবনে বহু বার কারাভোগ করেন। নেত্রকোণায় কংগ্রেস সংগঠনে তার যথেষ্ট অবদান ছিল। মদন থানার বাড়রী গ্রামের যতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ছিলেন একজন সাংবাদিক ও কংগ্রেস সংগঠক। তিনি ১৯২১ সনের অসহযোগ এবং ১৯৩১ সনে আইন অমান্য আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। নেত্রকোণার কংগ্রেস রাজনীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৯৩৯ সনে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রবসুর আগমন। নেতাজী সেই সময়ে ১৫ই মার্চ বর্তমান মেথরপট্টী ময়দানে এক ঐতিহাসিক জন সভায় ভাষণ দান করেন।

ফরোয়ার্ড ব্লক গঠিত হবার পর নেত্রকোণায় কংগ্রেসে ঝিমিয়ে পড়ে। সর্বশেষ পর্যায়ে বারহাট্টা থানার রায়পুর গ্রামের মিহির মজুমদারকে কংগ্রেসের কথা বলতে শোনা যায়। নেত্রকোণার কংগ্রেস রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্ষিতিশ চন্দ্র সরকারের অবদান অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদানের পূর্বে বিশের দশকে তিনি নেত্রকোণা মহকুমা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯২১ সনের অসহযোগ আন্দোলনে তার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। নেত্রকোণার কতিপয় মহিলা প্রকাশ্যে কংগ্রেস দলের সংগে যুক্ত থেকে গোপনে বিপ্লবীদের সহায়তা করেছেন বলে শোনা যায়। সেক্ষেত্রে গিরিজা নাথ রায়ের স্ত্রী সরোজনী রায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য ঐতিহাসিক আঠার বাড়ী ট্রেইন এ্যাকশনের কতিপয় অংশ গ্রহণকারী বিপ্লবী সন্তান এ্যাকশন শেষে রাত্রে এসে গিরিজা বাবুর বাসায় আশ্রয় নেয়। কিন্তু গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভোরে পুলিশ বাসায় হানা দেয়। তখন সরোজনী রায় বাসার সম্মুখে গোবর পানি ছিটিয়ে প্রাত কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে পুলিশ দীর্ঘক্ষণ বাসায় ঢুকতে পারেনি। তিনি পুলিশের সাথে সাহসিকতার সংগে তর্কে লিপ্ত হয়ে যান। ইত্যবসরে বিপ্লবীরা অন্যত্র সরে যেতে সক্ষম হয়। এইভাবে ঐতিহাসিক আঠার বাড়ী ট্রেইন এ্যাকশনের বিপ্লবীদের রক্ষা করেও উক্ত মহীয়সী রাজনীতিতে অবদান রাখেন।

দেশ বিভাগ কালে নেত্রকোণা মহকুমা কংগ্রেসের সর্বশেষ সভাপতি ছিলেন বাবু অমর চন্দ্র চক্রবর্তী এবং সাধারন সম্পাদক বাংলা গ্রামের শ্রী মনোরঞ্জন সিংহ ওরফে নকুল সিংহ ছিলেন বাংলার খ্যাতিমান জোতদার। নকুল সিংহ ১৯৩৩ সনে দত্ত হাই স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করার পর কলিকাতা বসত গড়ে তোলেন।

www.pathagar.com

সুসং দূর্গাপুরের রাজপরিবার ছাড়াও নেত্রকোণা অঞ্চলে গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের জমিদারী বিদ্যমান ছিল। তাদের কাচারী বাড়ীটি আজো মেছুয়া বাজারের নিকটে গৌরীপুর কাচারী নামে খ্যাত। যদিও বা বর্তমানে এটি নেত্রকোণা পৌর তহশীল অফিস। ব্রজেন্দ্র বাবুর অমর কীর্তি হলো স্বীয় মাতা বিশেশ্বরী দেবীর নামে খননকৃত নিউটাউনের "বিশেশ্বরী পুকুর"। যা বর্তমানে বড়পুকুর নামে খ্যাঁত। স্ত্রী অনন্ত বালা দেবীর নামে খনন করেন। নিউটাউনের অনন্ত সাগর। যা নিউটাউনের ছোটপুকুর নামে খ্যাত। গৌরীপুর ছাড়াও কালীপুর লাহেড়ী পরিবারের কাচারী ছিল বর্তমান হলি চাইল্ড কিন্ডার গার্টেন ভবন। সাতপাই ছিল রামগোপারপুরের কাচারী। মুক্তাগাছার সূর্যকান্ত আচার্য বাহাদুরের কাচারী ছিল বর্তমান সাতপাইস্থ কে,জি স্কুল ভবন। এই সব পরিবার বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে গোপনে অর্থ সাহায্য করতেন বলে প্রকাশ। কংগ্রেস ছিল তাদের আশীর্বাদ পুষ্ট দল। (গোলাম এরশাদ, ১৯৯৫)।

মুসলিম লীগ

ভারতব্যাপী পরিচালিত ১৯৩১ সনের আইন অমান্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯৩৬ সনে নেত্রকোণায় প্রথম মহকুমা মুসলিম লীগ কমিটি গঠিত হয়। প্রথম কমিটিতে অজহর রোড বাসিন্দা মোহনগঞ্জ থানার শহিলদের গ্রামের খান বাহাদুর কুবীর উদ্দিন খান উকিল সভাপতি এবং আবুল উদ্দিন আহমেদ মোক্তার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সনের দেশ বিভাগের পর মুসলিম লীগ নেত্রকোণায় প্রায় একক সংগঠন হয়ে পড়ে। নেত্রকোণা মহকুমার অসংখ্য সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবার দেশ ত্যাগ করে। বিশেষ করে নেত্রকোণা শহর থেকে অসংখ্য হিন্দু পরিবার চলে যায়। তবে নেত্রকোণা মহকুমার কোথাও কোনরূপ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা সৃষ্টি হয়নি। রাজনৈতিক দল হিসেবে কৃষক প্রজা পার্টি, আর, এস, পি, ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মতৎপরতা স্থাপিত হয়ে পড়ে। কমিউনিষ্ট পার্টি তখন গভীর আত্মগোপনে চলে যায়। ফলে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সন পর্যন্ত রাজনৈতিক মাঠ ছিল মুসলিম লীগের প্রায় একক দখলে। তবে শেরে বাংলা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, মৌলানা ভাসানী, নুরুল আমীন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক ভূমিকা নেত্রকোণার জনমনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। ১৯৪৬ সনের নির্বাচনে আহসান আলী মোক্তার এম,পি নির্বাচিত হন এবং এই নির্বাচনে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কৃষক প্রজা পার্টিও প্রার্থী মোহনগঞ্জ থানার পাবই পাড়ার জনাব সৈয়দ মৌজ আলী চৌধুরী মোক্তার সাহেব।

দেশ বিভাগ পূর্বকাল থেকে মোহনগঞ্জ থানার খান সাহেব আব্দুল আজিজ আহমেদ, আব্দুল আজিজ নায়েব, আবুল হোসেন শেখ বারহাট্টা থানার মাহমুদ আলী, কৈলাটীর আব্বাছ আলী খান, আটপাড়া থানার ইয়াকুব আলী নজমুল শেখ, খালিয়াজুরীর আব্দুল জলিল ওরফে ইদ্রিস মিয়া দূর্গাপুর থানার গুজিরকোণার কিতাব আলী তালুকদার চন্ডীগড়ের আব্দুল খালেক

www.pathagar.com

কলমাকান্দা থানার ছত্রংপুরের মোফাজ্জল হোসেন নেত্রকোণা থানার দেওপুরের ফারুখ আহমেদ মোক্তার, মেদনীর নবী হোসেন তালুকদার, কেন্দুয়া থানার তৈয়ব আলী খন্দকার, সাজিউড়া ইউনিয়নের দীর্ঘদিনের চেয়ারম্যান আমলীতলা গ্রামের মাজহারুল হক মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বৃটিশ শাসনামলে মোহনগঞ্জের খান সাহেব আব্দুল আজিজ আহমেদ নেত্রকোণায় অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৯৪৫ সনে মুসলিম স্টুডেন্টস লীগ প্রতিষ্ঠাকালে কিতাব আলী তালুকদার ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা মুসলিম স্টুডেন্টস লীগের সাধারণ সম্পাদক। মৌলানা মঞ্জুরুল হক সাহেব ১৯৪০ সন থেকে দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত নেত্রকোণা মহকুমা মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় সংগঠক ছিলেন।

কমিউনিষ্ট পার্টি

আটপাড়া থানার বিষ্ণুপুর গ্রামের প্রভাবশালী জোতদার জয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পুত্র ক্ষিতিশ চন্দ্র সরকার ছিলেন নেত্রকোনার কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তিনি অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী কর্মকান্ডে যোগদেন। ফলে হুলিয়া মাথায় নিয়ে দীর্ঘ ৯ বৎসর আত্মগোপনে থাকেন। শোনা যায় ১৯২৭ সনে পলাতক অবস্থায় কমরেড মনিসিংহ-এর সান্নিধ্যে আসেন এবং কমিউনিষ্ট আদর্শে উজ্জীবিত হন এবং জীবনে অসংখ্যবার কারাভোগ করেন। ক্ষিতিশ চন্দ্র সরকার প্রথমে কংগ্রেস সম্পাদক এবং পরবর্তীতে মহকুমা কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন। তখনই তিনি বিপ্লবীদের মধ্যে কমিউনিষ্ট আদর্শ প্রচার শুরু করেন।

১৯৪৫ সনের নেত্রকোণার সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলনের পশ্চাতে ছিল বৃটিশ শাসনামলের আদি পর্বের ফকির বিদ্রোহের চেতনা কৃষক প্রজা পার্টির কৃষক জনতার আর্থ সামাজিক মুক্তি করে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত টংক ও তেভাগা আন্দোলনের লড়াকু ঐতিহ্য। তাই নেত্রকোণা অঞ্চলের কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে টংক ও তেভাগা আন্দোলনের কথা বলতে হয়। কারণ টংক, তেভাগা ও ১৯৪৫ সনের সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলনের ঐতিহ্যের মাঝে আজো জীবন্ত হয়ে আছে নেত্রকোণার কমিউনিষ্ট পার্টিও ইতিহাস। নেত্রকোণার টংক আন্দোলনের প্রধান সংগঠক ছিলেন কমরেড মনিসিংহ। যিনি ১৯২৫ সনে কমিউনিষ্ট পার্টিতে সদস্য হিসাবে যোগদান করেন ১৯৩৭ সনে সদস্য পদ লাভ করেন। সেই সময় ১৯৩৭ সনে কমরেড মনিসিংহ কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর সুসং দূর্গাপুরে নিজ গৃহে পুনঃ অন্তরীণ হন। উনবিংশ শতকের হাতিরখেদা বিদ্রোহের মাটি দুর্গাপুরে তখনো চলছিল জনমনে বিদ্রোহের আগুন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে হাজংদের হাতিরখেদার বেগার খাটুনির প্রতিবাদে হাজং নেতা মনা সর্দারে নেতৃত্বে হাজং বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। জমিদার হাতীর পায়ের নিচে পিষ্ঠ করে হত্যা করে মনা সর্দারকে। তখন বিদ্রোহী হাজংরা জমিদারের হাতীর মাহুত সহ (মাহুত ছিল হাজং) রাজ বাড়ী ঘিরে ফেলে।

www.pathagar.com

জমিদার পরিবার ভয়ে নেত্রকোণায় পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয়। জমিদার তার সুসংগঠিত বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হলে বারোমারি নামক স্থানে রক্তয়ী সংর্ঘষ শুরু হয়। জমিদার বাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়। এই ঐতিহাসিক সংর্ঘষে হাজংনেতা রাতিয়া হাজং, মলঙ্গা হাজং, সুচারু হাজং, বাঘা হাজং ও সোয়া হাজং সহ শতাধিক বিদ্রোহী নিহত হয়।

নেত্রকোণায় টংক আন্দোলন

এই হাজং বিদ্রোহের রক্তের দাগ মুছতে না মুছতেই শুরু হয় টংক প্রথার জমিদারী নির্যাতন। এই টংক ছিল প্রতি ফসলে এক একর জমির জন্য নির্ধারিত ৮ মন ধান খাজনা। ফসল হোক বা না হোক জমিদারের ধান প্রজাকে দিতেই হবে। সেই টংক প্রথা নেত্রকোণা জেলার বর্তমান দূর্গাপুর কলমাকান্দা, পুর্বধলা থানা অঞ্চল সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চালু ছিল। এই টংক প্রথার মাধ্যমে সুসংগের জমিদারগণ বাৎসরিক দুই লক্ষ মণ ধান সংগ্রহ করতেন। ফসল কোনো কারণে নষ্ট হলে পরবর্তী ফসলের মৌসুমে চলতি টংক সহ বকেয়া টংক পরিশোধ করতে হতো। অনেকের মতে টাকার অংকেবর বিকল্প রূপে প্রচলিত এই ধান খাজনাকে টংক নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু যখন টংক আন্দোলন শুরু হয় তখন সোয়া একর জমির টংক ছিল ১৫ মণ ধান। আর ধান ছিল মাত্র ২ টাকা মণ। ফলে সোয়া একর জমির খাজনা দাঁড়ায় নগদ মুল্যে ৩০ টাকা। অথচ তৎকালীণ সময়ে সোয়া একর জমির খাজনা ৭ টাকার উর্ধে হতে পারে না। তার উপর টংক জমি যে কোন মূহূর্তে জমিদার কৃষকের নিকট থেকে কেড়ে নিতে পারতো। জমিদারের এই নিষ্ঠুর শোষণের বিরুদ্ধে স্থানীয় উপজাতিদের মধ্য থেকে ললিত সরকার, বিপিন গুণ, পরেশ সরকার এবং মহিলা নেত্রী রাশমনি আন্দোলনের শপথ নিয়ে বেরিয়ে আসেন। বাইরে থেকে পার্টির নির্দেশে কমরেড মনিসিংহের সহায়তায় দুর্গাপুর আসেন কমরেড প্রথম গুপ্ত ও শেরপুরের কমরেড রবি নিয়োগী।

শ্লোগান শুরু করা হলো।
টংক প্রতার উচ্ছেদ চাই-নইলে এবার রেহাই নাই।
টংক জমির স্বত্ব চাই-নইলে আর রক্ষা নাই।
বকেয়া টংক মওকুফ চাই-জমিদারী উচ্ছেদ চাই।

এই শ্লোগানে আলোড়িত হয়ে উঠলো গোটা টংক অঞ্চল। গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠতে থাকলো কৃষক সমিতি। ১৯৪৩ সনে দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত হলো ময়মনসিংহ জেলা কৃষক সমিতির সম্মেলন। টংক আন্দোলনের ফলে নেত্রকোণার অন্যান্য অঞ্চলেও কৃষক সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। ফলে ১৯৪৩ সনে নালিতা বাড়ীতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শুরু করা হয় তেভাগা আন্দোলন। টংক ও তেভাগা চরিত্রগতভাবে এক ও অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আন্দোলন ছিল। নালিতা বাড়ী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মে মাসের ১০/১১/১২ তিন

www.pathagar.com

দিন ব্যাপী। কলিকাতা থেকে কমরেড মোজাফ্ফর আহমেদ, বঙ্কিম ব্যানার্জী, আব্দুল্লাহ রসুল সহ বালির হান্নান মৌলভী নেত্রকোণায় সংগৃহীত চাঁদা নিয়ে পার্টির নির্দেশে এক সপ্তাহ পূর্বে নালিতাবাড়ী চলে যান। সেই সম্মেলনে শচীন চক্রবর্তী ও খুশু দত্ত রায়ের নেতৃত্বে ৩০/৩৫ জন কৃষক নেতা নেত্রকোণা থেকে অংশ নেয় বলে জানা যায়। নালিতা বাড়ী সম্মেলনের পর ব্যাপক ভাবে শুরু হয় টংক আন্দোলনের সংগে তেভাগা আন্দোলন। এই নালিতা বাড়ী সম্মেলনে কমরেড কমল বসুর প্রশিক্ষণে গঠিত হয় এক কৃষক ভলেন্টিয়ার বাহিনী। হাতে লাঠি ও মাথায় লাল টুপি ছিল ভলেন্টিয়ারের চিহ্ন। নালিতা বাড়ী সম্মেলন থেকে কমিউনিষ্টদের মধ্যে লাল টুপি ও বাঁশের লাঠির ব্যবহার শুরু হয়। নালিতা বাড়ী সম্মেলনে রন্ধন শালার দায়িত্বে ছিলেন নেত্রকোণার বালি গ্রামের হান্নান মৌলবী, সম্মেলনের পর টংক আন্দোলন আরো বেগবান হয়ে উঠে। তখন দূর্গাপুর এসে ললিত সরকার তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আরো বেগবান হয়ে উঠে। কমিউনিষ্ট পার্টিতে দান করেন। ১৯৪৬ সনে টংক আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারন করে। সরকার ও জমিদারগণ আতংক গ্রস্থ হয়ে পড়ে। এদিকে পাকিস্তান আন্দোলন তখন শহরাঞ্চলে তুঙ্গে। তবু বিরতিহীনভাবে এগিয়ে চলে টংক আন্দোলন। ১৯৪৭ সনে পুলিশ বাহিনী উপজাতি গ্রামগুলিতে চালায় ব্যাপক নির্যাতন। অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ সবকিছু শুরু হয় উপজাতি এলাকায়। ১৯৪৭ সনের জানুয়ারী মাসে দূর্গাপুর থানার বহেড়াতলী গ্রামে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ২৫ জন পুলিশ সহ গ্রামে ঢুকে গ্রামের সুন্দরী যুবতী কুমুদিনীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। কুমুদিনীর আর্তচিৎকারে রাশমনি বাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং এক পর্যায়ে রাশমনি রামদার কুপে একটি পুলিশের মস্তক ছিন্ন করে দিয়ে কুমুদিনীকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশের বন্দুকের গুলিতে রাশমনি ও জঙ্গী নেতা বলে খ্যাত সুরেন্দ্র শহীদ হন। এই ঘটনার কিছুদিন পর পাকিস্তানের জন্ম হয় তবু উচ্ছেদ হয়নি টংক প্রথা। ফলে নতুন করে চলে টংক আন্দোলন। পাকিস্তান সৃষ্টির সংগে সংগে সরকার ও জমিদার বকেয়া সহ চলতি টংক ধান আদায়ে ব্যাপক অভিযান শুরু করে দেয় ফলে হাজং কৃষকরাও মারমূখী হয় বলে জানা যায়। সবচেয়ে বড় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় লেঙ্গুরা বাজারে। পুলিশ ও কৃষক মঙ্গল চান, অগেন্দ্র, গৃহ বধু শংখ মনি, রেবতী, সারথী, বাদক, স্বরাজ প্রমুখ নেতা নেত্রী আর পুলিশের পক্ষে চারজন আহত ও একজন নিহত হয় বলে শোনা যায়। এর পর দুঃসাহসিক হাজং নেতা বিপিন গুণের নেতৃত্বে শুরু করা হয় গেরিলা যুদ্ধ। গেরিলা যুদ্ধে হাজংরা বন্দুক, পিস্তল, হাতবোমা চালাতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। টংক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পাহাড় অঞ্চলে ১৯৫০ সন পর্যন্ত চালু ছিল এই সশস্ত্র লড়াই। যে লড়াইয়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর গুলিতে শত শত হাজং জীবন দেয়। তখন ১৯৫০ সনে নূরুল আমিন মূখ্যমন্ত্রী হিসেবে দূর্গাপুর গমন করেন এবং টংক প্রথা ও জমিদারী উচ্ছেদের ঘোষণা দেন। তাছাড়া সেই মুহুর্তে রনদিভের থিসিস ভুল প্রমাণিত হয়। ফলে থেমে যায় লড়াই ও আন্দোলন কিন্তু পাকিস্তান সরকারের নিষ্ঠুর নির্মম অত্যাচারের কাহিনী আজো কেউ ভুলতে পারেনি।

www.pathagar.com

তে-ভাগা আন্দোলন

টংক আন্দোলনের সংগে সংগতি রেখে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে নেত্রকোণা সদর থানার বালি ও বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, আটপাড়া থানার রামেশ্বর পুর এলাকায় এবং মোহনগঞ্জ থানার বাহাম, পুকুরিয়া, ঝিমটী অঞ্চলে শুরু করা হয় একই সময়ে তে-ভাগা আন্দোলন। এই তে-ভাগা আন্দোলনের প্রধান দাবী ছিল-

ফসল কেটে বর্গাদারের বাড়ী তোলা হবে।
আধির বদলে ক্ষেত-ভাগা চালু হবে।
ভাগ চাষী উচ্ছেদ করা চলবেনা।
জমিদারী প্রথার বিলোপ চাই।

এই তে-ভাগা আন্দোলনে বাহির এলাকা থেকে পার্টির নির্দেশে শেরপুরের রবি নিয়োগী ময়মনসিংহের আলতাব আলী, নারায়ণগঞ্জের সুকুমার ভাওয়াল নেত্রকোণায় এসে কাজ করেন বলে জানা যায়। আর স্থানীয় নেতাদের মধ্যে কমরেড মনিসিংহের নেতৃত্বে জহুর উদ্দিন মুন্সি, ফজর আলী, হাসান, মিয়াফর আলী মোহনগঞ্জ এলাকায় হান্নান মৌলবী, উমেশ সরকার, সাফর আলী, মিছির উদ্দিন, আফছার উদ্দিন, মফিজ উদ্দিন খাঁ, আমুদ আলী, হাফিজ উদ্দিন, রোস্তম আলী, জাফর আলী, মমরোজ খলিফা প্রমুখ, দক্ষিণ নেত্রকোণায় খুশু দত্ত রায় এবং ফটিক শেখ বাংলা এলাকায় তে-ভাগা আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করেন। বারহাট্টা থানার রবি-বিক্রমশ্রী এলাকাতেও সুকুমার ভাওয়াল, জহুর উদ্দিন মুন্সি, ব্রজেন্দ্র শর্মা, দ্বিজেন বাগচী প্রমুখদের নেতৃত্বে কৃষক সমিতি গঠিত হয়। তখন কৃষক সমিতির সদস্যদের নিকট হতে নারিকেলের আচ্চার মাপে চাউল চাঁদা হিসেবে নেওয়ার প্রথা চালু হয়। এই ছিল তহবিল গঠনের প্রধান উৎস। তাছাড়া ফসলের মৌসুমে ধান সংগ্রহ করা হতো। তে-ভাগা আন্দোলনের চরম পর্যায়ে ভাগচাষীরা জোতদারদের জমির ধান কেটে নিজ বাড়ীতে উঠিয়ে নেয়। নেত্রকোণা থানায় প্রায় ৫ শত ভাগচাষীর বিরুদ্ধে মামলা হয়। সেই সময় নেত্রকোণা কমিউনিষ্ট পার্টি অফিস থেকে কমরেড পুলিন বকসীকে গ্রেফতার করা হয় এবং মনিসিংহ সহ বিশ জন নেতার নেত্রকোণায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। তখন নেত্রকোণা অঞ্চলে শুরু হয় ব্যাপক পুলিশী নির্যাতন। সেই নির্যাতন কালে দুই সিপাই বাংলা গ্রামে এক গাছের নিচে বসে আরামে বিড়ি টানতে থাকলে দুই মুসলিম গৃহ বধু দা হাতে সিপাইকে মারতে উদ্যত হলে, সিপাইদ্বয় রাইফেল ফেলে রেখে পালিয়ে নেত্রকোণা আসতে বাধ্য হয়। রাইফেল দু'টি পরে থানায় ফেরত পাঠানো হয়। তখন ফটিক শেখ, লেন্দু, ফজর আলীর নেতৃত্বে ৫/৬ শত কৃষক কর্মী বাংলা গ্রামের মাঠে ধান কাটতে শুরু করে। আলতাব আলী, হান্নান মৌলবী ও খুশু দত্ত রায় উপস্থিত ছিলেন। ধানের আঁটি লেন্দুর বাড়ীতে উঠানো হয়। বাধা দিতে ৬ জন পুলিশ আসে। কিন্তু বাধা দানে পুলিশ সাহস পায়নি। পরের দিন ময়মনসিংহের এ.ডি.এম নেত্রকোণায় ডাক বাংলায় এসে কৃষকনেতা ও মহাজনদের সংগে বৈঠক করেন তে-ভাগা সংকট নিরসনের জন্য। এই বৈঠকে জোতদারদের পক্ষে শ্রী অখিল চন্দ্র সেন ও কৃষক সমিতির পক্ষে হান্নান মৌলবী, শচীন চক্রবর্তী, খুশু দত্ত রায়, নেতৃত্ব

www.pathagar.com

দেয়। বৈঠক ব্যর্থ হয় এবং নির্যাতন আরো বৃদ্ধি পায়। সেই আন্দোলন মিছির উদ্দিন, ধরনী শর্মা, সুকুমার ভাওয়াল, নিত্যানন্দ, লেন্দু, ফজর আলী, গ্রেফতার হয়। আন্দোলন আরো বেগবান হতে থাকে। সেই সময় ময়মনসিংহের মুসলিম লীগ নেতা গিয়াস উদ্দিন পাঠান জোতদারদের পক্ষে নেত্রকোণা এসে পাকিস্তান হলে তে-ভাগা নয়-চৌ-ভাগা প্রদান করা হবে বলে ঘোষণা করেন। আটপাড়া থানার রামেশ্বরপুর ছিল কৃষক নেতা। সতু রায়ের ডাকে রামেশ্বরপুর এলাকায় ব্যাপক তে-ভাগা আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনে জোতদার সাতআনা এবং ভাগচাষী নয় আনা ফসল প্রাপ্তির সিদ্ধান্তে আপোষ ফয়সালা হয়। ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কৃষক সমিতি গড়ে উঠে।

বাহাম কৃষক আন্দোলন

মোহনগঞ্জ থানার কচুয়ার চর ছিল প্রখ্যাত কৃষক নেতা জহুর উদ্দিন মুন্সির বাড়ী। তার নেতৃত্বে ঝিমটির ফজর আলী সহ বাইরে থেকে আগত হান্নান মৌলবী, সুকুমার ভাওয়াল, আলতাব আলী আন্দোলন পরিচালনা করেন বলে জানা যায়। তখন একটি ভলেন্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলা হয়। সেই বাহিনীর নেতা ছিলেন সাহসী কৃষক নেতা মিয়াফর আলী। বাহাম গ্রামের এই কৃষক নেতা নিরর ছিলেন বলে জানা যায়। সেই সময় পুকুরিয়া বিল পাড়ের মাঠে এক ঐতিহাসিক কৃষকসভা অনুষ্ঠিত হয়। মাথায় লাল টুপি ও হাতে লাঠি সহ হাজার হাজার কৃষক উক্ত সভায় যোগ দেয়। জহুর উদ্দিন মুন্সীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কমরেড মনিসিংহ ও হান্নান মৌলবী বক্তৃতা করেন। ফলে আতংকিত হয়ে পড়ে স্থানীয় জোতদারগণ। কিন্তু দেশ বিভাগের ডামাডোলে তে-ভাগা আন্দোলন নিরব হয়ে যায়। নেত্রকোণায় বৃটিশ শাসনামলে কমিউনিষ্ট পার্টির দু'টি ঐতিহাসিক কৃষক সম্মেলন রাজনৈতিক ভাবে খুব তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। ১৯৪২ সনের ফ্যাসিবাদ বিরোধী কৃষক সমাবেশ ও ১৯৪৫ সনের সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলন। এ এলাকায় জনগোষ্ঠির নাগরিক সচেতনায় স্বাক্ষর বহন করে।

সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি

১৯৪২ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে-কমরেড ক্ষিতিশ সরকারকে সম্পাদক করে নেত্রকোণায় গঠন করা হয় সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি। ফ্যাসিবাদ বিরোধী এই সংগঠনের নেতৃত্বে নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক কৃষক সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লার ইয়াকুব মিয়া ওরফে বড় ভাই। এই সমাবেশে পশ্চিম বাংলার বর্তমান মূখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু সহ কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী, কমরেড মনি কুন্তলা সেন বক্তব্য দেন। কিশোরগঞ্জ থেকে পায়ে হেঁটে কমরেড ওয়ালী নেওয়াজের নেতৃত্বে একটি মিছিল সমাবেশে যোগ দেয়। এই মিছিলের প্রধান শ্লোগান ছিল জাপান বিরোধী-

হামদেশ পর জাপান আয়ে
জয় জয় জয় করনেওয়ালে
হুশিয়ার-হুশিয়ার।

www.pathagar.com

এই সমাবেশে জনযুদ্ধের তাৎপর্য ও কৃষকদের করণীয় সম্পর্কে জ্যোতিবসু ও বঙ্কিম মুখার্জীর বক্তৃতার প্রশংসা দীর্ঘদিন জীবন্ত ছিল। বঙ্কিম মুখার্জী একজন সুবক্তা হিসাবে নেত্রকোণার সর্বস্তরের জনতার হৃদয় জয় করেন বলে শোনা যায়।

সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলন

১৯৪৫ সনের ৮,৯,১০ই মার্চের সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলন নেত্রকোণার রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। মাসাধিককাল ব্যাপী নেত্রকোণা গাড়ার মাঠে সমাবেশের প্রস্তুতি কর্ম চলে বলে শোনা যায়। গ্রামাঞ্চল থেকে চাঁদা হিসেবে বাঁশ সংগ্রহ করে নেত্রকোণাকে "বাঁশের নগরী" হিসেবে সজ্জিত করা হয়। কমরেড শচীন চক্রবর্তী ছিলেন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক এবং কমরেড হান্নান মৌলবীকে আহ্বায়ক করে গড়ে তোলা হয় এক শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। সম্মেলন মাঠে ৮টি নলকূপ বসনো হয়। বিভিন্ন গ্রাম থেকে কৃষক সমিতি নিজেদের প্রয়োজনীয় চাউল, তরিতরকারী সহ সম্মেলনে যোগ দেয়। অনেকটা বর্তমান সময়কার ওরস শরীফের মতো। সেই সম্মেলন উপলক্ষে যোগেন্দ্র তালুকদার ও দত্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষক পারলার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান দেওয়ান মজলিশ সাহেব নিজের বসত বাড়ী সম্মেলনের অতিথিদের জন্য ছেড়ে দিয়ে ঐতিহ্য স্থাপন করেন। এই সম্মেলনে সর্বমোহন বণিক নিজ স্ত্রীর নামে একটি টিউবয়েল বসিয়ে দেন। বাঁশ দিয়ে ৫ শত লোক বসার মঞ্চ সহ রান্নাঘর, হাসপাতাল, পায়খানা, প্রদর্শনী স্থান, দোকানপাঠ, অনুসন্ধান অফিস স্থাপন করা হয়। গ্রামাঞ্চল থেকে বাঁশ কাটায় অংশ নিয়ে কমরেড জুঁইফুল রায় একটি আঙ্গুল কেটে ফেলেন। প্রথম দিকে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ যুক্তি পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করে। কিন্তু পরে নানা রকম অপপ্রচার চালায় সম্মেলন-ব্যর্থ করতে।

আওয়ামী লীগ

১৯৪৯ সালে ঢাকায় আওয়ামী লীগ গঠিত হলে এডভোকেট হাশিম উদ্দিন সাহেব ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে আওয়ামী লীগ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন বলে জানা যায়। তার প্রধান সহযোগী ছিলেন হাতেম আলী তালুকদার। ১৯৫৩ সনে করটিয়ার উপ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সম্পাদক শামসুল হক সাহেবের জয় লাভের প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল সহ গোটা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠে। ১৯৫৫ সালে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে আওয়ামী লীগের মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে দলটিকে একটি অসাম্প্রদায়িক দলে পরিণত করা হয়। তখন ১৯৫৫ সালের শেষের দিকে নেত্রকোণায় শ্রী সত্যকিরণ আদিত্যকে সভাপতি ও আব্দুল মজিদ তারা মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে মহকুমা যুব লীগ গঠন করা হয়। ১৯৫৮ সালে জারি হয় সামরিক শাসন। রাজনীতি হয়ে যায় নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধ অবস্থা শেষে ১৯৬৪ সন পর্যন্ত নেত্রকোণায় আওয়ামী লীগ কার্যত নিষ্ক্রিয় থাকে। জনাব আঃ খালেক সাহেব প্রায় এককভাবে অফিসে

www.pathagar.com

বসে দলীয় যোগাযোগ রক্ষা করতেন। দলের এই দূর্যোগ মূহুর্তে তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা হিসেবে জনাব মেহের আলী, জামাল উদ্দিন আহমেদ বেশ সক্রিয় ছিলেন। জনাব কে, এম, ফজলুল কাদের এডভোকেট ও এন, আই, খান ভাল ভূমিকা পালন করেন বলে জানা যায়। সেই সময় সম্মিলিত বিরোধী দল (সি ও পি) গঠিত হলে আওয়ামী লীগ সক্রিয় হয়ে উঠে। তবে ছাত্রলীগ বেশ শক্তিশালী সংগঠন ছিল। ফলে আওয়ামী লীগের রাজনীতি ছাত্রদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ১৯৬৪ সনে জনাব আঃ মমিন আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সনের পাক ভারত যুদ্ধের প্রাককালে আঃ মমিন, ফজলুর রহমান খান, আব্দুল খালেক যথাক্রমে মহাকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি, কার্যকরী সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক। নেত্রকোণায় আওয়ামী লীগ তখন একটি শক্তিশালী গণ সংগঠন রূপে কার্যকর ছিল। তবে ছাত্রলীগ ছিল দলের শক্ত ভিত। এই দলীয় নেতৃত্ব ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়। প্রকৃত অর্থে একাত্তরে রাজনৈতিক দল দেয় নেতৃত্ব এবং যুদ্ধ করে সমগ্র জনতা।

দেশ বিভাগের পর কমিউনিষ্ট পার্টি নেত্রকোণায় বেশ দূর্বল হয়ে পড়ে অবশ্য দূর্গাপুরের পাহাড় অঞ্চলে দীর্ঘদিন লড়াই চালু ছিল বলে জানা যায়। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর অসংখ্য কমিউনিষ্ট সংগঠক কলিকাতা চলে যেতে বাধ্য হন। তবে নেত্রকোণায় কোন দাঙ্গা না হলেও-ত্রাস সৃষ্টি হয়েছিল ব্যাপক। ফলে কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মকান্ড সীমিত হয়ে যায়। নেত্রকোণা মহকুমায় মোহনগঞ্জ থানার জহির উদ্দিন মুন্সী ও সদর থানার হান্নান মৌলবী ছিলেন ব্যক্তিত্বশালী মুসলিম কমিউনিষ্ট সংগঠক। জহির উদ্দিন মুন্সী ১৯৪৫ সনে যা রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। ফলে দেশ বিভাগের পর নেত্রকোণার কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মকান্ড সীমিত হয়ে যায়। তখন বারহাট্রা থানার রামভদ্রপুরে বসবাসকারী ধরণী শর্মা ও হান্নান মৌলভীর নেতৃত্বে পার্টি সেলে উমেশ সরকার, মনসুর আলী আফছর উদ্দিন অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তখন হরি শংকর চৌধুরী গৌরীপুর থেকে নেত্রকোণায় আসেন। আর সুকুমার ভাওয়াল দূর্গাপুর থেকে মাঝে মধ্যে এসে যোগদান করতেন। ফলে ধরনী শর্মা কঠোর আত্মগোপনে ও হান্নান মৌলবী কিছুটা প্রকাশ্যে কাজ করতেন।দেশ বিভাগের পর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কিশোরগঞ্জের কমরেড নগেন সরকারকে প্রার্থী করে দলটি পুনর্গঠিত হয়। পরবর্তীকালের রাজনীতিতে ন্যাপের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল কমিউনিষ্ট পার্টির অস্তিত্ব।

চাকুরীজীবি শহীদ

প্রখ্যাত কথাশিল্পী ও ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ হুমায়ূন আহমেদের পিতা শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদ ১৯৭১ সনের ৫ই মে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক পিরোজপুর জেলা সদরে নিহত হন। শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদ ছিলেন তৎকালীন পিরোজপুর মহকুমার পুলিশ কর্মকর্তা (এসডি, পি, ও)। শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদ কেন্দুয়া থানার কুতুবপুর গ্রামের মৌলানা আজিম উদ্দিন আহমেদ সাহেবের পুত্র।

www.pathagar.com

তিনি বি, এ পাশ করে কিছুকাল শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থেকে ১৯৪৭ সনে পুলিশ বিভাগের চাকুরীতে যোগ দেন বলে জানা যায়। শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদের মৃত্যুর পর গোটা পরিবার সহ ডঃ হুমায়ূন আহমেদ তাঁর নানা মোহনগঞ্জের থানা মুসলিম লীগ ও শান্তি কমিটির নেতা আবুল হোসেন শেখের সহায়তায় মোহনগঞ্জ চলে আসেন। ১৯৭১ সনের ৮ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর হাতে মোহনগঞ্জ মুক্ত দিবসে নিহত হয় সেই নানা আবুল হোসেন শেখ।

নেত্রকোণা কলেজের দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষক দূর্গাপুর থানার আরজ আলী সাহেবকে কলেজ থেকে ধরে নিয়ে আসে হানাদার বাহিনী। তাঁকেও পরদিন ভোরে হানাদার বাহিনী সাতপাই বর্তমান স্মৃতিসৌধ ঘাটে মগড়া নদীর তীরে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে বলে জানা যায়।

জাগীরপাড়া গণ এ্যাকশন

দূর্গাপুর থানার গাওকান্দিয়া ইউনিয়নের জাগীরপাড়া গ্রামের ছোট্টনী মিয়ার বাড়ীর গণএ্যাকশন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। জনাব তাছির উদ্দিন মাস্টার ছিলেন জাগীরপাড়া গ্রামের একজন স্কুল শিক্ষক। এই গ্রামে প্রায়শ দুইজন লম্পট পাকসেনা ক্যাম্প থেকে এসে গ্রামবাসীদের বিরক্ত করত। তখন উক্ত গ্রামে লুন্ঠন ও নারী নির্যাতনের চেষ্টা ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার। কুখ্যাত দালাল আমছর মেম্বার পথ দেখিয়ে সেনাদের গ্রামে নিয়ে আসতো। এইভাবে দালাল আমছার কেড়ে নিত মানুষের অর্থ ও গরু-ছাগল। তা ছাড়া যুবতী মেয়েদের সতীত্ব নষ্টের চেষ্টা ছিল নিত্যদিনের কাজ। ফলে অতিষ্ট হয়ে উঠে গ্রামবাসী। তখন তাছির মাষ্টার সাহেব গোপনে গ্রামবাসীদের সাহসী ও সচেতন করতে থাকেন। এমতাবস্থায় আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন বিকালে আমছর মেম্বার দুই পাকসেনাকে নিয়ে জাগীরপাড়া গ্রামের ছোট্টনী মিয়ার বাড়ী এসে হাজির হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে ছোট্টনি তাছির মাস্টারের বাড়ী চলে যায়। এদিকে আমছর মেম্বর সেনাদ্বয়কে ছোট্টনীর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে বাইরে ঘুরতে থাকে। ছোট্টনী বাড়ী ফিরে এসে গোয়াল ঘরে বসে গোপনে দেখতে পায় একজন সেনা তার ঘরের দিকে ঢুকেছে এবং অপর একটি সেনাটি বারন্দায় চাইনিজ রাইফেল রেখে বসেছে। তখন ছোট্টনী তার ভাইসহ কোদাল হাতে নিয়ে অপেক্ষামান সেনার মাথায় সজোরে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেয় এবং অপর ভাই রাইফেল দু'টি হাতে নিয়ে চিৎকার করতে থাকে। তখন দলবল সহ ছুটে আসেন তাছির মাস্টার। এভাবেই বন্দী করা হয় দুই লম্পট পাকসেনাকে। আমছর মেম্বার পালিয়ে প্রাণে বাঁচে। আর গণপিটুনিতে নিহত হয় সেনাদ্বয়। কিন্তু গ্রামবাসী লাশ দু'টি ভারতীয় সীমান্তে অস্ত্রসহ বহন করে নিয়ে যায়। অবশ্য পরদিন হানাদার বাহিনী গোটা গ্রামে অগ্নিসংযোগ করে এবং মুক্তি বাহিনীর সংগে ভয়াবহ খন্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ছোট্টনী ও জায়গীরপাড়ার মানুষের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে।

www.pathagar.com

মহাদেও ক্যাম্প

সীমান্ত অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইয়ুথ ক্যাম্প ছিল মহাদেও। কলমাকান্দা থানা আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আব্দুল জব্বার আনসারীর নেতৃত্বে মহাদেও ক্যাম্প পরিচালিত হয়। তাঁকে সহায়তা করেন ময়মনসিংহ ল' কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ মেদনীর সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান আনিসুর রহমান খান এডভোকেট, প্রবীন আওয়ামী লীগ নেতা আটপাড়া থানার গাভুরকাছ গ্রামের জনাব হাবিবুর রহমান খান, মওলানা ফজলুর রহমান খান, বন্নির রিয়াজ উদ্দিন চেয়ারম্যান, আলী ওসমান তালুকদার, নেত্রকোণা সদর থানার মেদনী গ্রামের অভিজাত মুসলিম পরিবারের সন্তান গাজী মোস্তফা হোসেন, বেতাটির আঃ ওয়াহেদ মাষ্টার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। মহাদেও ক্যাম্পের রিক্রুটমেন্ট চলত। তাছাড়া মহেশখলী থেকে রংড়া, বাঘমারা হয়ে তোরা চলাচলে মহাদের ছিল একটি উল্লেখ যোগ্য ট্রানজিট ক্যাম্প। মহাদেও ক্যাম্পের ব্যবস্থাপনা ছিল সবচেয়ে সুন্দর। মহাদেও ক্যাম্পকে হাউডআউট করে মুক্তিবাহিনী অসংখ্য হামলা পরিচালনা করে বলে জানা যায়।

রংড়া ক্যাম্প

জনাব আব্বাছ আলী খান এম,পি সাহেবের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় রংড়া ক্যাম্প। তাঁকে সর্বতোভাবে সহায়তা করেন নেত্রকোণা শহরস্ত নিউ টাউনের প্রবীন আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আব্দুল হেকিম আহমেদ। রংড়া এফ, এফ ক্যাম্পের কমান্ডার ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা ও সুবেদার আজিজুল ইসলাম খান। জনাব গোলাম মোস্তফা শত শত মুক্তিযোদ্ধার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা সুচারুভাবে সম্পন্ন করে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেন এইখানে থাকতেন ভারতীয় ক্যাপ্টেন চৌহান। ক্যাপ্টেন চৌহানের সহযোগীতায় রংড়া থেকে মুক্তিবাহিনী হানাদারদের উপর অসংখ্য হামলা চালায়। রংরায় একদিকে ছিল ইয়ুথ ক্যাম্প এবং অপরদিকে ছিল এফ, এফ ক্যাম্প। তা চাড়া রংড়াতে মদনপুরের বর্তমান চেয়ারম্যান তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা আঃ রহিমের নেতৃত্বে একটি মুজিব বাহিনী ট্রানজিট ক্যাম্প চালু করা হয়। তাকে সহায়তা করেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব আলাউদ্দিন খান ও বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতা নজরুল ইসলাম খান। তবে আলাউদ্দিন খান প্রায়শই তথ্য সংগ্রহের জন্য গোপনে নেত্রকোণা শহরে আসতেন। তিনি শহরে বিভিন্ন জনের সংগে যোগাযোগ করে তথ্যাদি সংগ্রহ করতেন বলে জানা যায় মুজিব বাহিনীর পক্ষ থেকে তাকে নিয়োগ করা হয়। কারণ তিনি ছিলেন আব্বাছ আলী খান সাহেবের আত্মীয়। ফলে তাকে নিয়ে কোন সন্দেহ সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিলনা। তা ছাড়া নেত্রকোণা শহরের অলিগলি ছিল তার অতি পরিচিত।

বাড়েংগাপাড়া ক্যাম্প

ন্যাপ, কমিউনিষ্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপের) নেতৃবৃন্দ তোরা শহরের নিকটস্থ বাড়েংগা পাড়া বাজার নামক স্থানে সমবেত হন বলে জানা যায়। বিচ্ছিন্নভাবে নেত্রকোণার

www.pathagar.com

এই সকল দলের কোন কোন নেতা বা সংগঠক মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেন বলে জানা যায়। তবে দলগতভাবে তাদের অবস্থান ছিল বাড়েংগাপাড়া দলীয় ক্যাম্পে। বাড়েংগাপাড়া ক্যাম্প তাদের প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র ছিল। এই ক্যাম্প থেকেই তারা ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। কমরেড অজয় রায় ছিলেন বাড়েংগাপাড়া ক্যাম্পের পরিচালক। নেত্রকোণার ন্যাপ, কমিউনিষ্ট নেতাদের মধ্যে সর্ব জনাব ওয়াজেদ আলী, আজিজুল ইসলাম খান, আঃ মোতালিব, নূরুল ইসলাম, জিন্নাতুল ইসলাম, মোস্তফা কামাল, মোজাম্মেল হক বাচ্চু, বাদল বিশ্বাস, আঃ বারী বাড়েংগাপাড়া ক্যাম্পে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে জানা যায়। তবে দলগত ভাবে সশস্ত্র লাড়াইয়ে যোগদান করেননি। অপরদিকে চীনপন্থী বলে খ্যাত অংশ দেশের অভ্যন্তরে দুই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তত্ত্ব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। নেত্রকোণা অঞ্চলের চল্লিশা, হাটনাইয়া, বুড়িজুড়ি, কমলপুর অঞ্চলে কতিপয় গোপন কেন্দ্র গড়ে তোলে বলে জানা যায়। এই লাইনে মোহনগঞ্জ থানার নওহাল গ্রামের অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা, হাটনাইয়া গ্রামের অধ্যাপক মোজাম্মেল হক, আটপাড়া থানার বালাইচ গ্রামের আঃ রাজ্জাক, জেলা বি, এন, পি'র বর্তমান সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুছ এডভোকেট, মোহনগঞ্জ থানার জয়পুর গ্রামের মতিয়র রহমান খান, জেলা বি, এন, পি'র বর্তমান যুগ্ম সম্পাদক এ্যাডভোকেট নুরুজ্জামন, জেলা জাতীয় পার্টি নেতা লিয়াকত আলী খান এ্যাডভোকেট, অজহর রোডের সুরজিত সরকার এ্যাডভোকেট, চল্লিশার মুসলেম উদ্দিন ও আবু সিদ্দিক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। কমরেড নগেন সরকার অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত তাদের সংগে কর্মরত ছিলেন। তবে তাদের কোন সশস্ত্র কর্মকান্ড জন সমক্ষে পরিচালিত হয়নি। টি. এ. রহমত উল্লাহ্ শহরে থেকে তাদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করতেন বলে জানা যায়।

সীমান্ত টহল ফৌজ

ভারতীয় সীমান্তের মহেশখালী, মহাদের, রংড়া, বাঘমারা মে মাস পর্যন্ত ছিল নিছক ইয়ুথ ক্যাম্প। তখন পর্যন্ত কোন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তি বাহিনী ক্যাম্প সমুহে আসেনি। সেই সময়ে সীমান্ত অঞ্চলে টহল দান করতেন সেনা কর্মকর্তা মোবারক আলী খানের নেতৃত্বে আনসার কমান্ডার আলী ওসমান তালুকদার, আব্দুল হামিদ, দারগা আলীসহ একটি সশস্ত্র বাহিনী। তাদের সংগে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল জব্বার আনসারী, মাওলানা ফজলুর রহমান খান, সেকান্দার নূরী ও আঃ মজিদ তারা মিয়া সশস্ত্রভাবে যোগদান করতেন বলে জানা যায়।

এফ. এফ ক্যাম্প

মুক্তিযুদ্ধে নেত্রকোণার প্রধান এফ. এফ ক্যাম্প ছিল রংড়া। এই রংড়া এফ. এফ ক্যাম্প থেকে গোটা নেত্রকোণা অঞ্চলের যুদ্ধরত কোম্পানীগুলোর সংযোগ রাখা হয় গোলা-বারুদ সরবরাহ থেকে শুরু করে যুদ্ধরত কোম্পানীগুলোকে রংড়া এফ. এফ ক্যাম্প থেকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ভারতীয় ক্যাপ্টেন চৌহান রংড়া ক্যাম্প থেকে কোম্পানীগুলোকে

www.pathagar.com

যুদ্ধের পরামর্শ দিতেন আর বাঘমারা জ্যাকশোগ্রাম এফ. এফ ক্যাম্পে থাকতেন ক্যাপ্টেন মোরাড়ী। জ্যাকশোগ্রাম ক্যাম্প থেকে দূর্গাপুর-পূর্বধলা অঞ্চলে যুদ্ধরত কোম্পানীগুলোর সংযোগ রক্ষা করা হতো। জনাব আঃ মজিদ এম, পি-কে সভাপতি এবং মাখন নাথ চৌধুরী কে সদস্য সচিব করে জ্যাকশোগ্রাম এফ. এফ ক্যাম্প পরিচালনার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয় আর এন. আই. খানই ছিলেন বাঘমারা ইয়ুথ ক্যাম্পের পরিচালক।

মুক্তির সংগ্রামে নেত্রকোণা

মহুয়া-মলুয়ার দেশ নেত্রকোণা। এখানকার অধিকাংশ মানুষ স্বভাব কবি। জীবন-যাপনে তারা সাধারণ আর আদর্শে দৃঢ় ও আন্তরিক। তাই এখানে সংস্কৃতিক ও সংগ্রামের ইতিহাস হাত ধরাধরি করে সামনে চলেছে সব সময়। নেত্রকোণার মানুষ কোনো সংগ্রাম থেকে, আন্দোলন থেকে কখনো পিছিয়ে থাকেনি।

টিপু পাগলার বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ৫২'র ভাষা আন্দোল ৬২'র ৬ দফা আন্দোলন এবং ৬৯'র গণঅভ্যূত্থান এবং ৭১-এর আন্দোলনে নেত্রাকোণার মানুষের রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা।

১ মার্চ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার সাথে সাথে ঢাকায় প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। নেত্রকোণায়ও সেদিন প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এবং দেশের মফস্বল এলাকার মধ্যে নেত্রকোণায়ই সেদিন এ প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ হয়েছিলো।

২৩ মার্চ নেত্রকোণা ঐতিহাসিক মুক্তারপাড়া মাঠে "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" জাতীয় সংগীত গেয়ে উত্তোলন করা হয় স্বাধীন বাংলার জাতীয় পতাকা। সে দিন পতাকা উত্তোলন করেন তৎকালীন পৌর চেয়ারম্যান এন আই খান।

২৩ এপ্রিল ঠিক পতাকা উত্তোলনের ১ মাস পর সকাল ৯ টায় পাক বাহিনী নেত্রাকোণা শহরের সামরিক হেলিকপ্টার থেকে হামলা চালায়।

নেত্রকোণায় সে সময় মহকুমা অফিসার (এসডিও) ছিলেন আব্দুল হামিদ চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক পরিকল্পনা সচিব। তিনি ছিলেন একজন মুক্তিকামী মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি উপলব্ধি করে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতার জন্য পুলিশের ৩ শত রাইফেলের সবকটি জয় বাংলা বাহিনীর সদস্যদের দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ সকল অস্ত্র প্রাপ্তির মধ্য দিয়েই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র পায় নেত্রকোণার মুক্তিযোদ্ধারা। জনাব চৌধুরী সাথে আলোচনা করে মুক্তিযুদ্ধে তার বহু অভিজ্ঞতা ও সহায়তার কথা জানার জানা যায়।

www.pathagar.com

মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ্য ও অর্জন: বিআইডিএস এর জরিপের ফলাফল

মুক্তিযুদ্ধের ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিজয় মেলা আয়োজিত হয়। অন্যান্য বছরেও এ ধরনের বিজয় মেলা আয়োজিত হতো তবে সেগুলো হতো মাত্র কয়েকটি জায়গাতেই। তখন থেকে এই উদ্যোগে বিস্তৃতি লাভ করে।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে গবেষণারত বিআইডএস-এর কতিপয় গবেষক মুক্তিযুদ্ধের ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত বিজয় মেলাগুলোতে জরিপ চালায়। মেলা সমবেত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মত বিনিময় ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এ কাজে তাঁরা একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নমালা ব্যবহার করা ছাড়াও কেস স্টাডি হিসেবে বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা মাধ্যমে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করেন। বিজয়মেলার সময় ছাড়া কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোর, কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহে এসব মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়।

BIDS এর জরিপে দেখা যায় যে ১৫৯ জন মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়, প্রাক-মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁদের মধ্যে শতকরা ৭৮ ভাগের বসবাস ছিল গ্রামাঞ্চলে। বাকি ২২ ভাগ সেই সময় বাস করতেন শহরাঞ্চলে। এখানে উল্লেখ্য, কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহে প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ হয়েছিল। যশোর ও কুমিল্লার শহর-গ্রাম উভয় এলাকাতেই এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিল। চট্টগ্রাম জেলাতেই কেবল শহর এলাকাতে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিল। যে সকল মুক্তিযোদ্ধদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিল, তাঁদেরও ৫০ শতাংশের বাস করতেন গ্রামাঞ্চলে।

BIDS এর জরিপের ফলাফলে দেখা যায় যে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে শতকরা ৬০.৩৭ জন ছিলেন ছাত্র, শতকরা ১২.৫৮ জন ছিলেন ব্যবসায়ী, শতকরা ১.৮৯ জন ছিলেন শিক্ষক, বেকার জীবনযাপন করছিলেন, এমন লোকজনের হার ছিল ০.৬৩ শতাংশ। উল্লেখ্য, যাঁরা রাজনীতি করতেন, তাঁদের প্রায় সবাই জীবিকা অর্জনের জন্য কোনো-না-কোনো পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন, অর্থাৎ শুধু রাজনীতি পেশা এমনটি ছিল বিরল। সাক্ষাৎকার প্রদানকারী মুক্তিযোদ্ধদের মধ্যে অন্যান্য পেশাজীবির হার ছিল ৩.১৪ শতাংশ।

গ্রাম এলাকার যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের ৭৫ শতাংশ পরিবারই ছিলেন স্বচ্ছল, ধনী কৃষক শ্রেণীর (৭.৫+একর জমির মালিক)। ক্ষুদে কৃষক শ্রেণীর পরিবার ছিল বিশ শতাংশ। সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে তারা মধ্য ও উচ্চ আয়ের স্বচ্ছল পরিবার থেকে এসেছিলেন, তারা আরো বলেছেন যে, তাদের আযের বড়ো অংশ তখন আসতো কৃষি থেকে। মূলত ব্যবসা থেকে আয় আসতো এমন মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সংখ্যা ছিল ২৫ শতাংশ।

www.pathagar.com

সমীক্ষায় আরো দেখা যায় যে, শিক্ষিত পিতার সন্তানেরাই মূলত মুক্তিযুদ্ধের যোগ দিয়েছিলেন। প্রায় ৮৫ শতাংশ উত্তরদাতা এ কথা বলেছেন। মুক্তিযোদ্ধোরা খুবই রাজনীতি-সচেতন ছিলেন। উত্তরদাতাদের ৭৮ শতাংশ রাজনীতি করতেন। তাদের সিংহভাগ (৬২%) আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দুই ন্যাপ থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের অংশভাগ ছিল ৭ শতাংশ। বাকি অন্যরা সরাসরি কোনো রাজনেতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও মোটামুটিভাবে রাজনীতি-সচেতন ছিলেন।

BIDS এর সমীক্ষায় নির্দিষ্ট প্রশ্নমালায় একটি জিজ্ঞাসা ছিল এমন : ১৯৭১ সারের ২৫শে মার্চের ঠিক আগে দেশের রাজনীতি নিয়ে তারা কী চিন্তা করতেন? এই প্রশ্নের জবাব দেন ১৫৫ জন মুক্তিযোদ্ধা। এদের মধ্যে ৯৭ জন বা ৬২.৫৮ শতাংশ বলেন যে, তাঁরা তখন স্বাধীনতা চাইতেন এবং শতকরা ৮.৩৯ জন চাইতেন স্বায়ত্তশাসন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯.৩৫ শতাংশ বলেন যে, তাঁরা স্বায়ত্তশাসন চাইতেন; তবে এর পরিণতিতে পাকিস্তান ভাগ হয়ে যাক, সেটা চাইতেন না। এদের মধ্যে ৩.২৩ জন গণতন্ত্র চাইতেন। ২৫ মার্চের ঠিক আগে সুনির্দিষ্ট কোনো ভাবনা ছিল না, এমন উত্তরদাতার হার হচ্ছে ৪.৫২ শতাংশ।

বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষনান্তে দেখা যায় যে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অন্যায়, অত্যাচার এবং বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের মতামত ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। ২৫ মার্চের ঠিক আগে যারা স্বায়ত্তশাসন চাইতেন, তারা মতামত পাল্টে স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার হয়ে যান। সরাসরি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের অংশ নেন। একইভাবে অন্যদের মতামতও পরিবর্তিত হয় তখন আর কোন মতপার্থক্য থাকে না। প্রত্যেকে সিদ্ধান্ত নেন দেশ স্বাধীন করার। শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাই করতে গিয়ে দেখা যায় যে, এই ১৫৯ জন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে নিরক্ষর ছিলেন মাত্র ১ জন অর্থাৎ ০.৬৩ শতাংশ। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন, এরকম লোকজনের হার ছিল ১২ শতাংশ। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন, এরকম লোকজনের হার ২৭.০৫ শতাংশ। এসএসসি এবং এইচএসসি পাশ করেছেন, এমন লোকের হার ছিল যথাক্রমে ১৪.৪৭ ও ১৯.৫০ শতাংশ। বি.এ পাশ করেছেন, এরকম লোকজনের হার ছিল ২৮.৩০ শতাংশ। এম এ পাশ করেছেন, এমন লোকজনের হার ছিল ৩.১৪ শতাংশ। অর্থাৎ শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগই ছিলেন এস.এস.সি এবং তার চেয়ে ওপরের ডিগ্রিধারী।

মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় তাঁদের উৎসাহিত করেছিল। এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ১৫১ জন। এঁদের মধ্যে ১৪৯ জন, অর্থাৎ প্রায় ৯৪ শতাংশ বলেছেন, স্বাধীন মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাই তাঁদেরকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রায় ৯১ শতাংশের আশংকা ছিল শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮০ শতাংশের কাছে সর্বপ্রথম কাম্য ছিল আত্মমর্যাদা

www.pathagar.com

নিয়ে বেঁচে থাকবার আশংকা। ৭০ শতাংশ উত্তরদাতা জানান যে, অন্যান্য আকাংখা, অর্থাৎ স্বাধীন মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠা, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ছাড়াও সমৃদ্ধ দেশ গঠনের আকাংখা তাঁদেরকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে উৎসাহিত করেছিল। উত্তর প্রদানকারী ৭২ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা বলেন যে, উল্লিখিত অন্যান্য আকাঙ্খা ছাড়াও কায়েমি স্বার্থবাদীদের প্রতিহত করার লক্ষ্যও তাঁদের ছিল। এই সব মুক্তিযোদ্ধাকে পাঁচটি বিষয় ক্রমানুসারে বেছে নিতে বলা হয়। এগুলো হচ্ছে; ক. স্বাধীন মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠা, খ. শোষণহীন সমাজ গঠন, গ. কায়েমি স্বার্থবাদীদের প্রতিহত করা, ঘ. আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচা এবং ঙ. সমৃদ্ধ দেশ গঠনের আকাঙ্খা। এই পাঁচটি বিষয়কে ক্রমানুসারে বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতা স্বাধীন মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নির্দেশ করেন। এই হার হচ্ছে ৭২.৩২ শতাংশ। এরপর ১৪.৪৭ শতাংশ বেছে নেন শোষণহীন সমাজ গঠনের বিষয়টি। শতকরা ৫.০৩ জন জানান যে প্রথমত আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকবার আকাংখাই তাঁদেরকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এছাড়া কায়েমি স্বার্থবাদীদের প্রতিহত করা, সমৃদ্ধ দেশ গঠন এবং অন্যান্য বিবেচনার বিষয়কে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রথম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন শতকরা ৩.১৫ ভাগ উত্তরদাতা। স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশে কায়েমী স্বার্থবাদীদের নতুনভাবে প্রতিহত করতে হবে, সম্ভবত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাবনাতে ও ছিলনা। BIDS এর সমীক্ষায় সম্ভবত প্রথম কারণে বিষয়টি এ জন্যেই প্রতিফলিত হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে আকাঙ্খা উত্তরদাতারা উল্লেখ করেন, তার থেকে দেখা যায় : ৫০.৩১ শতাংশ শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, ৬.২৯ শতাংশ কায়েমি স্বার্থবাদীদের প্রতিহত করা এবং ৫.৬৬ শতাংশ সমৃদ্ধ দেশ গঠনের কথা নির্দেশ করেন। সমাজ বিজ্ঞানের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য বলতে কর্ম দক্ষতা ও অবস্থানের কারণে পার্থক্য সৃষ্টি হয় তাতেই বুঝা যায়। রাজনৈতিক সুবিধা নিয়ে দুর্নীতির কারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টির বিষয়ে মানুষ তখনো এত মারাত্মক ভাবে অনুধাবন করতে পারেনি ।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের তৃতীয় কারণ হিসেবে উত্তরদাতা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ৩২.৭০ শতাংশ আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা, ২০.১৩ শতাংশ কায়েমি স্বার্থবাদীদের প্রতিহত করা, ১১.৯৫ শতাংশ শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, ৯.৪৩ শতাংশ সমৃদ্ধ দেশ গঠন এবং ৬.২৯ শতাংশ স্বাধীন মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠার আকাংখার কথা জানান।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে চতুর্থ কারণ হিসেবে শতকরা ৩৩.৩৩ জন সমৃদ্ধ দেশ গঠন, ১৮.৮৭ শতাংশ আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা, ১১.৩২ শতাংশ শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, ১০.০৬ শতাংশ কায়েমি স্বার্থবাদীদের প্রতিহত করা এবং ৩.১৪ শতাংশ স্বাধীন মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। পঞ্চম কারণ হিসেবে যে বিষয়গুলোর উল্লেখ উত্তর প্রদানকারী মুক্তিযোদ্ধারা করেছেন, সেসবের হার হচ্ছে : কায়েমি স্বার্থবাদীদের প্রতিহত করার আকাঙ্খা ৩৩.৩৩ শতাংশ, সমৃদ্ধ দেশ গঠনের আকাঙ্খা ২০.৭৫ শাতংশ, আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে

www.pathagar.com

থাকার আকাঙ্খা ৬.২৯ শতাংশ, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা ৩.১৪ শতাংশ এবং স্বাধীন মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা ০.০৬ শতাংশ। মুক্তিযুদ্ধকালে কায়েমি স্বার্থবাদীদের প্রতিহত করার বিষয়টি প্রথম কারণ হিসেবে বিবেচিত না হলে ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ বিষযটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ন ।

এসব তথ্য থেকে দেখা যায় যে, সর্বাধিকসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার আকাঙ্খা ছিল স্বাধীন মাতৃভূমির প্রতিষ্ঠা। এরপর ছিল শোষণহীন সমাজ গঠন, যা এখন নতুন করে ভাবনার বিষয়। তৃতীয় কারণ ছিল আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার আকাংখা। প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি আকাংখা পরস্পর সম্পর্কিত। পরাধীন মাতৃভূমিতে শোষণহীন সমাজ গঠন করা যায় না অথবা আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকাও সম্ভব নয়। স্বাধীন মাতৃভূমিই কেবল শেষোক্ত আকাংখা। দু'টির বাস্তবায়ন সম্ভব করে তুলতে পারে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে শাসন যন্ত্রই ছিল শোষণমূলক। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে সাম্প্রতিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে রাজনৈতিক বৈপরিত্য অনেকাংশে ব্যক্তিগত সংঘাতে পরিণত হয়েছে যা সমাজকে মারমুখী বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠিতে বিভক্ত করে ফেলেছে। দেশ প্রেম এবং দেশ উন্নয়নের চেয়ে কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের উদ্দেশ্য সাধনই উন্নয়ন এজেন্ডা হিসেবে প্রাধান্য পাচ্ছে। তাই দেশের অর্থনীতি হয়ে উঠেছে দাতা নির্ভরশীল এবং বাণিজ্য হয়ে উঠেছে আমদানীমুখী।

মানুষ ও উন্নয়ন

উন্নয়ন ভাবনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয়, বিদেশী সাহায্য, ঋণভার, সাহায্যের শর্ত, উৎপাদন ও বন্টন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়ে থাকে। প্রবৃদ্ধি, ঋণ, শর্ত, সুদের হার, তথা উন্নয়ন তো মানুষের কল্যাণের জন্যেই। প্রকৃতির সকল উপাদানই আল্লাহ সৃষ্টি যা মানুষের কল্যাণেই নিবেদিত। তাই সকল উন্নয়ন হবে মানুষকে ঘিরেই। উন্নয়নের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই উন্নয়ন। 'অর্থনৈতিক সংস্কারের' যান্ত্রিক যুগে উন্নয়নের সংজ্ঞা এমন সংকীর্ণ, রূপ নিচ্ছে যে, সেখানে মানুষের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। উন্নয়ন নামের বিশাল আয়োজনে মানুষ বেমালুম হারিযে যায়। বিশাল কর্মযজ্ঞের পটভূমিতে মানুষের অবস্থান হয়ে যায় নগন্য। বাস্তবে মানুষকে, মানুষের সৃজনশীলতাকে, প্রাণের কথাকে, তার প্রত্যাশা, প্রত্যয়, স্বপ্নকে বাদ দিয়ে বা তার অবস্থানকে গৌণ করে, যে কোন উন্নয়ন ভাবনাই হবে অপ্রাসঙ্গিক এবং অন্তসারশূন্য। "অন্য সব উন্নয়নশীল দেশের মতোই বাঙলাদেশের মানুষেরও উন্নয়নের সংগ্রাম উৎসারিত হয়েছে অধীনতা ও নির্ভরতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির অন্তর্নিহিত স্বপ্ন ও ইচ্ছে থেকে। আমাদের দেশের মানুষের উন্নয়ন-অন্বেষণ কেবল বৈষয়িক উন্নতির জন্যই নয়। আর কেবল বস্তুগত উন্নতি দিয়ে মানুষের জীবনের উন্নয়ন, জীবনকে মহীয়ান করে তোলার পরিমাপ করা যায় না। থার্লওয়াল যা বলেছেন, তার মোদ্দা অর্থ দাঁড়ায়; উন্নত হওয়ার বিষয় যতটা বস্তুগত, ঠিক ততটাই মনের ব্যাপার। বোধ, চিন্তা, অনুভবগত বিষয় "(এপি থার্লওয়াল (১৯৮৯), গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ম্যাকমিলান, লন্ডন)।" ও আতিয়ার, ২০০২।

www.pathagar.com

বর্তমান জটিল সামাজিক প্রেক্ষাপটে, দেশে উন্নয়নের প্রসঙ্গটি কেবল অর্থনীতির তত্ত্বের সীমানার মধ্যে রাখলেই চলেবে না। একে বিশ্লেষণ করতে হবে মানুষ, তথা সমাজের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ধর্ম, শ্রেণী, ব্যবস্থা, মনোভঙ্গি, ইত্যাদি বহুমাত্রিক আঙ্গিকে। যাতে করে সার্বিক সামাজিক ব্যবস্থা এবং দুর্গতি ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেতে পারে মানুষ ও মানব সমাজ ।

আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের মানুষের দিকে তাকালে দেখা যাবে, খুব সামান্যই গুরুত্ব দেয়া হয় উন্নয়ন কর্মীদের প্রতি। শুধু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বা মুনাফার মনোভাব নিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারই ছিল সকল প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য। বল্গাহীন বাজারের চাহিদা মেটানোই পাচ্ছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। মানুষের কাজে লাগার ও ভোগের মতো যা কিছু রয়েছে, তার সবই নিঃশেষ করা হচ্ছে উন্নয়নের নামে নানা কাজের কাঁচামাল যোগাতে, যা মূলতঃ নিশ্চিত করে বিশেষ জনগোষ্ঠীর আরাম আয়েশকে। নানা বর্ণে ও আচরণে, নানা জনপ্রিয় স্লোগান ও কর্মসূচির নামে এ কাজটি করছে বিশেষ সুবিধাবাদী জনগোষ্ঠী। এসব অপকৌশলের প্রথম বলি হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, অধিকারবোধ, প্রত্যাশা ও প্রত্যয়। এর ফলে বিসর্জন দিতে হয় অতীত অর্জনকে। তাই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মানুষকে রাখতে হবে কেন্দ্রে, করতে হবে মর্যাদাবান ও মহীয়ান। আর উন্নত করতে তার জীবনকে। তাহলেই শহীদের স্বপ্নের ও সাধারণ মানুষের ত্যাগে মধ্যে ঝলসে ওঠে বাংলাদেশের স্ব-উন্নয়নের মূলস্রোত ধারা।

শোষণমুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা সাংবিধানিক অঙ্গীকার

স্বাধীনতাত্তোর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও বিশেষজ্ঞরা সাধারণ মানুষের আশা-আকাংখার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই বাঙলাদেশের সংবিধান রচিত হয়েছিল। সেই সংবিধানে জনগণকেই রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস করা হয়েছে ছিল। তাদের আর্থ-সামাজিক মুক্তির সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে সেই দলিলে। উন্নয়নের মৌলিক অধিকারের অঙ্গীকারগুলো স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত রয়েছে। সেসব অঙ্গীকারকেই পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে নেয়া যেতে পারে। স্ব-উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া যায়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় স্পষ্ঠভাবে উল্লেখ রয়েছে : “আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসেবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করা ... ।”

www.pathagar.com

সংবিধানের প্রথম অধ্যায়ে সংবিধানের প্রাধান্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : "প্রজাতন্ত্রে সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ"; এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে: "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে" (অনুচ্ছেদ ৭(১) ও ৭ (২)।

সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে গণতন্ত্র ও মৌলিক মানবাধিকার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে সে ক্ষেত্রে প্রশাসনসহ সকল ক্ষেত্রে জনগনের সক্রিয় অংশ গ্রহণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে" (অনুচ্ছেদ ১১)।

মালিকানার নীতি প্রসঙ্গে সংবিধানে বলা হয়েছে "উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হিসেবে জনগণ" (অনুচ্ছেদ ১৩)। বাস্তবে এ জনগোষ্ঠি কারা তা এখন বিশ্লেষণ করার সময় এসেছে ।
সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়েই বলা হয়েছে : "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে মেহনতি মানুষকে– কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তিদান করা" (অনুচ্ছেদ ১৪)।

মৌলিক চাহিদা ও প্রয়োজনের ব্যবস্থা প্রসঙ্গে সংবিধানে বলা হয়েছে : "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের অর্জন নিশ্চিত করা যায় : ক. অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারনের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা; খ. কর্মের অধিকার অর্থাৎ গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসংগত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার; গ. যুক্তিগঙ্গত বিশ্রাম বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং (৪) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার" (অনুচ্ছেদ ১৫)।

গ্রাম উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব সম্পর্কে সংবিধানে বলা হয়েছে : "নগর ও গ্রামাঞ্চলে জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকীকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে" (অনুচ্ছেদ ১৬)। এ লক্ষার্জনে জাতিসংঘ শহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য

www.pathagar.com

ঘোষণা করেছে, বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র বিমোচন কৌশল গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এসব লক্ষার্জনে বাংলাদেশ যথেষ্ট এগিয়েও রয়েছে।

সংবিধানে সুসম শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে, জাতীয় চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রশিক্ষণসহ সর্বস্তরে নিরক্ষরতা দূরীকরনের কথা বলা হয়েছে" (অনুচ্ছেদ ১৭)। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

সংবিধানে জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : "জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিদ প্রয়োজন বীত্যত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। পতিতাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে" (অনুচ্ছেদ ১৭)।

কর্মকে অধিকার ও কর্তব্যরূপে ঘোষণা করে সংবিধানে বলা হয়েছে : "কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং 'প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মক্ষমানুযায়ী'– এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করবেন।

"রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও আত্মিক– সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিরধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে"(অনুচ্ছেদ ১৯)।

চলাফেরা, সমাবেশ সংগঠন এবং বাক, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতা প্রসঙ্গে সংবিধানে বলা হয়েছে : "জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে "(অনুচ্ছেদ ৩৬)। 'চিন্তা ও বিবেকের, বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল" "(অনুচ্ছেদ ৩৯)।

www.pathagar.com

কৃষক ও কৃষির সাংবিধানিক অধিকার

বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (অনুচ্ছেদ ১৪) যদিও রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে মেহনতি মানুষ, কৃষক ও শ্রমিকের এবং জনগণের সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্তিদান নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে । বাস্তবে বাংলাদেশে আজ কৃষি ও কৃষক দু'-ই উপেক্ষিত ও অবহেলিত। কৃষি খাতে সরকারি বিনিয়োগ ক্রমান্বয়ে কমছে। দাতাদের শর্তপূরণ করতে কৃষকদের ব্যবহৃত উপকারণের ওপর ভর্তুকিই শুধু তুলে নেয়া হচ্ছে না, বোঝার উপর সাঁকে আটি, এসবের বিতরণেও চলছে চরম অরাজকতা। এ বিষয়ে কোন টেকসই পরিকল্পনা নেই সরকারের। কৃষকরা উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সার ও সেচের সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকছে সর্বাবস্থাতেই। তাদের এ চাওয়া শুধু ন্যায্য নয়, পুরো জতির বাঁচা-মরা ও খাদ্য নিরাপত্তার সাথে জড়িত। এ বিষয়ে কোন টেকসই পরিকল্পনা নেই সরকারের। গত কয়েক বছরে চালের দাম বিশ পেরিয়ে ত্রিশ ছুঁই-ছুঁই করছে। পুরো গ্রামবাংলায় আজ চাল, সার ও সেচ সঙ্কট কৃষকদের নিত্য দিনের সাথী। এমন পরিস্থিতির শিকার হতে পারে এ দেশের কৃষক, তা কেউ কোনদিন কল্পনাও করেনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে। তখন মূলত কৃষকরাই লড়েছে প্রাণ দিয়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের শতকরা ৮০ ভাগই এসেছিল গ্রামবাঙলা থেকে। যারা শহর থেকে এসেছিল তাদেরও ছিল কৃষির সঙ্গে, গ্রামের সঙ্গে নাড়ির সংযোগ। শহরবাসীদের আশ্রয় দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সন্তান পাঠিয়ে হানাদার পাক বাহিনীর নির্যাতন সহ্য করে বাংলাদেশের কৃষকরাই মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের প্রকৃত ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। অথচ সেই কৃষকদেরই আজ দুর্দিন। তাদের পক্ষে কথা বলার কোনো সংগঠিত শক্তি নেই। রাজনীতিও আজ গোষ্ঠী ভিত্তিক শহর নির্ভর।

সত্তরের নির্বাচনী শ্লোগান এবং উনসত্তরের কৃষকদের অসন্তোষের সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক ভিত্তি ছিল, ভূমি প্রশাসনে ব্যর্থতা, ভূমি সংস্কারের অদূরদর্শিতা, কৃষিতে বিনিয়োগের অনীহা, কৃষিঋণের অপর্যাপ্ততা, খাদ্য ঘাটতি, গণবিমূখ স্থানীয় প্রশাসন। এ ছাড়া ও ছিলঃ জলমহাল পত্তন দেবার সময় স্থানীয় মাতাব্বরদের সুবিধে দেয়া হয়। প্রকৃত জেলেদের বঞ্চিত করা, কৃষিঋণ বিতরণের তীব্র সমস্যা, মহাজনের খপ্পরে পড়ে কৃষকদের সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া, কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব, খাস জমি বন্টনের নীতিমালার অভাব। বর্গাদারদেরও ভাগ ও অধিকার সংরক্ষণের নীতিমালার অভাব, কৃষকদের ন্যায্যমূল্যে উপকরণ সরবরাহের উদ্যোগের অভাব, কৃষকদের উৎপাদন পণ্যের- বীজ, সার, কীটপনাশক ও নিত্যব্যবহার্য শিল্পপণ্যের উর্ধ্বমুখী দাম, গ্রামীণ মানুষ তথা কৃষকদের নিরাপদ খাবার পানীয় অভাব।

BIDS এর জরিপে দেখা যায় যে মুক্তিযোদ্ধাদের ৭৫ শতাংশই এসেছিল গ্রাম থেকে। পাকিস্তান নামের অবিবেচক একচোখা রাষ্ট্রটি যে কৃষকের বন্ধু ছিল না, সে সত্যটি

www.pathagar.com

কৃষকসমাজ অতিসহজেই বুঝতে পেরেছিলেন। আর সে কারণেই একাত্তরের যুদ্ধে তাদেরই সন্তানরা দলে দলে যোগ দিয়েছিল, তারাই মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছিল জীবনের সকল ঝুঁকি নিয়ে। ভরসা দিয়েছিল শহরের ভদ্রলোকদের, নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছিল গ্রামের নিরীহ কৃষকরাই। সে অপরাধে তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল হানাদার পাক বাহিনী ও তাদের দোসররা। কিন্তু আজো সামান্যও হাল ছাড়েনি কৃষকরা। তাদের ত্যাগে, ঘামে, উৎসাহে দেশ একদিন শত্রুমুক্ত হলো, স্বাধীন হলো। কিন্তু সাড়ে তিন দশক পরে ও তাদের সাংবিধানিক অধিকার কতটুকু সংরক্ষিত হয়েছে এ প্রশ্ন আজ সকলের !

উপসংহার

ইংরেজ শাসনামল থেকে অত্র অঞ্চলের জননের ইতিহাস এ দেশের জনগণকে উজ্জিবীত করেছে এ কথা আজ ঐতিহাসিকভাবে প্রমানিত। এতো দুর্গম এলাকাতে সে সময় স্বতস্ফুর্তভাবে নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল। এমনকি মহিলা নেতৃত্বও পিছিয়ে ছিল না। শত আন্দোলন করে দেশ শত্রুমুক্ত হল স্বাধীন হল। কিন্তু শাসনতন্ত্রে তাদের সকল অধিকার কথা বিশদভাবে তুলে ধরা হল। কিন্তু বাস্তবে তা রূপায়ন করা সম্ভব হচ্ছে এ কথাও আজ সর্বজন স্বীকৃত। এখন শুধু প্রয়োজন বাস্তবায়নে গ্যাপ পূরণ করে আমাদের সুন্দর স্বপ্নীল দেশ বিশ্বের সামনে তুলে ধরা। সফল হোক সকলের এ প্রত্যাশা।

সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জ

কেদারনাথ মজুমদার (১৯০৭), ময়মনসিংহের ইতিহাস

গোলাম এরশাদুর রহমান (১৯৯৫), মুক্তিসংগ্রামে নেত্রকোণা

আতিউর রহমান (১৯৯৬), মুক্তিযুদ্দের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দারিদ্র্য চিত্র ঃ নেত্রকোণা

পূর্ব ময়মনসিংহের ১,০৭৫ বর্গ মাইল আয়তন বিশিষ্ট ১০টি উপজেলা নিয়ে নেত্রকোণা জেলা গঠিত। এ জেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যময় অন্যতম উপাদানের মধ্যে রয়েছে হাওর বাওর, পাহাড় ও সাপের মত আকা বাকা অসংখ্য নদী নালা। ফলে এখানকার জনগোষ্ঠীর, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বহু স্বকীয়তাও স্বাতন্ত্র্য দিক রয়েছে। জীবনের অনেক দিক, অনেক উপাদান বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ প্রবন্ধে নেত্রকোনা জেলার আর্থসামাজিক অবস্থা ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা নিয়ে মূলত আলোকপাত করা হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ। আমাদের উন্নত জীবনের স্বপ্ন ও এর সফলতা পেতে হলে, এ লক্ষ্যে আমাদের প্রধান অন্তরায় ও বাঁধাগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং প্রয়োজন হবে এ থেকে উত্তরণের উদ্যোগ। তাই জীবনের বিকাশ ও উত্তরণের পথে প্রধান অন্তরায় দারিদ্র্যকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। দারিদ্র্যের পাশাপাশি প্রকৃতির অবদান ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের বিষয়টি ও বিশ্লেষণ করার আবশ্যকতা রয়েছে। নেত্রকোণা জেলার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনন্য এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ পাহাড় ঘেরা, নদী ভরা হাওর বাওর এ পরিবেষ্টিত, শস্য শ্যামল ও সবুজ সুফলা বৈশিষ্ট্যে জেলাটি অনন্য ও অদ্বিতীয়। দারিদ্র্যের বিষয় আলোকপাত করতে হলে প্রথমে দেখতে হবে এ জেলার জনগোষ্ঠীর অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কতটুকু নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে এ জনগোষ্ঠীকে ভরণ পোষণ করার মত প্রকৃতির বহন ক্ষমতা (Carrying Capacity) এর অবস্থানটিও পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

গড় পরিবারের সদস্য সংখ্যা

বর্তমান আলোচনায় নেত্রকোণা জেলার অবস্থার সাথে বৃহত্তর ময়মনসিংহের অন্যান্য জেলা ও ঢাকা বিভাগের অবস্থা তুলনা করা হয়েছে। সারণী ৯.১ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নেত্রকোণায় মোট গড় পরিবারের সদস্য সংখ্যা ঢাকা বিভাগের পরিবারের গড়ের চেয়ে কম। তবে কিশোরগঞ্জ জেলার পরিবারের সদস্যদের গড়ের চেয়ে বেশ কম। নেত্রকোণা জেলার গ্রামীণ পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৭৭ জন যা ঢাকা বিভাগ ও কিশোরগঞ্জ জেলার গ্রামীণ পরিবারের সদস্যদের গড়ের চেয়ে কম, তবে বৃহত্তর ময়মনসিংহের অন্যান্য জেলার গ্রামীণ পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যার চেয়ে বেশী। শহরের গড় পরিবারের ক্ষেত্রে নেত্রকোণা জেলার পরিবারের গড় একই রকম অর্থাৎ গড়ে ৫.০৮ জন। পরিবারের আকার বড় থাকায়

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য কারণের মধ্যে রয়েছে উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, যেমন নেত্রকোণার গ্রামাঞ্চলের অনেক জোতদার ধন-সম্পদ দেখাশুনার অজুহাতে একাধিক বিয়ে করে থাকেন। এভাবে তারা নানাবিধ কুসংস্কার ও কুপমুন্ডকতার শিকার। গরীব শ্রেণীর লোক বেশি সন্তান গ্রহণ করে থাকে, তারা মনে করে বেশি সন্তান হলে উপার্জন বেশি হবে। উপযুক্ত শিক্ষা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার অভাবে অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কারের ফলে পরিবারের ব্যবস্থাপনা, সন্তান গ্রহণ এবং তাদেরকে সমাজের উপযুক্ত প্রতিনিধি করার মত পরিকল্পনা গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। তাছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদের উপর যথা ভূমি, বন ও মৎস্য সম্পদের উপর জীবিকার্জনের অধিক নির্ভরশীলতা ।

সারণী ৯.১: গড় পরিবারের সদস্য সংখ্যা

বিভাগ/ জেলা	মোট	গ্রামীণ	শহর
ঢাকা বিভাগ	৪.৭৩	৪.৮১	৪.৫৫
নেত্রকোণা জেলা	৪.৭৯	৪.৭৭	৫.০৮
ময়মনসিংহ	৪.৬৬	৪.৬৩	৫.০৬
কিশোরগঞ্জ	৫.১৪	৫.১৩	৫.২৩
জামালপুর	৪.৪৫	৪.৪২	৪.৫৯
শেরপুর	৪.৩০	৪.২৬	৪.৭২
টাঙ্গাইল	৪.৫৫	৪.৫৩	৪.৭

Source : BBS: Vital Sample Registration System (VSRS), ২০০২

আবাসন

সুন্দর জীবন যাপনের অন্যতম মৌলিক চাহিদা বাসযোগ্য সুন্দর বাসস্থান। আমাদের দেশের মত প্রতিটি স্বাধীন দেশে শাসনতান্ত্রিকভাবে স্বীকৃত জীবনের মৌলিক চাহিদার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে এ সব চাহিদাপূরণের জন্য শাসনতন্ত্রে বিধান রয়েছে। Annex-A, সারণী ৯.১ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, পাকা বাড়ি বা দালানে বাস করে এমন সদস্যের সংখ্যা বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও ঢাকা বিভাগের মধ্যে সর্ব নিম্নে রয়েছে নেত্রকোণা জেলা যা ০.৫৪ শতাংশ মাত্র, পক্ষান্তরে ঢাকা বিভাগে এর সংখ্যা ১২.০৭ শতাংশ। নেত্রকোণা জেলায় আধা পাকা বাড়ির বসবাস করে মাত্র ২.৮৪ শতাংশ লোক, অথচ ঢাকা বিভাগে এর পরিমান ৮.৯৩, প্রায় তিনগুণের বেশী অর্থাৎ ৯ শতাংশ। বৃহত্তর ময়মনসিংহের অন্যান্য জেলাগুলোর মধ্যেও নেত্রকোণার অবস্থান তৃতীয়। নেত্রকোণা জেলার নিম্ন গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রায় ৫৮ শতাংশ লোক টিন ও কাঠের ঘরে বসবাস করে। ঢাকা বিভাগে এ সংখ্যা ৬৩ শতাংশ। এ জেলার সাধারণ ৩৬ শতাংশ জনগোষ্ঠী বাঁশের নির্মিত ঘরে বাস করে যা, বৃহত্তর ময়মনসিংহে সর্বোচ্চ। ঢাকা বিভাগের এ

www.pathagar.com

সংখ্যা ৯ শতাংশ। এর অন্যতম কারন নেত্রকোণা জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ছাড়াও সিলেট ও অন্যান্য পাহাড়ী এলাকা থেকে বাঁশের প্রচুর আমদানী রয়েছে। এ ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে এবং নির্বিচারে এ সম্পদ আহরণ অব্যাহত থাকলে জেলার প্রাকৃতিক ভারসাম্য প্রায় হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। তাই যথা সময়ে যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে আত্মনির্ভরশীল জীবন ও প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে। চিত্র-৯.১ ও ৯.২ এ ঢাকা বিভাগ ও নেত্রকোণা জেলার গৃহনির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের তুলনামূলক বিবরণীর বর্ণনা দেয়া হল।

চিত্র - ৯.১ : আবাসন: গৃহ নির্মাণ, নেত্রকোণা

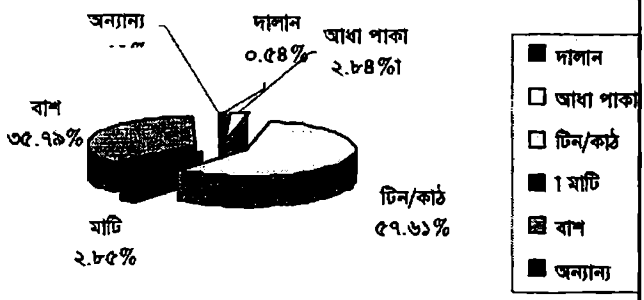

চিত্র - ৯.২ : গৃহ নির্মাণ সামগ্রী, ঢাকা বিভাগ

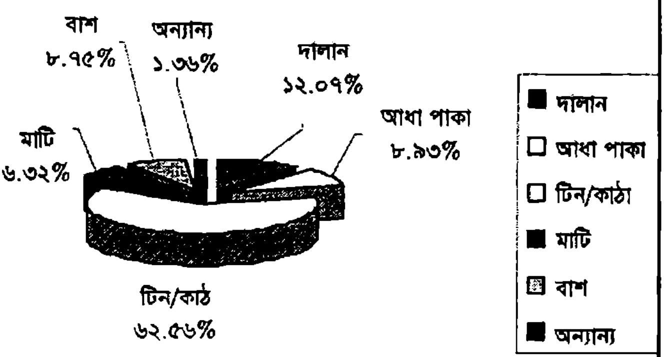

www.pathagar.com

সুপেয় পানীয়, জল

জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও সুস্থ জীবনযাপনের অন্যতম পূর্বশর্ত সুপেয় পানীয় পান করা। পানির অপর নাম জীবন। অন্যদিকে মানবজীবনে সকল রোগের প্রধান উৎস পানি। নেত্রকোণার দারিদ্র্য চিত্র আলোচনায় Annex-A সারণী ৯.২ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগে টেপের পানি পান করে ১৭.০ শতাংশ, অপরদিকে নেত্রকোণা জেলায় এ সুযোগ পায় মাত্র ০.৩৯ শতাংশ জনগোষ্ঠী। টিউবয়েলের পানি পান করে এর সংখ্যা নেত্রকোণা জেলায় ৯৯.২৮ শতাংশ। তাও টাঙ্গাইল ছাড়া অন্যান্য জেলার চেয়ে কিছুটা কম। টিউবওয়েলের পানি হলেও কোন অবস্থাতেই সব জেলার জন্য তা নিরাপদ নয়। কোথাও কোথাও আর্সেনিক ইতোমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনো আর্সেনিক যুক্ত টিউবওয়েলগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। যে সমস্ত এলাকায় আর্সেনিক যুক্ত টিউবওয়েলগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, সে সব স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করণ করে জরুরী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। দুর্গাপুর উপজেলার কুল্লাগড়া ইউনিয়নের বিপিনগঞ্জ গ্রাম সরেজমিনে পরিদর্শন কালে দেখা যায় ওয়ার্ল্ড ভিশনের আর্থিক সহায়তায় কতিপয় উপজাতীয় (গারো) পরিবার কমিউনিটি ভিত্তিতে বৃষ্টির পানি আহরণের ব্যবস্থা করেছে। এক্ষেত্রে জলধার তৈরী করে সারা বৎসরের জন্য ৮-১০টি পরিবারের সুপেয় পানির সংস্থান করতে প্রায় ১ লক্ষ টাকা খরচ হয়। চিত্র-৯.৩ ও ৯.৪ এ ঢাকা বিভাগ ও নেত্রকোণা জেলার সুপেয় পানির উৎসের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হয়েছে।

চিত্র - ৯.৩ : নেত্রকোণা জেলা, সুপেয় পানীয়জল

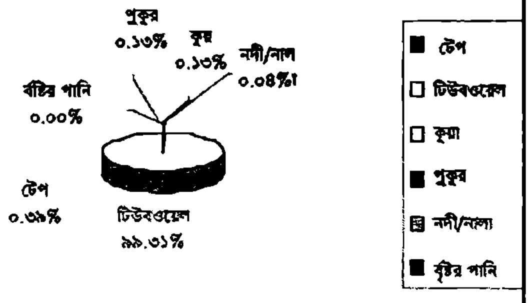

www.pathagar.com

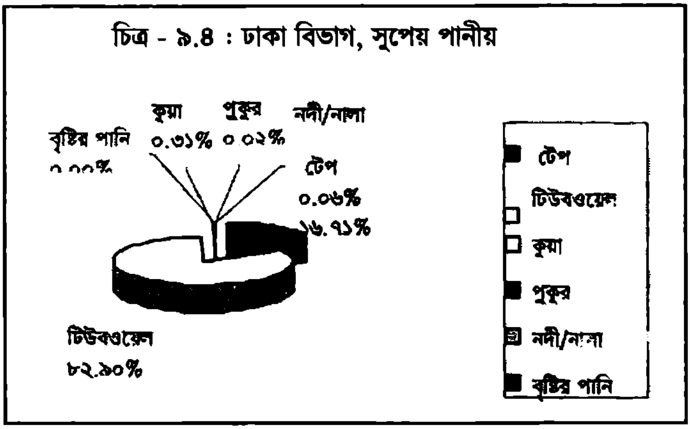

জ্বালানির উৎস

সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ব্যাপক উদ্যোগ থাকা সত্ত্বে ও দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ লোক এখনো বিদ্যুৎ সংযোগের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বিকল্প হিসাবে অবশিষ্ট জনগোষ্ঠী কেরোসিন ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে কেরোসিন কি আর সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে? তাহলে দেশের তথা নেত্রকোণার ৮০ শতাংশ লোকের ঘরে আলো জ্বলবে কিভাবে এ বিষয়টি ভাববার এখনই উপযুক্ত সময়। Annex-A সারণী ৯.৩ বিদ্যুৎ সংযোগের দিকটি পর্যালোচনায় দেখা যায় জেলার ১৬ শতাংশ জনগোষ্ঠীর মাত্র এ সুবিধা রয়েছে যা টাঙ্গাইল ২৫ শতাংশ এবং ময়মনসিংহে ১৮ শতাংশ। পক্ষান্তরে ঢাকা বিভাগে এ সুবিধা রয়েছে ৪৫ শতাংশ জনগোষ্ঠীর যা নেত্রকোণার চেয়ে তিনগুণেরও বেশী। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহের ৮০ শতাংশ গ্যাস ভিত্তিক দেশে ব্যাপক বিদ্যুৎ চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ক্রমাগত পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহের সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়টি এখনো পরীক্ষাধীন রয়েছে। এ বিবেচনায় বিদ্যমান প্লান্টগুলোতে নিয়মিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে নতুন করে বিদ্যুৎ বিতরণ সম্প্রসারণ ও সংযোগ কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে আরো পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। বিদ্যুৎ ও কেরোসিনের ব্যবহার সংক্রান্ত তুলনামূলক চিত্র ৯.৫ ও ৯.৬ দেখানো হল।

জ্বালানী নিরাপত্তা

জ্বালানি নিরাপত্তা সভ্যতা ও উন্নত জীবন যাপনের পূর্বশর্ত। গ্রাম গঞ্জের ৮০ শতাংশ মানুষ দু'বেলা ভাতের চাল ডাল যোগাড় করতে পারলেই যে তার খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত হয়ে গেল এমন কোন কথা নেই। সে জন্য থাকতে হবে পর্যাপ্ত জ্বালানি ব্যবস্থা। সৌভাগ্যক্রমে এ

www.pathagar.com

চিত্র - ৯.৫ : নেত্রকোণা জেলা, কেরোসিন ও বিদ্যুতের ব্যবহার

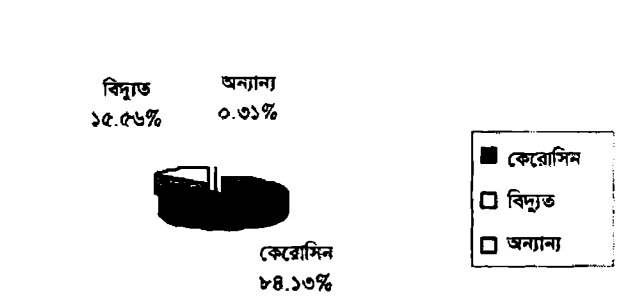

চিত্র - ৯.৬ : ঢাকা বিভাগ, কেরোসিন ও বিদ্যুতের ব্যবহার

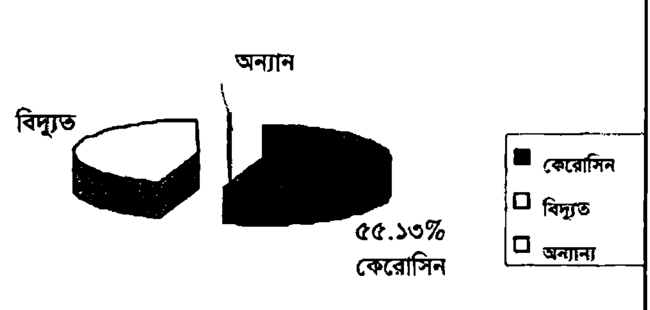

দেশে হিটিং এর প্রয়োজন হয় না। বিভিন্ন গবেষণা এবং বাস্তব ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, জ্বালানির অভাবে এ দেশের গ্রামে গঞ্জের মানুষ এক বেলা রান্না করে দু' তিন বেলা খেয়ে থাকে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাদের খাবার পঁচেও যায়। মোট কথা বাসি খাবার খাওয়ার ফলে সম্পূর্ন food value তারা গ্রহণ করতে পারে না। দেশের অন্যান্য জেলার মত নেত্রকোণার মানুষও খড়, তুষ/ভুষি/বাঁশ/কাঠ/কেরোসিন/ বিদ্যুৎ /গ্যাস ইত্যাদি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে। ঢাকা বিভাগ ও নেত্রকোণার জ্বালানী নিরাপত্তার বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নেত্রকোণা জেলায় গৃহ নির্মাণের ন্যায় বাঁশ ও কাঠের ব্যবহার সর্বোচ্চ ৬৮ শতাংশ। এর প্রধান কারণ গ্যাস ও অন্যান্য বিকল্প জ্বালানী না থাকায় বাঁশ ও কাঠের যোগান ও অন্যান্য এলাকার চেয়ে বেশি এবং তুলামূলকভাবে মূল্যও কম। এ নবায়নযোগ্য সম্পদ আহরণের পরিমান পুনর্জন্ম প্রবৃদ্ধি এর চেয়ে বেশী বা কম এ পরিমাণ নির্ধারণ ও নিয়মিত মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা উচিত। অন্যথায় জীববৈচিত্র্যসহ এ সম্পদ হারিয়ে যাবে। ফলে এ জেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের কষাঘাত আরো বাড়বে।

www.pathagar.com

পরিণতিতে এ এলাকায় আধুনিক সভ্যতার আলো পৌঁছা বাধাপ্রাপ্ত হবে মারাত্মক ভাবে। চিত্র ৯.৭ ও ৯.৮ ঢাকা বিভাগ ও নেত্রকোণা জেলার জ্বালানী উৎসের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হলো। আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে তুলনা করলে জ্বালানী উৎসের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ও ভয়াবহ বলে প্রতীয়মান হয়। ঢাকা বিভাগে জ্বালানী হিসেবে বিদ্যুতের ব্যবহার মাত্র ১.৪৯ শতাংশ। অথচ নেত্রকোণা জেলায় এর পরিমান ০.৪১ শতাংশ। জ্বালানী হিসেবে গ্যাসের ব্যবহার ঢাকা বিভাগে ১৯ শতাংশ। পক্ষান্তরে নেত্রকোণা জেলায় গ্যাস এর ব্যবহার ০.৯১ শতাংশ যা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য (Annex-A, সারণী ৯.৪)।

চিত্র - ৯.৭ : ঢাকা বিভাগ জ্বালানীর উৎস

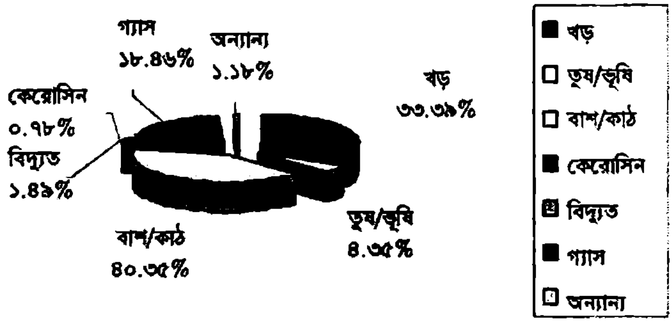

চিত্র - ৯.৮ : নেত্রকোণা জেলা, জ্বালানীর উৎস

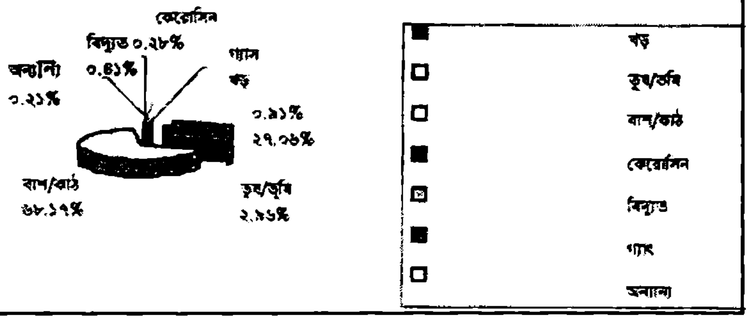

পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাদি

দূষণমুক্ত পরিবেশে বসবাস করা সুস্থ থাকা ও স্বাস্থ্য সম্মত জীবন যাপনের পূর্বশর্ত। Annex-A, সারণী ৯.৫ এ দেখা যায় ঢাকা বিভাগে ৪৭ শতাংশ মানুষ স্যানিটারী টয়লেট ব্যবহার করে। পক্ষান্তরে নেত্রকোণা জেলায় ৩৫ শতাংশ লোক বাড়ির আঙ্গিনায় জঙ্গল বা নদীর ধারে অথবা রাস্তার ধারে তাদের মলমূত্র ত্যাগ করে। স্যানিটারী টয়লেটের সুবিধা

www.pathagar.com

রয়েছে মাত্র ২৭ শতাংশ লোকের। এভাবে যত্রতত্র পয়:নিস্কাশনের ফলে বদ্ধ জলাশয়, ছোট ছোট নদী নালার পানি দূষিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে অন্যান্য পরিবেশ দূষণ কারী উপাদান তো আছেই। এর ফলে মারাত্মক ঝুঁকির মুখে রয়েছে আমাদের জনস্বাস্থ্য। দক্ষ জনশক্তির জন্য প্রয়োজন উন্নত জনস্বাস্থ্য। জনস্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লে, কমে যাবে কর্মদক্ষতা এবং বেড়ে যাবে চিকিৎসা খরচ। সর্বোপরি ব্যাহত হবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন। চিত্র ৯.৯ ও ৯.১০ এ বিভাগীয় স্যানিটারী সুবিধাদির নেত্রকোণা জেলায় এ সুযোগ রয়েছে অর্ধেকে প্রায়। বিশাল এ জনগোষ্ঠীর পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারলে জেলার জনস্বাস্থ্যেরও কর্মদক্ষতার হার বিপর্যস্ত হবে তা প্রায় নিশ্চিত।

চিত্র - ৯.৯ : ঢাকা বিভাগ : পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাদি

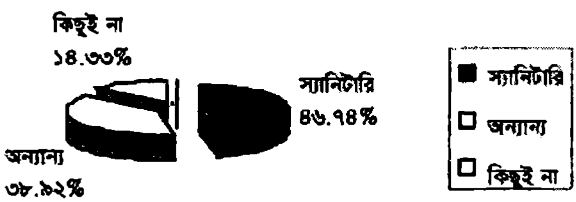

চিত্র - ৯.১০ : নেত্রকোণা জেলা ; পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাদি

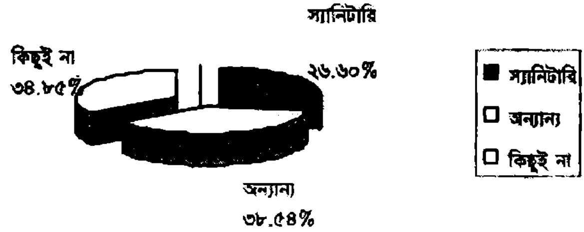

জেলার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড দারিদ্র পরিমাপের অন্যতম উপাদান। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের দিক বিবেচনা করলে নেত্রকোণা জেলার অবস্থান ময়মনসিংহ জেলার পর (Annex-A, সারণী

www.pathagar.com

৯.৬)। এ জেলার প্রায় ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠী স্থায়ি বা অস্থায়ি ভাবে অস্বচ্ছল। এ অবস্থা বিভাগীয় পর্যায়ে ৩৬ শতাংশ এবং ময়মনসিংহে ৪২ শতাংশ। আয়-ব্যয় সমান এমন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বৃহত্তর ময়মনসিংহের জেলা গুলোর মধ্যে দরিদ্রতম জেলা জামালপুরের চেয়ে কিছুটা ভালো অবস্থায় রয়েছে নেত্রকোণা। তবে স্বচ্ছল জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিভাগীয় পর্যায়ের কাছা কাছি এর অবস্থান। সঞ্চয়কারী জনগোষ্ঠী নেত্রকোণা, বিভাগীয় পর্যায় ও ময়মনসিংহের অন্যান্য জেলার জনগোষ্ঠীর চেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে। এ বিশাল দারিদ্রের মাঝেও নেত্রকোণায় স্বচ্ছল জনগোষ্ঠী বেশী হবার অন্যতম কারণ, বিরাট পরিমান ভূমি যা অত্যন্ত উর্বর ও উচ্চ ফলনশীল। এ ছাড়া রয়েছে অন্যান্য বিপুল পরিমান প্রাকৃতিক সম্পদ। যেমন পাহাড়ের বন, হাওর, বাওর এর মৎস্য সম্পদ। তাছাড়া ঘন ঘন নদী নালা খাল বিল আধুনিক চাষাবাদে এবং সেচ ব্যবস্থায় অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। চিত্র ৯.১১ ও ৯.১২ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ঢাকা বিভাগ ও নেত্রকোণা জেলার তুলনামূলক বিবরণী লক্ষ্য করা যেতে পারে।

চিত্র - ৯.১১ : ঢাকা বিভাগ, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

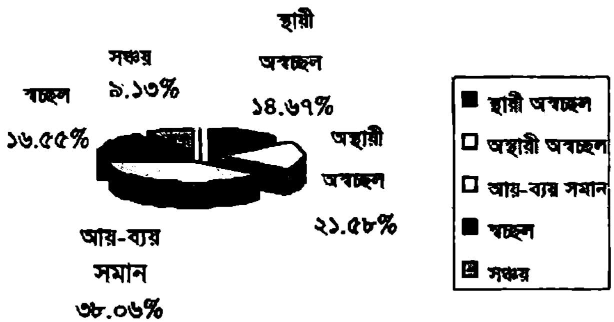

চিত্র - ৯.১২ : নেত্রকোণা জেলা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

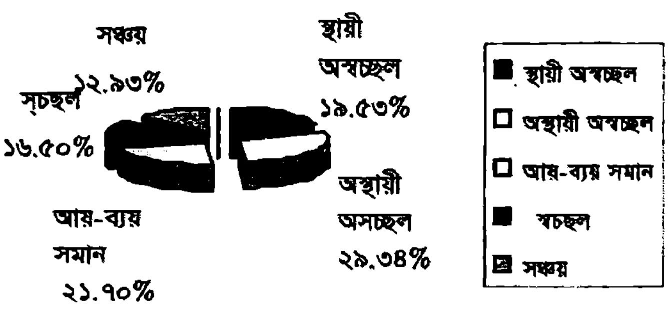

www.pathagar.com

স্থূল জন্মহার [Crude Birth Rate (CBR)]

জেলার CBR চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নেত্রকোণা জেলায় এর হার বিভাগীয় পর্যায় ও বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে সর্বাধিক। বিভাগীয় পর্যায়ে CBR প্রতি হাজারে ২১জন যা নেত্রকোণায় রয়েছে প্রতি হাজারে প্রায় ২৬ জন। নেত্রকোণা জেলার শহর অঞ্চলের CBR বৃহত্তর ময়মনসিংহের জেলাগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম এমনকি বিভাগীয় পর্যায়ের চেয়ে ও ভালো যা প্রতি হাজারে ১৮ জন। মারাত্মক আশংকা জনক অবস্থায় CBR রয়েছে নেত্রকোণার গ্রামাঞ্চলে যা শহর অঞ্চলের প্রায় দ্বিগুণ (সারণী ৯.২)। এ পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ জেলার গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একেবারেই সেকেলে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, এ জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই জরাজীর্ণ আর এ কারণে ডাক্তার, ঔষধ ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সুবিধাদি গ্রাম পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে না।

সারণী ৯.২: স্থূল জন্মহার প্রতি হাজার (Crude Birth Rate per 1000)

বিভাগ/ জেলা	মোট	গ্রাম	শহর
ঢাকা বিভাগ	২১	২২.৫৫	১৭.৪৮
নেত্রকোণা জেলা	২৫.৪১	২৬.০৮	১৪.৯০
ময়মনসিংহ	২৪.৮১	২৫.৫৯	১৬.৭০
কিশোরগঞ্জ	২৩.৭২	২৪.৩৫	১৬.৬৮
জামালপুর	২৩.৪৮	২৪.৬৩	১৬.৬৯
শেরপুর	২১.২৯	২১.৭৩	১৬.৩৯
টাঙ্গাইল	২৩.৭৫	২৪.৫৪	১৭.২২

Source : BBS: Vital Sample Registration System (VSRS), 2002

প্রজনন অবস্থা

সারণী ৯.৩ থেকে দেখা যায় TFR ঢাকা বিভাগ ও বৃহত্তর ময়মনসিংহের অন্যান্য জেলার ১৫ থেকে ৩৪ বছর বয়সের মহিলাদের প্রজনন ক্ষমতার হার ও ঢাকা ও বৃহত্তর ময়মনসিংহের অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেক বেশী। এর প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে, শিক্ষার অভাব, বাল্যবিবাহ, স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব, বহু বিবাহ এবং সামাজিক কুসংস্কার যেমন আল্লাহ মুখ দিয়েছে আহারও দিবে। সর্বোপরি শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সামাজিক সচেতনতার অভাব ।

www.pathagar.com

সারণী ৯.৩: বয়স ভিত্তিক প্রজনন হার (Age Specific Fertility Rate) প্রতি হাজার মহিলা (মোট জন্ম,Total Birth) : (TFR)

জেলা	১৫-১৯	২০-২৪	২৫-২৯	৩০-৩৪	৩৫-৩৯	৪০-৪৪	৪৫-৪৯	TFR
ঢাকা বিভাগ	৪৯	১৫৬.২৬	১৪৭.১৯	১০০.০৫	৪৯.২৪	২০.৬৯	১৩.২১	২.৬৭
নেত্রকোণা জেলা	৭৮.১১	২০২.৯৪	২১১.২৬	১৩৪.১৬	৭৮.৪১	২৪.৯৭	২০.৭৪	৩.৭৫
ময়মনসিংহ	৬৪.৪৯	১৮৫.৯৪	১৭৪.০৪	১২৪.৫২	৭৮.৮৭	২৯.৭৪	১৯.৬৫	৩.৩৮
কিশোরগঞ্জ	২৮.১৬	১৫৮.২০	১৬৭.৫০	১৫৫.৫৭	৯৪.৬৯	১৫.৬৭	২২.৭৫	৩.২১
জামালপুর	৬৮.৩১	১৭৬.৩৭	১৬৭.১৩	১২২.৮৯	৩৩.৬৫	৪১.৬২	১১.২৯	৩.১০
শেরপুর	৫৫.৬৬	১৭৬.০৯	১৩৩.০২	৮৩.৬২	৫২.৪৭	২৮.৮১	১০.৯৬	২.৭০
টাঙ্গাইল	৭৬.১৭	১৭৮.৩০	১৪৮.৮৭	৮৬.৬৪	৪৬.২৪	২৮.৭৭	৩৪.১৭	২.৯৯

Source : BBS: Vital Sample Registration System (VSRS), 2002

সারণী ৯.৩ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, TFR এর ন্যায় নেত্রকোনার NRR ও ঢাকা বিভাগ ও বৃহত্তর ময়মনসিংহের অন্যান্য জেলার চেয়ে বেশী। সারণী ৯.৫ এ ১৯৯৭-২০০২ সালের চিত্র তুলনা করলে দেখা যায় যে, নেত্রকোণা জেলায় NRR ১.৭৫ থেকে ১.৫৯ কমে এসেছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘদিন সরকারী ব্যাপক উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও এ হার অত্যন্ত বেশী। দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যা জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ বৃদ্ধি করছে নিঃসন্দেহে। এ বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ জেলার প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য বিরাট অন্তরায় এ কথা বলা যায় নিঃসন্দেহে।

সারণী ৯.৪: বয়স ভিত্তিক প্রজনন হার (Age Specific Fertility Rate) প্রতি হাজার মহিলা: (NRR)

জেলা	১৫-১৯	২০-২৪	২৫-২৯	৩০-৩৪	৩৫-৩৯	৪০-৪৪	৪৫-৪৯	NRR
ঢাকা বিভাগ	২৩.১৩	৭৬.৯৫	৭১.৯৯	৪৯.৩৮	২৪.৮২	১০.০৯	৬.৯৫	১.১৭
নেত্রকোণা জেলা	৩৯.০৫	৯৩.২৮	১০৬.২২	৪৭.৭৭	৩৫.৬১	২০.২৮	৭.৫৫	১.৫৯
ময়মনসিংহ	৩০.৮৭	৮৫.৬৬	৯৭.১৫	৬০.৭০	৪০.৫৮	১৮.৫১	৬.৩০	১.৫৩
কিশোরগঞ্জ	১০.৭৬	৬৬.৪৯	৯১.৩৬	৭৪.২৯	৫৫.২৪	১০.৬১	৬.০৯	১.৪০
জামালপুর	৪৭.১৪	৭৪.৫৪	৭৬.৩৩	৭২.০৯	২০.৬৩	১১.৫৪	৯.৮১	১.৪১
শেরপুর	২২.৩৬	১০৫.৯৯	৮১.৯৫	৪৩.০২	৩০.৬৯	১৪.১৪	৫.৪৮	১.৩৯
টাঙ্গাইল	৩৩.০৭	৮৮.৮০	৫৮.৯০	৫২.১৪	২১.৮১	১২.৭৩	৭.৬৯	১.২৫

Source : BBS: Vital Sample Registration System (VSRS), 2002

www.pathagar.com

সারণী ৯.৫ নীট পুন:প্রজনন হার (Net Reproductive Rate) (১৯৯৭-২০০২)

বিভাগ/ জেলা	২০০২	১৯৯৮	১৯৯৭
নেত্রকোণা জেলা	১.৫৯	১.৬৭	১.৭৫
ময়মনসিংহ	১.৫৩	১.৭৬	১.৮৪
কিশোরগঞ্জ	১.৪	১.৬৭	১.৭৫
জামালপুর	১.৪১	১.৫৫	১.৬৩
শেরপুর	১.৩৯	১.৬১	১.৬৯
টাঙ্গাইল	১.২৫	১.৫১	১.৫৮

Source : BBS: Vital Sample Registration System (VSRS), 2002

১৯৯৬ ও ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি জরিপের তুলনামূলক বিবরণী

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর ১৯৯৬ সালের কৃষি জরিপে কৃষিখাতের কতিপয় মৌলিক উপাদানের সাথে ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি জরিপের একটি তুলনামূলক বিবরণী দেয়া হয়েছে। এর প্রধান উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে, বাসস্থান এলাকা, মোট ও নীট আবাদযোগ্য এলাকা মাথাপিছু হোল্ডিং, শস্য উৎপাদনের তীব্রতা (cropping Intensitity), সেচ ব্যবস্থার আওতাধীন এলাকা, ও গৃহপালিত পশু পাখীর সংখ্যা। পরিসংখ্যানটি জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও মৌজা বা গ্রাম পর্যায়ে দারিদ্র্যচিত্র পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এসব সংখ্যা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে স্থানীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব।

Annex-A সারণী-৯.৭ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৯৮৩-৮৪ সালের জরিপে প্রতিহোল্ডিং এর জন্য ০.০৮ একর বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। মোট কৃষিহোল্ডিং এর ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ছিল ০.০৯ একর। কৃষি জরিপ ১৯৯৬ এ পরিমাণ সকল হোল্ডিং এর ক্ষেত্রে কমে ০.০৭ দাঁড়িয়েছে। তবে মোট কৃষিহোল্ডিং ও অন্যান্য বিভিন্ন আকারের কৃষি ক্ষেত্রে তা অপরিবর্তিত রয়েছে। নীট আবাদী ভূমির জন্য সকল হোল্ডিং এর ক্ষেত্রে ১৯৯৮৩-৮৪ সালে ১.৮২ এবং মোট কৃষি হোল্ডিং এর জন্য ২.৫৬ ছিল যা কমে ১৯৯৬ সালে যথাক্রমে ১.২৬ ও ২.০১ এ দাঁড়িয়েছে। দেশের জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির বিশ্লেষণে এর তাৎপর্য অনেক অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভূমির বিবিধ ব্যবহার বাড়ছে, সেই প্রেক্ষাপটে নীট আবাদি জমির পরিমান কমতে থাকবে। মাথাপিছু নীট আবাদী জমি কমতে থাকলে নেত্রকোণা জেলার জন্য মারাত্মক হুমকির সম্মূখীন হবে সেখানকার বিরাট জলমহালগুলি যা দ্রুত

www.pathagar.com

কৃষিভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে। এ জেলার পাহাড়ী জমি, নদী ও খাল ভরাটের যা অবস্থা তা পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। এ বিবেচনায় দেশের তথা নেত্রকোণা জেলার বিরাট জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি অনিশ্চিত থাকবে যা দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রবৃদ্ধির বিবেচনায় সর্বোপরি উন্নয়ন সহায়ক হবে না।

খাদ্য নিরাপত্তা ও শস্য তীব্রতা

খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষি জমির যেমন ব্যাপক চাহিদা বাড়ছে, পাশাপাশি আমাদের আবাদী জমিগুলির কৃষি তীব্রতাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি জরিপ ১৯৮৩-৮৪ সালে যেখানে শস্য নিবিড়তা ছিল ১৫৭.৮। ১৯৯৬ সালের জরিপে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৯ এ দাঁড়িয়েছে। এ তীব্রতা ছোট ও মাঝারী আকারের খামারগুলির ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেলেও বৃহৎ আকারের ক্ষেত্রে কমেছে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে বড় জমিনের মালিকরা বেশির ভাগই অনুপস্থিত মালিক (Absentee Owner).

জেলার বর্ধমান বিরাট জনগোষ্ঠীর কল্যাণে, জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ক্রমাগত প্রাকৃতিক সম্পদের ধারণ ক্ষমতার (carrying capacity), উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। তাই উন্নয়ন পরিচালনায় সর্বক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের ধারণক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে, অন্যথায় প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়, অবক্ষয় ও পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা (Ecological Imbalance) দেখা দিবে। নেত্রকোণা জেলার সেচব্যবস্থার তথ্য পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, আশির দশকের চেয়ে বর্তমানে সেচ ব্যবস্থা প্রায় দ্বিগুণ। সার ব্যবহারও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সার ব্যবহারের জন্য তথ্য থেকে দেখা যায় যে, সার ব্যবহারের হোল্ডিং সংখ্যা ছোট ও বড় খামারের চেয়ে মাঝারি আকারের খামারের সংখ্যা বেশি। এর কারণ হিসাব অতি সহজেই অনুমেয় যে, ছোট খামারের মালিকরা তা বহন করতে পারেনা আর বড় খামারের মালিকদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন দুইটির অভাব রয়েছে। মাঝারি খামারের মালিকদের সামর্থ্য কিছুটা রয়েছে। তবে বেশি প্রবণতা হয়েছে তাদের প্রয়োজনের ও আন্তরিকতার।

শস্য আবাদ এলাকা (Crop Area)

Annex-A সারণী-৯.৭ থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আশির দশকের চেয়ে ১৯৯৬ এর কৃষি সারণী অনুযায়ী HYV আউশ, এবং পাজাম, HYV বোরো ও পাজাম আবাদ এলাকা প্রায় দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিষয়ে বহুবিধ তাৎপর্য রয়েছে প্রথমত: অকৃষি জমি কৃষি খামারে রূপান্তরিত হয়েছে যেমন জলাভূমি, বন ও মৎস্য চাষ এলাকা। দ্বিতীয়ত: কৃষি জমিতে পূর্বে ধান ব্যতিত অন্য কিছু চাষাবাদ করা হতো। সময়ের প্রয়োজনে অন্য কৃষি চাষাবাদ না করে বোরো ধান চাষ করা হচ্ছে যেমন ডাল চাষাবাদ ৯,৬৩৮ (১৯৮৩-৮৪) থেকে ৩,৩৩৩ (১৯৯৬) এ কমে এসেছে।

www.pathagar.com

তৈলবীজ ২৫,১০৬ (১৯৮৩-৮৪) থেকে কমে ১৬,৮৯৮ (১৯৯৬) কমে এসেছে। অর্থকরী ফসল (Cash Crop) ৬১,৬২২ (১৯৮৩-৮৪) থেকে কমে ২৭,৭৭০ এ দাঁড়িয়েছে। তবে খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজনে সক্ষম গম চাষ বেড়েছে প্রায় তিনগুণ।

বাংলাদেশে পশু সম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন উদ্যোগ

বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতিতে পশু সম্পদ, পশু-পাখি, প্রানিজ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, পশু-পাখি পালন ও কর্মসংস্থান, পশু-সম্পদের বাণিজ্যিক খামার স্থাপন ও কর্মসংস্থানসহ বহুবিধ গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রয়েছে। এই বিষয়ে ড. কাশেম তাঁর "বাংলাদেশের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি" নামক গ্রন্থে জাতীয়ভাবে এই সেক্টরটি সম্প্রসারণের ও সরকারী উদ্যোগের বিষয় আলোকপাত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখী রয়েছে। তার মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি, কবুতর প্রভৃতি প্রধান। গ্রামাঞ্চলে পারিবারিক ভিত্তিতে এ সকল পশু পাখি পালন করা হয়ে থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদেরকে কৃষি খামারের সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ দেশে বাণিজ্যিকভাবে পশু-পাখি পালনের বিস্তার লাভ শুরু হয় নব্বই দশকের শুরুতে। ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে সরকার গাভী ক্রয়ে ভর্তুকি প্রদান শুরু করলে দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের মাধ্যমে দেশে দ্রুত দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা। বর্তমানে এ প্রাণীজ খাদ্যের উৎস হলো পারিবারিক উদ্বৃত্ত ও বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত দুধ এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত গুড়া দুধ।

বাংলাদেশে প্রানিজ খাদ্যের প্রধান উৎসই হলো পারিবারিক উৎপাদন, তবে পশু-পাখি উন্নত জাতের না হওয়ায় তাদের উৎপাদনশীলতা অতি অল্প। যেমন একটি স্বাভাবিক গাভীর দৈনিক দুধের গড় উৎপাদন মাত্র এক কেজি এবং দুধ প্রাপ্তির সময়কাল চার-পাঁচ বছর, আর একটি ছাগলের দৈনিক দুধের গড় উৎপাদন মাত্র এক-চতুর্থাংশ কেজি। একটি ৪-৫ বছর বয়স্ক গরুর মাংসের পরিমাণ ১০০ কেজির মত এবং তিন বছরের ছাগল-ভেড়ার উৎপাদন ৮-১০ কেজি। সবচেয়ে অবাক হতে হয় যখন দেখা যায় যে, এসকল গবাদি পশু-পাখীর জন্য কোন পরিবারই প্রয়োজনীয় খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে না। গরু-মহিষের প্রধান খাদ্য উৎপাদন হলো খামারের উচ্ছিষ্ট খড়, ঘাস ও চালের কুঁড়া। অন্যদিকে হাঁস-মুরগির ক্ষেত্রে খাদ্যের কোন বালাই নেই। তারা বাড়ির আঙ্গিণা এবং চারপাশ থেকে যা খুঁজে পায়, তাই খেয়ে বেঁচে থাকে। যে কারণে তাদের উৎপাদন ক্ষমতাও নিতান্ত অল্প। এরূপ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য উপযুক্ত পশু-পাখীর জাত নির্বাচন এবং তাদের উন্নত খাবার ও চিকিৎসার প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকারী পশু সম্পদ অধিদপ্তর খানিকটা এগিয়ে রয়েছে। অধিদপ্তরের বেশ কয়েকটি খামার রয়েছে, যেখান থেকে উন্নতজাতের হাঁস-মুরগির বাচ্চা সরবরাহ করা হয়। আর ডেইরি খামার উন্নয়নে সারাদেশ জুড়ে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে এসব উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলাফল নিয়ে তেমন কোন

www.pathagar.com

প্রকাশনা নেই এবং তার সঠিক কারণও আমরা অবগত নই। এ প্রবন্ধে সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে কিছুটা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমানে সীমিত আকারে দেশে যে পশু-পাখির বাণিজ্যিক খামার পরিচালিত হচ্ছে, তাদের বার্ষিক অগ্রগতি কতটুকু ও খামারগুলোর বর্তমান আর্থিক অবস্থা কি এবং তাদের উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাগুলো কি তারও কিছু আলোচনা করা হয়েছে এ লেখাতে।

আমাদের দেশে প্রানিজ খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ খুবই কম। গত ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে মোট মাংস ভোগের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেক (দৈনিক মাথাপিছু মাত্র ১৩.৩ গ্রাম)। দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের গ্রহণও স্বল্প (৩০ গ্রাম)। দৈনিক ডিমের ভোগের মাত্রা ৫.৩ গ্রাম। এরূপ নিম্ন মাত্রায় আমিষ খাদ্য গ্রহণের কারণ বিবিধ। তবে উৎপাদন স্বল্পতা ও তাদের অধিকতর মূল্যই প্রধান বলে মনে করা হয়। আরও যা অনুমেয় তা হলো ভোক্তাদের আর্থিক দৈন্যতা। তার প্রমাণ হলো গ্রামে-গঞ্জে অনেক পরিবারে দুগ্ধ ভোগের প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও নিজস্ব গাভীর দুধ বাজারে বিক্রি করে নিত্য ব্যবহার্য জরুরি দ্রব্যাদি ক্রয় করে থাকে। অবশ্য ইদানিং দেশে পশু-পাখী পালনও বেশ হ্রাস পেয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষির যে অবদান, তার মধ্যে পশু সম্পদের অবদান শতকরা মাত্র ২.৮১ ভাগ এবং বিগত দশকে এ হিস্যার কোন পরিবর্তন নেই। কারণ বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার অতি অল্প (শতকরা তিন ভাগের নীচে)।

গ্রামাঞ্চলে পশু-পাখির প্রতিপালন ও মালিকানা

অতি আধুনিকতা ও উন্নাসিকতার ফলে অতীতের ন্যায় বর্তমানে গ্রামের প্রতিটি পরিবারে আর পশু-পাখি পালন করা হয় না। তাছাড়া যেহেতু গ্রামের শতকরা ৪০ ভাগ পরিবার ভূমিহীন এবং তাদের নিজস্ব চাষের জমিও নেই। এমতবস্থায় মাঝারি এবং বড় কৃষকরাই জমি চাষের উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ গরু-মহিষ পালন করে থাকে। অবশ্য অনেক স্বচ্ছল পরিবার দুধ পানের উদ্দেশ্যেও গাভী পোষে। তারপর কিছু পরিবার আছে, যার মালামাল পরিবহনের উদ্দেশ্যে গরু-মহিষ পালন করে। হাঁস-মুরগী অবশ্য নিজস্ব ভোগের জন্য প্রায় সবাই পালে। এসব নিয়ে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য কোন জরিপ নেই, তবে ১৯৯৬ সালে যে কৃষিশুমারী হয়েছে তা থেকে অনেকটা ধারণা পাওয়া যায়। আর অন্যদিকে ২০০১ সালে ঢাকা জেলার কাছাকাছি যোগাযোগ উন্নত ১২টি গ্রামে যে সংক্ষিপ্ত কমিউনিটি জরিপ করা হয়, তার তথ্যাবলীও পশু সম্পদের অবস্থা বুঝতে কিছুটা সহায়তা করতে পারে। জরিপের ফলাফলে দেখা যায় যে, শতকরা ৬৮ ভাগ পরিবারে গরু-মহিষ এবং ৩৭টি পরিবারে ছাগল রয়েছে, যদিও ১৯৯৬ এর কৃষিশুমারীতে তাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৭ এবং ৩১। পালনকারী পরিবার প্রতি গো-মহিষের সংখ্যা ৩.৭ এবং ছাগল-ভেড়া ২.৭টি। ১৯৯৬ এর শুমারির তুলনায় বর্তমান জরিপকৃত গ্রামে পশু সম্পদের পরিমাণ অধিক কারণ গ্রামগুলো উন্নত

www.pathagar.com

এলাকায় এবং সেখানে সরকারি পশু উন্নয়ন প্রকল্পও চালু রয়েছে। জরিপে আরও যা লক্ষণীয় তা হলো মুরগী পালনকারির সংখ্যা অধিক এবং প্রতি পালনকারীর ৭-৮টি মোরগ-মুরগী রয়েছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের মোট গরু-বাছুরের মধ্যে শংকর জাতের গরুর সংখ্যা শতকরা ১১ ভাগ মাত্র, তবে কোন কোন গ্রামে এ সংখ্যা ২ থেকে ৩০ ভাগ। মোট সংখ্যার মধ্যে বাছুরের সংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগ এবং গাভী হলো শতকরা ৪৩ ভাগ। অধিক সংখ্যক গাভী প্রমাণ করে যে, লোকজন এখন দুধ উৎপাদনে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠছে।

পারিবারিক পর্যায়ে প্রাণীজ খাদ্যের যোগান ও চাহিদা

উৎপাদিত প্রানিজ খাদ্যের মধ্যে প্রধান হলো দুধ, ডিম ও মাংস। গ্রামের সকল পরিবারে সকল সময় এ সব আবার উৎপাদিত হয় না। মুরগি থাকলেও ডিম দেয়না, আবার তাদের জবাই না করলে মাংস পাওয়া যায় না। আরও যা লক্ষণীয়, তা হলো অনেক গরু পালনকারির গাভী নেই, আবার গাভী থাকলেও তা হয়ত দুধ দেয়না। কাজেই প্রাণীজ খাদ্যের উৎপাদন হিসেব করা বেশ জটিল। তবে জরিপকৃত পরিবারের দেয়া তথ্যানুযায়ী শতকরা ৪৩টি পরিবারে জরিপের সময় (এপ্রিল-মে) দুধ উৎপাদিত হতো যদিও গরু-মহিষ পালন করত শতকরা ৬৮টি পরিবার। জরিপে আরও দেখা যায় যে, মুরগির ডিম উৎপাদিত হতো প্রায় অর্ধেক পরিবারে। উৎপাদকদের মধ্যে গড়ে সাপ্তাহিক দুধের উৎপাদন ছিল ৮.৩ লিটার, ডিম ছিল ৯টি এবং মুরগীর মাংস মাত্র ০.২১ কেজি উৎপাদক এবং উৎপাদনের পরিমাণ থেকে বুঝা যায় যে, গ্রামে প্রানিজ খাদ্যের উৎপাদন অল্প। তবে বর্তমানে দেশের কিছু কিছু এলাকায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামার স্থাপন করার ফলে উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাতে শহর এলাকায় যোগানের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে পশু-পাখির ব্যবহারঃ যোগান ও চাহিদা

কৃষিক্ষেত্রে পশু শক্তির ব্যবহার দেশের সর্বত্র। জমি চাষ করতে পশু শক্তির ব্যবহার হয়ে থাকে। শস্য ও মাল পরিবহন করতে গরু ও মহিষের গাড়ী ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আজকাল পশু শক্তির ব্যবহার অনেক কমে আসছে। গ্রামে রাস্তাঘাটের উন্নয়নের ফলে পরিবহনের ক্ষেত্রে রিক্সা; ভ্যান ও পাওয়ার টিলার ব্যবহৃত হচ্ছে। ও দিকে গ্রামে গো-খাদ্যের অভাব এবং হালের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় টিলার দিয়ে জমি চাষ করা হচ্ছে। ২০০১ সালের বারোটি গ্রাম জরিপে দেখা যায় যে, জমি চাষে গরু মহিষের ব্যবহার মাত্র শতকরা ৩২ ভাগ জমিতে, আর বাকী জমি চাষ করা হচ্ছে পাওয়ার টিলার দ্বারা। চাষের জমি সমতল করতে অবশ্য গরুর ব্যবহার একটু বেশী শতকরা ৬১ ভাগ। আর মালামাল পরিবহনে পশু শক্তির ব্যবহার দেখা যায় মাত্র শতকরা ২৯ ভাগ। তার অর্থ, ভ্যান এবং রিক্সা গ্রামীণ পরিবহন খাতে বিরাট একটা পরিবর্তন এনেছে।

www.pathagar.com

পরিবহন এবং প্রানিজ খাদ্যের উৎপাদনের বাইরেও পশু-পাখির কদর রয়েছে তাদের গোবর ও বিষ্ঠার জন্য। জমিতে জৈব সার হিসেবে পঁচা গোবর ও হাঁস-মুরগির বিষ্ঠার ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর আজকাল জ্বালানী হিসেবেও গোবরের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাছের খাদ্যের একটা বিশেষ উপকরণ হলো হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা। এক হিসেবে প্রকাশ পায় যে, দেশে গোবরের ব্যবহারের ফলে মোট ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের শতকরা ১০ ভাগ সমমানের জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। তারপর দেশে জ্বালানি কাঠের অভাবের কারণে মোট জ্বালানির শতকরা ২৫ ভাগ যোগান আসে গোবরের ঘুঁটে থেকে। জনাব রহমান, ২০০১ তার হিসেবে দেখিয়েছেন যে, বার্ষিক ৬.৫ মিলিয়ন টন গোবর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করায় দেশে ৬০০ কোটি টাকার সাশ্রয় হচ্ছে। তারপর পশুর চামড়া রপ্তানি করে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৫ ভাগ আয় হয়।

পারিবারিক পর্যায়ে পশু-পাখী পালন ও কর্মসংস্থান

গ্রামে পারিবারিক পর্যায়ে পশু-পাখি পালনে সাধারণতঃ পৃথক কোন শ্রমিক নিয়োগ করা হয় না। একই ব্যক্তি ক্ষেত-খামারে কাজ করে এবং পাশাপাশি গরু-বাছুরও দেখাশুনা করে। হাঁস-মুরগী সাধারণতঃ মহিলারাই সারাক্ষণ দেখে থাকে। যে সমস্ত পরিবারে গরু-বাছুরের সংখ্যা অধিক এবং জনবল কম তাদের অনেকেই আলাদা লোক নিয়োগ দিয়ে থাকে। রহমান ২০০১ তার লেখায় উল্লেখ করেছেন যে, গ্রামীণ জনশক্তির শতকরা ২০ ভাগ সার্বক্ষণিকভাবে পশু-পাখী পালনে নিয়োজিত। খন্ডকালীনভাবেও অনেক লোক কাজ করছে। শ্রমের ব্যবহার নিয়ে সঠিক কোন তথ্য নেই, তবে পশু-পাখী পালনে মহিলাদের অবদান অধিক। অনেক ভূমিহীন পরিবারে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পশু-পাখী পালনকে বিশেষ একটি উন্নয়ন কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে কিছুটা আর্থিক পুঁজির দরকার থাকলেও জমির প্রয়োজন অল্প। ছোট-খাট পারিবারিক খামার ভিটে বাড়ির সীমানাতেই প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং ভাড়া শ্রমিকের কোন দরকার হয় না।

পশু-সম্পদের বাণিজ্যিক খামার স্থাপনঃ সরকারী উদ্যোগ

নব্বই দশকের প্রথম থেকেই বাণিজ্যিক খামার স্থাপনে সরকার বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে এর জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং গাভী ক্রয়ে শতকরা ২০-২৫ ভাগ ভর্তুকি দেয়াও শুরু হয়। বিদেশ থেকে উন্নত জাতের হাঁস ও মুরগির বাচ্চা ও ডিম এবং পশু খাদ্য উপকরণ আমদানীতে মার্কেট উদারিকরণ করা হয়। তাতে করে প্রাইভেট সেক্টরে মুরগির হ্যাচারি এবং পশু-খাদ্য মিল স্থাপন শুরু হয়। দেশের বিভিন্ন শহরে পোল্ট্রি ও ডেইরি ফার্ম স্থাপন দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে পশু-সম্পদ অধিদপ্তর এবং যুব মন্ত্রণালয় সরকারি খরচে যুবকদের জন্য প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করে। তদুপরি অধিদপ্তরে নিয়োজিত সকল পশু চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞবৃন্দ খামারিদেরকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করতে থাকে। পশু সম্পদ অধিদপ্তর তাদের নিজস্ব বিভিন্ন পোল্ট্রি খামার থেকে একদিনের বাচ্চাও বিতরণ করে থাকে।

www.pathagar.com

বেসরকারি পোল্ট্রি ও ডেইরী ফার্ম স্থাপনে ১৯৯২-৯৩ থেকে ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত সরকারের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯০৬,২৭ কোটি টাকা। তদুপরি বিভিন্ন এনজিও বেশ ঋণ প্রদান করে থাকে। উল্লেখ্য, গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের জন্য বর্তমানে একটি সরকারি Cattle Breeding Station, মহিষ প্রজনন খামার, তেরটি গবাদি পশুর খামারসহ বৃহত্তর জেলা সমূহে কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস উৎপাদন কেন্দ্র এবং ৩৯১ টি উপজেলাসহ প্রায় ১০০০টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্ট রয়েছে। পশু সম্পদ অধিদপ্তরের হিসেবে ১৯৯১-৯২ থেকে ২০০০-০১ পর্যন্ত মোট ১২২.৬টি গাভী/বকনাকে কৃত্রিম প্রজনন করা হয়েছে। হাঁস-মুরগির জন্য ৮টি হ্যাচারি সহ অধিদপ্তরের ৩৫টি হাঁস-মুরগির খামার রয়েছে। এসকল খামার থেকে বিগত দশ বছরে ৪.৫ কোটি এক দিনের হাঁস-মুরগির বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে (রাজ্জাক, ২০০১)। পশু সম্পদ অধিদপ্তর বর্তমানে যে সকল সেবা প্রদান করে থাকে তা হলোঃ

(১) কৃত্রিম প্রজননের লক্ষ্যে উৎপাদন ও বিতরণ,
(২) হাঁস-মুরগির জাত উন্নয়নে প্রজনন খামার স্থাপন, ডিম ও বাচ্চা বিতরণ,
(৩) পশু স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং
(৪) দারিদ্র্য দূরীকরণে পশু সম্পদ উন্নয়ন এবং বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করা ইত্যাদি।

কৃষি শুমারি ১৯৯৬এ নেত্রকোণার তুলনামূলক বিবরণীতে দেখা যায় যে, প্রতি হোল্ডিং এর গো-সম্পদের সংখ্যা ২.৩২ (১৯৮৩-৮৪) থেকে ১.৭৫ এ কমে এসেছে। কারণ হতে পারে গোচারণ ভুমির অভাব এবং দারিদ্র্য। তাছাড়া আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে পশু নির্ভরতা কমে এসেছে। তবে চাষাবাদে পশুর উপর নির্ভরশীলতা কমে আসলেও, বাড়তি আয় অর্জনে ও পুষ্টি সরবরাহে পশুর গুরুত্ব অপরিসীম। ছাগল পালনের ক্ষেত্রে ও প্রতি হোল্ডিং এর সংখ্যা কমে আসছে। সরকার দেশীয় ছাগল পালনে উৎসাহিত করার জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। দেশে তথা নেত্রকোণা জেলার বর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা মিটাইতে এখনো আমরা ভারতীয় গরু ছাগল এবং মাছের ওপর নির্ভরশীল। এ সরবারহ কখনো কোন অবস্থাতে বাধাগ্রস্থ হলে আমাদের মারাত্মক পুষ্টি সংকট দেখা দিতে পারে একথা বলা যায় নিঃসন্দেহে। এ ঝুঁকি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে গ্রাম পর্যায়ে প্রতি পরিবারে গরু ছাগলসহ অন্যান্য পশু পালনকে উৎসাহিত করতে হবে এবং সরকারিভাবে সময় উপযোগী নীতিমালা ও কর্মসূচী থাকা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

কৃষি শুমারী ১৯৯৬ সালের তথ্যানুসারে দেখা যায় যে ফাউল্‌স (মোরগ-মুরগি) ইত্যাদির সংখ্যা ও প্রতি হোল্ডিং এ ৫.২ (১৯৮৩) থেকে ৪.৭ (১৯৯৬) এ নেমে এসেছে। বিভিন্ন গবেষণা ফলাফল বাস্তব অবস্থা দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে, দশ বৎসর আগের তুলনায় ব্যাণিজিক ভিত্তিতে পোল্ট্রি সেক্টরের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। দেশের চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত না হলেও এর অবদান দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে ব্যাপক। তবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না হওয়ায় প্রতিটি পরিবারকে এ ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধকরণ আবশ্যক। অনুরূপভাবে হাঁস ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু পাখী পালনে গ্রামীণ পরিবারকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এ ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কম পুঁজির প্রয়োজন, তাছাড়া বাড়ির মহিলারাই এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতে পারে। এ ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের সম্পৃক্ত করতে পারলে তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও দারিদ্র্য বিমোচন দুই হবে। তাছাড়া সহজলভ্য পুষ্টি যোগান বেড়ে যাবে।

হোল্ডিং এর আকারের ভিত্তিতে কৃষি ও কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্য

Annex- A এর সারণী-৯.৮ নেত্রকোণা জেলার হোল্ডিং এর আকারের ভিত্তিতে কৃষি কুটির শিল্প খাতের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেয়া হল। সারণীতে দেখানো হয়েছে আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম যেমন গভীর নলকুপের সুযোগ, ব্যবহার ও বড় ফার্মগুলো হচ্ছে সঙ্গত কারণেই। আধুনিক কৃষি কাজে ব্যবহারের যে পরিমান পুঁজি প্রয়োজন তা ছোট খামার মালিকদের নেই। এ জন্যে তাদের উৎপাদন কম, ফলে আয়ও কম। দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ও আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে নিঃসন্দেহে। এভাবে কালের আবর্তে তারা গরীবই থেকে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে মধ্যম এবং বড় কৃষকগণ আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনী ব্যবহার করে তাদের ফসলি জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করছে। তাদের উত্তরোত্তর জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ভাবে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক বৈষম্য, হারাচ্ছে সামাজিক ভারসাম্য। এ অবস্থা কোন সমাজেরই কোন ভাবেই কাম্য হতে পারে না।

গ্রামীণ যানবাহনের মালিকানা চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, নৌকা ও গরুর গাড়ির মালিকানা মাধ্যম ও বড় কৃষকদের বেশী। উল্লেখযোগ্য হলো রিকশা এবং রিকশা ভ্যানের মালিকানা মধ্যম শ্রেণীর পরিবার বড় শ্রেণী কৃষক পরিবারের চেয়ে সামান্য বেশী। মধ্যম এবং বড় কৃষকরা এ যানবাহনের মালিক হয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দৈনিক ভিত্তিতে গরীব মানুষের কাছে ভাড়া খাটায়। গরীব জনগোষ্ঠীর হাঁড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সারা দিনে যা উপার্জন করে তা দিয়ে তাদের দুবেলা খাবার জোটানোই দায়। এ রকম পরিস্থিতে আমাদের ছোট খামার মালিকও ভূমিহীনদের গ্রামীণ যানবাহন মালিকানা লাভের ক্ষেত্রে সহজ শর্তে ও কিস্তিতে উপজেলা ও ইউনিয়ন ভিত্তিক ঋণদানের ব্যবস্থার জন্য সরকারি নীতিমালা এবং প্রয়োজনীয় কর্মসূচি থাকা উচিত।

www.pathagar.com

নেত্রকোণা জেলার কৃষিকাজে ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মাঝারী খামার গুলোতে শ্রম তীব্রতা বেশী যেমন ছোট খামারের ১.৫০ একর আকারের খামার গুলোতে বিভিন্ন আকারের মোট খামার গুলোর প্রায় ২৮ শতাংশ লোক নিয়োজিত থাকে আবার মধ্যম খামার গুলোতে ও ২.৫-৭.৪৯ একর আকারের খামার গুলোতে ও প্রায় ২৮ শতাংশ জনগোষ্ঠী নিয়োজিত থাকে। এক কথায় প্রায় ৫০-৬০ শতাংশ লোক মাঝারী আকারের খামার গুলোতে নিয়োজিত থাকে। আশংকার বিষয় হচ্ছে, প্রাকৃতিক ধারায় আমাদের জনসংখ্যা বাড়তে থাকবে। নেত্রকোণা জেলায় কোন শিল্প কারখানা নেই। এ ধারা অব্যাহত থাকলে এ জেলার প্রাকৃতিক সম্পদ ভান্ডার বর্ধিত এ জনগোষ্ঠীকে বহন করা ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের মজুদ কমতে থাকবে বিপর্যয় ঘটবে পরিবেশের, অভাব-অনটন হবে এ এলাকার জনগোষ্ঠীর নিত্যদিনের সঙ্গী। এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের সময়োপযোগী করে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক ছোট ছোট শিল্প কারখানা গড়ে তোলা; বিশেষত পাহাড়ী এলাকায় ও হাওর এলাকায় ইকোটোরিজম, বালু মহাল ও সাদামাটি ভিত্তিক শিল্প ও ব্যবহার প্রসার করে বিকল্প কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। নেত্রকোণা জেলার কুটির শিল্পের তথ্য অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক যার জন্যে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে, শিল্প কারখানা গড়ে তোলার জন্য।

হ্যান্ডলোম, আছে এমন হোল্ডিং-এর সংখ্যা ১৩৫১টি Blacksmeith ও Pottery যথাক্রমে ২৯৭ ও ২৪২ টি। Annex-X এর সারণী–৯.৮ (Cottage Industry-sub-heading) এর কলাম-৩ এর সংখ্যার দিকে তাকালে নেত্রকোণা জেলার কুটির শিল্পের চিত্র সঠিকভাবে বুঝা যায় যা জেলার টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development)-এর প্রেক্ষাপট মোটেও আশানুরূপ নয়। এজন্যে স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা পর্যায়ে কুটির শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। জেলা উপজেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন উদ্যোগ নিয়ে তা সফল করা যেতে পারে। এজন্যে উন্নয়ন উদ্যোগ জ্বালানি শক্তি হিসেবে কাজে লাগাতে পারে রাজনৈতিক সদিচ্ছাকে। স্থানীয় উন্নয়ন ভিত্তিক দলমত নির্বিশেষে নেতৃবৃন্দকে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য রাজনৈতিক কর্মসূচী দিয়ে প্রশাসনের কর্মসূচীকে শক্তিশালী এ উদ্যোগের বাস্তবমূখী সময়োপযোগী বাস্তবায়ন নিশ্চিত হলে, জনগণকে এর সুফল পেতে সহায়তা করতে পারে। এ জন্যে স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে সংগঠিত সমন্বিত ও উদ্যোগী হতে হবে। সরকার কঠিন শর্তে বিশ্বব্যাংক ও আই.এম.এফ এর অর্থায়নে মেগা প্রকল্প গ্রহণ না করে সহজ শর্তে মধ্যপ্রাচ্য, কুয়েত, ফাও, আরব ডেভেলপমেন্ট, ADB এশিয়ার অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী ছোট ছোট বেশী করে গণমূখী প্রকল্প গ্রহণ করে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারে। তাছাড়া Impact Study করে প্রকল্পের সুফল কি হয়েছে যেমন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সম্পদ উৎপাদন, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ,

www.pathagar.com

মানবসম্পদ ও বস্তগত সম্পদ (Physical wealth) এ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সব বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে প্রকল্প মূল্যায়ণ করে সামনে আগানোর কর্মসূচী নেয়া যেতে পারে।

শস্য আবাদী এলাকা (Crop Area of Farmholdings), নেত্রকোণা

নেত্রকোণা জেলার প্রধান খাদ্য শস্য (Staple food) ধান ও গম। ধানের প্রধান প্রধান শ্রেণীগুলো হল আউশ, আমন ও বোরো। Annex-X সারণী-৯.৯ ধান ও গম উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। ফসলের নিবিড়তা চিত্রের সাহয্যে দেখানো হল। (চিত্র ৯.১৩) দেখা যায় যে, ছোট আকারের খামারগুলি ০.০৫ থেকে ২.০০ একর পর্যন্ত খামারগুলির ফসলের নিবিড়তা ১৭৫-১৭৯ পর্যন্ত অত্যন্ত বেশী। বড় খামারগুলি যার আকার ২.০০ একর এর চেয়ে বড় এর শস্য তীব্রতা ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে যে, প্রয়োজনের তাগিদেই মাঝারি খাবারগুলো তীব্রভাবে চাষাবাদ করা হয়। এসব খামারে নিয়োজিত শ্রমিকও বেশি থাকে। তা'ছাড়া মাঝারি খামারের মালিকদের কিছুটা সামর্থ্য আছে বলে তারা আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে যেমন সেচ, সার ও উন্নতমানের বীজ ইত্যাদি।

চিত্র ৯.১৩: নেত্রকোণা জেলার ফসলের নিবিড়তা

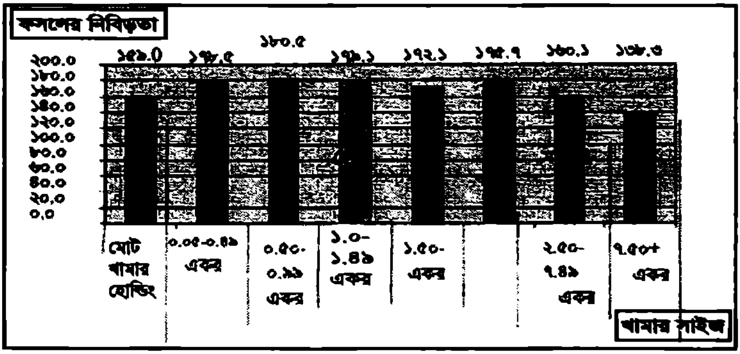

ধান গম চাষাবাদের এলাকার (Crop Area) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ছোট খামারের মালিকগণ ৩৮.৫৬ শতাংশ এলাকায় আউশ ধান চাষ করে এর মধ্যে ১৯ শতাংশ এলাকায় চাষ করে যাদের জমির পরিমাণ ১.৫-২.০০ একর। আউশ ধান চাষে সবচেয়ে বেশী এলাকা চাষ করে মধ্যম আকারের চাষি প্রায় ৪৪ শতাংশ এলাকা যাদের খামারের আকার ২.৫-৭.৪৯ একর। আমন চাষের ক্ষেত্রেও প্রায়ই একই অবস্থা মাঝারি চাষিরা প্রায় ৪৫ শতাংশ এলাকায় আবাদ করে। পক্ষান্তরে ছোট চাষিরা মাত্র ৩৫ শতাংশ এলাকা আবাদ করে।

www.pathagar.com

নেত্রকোণা জেলার ভাটি এলাকায় ব্যাপক বোরো ধান চাষাবাদ হয় তবে আমন চাষই বেশি বলে পরিসংখ্যানে দেখা যায়। বোরো চাষের ৪২ শতাংশ মাঝারি চাষিরা আবাদ করে ছোট চাষীরা মাত্র ২৯ শতাংশ এলাকা চাষ করে। গম সাধারণ গ্রাম পর্যায়ে লোকজনের গরীবের খাবার বলে মনে করা হয়। এর প্রমাণ মিলে নেত্রকোণা জেলার গম চাষের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে। ছোট খামারের মালিকরা প্রায় ৪২ শতাংশ এলাকায় গম চাষ করে মাঝারি চাষিরা তা করে ৪১ শতাংশ এলাকায়। অথচ বড় চাষিরা তা করে মাত্র ১৭ শতাংশ এলাকায়। বড় চাষিরা বোরো করে প্রায় দ্বিগুণ এলাকায় অর্থাৎ ২৯ শতাংশ এলাকায়। বড় চাষিদের তুলনায় ছোট চাষিরা শাকসবজি ও মসলা ইত্যাদি উৎপাদন করে সবচেয়ে বেশি, মোট উৎপাদিত এলাকার প্রায় যথাক্রমে ৪০-৪৫ শতাংশ এলাকায় তারা এ আবাদ করে থাকে, মাঝারি চাষিরা করে এর মাত্র ৩৮-৩৯ শতাংশ। অর্থকরী ফসল উৎপাদনেও মাঝারি চাষিদের অবদান অগ্রগণ্য তারা এন্টি ক্যাশ ক্রপ আবাদি এলাকা ৪৫ শতাংশ আবাদ করে থাকে। পক্ষান্তরে ছোট চাষিরা আবাদ করে মাত্র ৩৫ শতাংশ।

শস্য আবাদী এলাকা (Crop Area of formholding) : দুর্গাপুর

Annex-A সারণী–৯.১০ এ দুর্গাপুর উপজেলার কৃষি খামারের আকার ভিত্তিক জমির ব্যবহার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ফসল আবাদির ৩২ শতাংশ জমি ছোট আকারের খামার, মাঝারি আকারের খামার ৪৩ শতাংশ। অথচ বড় আকারের খামার মোট শস্য আবাদী জমির মাত্র এক চতুর্থাংশ। ফসলের নিবিড়তা পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, জেলার ন্যায় এ উপজেলায়ও ছোট আকার শস্য ফলনে ফসলের নিবিড়তা বেশি। তবে ফসলের নিবিড়তার পরিমাণ জেলার গতির চেয়ে অনেক কম। জেলার ছোট খামারের শস্য ফলন ফসলের নিবিড়তা ১৭৬ শতংশের বিপরীতে দুর্গাপুরে এর পরিমাণ মাত্র ১৬৯ শতাংশ।

চিত্র ৯.১৪: দুর্গাপুর উপজেলার শস্য নিবিড়তা

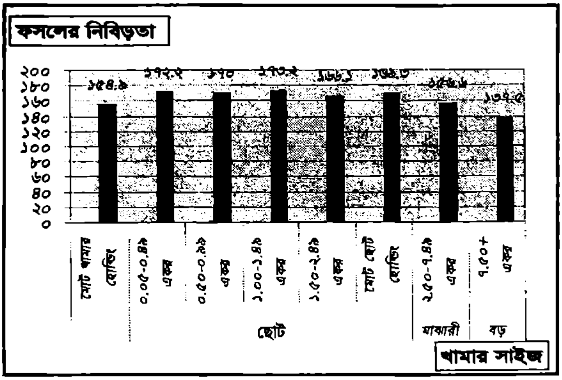

www.pathagar.com

কারণ জেলার উন্নয়নের তুলনায় এ উপজেলার যোগাযোগ, শিক্ষা, গণসচেতনতা ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিতে অনেক পিঁছিয়ে রয়েছে। দুর্গাপুর উপজেলায়ও আউশ, আমন বোরো ও গম চাষে মধ্যম চাষিদের অংশ বেশি। যথাক্রমে ৪৪, ৪৫, ৪২ ও ৪১ শতাংশ। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র চাষিদের এ অংশ যথাক্রমে ৩৫, ৩১, ৩০ এবং ৩৭ শতাংশ। জেলার গড়ের তথ্যের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় উপজেলার গড় জেলার চেয়ে অনেক কম। প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য শিক্ষা সচেতনতা ছাড়াও তারা এত হতদরিদ্র যে, মাথা পিছু আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ এবং আয় রোজগার কম বলে তাদের কৃষি পদ্ধতি একেবারেই সনাতন পদ্ধতিতে রয়ে গেছে। বিনিয়োগ করার মত পুঁজিও তাদের নেই। জেলায় গড়ে যে সমস্ত এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে দুর্গাপুরের কৃষক এর সামান্য সুফলই পেয়ে থাকে। তাছাড়া রিক্সা, ভ্যান গাড়ি চালানো ও শিল্প কারখানার অকৃষি মৌসুমে বিকল্প কর্মসংস্থানে কোন সুযোগ নেই। এক সময় খালবিল নদী নালায় প্রচুর মাছ ছিল, এবং পাহাড়ি এলাকায় প্রচুর বন ছিল। বিল থেকে আয় উপার্জনের জন্য অনেকে মাছ ধরে গ্রামের বাজারে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতো। খাল বিল নদীগুলো বিলীন হয়ে যাবার ফলে অধিক জনসংখ্যার চাপে পাহাড়ের বন উজার হয়ে যাবার কারণে স্থানীয় ভাবে বিকল্প কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ নেই। সত্তর-আশির দশক পর্যন্ত এই এলাকার অন্যান্য জেলাগুলো থেকে বর্ষাকালে নৌকা নিয়ে আমন মৌসুমে ধান কাটার আগেই জোতদারদের কাছে এসে চুক্তি করে যেতো তারা ১০/২০ জনের দল এসে ধান কেটে মারাই করে উড়ায়ে (পরিস্কার) দিবে। এ ভাবে ধান কাটার জন্য ২০-২৫ ভাগ ধান তারা মজুরি হিসাবে পেত। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, এ সমস্ত বড় বড় জোতদার ও চেয়ারম্যান মেম্বারের ছেলেরা বেশিরভাগ এখন সিলেট ও কুমিল্লা এলাকায় ধান কাটতে বোরো মৌসুমে কয়েক মাসের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এ দৃশ্য বর্ণনা করার জন্য কোন প্রবীনের প্রয়োজন নেই, ৪০-৫০ বৎসরের লোক জনই এসব ঘটনা প্রবাহের চাক্ষুস স্বাক্ষি। দুর্গাপুরে গ্রামীন অর্থনীতির সাবেক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সম্মলিত উদ্যোগ ও জনগণের সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন। কুমিল্লায় ক্ষুদ্র কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের উন্নয়ন অর্জন করার জন্য রাজনৈতিকভাবে তারা অনেকটা ঐক্যবদ্ধ। এভাবে আমাদেরও এগুনো উচিত।

শস্য আবাদি এলাকা (Crop Area) : কলমাকান্দা

Annex-A সারণী-৯.১১ এ কলমাকান্দা উপজেলার শস্য আবাদী খামারের অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। মোট কমলাকান্দা এলাকার ছোট খামারের ৩২ শতাংশের মধ্যে ২৩ শতাংশ খামার ১.০০-২.৪৯ একর। পক্ষান্তরে কলমাকান্দা উপজেলায় এর পরিমান মোট ছোট খামারের ২৯ শতাংশের মধ্যে তার সংখ্যা ২১ শতাংশ। তবে শস্য আবাদি মাঝারি আকারের কৃষি খামারের পরিমান উভয় উপজেলায় প্রায় সমান। শস্য আবাদি বড়

www.pathagar.com

আকারের খামার ৭.৫ একর ও এর বেশী দুর্গাপুরের চেয়ে কলমাকান্দা উপজেলায় বেশি। এ সংখ্যা জেলার গড়ের চেয়ে বেশি যা ২৩ শতাংশ। দুর্গাপুর ও কমলাকান্দা উপজেলায় যথাক্রমে ২৫ ও ২৯ শতাংশ। কলমাকান্দা উপজেলায় বড় আকারের খামারের পরিমান বেশি হওয়ার কারণ অবস্থান গত দিক দিয়ে উপজেলাটি অত্যন্ত নীচু ও বিশাল জলরাশিপূর্ণ এলাকা যা প্রায় সারা বৎসর পানির নীচে থাকে। জমির সীমানা নির্ধারিণ করাও সেখানে কঠিন ব্যাপার। হাওরগুলো বেশিরভাগ সরকারি মালিকানায়। এর আশে পাশে ধনী প্রভাবশালী লোকজন তাদের প্রভাব বিস্তার করে বোরো অথবা সরকারের কাছ থেকে হাওর লীজ নিয়ে মাছের ব্যবসা করে থাকে। এ ভাবে অপ্রতিরুদ্ধ অবস্থায় তারা তাদের খামারের আকার বড় করতে পারে। ছোট খামারের মালিকগন এসব এলাকায় জমির মলীকানা নিজের টুকু ঠিক রাখতে হিমশিম খেয়ে যায় এমনকি হাওর এলাকায় তাদের মাছ ধরা পর্যন্ত নিষেধ। তাদের হাঁস মুরগি গরু মহিষ এসব হাওর এলাকায় প্রবেশ পর্যন্ত নিষেধ। কলমাকান্দা উপজেলার বড়কাপন ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামটিতে দারিদ্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সমীক্ষাকালে সরেজমিনে এমন চিত্রই মিলেছে। কলমাকান্দা উপজেলায় ছোট আকারের কৃষকদের শাক সবজি চাষের পরিমান দুর্গাপুর উপজেলার চেয়ে অনেক কম যা যথাক্রমে ৩৯ ও ৪৪ শতাংশ। নেত্রকোণা জেলার গড় পরিমাণও ৪৪ শতাংশ। কলমাকান্দা উপজেলায় প্লাবন ভূমি (wetlands) বেশী শীত মৌসুমে মানুষ সেখানে বোরো ধান চাষ করে। তবে বড় আকারের খামারের মালিকরা কলমাকান্দায় বেশি শাক সবজি আবাদ করে বলে সমীক্ষাকালে দেখা যাচ্ছে যা মোট শাক সবজি চাষাবাদের প্রায় ২৩ শতাংশ। দুর্গাপুর উপজেলা ও নেত্রকোণার গড়ের চেয়ে এ পরিমান বেশি, উভয় ক্ষেত্রে তা ১৭ শতাংশ।

মোট অর্থকরী ফসল ঃ দুর্গাপুর উপজেলায় ছোট খামারের চাষিরা কলমাকান্দার তুলনায় বেশী অর্থকরী ফসল করে থাকে যা দুর্গাপুরে ৩৩ শতাংশ পক্ষান্তরে কলমাকন্দায় ২৭ শতাংশ। অথচ জেলা গড় প্রায় ৩৪ শতাংশ। এ থেকে সম্পদ ঢাকার জেলার তুলনায় আয় উপার্জনকারী শস্যের উৎপাদন কম থাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের একমাত্র কৃষি ভিত্তিক উপার্জন কমতে থাকবে, যা দারিদ্র বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। শস্য উৎপাদনে নিবিড়তা চিত্র-৯.১৫ কলমাকান্দা উপজেলা শস্য উৎপাদনের নিবিড়তা বেশী যা মোট নিবিড়তা ১৪১ শতাংশের চেয়ে বেশী অর্থাৎ ১৫২-১৫৩ শতাংশ। পক্ষান্তরে সব চেয়ে বড় আকারের খামারের (৭.৫০ একরের) শস্য নিবিড়তা ১৩২ শতাংশ। সামগ্রিক ভাবে কলমাকান্দা উপজেলার শস্য নিবিড়তা দুর্গাপুর উপজেলা ও জেলার গড়ের চেয়ে অনেক কম যা যথাক্রমে ২৬৯ ও ১৭৭ শতাংশ।

এ ক্ষেত্রে ছোট খামারের মালিকগুলোর প্রবণতা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ছোট আকারের মোট খামারগুলি প্রায় ৫০ শতাংশ সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আরো লক্ষণীয় বিষয়

www.pathagar.com

চিত্র ৯.১৫: কলমাকান্দা উপজেলায় শস্য নিবিড়তা

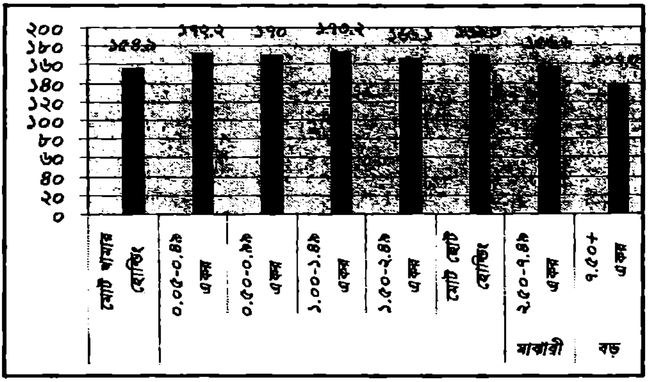

হলো এদের মধ্যে খামারের আকার বৃদ্ধি সাথে সাথে তাদের সেচ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে মাঝারি আকারের খামারগুলি প্রায় ৫২ শতাংশ খামারে সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। বড় আকারের খামারগুলি ক্ষেত্রে ৫৪ শতাংশ খামারে সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ২৫ একর ও এর চেয়ে বেশি বড় খামারে সেচ গ্রহণের প্রবনতা কম।

সার বিতরণ ব্যবস্থাপনা ঃ জাতীয় অবস্থা

এই বিষয়ে ড. কাশেম তাঁর গ্রন্থে এক পর্যালোচনায় উল্লেখ করেন যে সারের বর্তমান ব্যবহার সুষম না হওয়ার পিছনে বাজার দরের বাইরে আরও যে কারণ থাকতে পারে তা হল বিতরণ জটিলতা। সময়মত সার কৃষকদের নিকট পৌছে না। বর্তমানে ইউরিয়া ব্যতিত অন্যান্য সকল সারের আমদানি প্রাইভেট খাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ইউরিয়া সারের উৎপাদন এবং মিলগেইট বিক্রয় মূল্য সরকার নির্ধারণ করে থাকে। মিলগেইট থেকে ক্রয় করার পর সারা দেশে ইউরিয়ার বিতরণ সার ব্যবসায়িরাই করে থাকে। আর অন্যান্য সার আমদানি থেকে শুরু করে দেশের সর্বত্র বিক্রয় করা পরোপুরি পাইকারি ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীল। তবে বর্তমানে সরকার কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিয়মিত দেশের সার বিতরণ পরিস্থিতি মনিটরিং করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গ্রামাঞ্চলে সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে ডিলারশিপ ব্যবস্থা উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং দেশের কয়েকটি খ্যাতনামা মার্কেটে 'বাপার' মজুদ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। তদুপরি, অধিক সম্পন্ন ফসফেটিক সার আমদানি উৎসাহিত করতে সরকার টিএসপি, ড্যাপ (DAP) এবং এনপিকেএস মিশ্র সার আমদানির উপর হতে আগাম আয়কর ও উন্নয়ন সারচার্জ মওকুফ করেছে।

www.pathagar.com

দেশের সত্তর দশক সার ব্যবহারে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) বিশেষ অবদান রেখেছিল। সে সময় বিএডিসি সার বিক্রির লক্ষ্যে সারা দেশ জুড়ে ডিলারশীপ প্রথা চালু করেছিল এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনায় উপজেলা পর্যন্ত তাদের কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিল। তখন সারের উপর সরকারের ভর্তুকি ছিল ৫০-৬০ শতাংশ। ১৯৭৮-৭৯ সালে সারের ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ১৩০ কোটি টাকা, যা কৃষি খাতের উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ২৭ শতাংশ। ভর্তুকির পরিমাণ হ্রাস করতে ১৯৭৯ সাল থেকে পরীক্ষামূলকভাবে দেশের একটি বিভাগ এবং ১৯৮০ সালে সারা দেশে সারের বিতরণ ব্যবস্থা বেসরকারি খাতে স্থানান্তর করা হয়। তবে তখন সারের বাজার মূল্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৮৩ সাল থেকে খুচরা মূল্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়। অবশ্য তখনও মিলগেইট ও বন্দর থেকে সার উত্তোলনের পাইকারি মূল্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে ।

১৯৯১ সালের জুলাই মাস থেকে সরকারি খাতে সার আমাদানী সংকোচ করে বেসরকারি খাতে ফসফেট ও পটাশ সার আমদানীর অনুমতি দেয়া হয়। পরবর্তীতে ভেজাল / নকল / নিম্নমানের সার উৎপাদন, আমদানী ও বাজারজাতকরণ নিয়ন্ত্রণ করা সহ সারের গুণগত মান অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে সার নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৯৯ জারী করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী বেসরকারি খাতে আমদানীকৃত সারের ক্ষেত্রে পোষ্ট ল্যান্ডিং ইন্সপেশন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের ফলাফল এখনও অজানা। তবে আশা করা হয় যে, সার-নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৯৯ দেশের সারের মান অক্ষুন্ন রাখতে সফল হবে ।

সেচ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন ঃ জাতীয় উদ্যোগ

সেচ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন বিষয়ে ড. কাশেম তাঁর পর্যালোচনায় যে, বাংলাদেশে খাদ্যে দ্রুত স্বয়ং স্বম্পূর্ণতা অর্জন এবং দারিদ্র বিমোচনে উফশি ধান ও গমের জমি বৃদ্ধি সেচকে প্রাধান্য দেয়া হয়। আর বন্যার কারণে ফসলহানি হ্রাস কল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (Flood Action Plan) গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৭২ সালে পানি সম্পদ উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক তাদের সম্পাদিত Land and Water Sector Study-তে ক্ষুদ্র প্রযুক্তির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের উপর জোর দেয়ার সুপারিশ করে। আশির দশকের প্রথমার্ধে পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে Master Plan Organization (MPO) নামে একটি সংস্থা গঠন করে এবং তারা দীর্ঘমেয়াদী সেচ অবকাঠামো সম্প্রসারণের নীতিমালা সুপারিশ করে। এ বিষয়ে হোসেন, ২০০৩ তাঁর প্রবন্ধে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর রিপোর্ট অনুযায়ী স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় ১৯৮৫-৯৫ সময়কালে ৬৩টি ক্ষুদ্র আয়তনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। তার মধ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সেচ নালা ও সুইচ গেইট নির্মাণও রয়েছে।

www.pathagar.com

সেচ জমি সম্প্রসারণে পানি উন্নয়ন বোর্ড বৃহদাকারে সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, আর ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প প্রণয়ন ও সম্প্রসারণে বিএডিসি প্রধান দায়িত্ব নেয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড সেচ প্রকল্প এলাকায় পানি সরকারের ব্যবহারের ব্যবস্থা করে এবং কৃষককে তাদের জমির পরিমাণ অনুযায়ী পানির মূল্য (খাজনা) পরিশোধ করতে হয়। তবে যতদুর অবগত, চাষীরা সেচের এ খাজনা পরিশোধ অনেক পিছিয়ে আছে। এ দুরাবস্থার অবসানকল্পে বোর্ড ছোট ছোট প্রকল্প এখন স্থানীয় কমিউনিটির ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

বিএডিসি পরিচালিত গভীর নলকূপ এবং পাওয়ার পাম্পের ক্ষেত্রে সেচ গ্রহীতারা পাম্প/নলকূপ ভাড়া ও পানির মূল্য পরিশোধ করলেও তাদের পক্ষে সকল প্রশাসনিক ও প্রকল্প পরিচালনা ব্যয় (যন্ত্রপাতি মেরামতসহ) মিটানো সম্ভব হয়নি বিধায় সরকারকে বেশ ভর্তূকি দিতে হয়। ভর্তুকির পরিমাণ হ্রাস করতে আশির দশকের মাঝামাঝি তাদের সকল সেচযন্ত্র বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয় এবং বিক্রয় পদ্ধতির পাশাপাশি ভাড়া পদ্ধতি চালু থাকে ১৯৮৭-৮৮ সাল পর্যন্ত। অগভীর নলকূপ অবশ্য বরাবরই প্রাইভেট সেক্টরে ছিল। তবে তাদের উপর কিছু বিধি-নিষেধ ছিল যেমন অগভীর নলকূপের ইঞ্জিন আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ এবং কোন ধরনের ইঞ্জিন আমদানী করা যাবে তা নির্দিষ্টকরণ ইত্যাদি। নলকূপ বসানোর ক্ষেত্রেও দুটি নলকূপের মধ্যে নূন্যতম দুরত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা অর্ডিন্যান্স বা প্রবর্তন করা হয়। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী কর্তৃক প্রণীত Agricultural Sector Review এর সুপারিশে এ বিধি নিষেধ গুলো ১৯৮৯ সাল থেকেই উঠিয়ে নেয়া হয় এবং কৃষি যন্ত্রপাতির উপর আরোপিত আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়। তাতে অগভীর নলকূপের বিক্রয় মূল্য হ্রাস পাওয়ায় সারা দেশে এর দ্রুত বিস্তার ঘটে এবং সেচ জমির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। ফলে উফশি বোরো ধানের উৎপাদনও উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ক্ষুদ্র সেচযন্ত্র প্রকল্প পুরোপুরি বেসরকারি খাতে। তবে সেচ যন্ত্রের আওতায় জমি বৃদ্ধি উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যাংক নানা ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ ও সেচনালা মেরামত এবং ম্যানেজারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে।

বিগত দশকে সেচের জমি বৃদ্ধি পাওয়ায় বোরো ধান, গম এবং আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে; কিন্তু অন্য দিকে ডাল, তৈল বীজ এবং মশলা জাতীয় ফসলের আবাদ হ্রাস পেয়েছে। সেচ সম্প্রসারণের প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল জমির ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি, যাতে করে ধানের উদ্বৃত্ত জমি অন্যান্য অপ্রধান ফসলে রুপান্তরিত হয়। তা কিছুটা সফল হয়েছে, দেশী ধানের জমি উফশি ধানে রূপান্তরিত হওয়ায় ধানের মোট জমি হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে (কাশেম,২০০৫)। এর প্রধান কারণ অপ্রধান ফসল যেমন ডাল ও তৈলবীজের উৎপাদনশীলতা কম এবং ধান উৎপাদনের তুলনায় কম লাভজনক।

www.pathagar.com

নেত্রকোণা জেলায় সেচ ব্যবস্থাপনা

Annex-A সারণী -৯.১২ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নেত্রকোণা জেলায় শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত ৭৫ শতাংশ এলাকায় সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুসারে কি পরিমান আধুনিক পদ্ধতিতে এবং কি পরিমান সনাতন পদ্ধতি রয়েছে তার উল্লেখ নেই। নেত্রকোনা হাওর বাওর নদী-নালায় পরিপূর্ন এলাকা। ছোট খাট সেচ ব্যবস্থা মানুষ সনাতন পদ্ধতিতে সেরে ফেলে। হালে কোন কোন এলাকায় গভীর ও অগভীর নলকূপ করে মানুষ সেচ ব্যবস্থা করে থাকে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও জরীপ চালিয়ে এ বিষয়ে আগে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের আবশ্যকতা রয়েছে। গত মে, ২০০৫ সালে কলমাকান্দা বড় কাপন ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামে জরিপ চালানো কালে আধুনিক পদ্ধতিতে সেচ ব্যবস্থার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবহার আছে বলে পরিলক্ষিত হয়নি। যা হোক, নেত্রকোনা জেলায় সেচ ব্যবস্থা আধুনিক পদ্ধতি আরো ব্যাপক করা গেলে শস্য নিবিড়তা, জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সহ আরো ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টির সুযোগ হবে।

Annex-A সারণী-৯.১২ এ নেত্রকোণা জেলার সার ব্যবহারের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সকল হোল্ডিং শস্য আবাদযোগ্য প্রায় ৭৬ শতাংশ জমিতে সার ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে তাহলে আবশ্যিকভাবে তা রাসায়নিক সারই হতে হবে এমন কোন কথা নেই। নেত্রকোণার গ্রামীন কৃষকরা সাধারণত পোষা হাঁস মুরগির বিষ্ঠা, কচুরিপানা, কৃষিজ উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি জৈব সার দ্রব্যরূপে করে থাকে ব্যাপক হারে। এ বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন ও জরিপের মাধ্যমে আরো সঠিক তথ্য পাওয়া যেতে পারে। শস্য আবাদযোগ্য মোট ছোট খামারগুলির ৭৩ শতাংশ সার ব্যবহার করে থাকে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল সবচেয়ে ছোট খামার আকার ০.০৫-০.৪৯ একর আকারের ক্ষেত্রে সারের ব্যবহার হয় ৫৩ শতাংশ খামারে। সম্ভবত তাদের বেশীরভাগই জৈব সার ব্যবহার করে থাকে। ছোট খামারের সবচেয়ে বড় আকারের ১.৫০-২.৪৯ একর আকারের খামারের সার ব্যবহার হয় ৭৬ শতাংশ জমিতে।

এ ক্ষেত্রে স্পষ্ঠতই অনুমেয় যে, সামর্থ্য আছে বলে বড় আকারের খামারগুলিতে সারের ব্যবহারের প্রবণতা বেশী। সেচ ব্যবহারের ন্যায় সবচেয়ে বড় খামারগুলির সারের ব্যবহারের প্রবণতাও কম। কারণ তাদের বেশীর ভাগই অনুপস্থিত মালিক (Absenuee owner) মাঝারি আকারের খামারগুলির সার ও সেচ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবণতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মাঝারি খামার ও ছোট খামারগুলোকে মূলধন ও সম্ভাব্য সুযোগ দিলে তারা আরো বেশি করে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করে অধিক কৃষি উৎপাদনমুখি হতে পারবে।

www.pathagar.com

দুর্গাপুর উপজেলার সেচ ও সার ব্যবহার

Annex-A সারণী–৯.১২ ও ৯.১৩ এর তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নেত্রকোণা জেলার গড় সেচ ব্যবস্থা (৫১%) ও সার (৭৫%) ব্যবহারের তুলনায় দুর্গাপুর উপজেলার শস্য আবাদযোগ্য এলাকায় সেচ গ্রহণ (৪০%) ও সার (৭১%) ব্যবহারের প্রবণতা কম। এ কম প্রবণতার প্রধান কারণ সামর্থের অভাব তথা দারিদ্র্য। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হতে পারে, যেমন শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, সেচ ব্যবহার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অভাব। তাছাড়া বাজারজাত করণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সংকটের ফলে সহজ লভ্যতার অভাব। এ সব সমস্যা যথাযথভাবে চিহ্নিত ও সুরাহা না করতে পারলে এবং উপজেলার কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে কৃষি উন্নয়ন করতে না পারলে দুর্গাপুরের সার্বিক উন্নয়নের প্রত্যাশা ঝিমিয়েই থাকবে। এ উপজেলার ৯৯ শতাংশ জনগোষ্ঠী কৃষিনির্ভরশীল, তাদের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন কৃষি আধুনিককরণ ও উন্নয়ন সাধন না হলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ সর্বোপরি সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত হবে। দলমত নির্বিশেষে স্থানীয় উদ্যোগ প্রয়োজন। বর্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সাংসদের মাধ্যমে উন্নয়ন বরাদ্দ হয়ে থাকে। তাঁদেরকে আরো কমিটেড, স্বচ্ছ এবং দায়িত্বশীল হতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় উন্নয়নের স্বার্থে আরো উদারভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত ও সচেতন করে তুলতে হবে। নিঃসন্দেহে এতে রাষ্ট্রিয় পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হবে। তবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে নিজ এলাকার উন্নয়নের স্বার্থেই।

কলমাকান্দা

Annex-A সারণী–৯.১৪ এর তথ্য পর্যালোচনাতে দেখা যায় যে, জেলার গড় সেচ ও সার ব্যবহারের প্রবণতার তুলনামূলকভাবে কলমাকান্দা উপজেলায় কম যা ৫৫% এবং ৭৪ শতাংশ। তবে সামগ্রিকভাবে দুর্গাপুর উপজেলার চেয়ে কলমাকান্দায় এ প্রবণতা বেশি। এ ক্ষেত্রে প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে, কলমাকান্দা নিচু জায়গা এখানে সেচ সুবিধা বেশি। এ এলাকায় অধিকাংশ মানুষকে বোরো ফসল করতে হয় যা শীত ও শুস্ক মৌসুমের ফসল। অনেক ক্ষেত্রে সারা বৎসরের একটি মাত্র শস্য তারা চাষ করতে পারে। বাকী সময় এ জমি পানির নিচে থাকে, এজন্যে একমাত্র প্রধান অবলম্বনকে সর্বাত্মক মনযোগী হয়ে সেচে সুযোগ গ্রহণ এবং সারের ব্যবহার করে থাকে। কলমাকান্দায় বড় কৃষকদের মূলধনের অভাব কম বিধায় তারা অধিক পরিমাণে সেচ ব্যবহার সুযোগ গ্রহণ করে ও অধিক পরিমাণে সার ব্যবহার করে থাকে। তবে জেলার গড় প্রবণতার তুলনায় কলমাকান্দা উপজেলার সেচগুলো গ্রহণের প্রবণতা বেশি। জেলার গড় যেখানে ৫৬ শতাংশ কলমাকান্দায় তা ৬০ শতাংশ। পক্ষান্তরে সার ব্যবহারের প্রবণতা জেলার চেয়ে কম। জেলার যেখানে ৭৯ শতাংশ কলমাকান্দায় সেখানে ৭৭ শতাংশ।

www.pathagar.com

জেলার ভূমিসত্ব: নেত্রকোণা

Annex-A সারণী-৯.১৫ এর তথ্যে নেত্রকোণা জেলার ভূমিসত্ব পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মোট ২১১, ১৫৪টি হোল্ডিং এর মধ্যে নিজস্ব মালিকানাধীন ৭০ শতাংশ, বর্গাচাষি ২ শতংশ, বর্গা চাষি ও মালিকানাধীন উভয় শ্রেণী মিলে ২৮ শতাংশ। জমির পরিমাণের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৪৬৪, ৮৮০ একর, যার ৬৯ শতাংশ নিজস্ব মালিকানাধীন চাষ করে, প্রায় ১০ শতাংশ বর্গা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে শুধু বর্গাচাষীদের আওতাধীন ১ শতাংশ। বর্গাচাষী ও মালিকানাধীন চাষাবাদের আওতায় মোট আবাদী এলাকার ৩০ শতাংশ। নিজেরা চাষাবাদ করে ২০ শতাংশ, বর্গা দেয়া হয় ২ শতাংশ এবং বর্গা নেয়া হয় মোট আবাদযোগ্য এলাকার ১২ শতাংশ। ভূমিসত্ব বিশ্লেষণ ভূমিমালিকানা খামারের আকার ভিত্তিতে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ছোট খামার, মাঝারি খামার ও বড় খামার।

ভূমি হোল্ডিং বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রায় ৭২ শতাংশ ভূমি হোল্ডিং ছোট আকারের খামারের মালিকানাধীন, তারা মাত্র ৩২ শতাংশ চাষাবাদযোগ্য ভূমির মালিক। চাষাবাদ যোগ্য ভূমি মালিকদের মাত্র ৭৩ শতাংশ মালিক নিজেরা চাষাবাদ করে বাকি ২৭ শতাংশ বর্গা দেয় বা মোট চাষাবাদযোগ্য ভূমির ১৭ শতাংশ ছোট খামারের ভূমি মালিকদের মাত্র ৬৫ শতাংশ আবাদযোগ্য ভূমি চাষ করে থাকে। মাঝারি আকারের ভূমি মালিকানা বিশ্লেষণ দেখা যায় যে, মোট হোল্ডিং সংখ্যার মাত্র ২৩ শতাংশের তারা মালিকানা যা আবাদযোগ্য ভূমি এলাকার ৪২ শতাংশ। মাঝারি ভূমি মালিকরা মোট হোল্ডিং সংখ্যার মাত্র ২৩ শতাংশ। মাঝারী ভূমি মালিকরা নিজেরা ৬৯ শতাংশ জমি আবাদ করে এবং ৭.৪৭ শতাংশ বর্গা দেয়। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে ছোট ও মাঝারি ভূমি হোল্ডিং এর সংখ্যা ও মালিকানার সিংহভাগ ছোট ও মাঝারি খামার মালিকদের। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো মোট হোল্ডিং এর ৫ শতাংশ বড় খামারের মালিক হলেও তারা চাষাবাদযোগ্য এলাকার প্রায় ২৬ শতাংশের মালিক। ভূমিসত্বের আসল মালিকানার ফলে বড় খামারগুলির উৎপাদনশীলতা পুরোপুরি ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন করতে হলে অর্থনৈতিক সাম্যের সাথে সামাজিক সমতা ও ন্যায়বিচার (Social equity and justice) নিশ্চিত করতে হবে।

www.pathagar.com

ভূমিসত্বঃ দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা

Annex-A সারণী-৯.১৬ ও ৯.১৭ জেলার ভূমিসত্বের গড়ের সাথে উপজেলা পর্যায়ের অবস্থাটি তুলনা করলে বুঝা যাবে দুর্গাপুর উপজেলার জনগোষ্ঠী কেমন আছেন। এ উপজেলার ৬৬ শতাংশ হোল্ডিং ব্যক্তি মালিকানাধীন যার ১০ শতাংশ বর্গা দেয়া হয় এবং ৬৯ শতাংশ মালিকরা নিজে চাষাবাদ করে। জেলার গড় অবস্থার সাথে এ চিত্র মোটামুটি সঙ্গতিপূর্ণ। ছোট খামারের মালিকানা বিষয়টি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মোট হোল্ডিং এর ৭৪ শতাংশই ছোট খামারের মালিকানাধীন যা মোট আবাদযোগ্য এলাকার মাত্র ৩১ শতাংশ। পক্ষান্তরে জেলার গড়ে মোট ছোট খামারের মালিকানা ৭২ শতাংশ এবং আবাদযোগ্য এলাকা ৩২ শতাংশ। কলমাকান্দা উপজেলায় তা যথাক্রমে ৭২ ও ২৯ শতাংশ।

Annex-A সারণী-৯.১৬ ও ৯.১৭ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মাঝারি আকারের খামারের মোট সংখ্যার ২২ শতাংশের মালিক মাঝারি খামারের আওতাধীন যা আবাদযোগ্য মোট জমির ৪২ শতাংশ। কলমাকান্দা উপজেলায় এ সংখ্যা যা জেলার গড়ের প্রায় সমান। মোট সংখ্যা মাত্র ৫.৩৩ শতাংশ বড় খামার যা আবাদযোগ্য মোট জমির এলাকার মাত্র ২৯ শতাংশ। এতে দেখা যায় দুর্গাপুর ও কলমাকান্দায় বড় খামারের মালিকরা জেলার গড়ের চেয়ে বেশী এলাকার মালিক। এর ফলে ছোট ও মাঝারি আকারের জনগোষ্ঠীর ভূমি সত্বের অংশ কম পাচ্ছে। দারিদ্র বিমোচনের জন্য ভূমি মালিকদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা এখনই প্রয়োজন।

ভূমি মালিকানাঃ ইউনিয়ন ও মৌজা পর্যায়ে

সারণী-৯.৬ ইউনিয়ন ও মৌজা পর্যায়ে ভূমি মালিকানা পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, মোট হোল্ডিং এর ০.৭৩৫ শতাংশ যাদের কোন বাসস্থান নেই এবং শুধু বাসস্থান আছে এমন সংখ্যা মোট হোল্ডিং এর ২৬ শতাংশ। বাসস্থান ছাড়া এক একরের নিচে জমির মালিকানা ৩৭ শতাংশ জনগোষ্ঠীর। সর্বোপরি ছোট আকারের জমির মালিকানার জনগোষ্ঠী ৫৩ শতাংশ। জেলার ১৭ শতাংশ লোক বড় হোল্ডিং এর মালিক। তাদের মোট হোল্ডিং সংখ্যা ৫৮,২৩৪টি।

www.pathagar.com

সারণী–৯.৬: খামারের আকার ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার, দূর্গাপুর

মৌজা/ইউনিয়ন/ উপজেলা : দূর্গাপুর	সকল হোল্ডিং	অকৃষি পরিবার	কৃষি খামার	ছোট খামার	মাঝারী খামার	বড় খামার	বাসস্হান এলাকা	নিজস্ব এলাকা	অন্যকে দেয়া ভূমি	অন্য থেক নেয়া ভূমি	ব্যবহৃত এলাকা	চাষ এলাকা	নীট সেচকৃত এলাকা	নীট সার ব্যবহার এলাকা
কুল্লাগড়া ইউনিয়ন	৪৬০১	২২৩৭	২৩৬৪	১৬৫২	৫৭৭	১৩৫	৫৩১	৫৭৬৯	৮৯৪	৯৮৩	৫৮৫৮	৪৯৪২	১১৬৫	৩৪২০
আরাপাড়া	৩৩০	১৮১	১৪৯	৯৮	৪২	৯	৪২	৩৭০	৮৯	১১৬	৩৯৬	৩১৭	১৩১	২২৩
%ইউনিয়ন পর্যায়ে		৪৮.৬২	৫১.৩৮	৩৫.৯০	১২,৫৪১	২.৯৩	১১.৫৪					৮৪.৩৬	১৯.৮	৫৮.৩
% মৌজায় পর্যায়ে		৫৪.৮৪	৪৫.১৫	২৯.৬৯	১২.৭২৭	২.৭৩	১২.৭৩					৮০.০৫	৩৩.১	৫৬.৩

Source : BBS : Census of Agriculture; 1996, P310

www.pathagar.com

কুল্লাগড়া, দুর্গাপুর

সারণী-৯.২১ পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, দুর্গাপুর উপজেলা আড়াপাড়া মৌজায় হোল্ডিং সংখ্যা কুল্লাগড়া ইউনিয়নের খামারের মোট হোল্ডিং এর ৫১ শতাংশ। এর মধ্যে ছোট খামার ৩৬ শতাংশ মাঝারি খামার ১৩ শতাংশ এবং বড় খামার ৩ শতাংশ। আড়াপাড়া মৌজায় বাসস্থানের এলাকায় কুল্লাগড়া ইউনিয়নের মোট হোল্ডিং এর ১.৫ শতাংশ। এই ইউনিয়নের ৮৪ শতাংশ এলাকায় চাষাবাদ করা হয়। নীট সেচ ব্যবস্থা রয়েছে মাত্র ২০ শতাংশ জমিতে এবং সার ব্যবহার করা হয় মাত্র ৫৮ শতাংশ জমিতে। আড়াপাড়া মৌজায় কুল্লাগড়া ইউনিয়নের ৪৫ শতাংশ খামার রয়েছে যার ৩০ শতাংশ ছোট খামার, মাঝারি ১২ শতাংশ এবং বড় খামার মাত্র ৩ শতাংশ। এ মৌজার ৮০ শতাংশ ভূমি চাষাবাদ হয়, যার ৩১ শতাংশ সেচ আওতাধীন এবং ৫৬ শতাংশ এ সার ব্যবহার হয়। উল্লেখযোগ্য দিক হলো আড়াপাড়া মৌজায় ইউনিয়নের গড়ের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ সেচ ব্যবস্থা রয়েছে। সারের ব্যবহার ইউনিয়নের গড়ের চেয়ে সামান্য কম।

চৌহাট্টা, কলমাকান্দা

কলমাকান্দা উপজেলার বড়কাপন ইউনিয়নের চৌহাট্টা মৌজার খামারের আকার ভিত্তিক ভূমি ব্যবহারের চিত্র সারণী-৯.৭ দেখানো হয়েছে। বড় কাপন ইউনিয়নের ২৮৭৯টি হোল্ডিং এর মধ্যে ৪৫৪টি হোল্ডিং চৌহাট্টা মৌজায়। এ ইউনিয়নে ১৯১৯টি খামারের মধ্যে চৌহাট্টা মৌজায় রয়েছে ২৮০টি। ইউনিয়নের মোট হোল্ডিং এর ৬৭ শতাংশ কৃষিখামার যার ৪৩ শতাংশ ছোট ১৮ শতাংশ মাঝারি মাত্র ৬ শতাংশ বড় খামার। মোট হোল্ডিং এর ৬ শতাংশ ইউনিয়ন পরিবারের বাসস্থান। ইউনিয়ন পর্যায়ে আবাদী জমি ৮৯ শতাংশ যার ৫৮ শতাংশে সেচ ব্যবস্থার সুযোগ রয়েছে। সার ব্যবহার করে ৬৪ শতাংশ কৃষি জমিতে। মৌজার ক্ষেত্রে দেখা যায়, এ মৌজায় ইউনিয়নের মোট হোল্ডিং-এর ৬১ শতাংশ খামারে সার ব্যবহার করা হয়। এর ছোট আকারের খামারে ৩৮ শতাংশ, মাঝারি খামারে ১৬ শতাংশ এবং বড় খামারে মাত্র ৮ শতাংশ জমিতে সার ব্যবহার করা হয়। কলমাকান্দা উপজেলা এ মৌজাটিতে সেচ ব্যবস্থা রয়েছে ৭৯ শতাংশ আবাদী এলাকায়। সার ব্যবহার করে ৫৭ শতাংশ আবাদী এলাকায় যা দূর্গাপুর উপজলার আড়াপাড়া মৌজার চেয়ে অনেক বেশী।

www.pathagar.com

সারনী–৯.৭খামারের আকার ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার, কলমাকান্দা

মৌজা / ইউনিয়ন / উপজেলা	সকল হোল্ডিং	অকৃষি পরিবার	কৃষি খামার	ছোট খামার	মাঝারি খামার	বড় খামার	বাসস্থান এলাকা	নিজস্ব এলাকা	অন্যকে দেয়া ভূমি	অন্য থেক নেয়া ভূমি	ব্যবহৃত এলাকা	চাষ এলাকা	নীট সেচকৃত এলাকা	নীট সার ব্যবহার এলাকা
বড়কাপন	২৮৭৯	৯৮০	১৯১৯	১২২১	৫২৭	১৭১	১৫৭	৫৭১৫	৭৪১	৮০১	৫৭৭৬	৫১৪৭	৩৩৭৬	৩৬৭০
চৌহাট্টা	৪৫৪	১৭৪	২৮০	১৭১	৭৩	৩৬	২৬	৯২৭	২১৩	২৬৭	৯৮১	৮৯১	৭৭৮	৫৬০
%ইউনিয়ন পর্যায়ে		৩৪.০৪০	৬৬.৬৫৫	৪২.৪১১	১৮.৩০	৫.৯৪০	৫.৪৫৩					৮৯.১১	৫৮.৪৫	৬৩.৫৪
% মৌজায় পর্যায়ে		৩৮.৩৩	৬১.৭	৩৭.৬৬	১৬.০৭	৭.৯৩০	৫.৭২৭					৯০.৮৩	৭৯.৩১	৫৭.০৮

Source : Census of Agriculture 1996: P 313

www.pathagar.com

বিভিন্ন শস্য আবাদী এলাকা

সারণী–৯.৮ বিভিন্ন শস্য আবাদী এলাকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নে মোট শস্য আবাদী ৭ শতাংশ আড়াপাড়া মৌজায় এর মধ্যে HYV আউশ ৩৮ শতাংশ, HYV আমন ১.২ শতাংশ এবং স্থানীয় ধান ৭.১৮ শতাংশ। সারণী–৯.২৩ এ লক্ষ্য করলে আরো দেখা যাবে যে, কুল্লাগড়া ইউনিয়নে HYV আউশ আমন ছাড়াও গম, আলু, শাকসবজি ডাল, তৈলবীজ, ইক্ষু ও পাট চাষ হয়। তবে আড়াপাড়া মৌজাটি উচু নীচু পাহাড়ী এলাকা বলে শস্যাদি ভালো উৎপাদন হয় না। কৃষি আর পাহাড়ে জ্বালানী কাঁঠ সংগ্রহ করা ছাড়া এখানে অন্য কোন বিকল্প কর্মসংস্থান নেই। এহেন পরিস্থিতিতে অত্র এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদের যেমন– সুমেশ্বরী নদীর বালু, কয়লা, বিজয়পুরের সাদামাটি পাহাড়ের বন ভূমি টেক্সই ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন। স্থানীয় পর্যায়ে এ সব সম্পদ ভিত্তিক ছোট ছোট কলকারখানা ও ট্রেডিং গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এ সব উদ্যোগ প্রাথমিকভাবে স্থানীয় পর্যায়ে নেয়াই শ্রেয়।

সারণী–৯.৮ এ কলমাকান্দা উপজেলার বড়কাপন ইউনিয়নের চৌহাট্টা মৌজার বিভিন্ন শস্যাদি আবাদী এলাকার অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইউনিয়নের মোট শস্য আবাদী এলাকার প্রায় ১৬ শতাংশ এ মৌজায়, যা আড়াপাড়ার এলাকার চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশী। তবে নিচু এলাকা বলে সেখানে কোন আমন বা আউশ করা হয় না। বোরো ও স্থানীয় ধান যথাক্রমে ১৭ শতাংশ এলাকা করে ইউনিয়নের মোট ৩৪ শতাংশ এলাকা দখল করে আছে। এখানে গম চাষ হয় সবচেয়ে বেশী ইউনিয়নের প্রায় ৪৭ শতাংশ এলাকায়। চৌহাট্টা মৌজায় আলু ১৭ শতাংশ, শাকসবজি ২ শতাংশ, মসলা ৭ শতাংশ, তৈলবীজ ১২ শতাংশ এবং পাট জন্মায় ইউনিয়নের ৪ শতাংশ এলাকায়। দুইটি মৌজার তুলনামূলক বিবরণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আড়াপাড়া মৌজার চেয়ে চৌহাট্টা মৌজার শস্য উৎপাদন কার্যক্রম বেশী। তাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশী এবং দারিদ্র্যও অনেকটা কম হতে পারে। গ্রাম বা মৌজা পর্যায়ে বিশদভাবে জরিপ করলে এ বিষয়ে বিস্তারিত আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

কৃষিশ্রমিক, কুটির শিল্প, কৃষিসরঞ্জাম ও গ্রামীন যানবাহন

সারণী ৯.৮ খামারের আকার ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার : দূর্গাপুর ও কলমাকান্দা

মৌজা / ইউনিয়ন / উপজেলা	নীট সাময়িক শস্য	গ্রস শস্য	HYV আউশ ধান	HYV আমন ধান	বোরো ধান	স্থানীয় ধান	গম	মেইজ	আলু	শাক সবজী	মসলা	ডাল	তৈল বীজ	Bz	পাট	তুলা
দূর্গাপুর																
কুল্লাপাড়া	৪৭৪০	৭২৪৭	৮৯	২৪৯	১৬৭	৬৫০৮	৪১	০	৩৬	৪০	৫০	৩	৩১	৪	২৯	০
আড়াপাড়া	৩১৫	৫০৬	৩৫	৩	০	৪৬৭										
% ইউনিয়নে	৬.৬৫	৬.৯৮	৩৯.৩৩	১.২০	০.০০	৭.১৮	০	০	০	০	০	০	০.০০	০	০	০
কলমাকান্দা																
বড় কাপন	৫০৬৭	৫৯১১	৬	২৩	১৫৪০	৩১৭১	৩২	০	৭৬	৪৮	১০৩	১৪	৭২৪	২	১৭১	
চৌহাট্টা	৮৮৭	৯৩৮			২৬২	৫৪২	১৫		১৩	১	৭	৩	৮৯		৬	
% ইউনিয়নে	১৭.৫১	১৫.৮৭	০.০০	০.০০	১৭.০১	১৭.০৯	৪৬.৮৮	০	১৭.১১	২.০৮	৬.৮০	০	১২.২৯	০	৩.৫১	

Source: Census of Agriculture 1996 p;388 & 391

www.pathagar.com

সারণী–৯.৯ দুর্গাপুর উপজেলাধীন কুল্লাগড়া ইউনিয়নে কৃষি খামার সংখ্যা ১৭৬৫টি এবং আড়াপাড়া মৌজায় এ সংখ্যা ১৯৮টি যা ইউনিয়নের সংখ্যার ১১ শতাংশ। কুটির শিল্পের সংখ্যা ইউনিয়নের সর্বমোট ১৮৩টি এবং আড়াপাড়া মৌজায় ৫টি যা ইউনিয়নের সংখ্যার মাত্র ৩ শতাংশ। আড়াপাড়া গ্রামের গ্রামীণ যানবাহন ও কৃষি সরঞ্জামের পরিসংখ্যানের চিত্র অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। গ্রামীণ যানবাহন ইউনিয়নের সংখ্যার তুলনায় আড়াপাড়া গ্রামে মাত্র ৩ শতাংশ। এগুলির মধ্যে ট্রাক্টর ১টি, বাইসাইকেল ৮টি, গবাদি পশু ৩৭২ (প্রতি খানায় ২টি), মহিষ মোট ১৫টি (প্রতি খানায় ০.০৭৬) ছাগল ২৯৮ (প্রতি খানায় ১.৫০ টি) মুরগীর সংখ্যা ১৩৬০টি (প্রতি খানায় ৭টি) হাসের সংখ্যা ৩৪২টি (প্রতি খানায় ১.৭২টি)। পাহাড়ী উঁচুনিচু এলাকা বলে এ মৌজায় নৌকা, রিকসা ও রিকসা ভ্যান কোন কিছুই নেই। ফলে যাতায়াত ও যোগাযোগের মাধ্যম মূলত পায়ে হাটার উপর নির্ভর করতে হয়। এ এলাকায় রাস্তাঘাটও একেবারে জরাজীর্ণ অবস্থা। খাল ও বিলের ভাঙ্গা জায়গাগুলোতে বাঁশের সাঁকো দিয়ে পার হতে হয়। ফলে মটর সাইকেল এবং বাইসাইকেল দিয়ে চলাফেরাও অনেক ক্ষেত্রে কষ্ট সাধ্য ব্যাপার।

এ গ্রামের দারিদ্র্য চিত্র ইউনিয়নে পর্যায়ের অবস্থানের সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, যে সমস্ত কৃষি সরঞ্জাম এ মৌজায় রয়েছে তাও ইউনিয়নের গড়ের প্রায় অর্ধেক (সারণী–৯.৯)।

উপসংহার

নেত্রকোণা জেলার দারিদ্র্য চিত্র পর্যালোচনা করতে গিয়ে এ অধ্যায়ে জেলার তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর নিত্য দিনের মৌলিক চাহিদা পূরণের অবস্থাটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবেশী জেলাগুলোর এবং ঢাকা বিভাগের অবস্থার সাথে নেত্রকোণার দারিদ্র্য চিত্র ও মৌলিক চাহিদা পূরণের অবস্থার সার্বিক তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নেত্রকোণা জেলায় প্রাকৃতিক সম্পদের বিরাট ভান্ডার থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্য বিমোচনে পিছিয়ে রয়েছে প্রতিবেশী অনেক জেলা থেকে। এজন্যে আঞ্চলিক উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। গবেষণা এলাকার দারিদ্র্য চিত্র আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণের লক্ষ্যে জরিপাধীন উপজেলাদ্বয় ও সংশ্লিষ্ট মৌজাদ্বয়ের দারিদ্র্যাবস্থা জেলায় উপজেলার অবস্থার সাথে তুলনা করে দেখা যায় যে, জরিপকৃত এলাকার তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যাবস্থা উপজেলা ও জেলার গত অবস্থার চেয়ে খারাপ। এক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্তকরণ ও তৃণমূলপর্যায়ে ত্যাগী ও কল্যাণমূখী নেতৃত্ব গড়ে তোলা প্রয়োজন। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে আলোকে এ ধরণে গ্রামীমূখী কর্মসূচী নিয়ে প্রস্তাবিত কৌশল বাস্তবায়ন ও সহস্রাব্দ লক্ষ্যার্জন সম্ভব হতে পারে।

www.pathagar.com

সারণী ৯.৯ দুর্গাপুর উপজেলার কুল্লাগড়া ইউনিয়নের আড়াপাড়া মৌজার দারিদ্র্য চিত্র

মৌজা / ইউনিয়ন	কৃষি শ্রমিক পরিবার	পরিবার Household Reporting								পশু পাখির সংখ্যা				
		কুটির শিল্প	গ্রামীণ যান বাহন	ট্রাক্টর	পাওয়ার টিলার	নৌকা	রিক্সা	রিক্সা ভ্যান	বাই সাই কেল	গবাদি পশু	মহিষ	ছাগল	ফাউল ভড়ষি	হাঁস
কুল্লাগড়া ইউনিয়ন	১৭৬৫	১৮৩	৩৬৬	৪	২	৯৯	১৮	১৮	২৮১	৪৫২০	১৫১	২৯০০	১৯৩০১	৪২৪৯
আড়াপাড়া	১৯৮	৫	৮	১					৮	৩৭২	১৫	২৯৮	১৩৬০	৩৪২
ইউনিয়নের %	১১.২১৮	২.৭৩২	২.১৮৬	২৫.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০	২.৮৪৭	৮.২৩০	৯.৯৩৪	১০.২৭৬	৭.০৪৬	৮.০৪৯
প্রতি পরিবার ইউনিয়ন পর্যায়ে		০.১০৪	০.২০৭	০.০০২	০.০০১	০.০৫৬	০.০১০	০.০১	০.১৫৯	২.৫৬১	০.০৮৬	১.৬৪৩	১০.৯৩৫	২.৪০৭
প্রতি পরিবার মৌজা পর্যায়ে		০.০২৫	০.০৪০	০.০০৫	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০	০.০৪০	১.৮৭৯	০.০৭৬	১.৫০৫	৬.৮৬৯	১.৭২৭

Source: BBS: Census of Agriculture,1996: p349

www.pathagar.com

সারণী–৯.১০ কৃষি শুমারী ১৯৯৬ সালের তথ্য অনুসারে কলমাকান্দা উপজেলার বড়কাপন ইউনিয়নের চৌহাট্টা মৌজার দারিদ্র চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ মৌজায় ইউনিয়নের ৮৯৫টি খামার মধ্যে চৌহাট্টায় রয়েছে ১৮২ (২০ শতাংশ)।

সারণী ৯.১০ কলমাকান্দা উপজেলার বড় কাপন ইউনিয়নের চৌহাট্টা মৌজার দারিদ্র চিত্র

মৌজা / ইউনিয়ন	কৃষি শ্রমিক পরিবার	পরিবার (Household Reporting)								পশু পাখির সংখ্যা				
		কুটির শিল্প	গ্রামীণ যান বাহন	ট্রাক্টর	পাওয়ার টিলার	নৌকা	রিক্সা	রিক্সা ভ্যান	বাই সাই কেল	গবাদি পশু	মহিষ	ছাগল	ফাউল ভড়ষি	হাঁস
কুল্লাগড়া ইউনিয়ন	৮৯৫	৬৬	৪৮৮	২	৬	৪৬৪	৮	১	২৮	৩৯৮৬	৮	৬৫৮	৫৮৪৬	৮২৭২
আড়াপাড়া	১৮২	৪	১০৭		১	১০৪			৮	৬৫৬		১০০	৯০৬	১৪২৭
% ইউনিয়নের	২০.৩৩৫	৬.০৬১	২১.৯২৬	০.০০০	১৬.৬৬৭	২২.৪১৪	০.০০০	০.০০০	২৮.৫৭১	১৬.৪৫৮	০.০০০	১৫.১৯৮	১৫.৪৯৮	২৫১১৭
প্রতি পরিবার ইউনিয়ন পর্যায়ে		০.০৭৪	০.৫৪৫	০.০০২	০.০০৭	০.৫১৮	০.০০৯	০.০০১	০.০৩১	৪.৪৫৪	০.০০৯	০.৭৩৫	৬.৫৩২	৯.২৪২
প্রতি পরিবার মৌজা পর্যায়ে		০.০২২	০.৫৮৮	০.০০০	০.০০৫	০.৫৭১	০.০০০	০.০০০	০.০৪৪	৩.৬০৪	০.০০০	০.৫৪৯	৪.৯৭৮	৭.৮৪১

Source:BBS:Census of Agriculture, 1996: p352

www.pathagar.com

ইউনিয়নে ৬৬টি কুটির শিল্পের মধ্যে এ মৌজায় রয়েছে মাত্র ৪টি (৬শতাংশ)। গ্রামীণ যানবাহনের ৪৮৮টির মধ্যে এ মৌজায় রয়েছে ১০৭ (২২ শতাংশ), পাওয়ার টিলার ইউনিয়নের ৬টির মধ্যে ১টি। নৌকা ইউনিয়নে ৪৬৪ এর মধ্যে এ মৌজায় ১০৪টি (২২ শতাংশ)। বাইসাইকেল ৮টি, গরু ৬৫৬টি, ছাগল ১০০, মুরগী ৯০৬ এবং হাস ১৪২৭ টি। এসব গ্রামীণ সুবিধা ও সরঞ্জাম খানা ভিত্তিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের গড়ের তুলনায় চৌহাট্টা মৌজার সুবিধার প্রায় অর্ধেক। তাই মৌজা বা গ্রামকে ইউনিয়নের গড়ের পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। ইউনিয়নকে উপজেলা পর্যায়ের গড়ের সমান করে আনতে হবে। তাতে সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ ও জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিও সুফল তৃণমূল পর্যায়ে সবার দ্বারে পৌছানো সম্ভব হবে।

সহায়ক গ্রন্থ

BBS (2002) Vital Sample Registration System(VSRS)
BBS (1996) Census of Agriculture
লেখকের সরেজমিন পরিদর্শন

Annex A

Annex A সারণী-৯.১: আবাসন: গৃহ নির্মাণ সামগ্রী

জেলা	মোট	দালান	আধা পাকা	টিন/কাঠ	মাটি	বাশ	অন্যান্য
ঢাকা বিভাগ	১০০	১২.০৭	৮.৯৩	৬২.৫৩	৬.৩২	৮.৭৫	১.৪০
নেত্রকোণা জেলা	১০০	০.৫৪	২.৮৪	৫৭.৬	২.৮৫	৩৫.৭৮	০.৩৯
ময়মনসিংহ	১০০	২.১১	৪.৪১	৫৪.৪৮	১৮.৮৩	১৯.৮৮	০.২৩
কিশোরগঞ্জ	১০০	১.৪৬	৩.৮১	৮৮.৫২	০.৮১	৫.৩	০.০৭
জামালপুর	১০০	১.২৩	২.৩৫	৮২.৮৯	৪.৩৯	৮.৯৬	০.১৫
শেরপুর	১০০	১.১৫	২.৬	৬৩	৭.১২	২৫.৭২	০.০৩৭
টাঙ্গাইল	১০০	০.৭২	১.৮৮	৯১.০৯	৩.৯৪	২.৩১	০.০৩

Source: BBS: Vital Sample Registration System (VSRS), 2002

www.pathagar.com

Annex A-৯.২: সুপেয় পানীয় জলের উৎস

জেলা	মোট	টেপ	নলকূপ	কুয়া	পুকুর	নদী/নালা	বৃষ্টির পানি
ঢাকা বিভাগ	১০০	১৬.৭০	৮২.৮৮	০.৩১	০.০২	০.০৬	০.০০
নেত্রকোণা জেলা	১০০	০.৩৯	৯৯.২৮	০.১৩	০.১৩	০.০৪	০.০০
ময়মনসিংহ	১০০	০.৩১	৯৯.৪৩	০.২৫	০.০০	০.০০	০.০০
কিশোরগঞ্জ	১০০	০.৪৪	৯৯.৩৩	০.২২	০.০০	০.০০	০.০০
জামালপুর	১০০	০.০৮	৯৯.৮১	০.০০	০.০৪	০.০১	০.০৪
শেরপুর	১০০	০.৩৭	৯৯.৪২	০.১৯	০.০০	০.০০	০.০০
টাঙ্গাইল	১০০	০.১৫	৯৮.১২	১.৭১	০.০০	০.০০	০.০০

Source: BBS: Vital Sample Registration System (VSRS), 2002

Annex A-৯.৩ : কেরোসিন ও বিদ্যুতের ব্যবহার

বিভাগ/ জেলা	মোট	কেরোসিন	বিদ্যুত	অন্যান্য
ঢাকা বিভাগ		৫৫.১২	৪৪.৪৫	০.৪১
নেত্রকোণা জেলা		৮৪.১১	১৫.৫৬	০.৩১
ময়মনসিংহ	১০০	৮১.৫৪	১৮.১৮	০.২৭
কিশোরগঞ্জ	১০০	৮৬.৩২	১৩.১২	০.৫৫
জামালপুর	১০০	৮৯.১৬	১০.৫৯	০.২৪
শেরপুর	১০০	৮৬.৭৭	১২.৮৭	০.৩৪
টাঙ্গাইল	১০০	৭৪.৭৭	২৪.৮৭	০.৩৫

Source: BBS: Vital Sample Registration System (VSRS), 2002

www.pathagar.com

Annex A-৯.৪ : জ্বালানীর উৎস

বিভাগ/ জেলা	মোট	খড়	তুষ/ভূষি	বাশ/কাঠ	কেরোসিন	বিদ্যুত	গ্যাস	অন্যান্য
ঢাকা বিভাগ		৩৩.৩৮	৪.৩৫	৪০.৩৪	০.৭৮	১.৪৯	১৮.৪৫	১.১৮
নেত্রকোণা জেলা		২৭.০৫	২.৯৬	৬৮.১৫	০.২৮	০.৪১	০.৯১	০.২১
ময়মনসিংহ	১০০	৪৮.১৯	২.০২	৪৬.৫৩	০.৩২	০.৪১	২.০২	০.৪৮
কিশোরগঞ্জ	১০০	৩৫.৪৬	২.৮৯	৫৬.৫৩	০.২৫	০.২১	৩.৫৩	১.০৮
জামালপুর	১০০	৬৫.৩৪	৬.১৯	২৭.২৫	০.০৮	০.২৭	০.৭১	০.১৪
শেরপুর	১০০	৬০.৫১	০.৮৫	৩৭.৬৪	০.১৩	০.২৮	০.৪২	০.১৪
টাঙ্গাইল	১০০	৫৮.৮৮	১৩.৩৮	২৬.৭৩	০.২২	০.১৩	০.৪৯	০.১৪

Source: BBS: Vital Sample Registration System (VSRS), 2002

Annex A-৯.৫ : পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাদি (টয়লেট)

বিভাগ/ জেলা	মোট	স্যানিটারি	অন্যান্য	কিছুই না
ঢাকা বিভাগ		৪৬.৭৪	৩৮.৯২	১৪.৩৩
নেত্রকোণা জেলা		২৬.৬০	৩৮.৫৪	৩৪.৮৫
ময়মনসিংহ	১০০	৩০.৩৬	৪১.৪২	২৮.২০
কিশোরগঞ্জ	১০০	২৫.৩৫	৬০.৪৯	১৪.১৫
জামালপুর	১০০	১৮.১৮	৪৬.৩২	৩৫.৪৮
শেরপুর	১০০	২৮.৪৩	৩৮.৮৭	৩২.৬৯
টাঙ্গাইল	১০০	৩৪.১৫	৫৩.৫৯	১২.২৫

Source: BBS: Vital Sample Registration System (VSRS), 2002

www.pathagar.com

Annex A-৯.৬: অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

বিভাগ/ জেলা	মোট	স্থায়ী অস্বচ্ছল	অস্থায়ী অস্বচ্ছল	আয়-ব্যয় সমান	স্বচ্ছল	সঞ্চয়
ঢাকা বিভাগ		১৪.৬৭	২১.৫৮	৩৮.০৫	১৬.৫৫	৯.১৩
নেত্রকোণা জেলা		১৯.৫২	২৯.৩৩	২১.৬৯	১৬.৫০	১২.৯৩
ময়মনসিংহ	১০০	১৭.১১	২৫.০৯	৩৬.২৯	১৫.৪৪	৬.০৩
কিশোরগঞ্জ	১০০	১৬.৭৫	২৯.০২	৩৫.০৭	১১.৬৭	৭.৪৭
জামালপুর	১০০	২৫.৭৫	৩৬.৮৮	২১.২০	৮.৯০	৭.৮০
শেরপুর	১০০	২৭.৪৫	২৮.০৪	২২.৩৭	১৬.৭৬	৫.৩৬
টাঙ্গাইল	১০০	১৫.৪	২২.৮০	৩১.৯৭	২০.৪৮	৯.২৮

Source: BBS: Vital Sample Registration System (VSRS), 2002

www.pathagar.com

Annex A-৯.৭: নেত্রকোণা জেলার ১৯৯৬ ও ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি জরিপের তুলনামূলক বিবরণি

বিষয়াদি			১৯৮৩-১৯৮৪				১৯৯৬					
	সকল হোল্ডিংস	অকৃষি পরিবার	কৃষি হোল্ডিংস Farm Holdings				সকল হোল্ডিংস	অকৃষি পরিবার	কৃষি হোল্ডিংস Farm Holdings			
			মোট	ছোট	মাঝারি	বড়			মোট	ছোট	মাঝারি	বড়
বসত বাড়ি এলাকা	২০২৭৩	২৬৫০	১৭৬২৩	৮০৯৪	৬৮৪৯	২৬৮০	২৩৭৯৮	৫৫৮৪	১৮২১৪	১০৫৯৬	৫৭৭১	১৮৪৭
শতকরা	১০০.০০	১৩.০৭	৮৬.৯৩	৪৫.৯৩	৩৮.৮৬	১৫.২১	১০০	২৩.৪৬	৭৬.৫৪	৫৮.১৮	৩১.৬৮	১০.১৪
প্রতি হোল্ডিং এলাকা	০.০৮	০.০৪	০.০৯	০.০৭	০.১২	০.১৯	০.০৭	০.০৪	০.০৯	০.০৭	০.১২	০.১৯
নীট আবাদি এলাকা	৪৭৮৯২৬	২৬১	৪৭৮৬৬৫	৯৯৭৭৩	২১৫৯৭৫	১৬২৯১৭	৪২৪১৬৬	৩১১.০০	৪২৩৮৫৫	১২৮৬১৭	১৮২২১৪	১১৩০২৪
শতকরা	১০০.০০	০.০৫	৯৯.৯৫	২০.৮৪	৪৫.১২	৩৪.০৪	১০০.০০	০.০৭	৯৯.৯৩	৩০.৩৪	৪২.৯৯	২৬.৬৭
প্রতি হোল্ডিং এলাকা	১.৮২	০.০০	২.৫৬	০.৮৫	৩.৮৮	১১.৩০	১.২৬	০.০০	২.০১	০.৮৪	৩.৭৬	১১.৪৯
গ্রস শস্যএলাকা			৬৮৫০৬৬	১৫৪১৪৫	৩১৭০০১	২১৩৯২০			৬৬০.৪৯	২১৯৩৭৭	২৮৬৯৯১	১৫৪১২২
শতকরা			১০০.০	২২.৫	৪৬.৩	৩১.২			১০০.০	৩৩.২	৪৩.৫	২৩.৩
দেশের মোটের শতকরা			২.১	১.৬	২.১	২.৮			২.৩	১.৮	২.৪	৩.৪
শস্য নিবিড়তা			১৫৭.৮	১৬৭.৯	১৫৫.১	১৫৬.২			১৫৯	১৭৫.৭	১৬০.১	১৩৮.৩

www.pathagar.com

হোল্ডিংস রিপোর্টিং			৯৪২৩১	৪৩৯৬৪	৩৮৩৬৩	১১৯০৪			১৪৬৩৬৫	১০০৩৬৪	৩৭৯০৩	৮০৯৮
কৃষি হোল্ডিংসের শতকরা			৫০.৩	৩৭.৫	৬৮.৯	৮২.৬			৬৯.৩	৬৫.৬	৭৮.৩	৮২.৩
সেচ এলাকা			১৬১৩৭৫	২৬৬৬৭	৬৮১৫৬	৬৬৫৫২			২৪২৫৩১	৭২১৮৭	১০৩০২২	৬৭৩২২
চাষাবাদ এলাকার শতকরা			১৪৮.৫৮	১৬৪.০১	১৫১.৩৯	১৩৫.৮৮			৫৭.২২	৫৬.১৩	৫৬.৫৪	৫৯.৫৬
সারের ব্যবহার (Use of Fertilizer)												
হোল্ডিংস রিপোর্টিং									১৮৭৩৩৯	১৩১৭৮৪	৪৬১১৫	৯৪৪০৯৫.৯৮
কৃষি হোল্ডিংসের শতকরা									৮৮.৭২	৮৬.১৯	৯৫.২৪	৯৫.৯৮
সার ব্যবহারের এলাকা									৩৫৮০৫৩	১০৮২০৪	১৫৪৮৮১	৯৪৯৬৮
চাষাবাদ এলাকার শতকরা									৮৪.৫	৮৪.১	৮৫.০	৮৪.০

www.pathagar.com

শস্য এলাকা (Crop-Area)												
HYV আউস ও পাজম	১৬৭৯৩	৪৫৩৪	৮১৬৯	৪০৮৮					২৫১২৬	৯৯৫৫	১০৯৮৭	৪১৮৪
HYV আমন ও পাজম	৩১৬৯৯	৯০০৬	১৫১২০	৭৫৭৩					৯৩২৬৪	৩৫২৪৭	৪১৩১২	১৬৭০৫
HYV বোরো ও পাজম	৯১৫৪১	১৫২০৭	৩৯০৮৭	৩৭২৪৭					১৭৬৫০৫	৫২৪৩২	৭৪৬৩৬	৪৯৪৩৭
গম			৩২৯৪	৯২০	১৬০০	৭৭৩			১০৮৮৭	৪৫২০	৪৫০৫	১৮৬২
ডাল			৯৬৩৮	২৫৯৮	৪৫৮৩	২৪৫৭			৩৩৩৩	৮৫৬	১৫৬৩	৯১৪
তৈলবীজ			২৫১০৬	৪৩৩৬	১১২০৮	৯৫৬২			১৬৮৯৭	৪৫৯৯	৭৩৯৯	৪৮৯৯
ক্যাশ শস্য			৬১৬২২	১৫৫২৪	২৯১৯৬	১৬৯০২			২৭৭৭০	৯৫৫০	১২৫৩০	৫৬৯০
পশু সম্পদ Livestock and Poultry												
(ধ) গোস্পদ												
হোল্ডিংসে রিপোর্টিং	১৩৮৭৩৯	৬৫৬১	১৩২.১৭৮	৬৪.৮৮৮	৫৩০৯৪	১৪১৯৬	১৪১৪২১	১০৬১৭	১৩০৮০৪	৮০৬৩৭	৪১২৬৪	৮৯০৩
সকল হোল্ডিংসের শতকরা	৫২.৮৬	৮.৭৩	৭০.৫৭	৫৫.৩৪	৯৫.৪১	৯৮.৪৮	৪১.৯৫	৮.৪৩	৬১.৯৫	৫২.৭৪	৮৫.২২	৯০.৫২
গোস্পদ সংখ্যা	৪৪৬০৫৯	১০৭৬৫	৪৩৫২৯৪	১৩৫০০৫	১৯৩২২০	১০৭০৬৯	৩৮৭০২২	১৬৯৪৭	৩৭০০৭৫	১৬৮১৯০	১৪৪৩৫৬	৫৭৫২৯

www.pathagar.com

শতকরা	১০০.০০	২.৪১	৯৭.৫৯	৩১.০১	৪৪.৩৯	২৪.৬০	১০০.০০	৪.৩৮	৯৫.৬২	৪৫.৪৫	৩৯.০১	১৫.৫৫
প্রতি হোল্ডিংস গোস্পদ সংখ্যা	১.৭০	০.১৪	২.৩২	১.১৫	৩.৪৭	৭.৪৩	১.১৫	০.১৩	১.৭৫	১.১০	২.৯৮	৫.৮৫
(ন) ছাগল												
হোল্ডিংস রিপোর্টিং	৭৮৫২৮	১৪৪২২	৬৪১০৬	৩৬৮২৭	২০৯৪৭	৬৩৩২	৬৭৭৭২	১৭৩৬৪	৫০৪০৮	৩৪০৩১	১৩৩৪৫	৩০৩২
সকল হোল্ডিংসের শতকরা	২৯.৯২	১৯.১৯	৩৪.২২	৩১.৪১	৩৭.৬৪	৪৩.৯৩	২০.১১	১৩.৭৯	২৩.৮৭	২২.২৬	২৭.৫৬	৩০.৮৩
ছাগলের সংখ্যা	১৮২৩৭৮	২৮৪৯৩	১৫৩৮৮৫	৭৮৪৬৫	৫৩২৫০	২২১৭০	১৪৫৪২৯	৩২৮১৩	১২৬১৬	৭০১২৩	৩২৮৩১	৯৬৬২
শতকরা	১০০.০	১৫.৬	৮৪.৪	৫১.০	৩৪.৬	১৪.৪	১০০.০	২২.৬	৭৭.৪	৬২.৩	২৯.২	৮.৬
প্রতি হোল্ডিংস গোস্পদ সংখ্যা	০.৬৯	০.৩৮	০.৮২	০.৬৭	০.৯৬	১.৫৪	০.৪৩	০.২৬	০.৫৩	০.৪৬	০.৬৮	০.৯৮
(প) ফাউলস												
হোল্ডিংস রিপোর্টিং	১৭৯৩০০	৩৬০৫৬	১৪৩২৪৪	৮৩৭৪৯	৪৬৯৩১	১২৫৬৪	২১৪৪১২	৫৭৪৯৭	১৫৬৯১৫	১০৯১৮৩	৩৯৬৫২	৮০৮০
সকল হোল্ডিংসের শতকরা	৬৮.৩	৪৮.০	৭৬.৫	৭১.৪	৮৪.৩	৮৭.২	৬৩.৬	৪৫.৭	৭৪.৩	৭১.৪	৮১.৯	৮২.২
ফাউলসের সংখ্যা	১উ+০৬	১৫৫৫২৯	৯৭৩.৫৭১	৪৬০৪৭৬	৩৬৬৩৮৯	১৪৬৭০৬	১২৬৪৭৩৫	২৬৯৪৬৭	৯৯৫২৬৮	৬১৩৯০১	৩০১২৪৮	৮০১১৯
শতকরা	১০০.০	১৩.৮	৮৬.২	৪৭.৩	৩৭.৬	১৫.১	১০০.০	২১.৩	৭৮.৭	৬১.৭	৩০.৩	৮.১
প্রতি হোল্ডিংস ফাউলসের সংখ্যা	৪.৩	২.১	৫.২	৩.৯	৬.৬	১০.২	৩.৮	২.১	৪.৭	৪.০	৬.২	৮.২

www.pathagar.com

(ফ) হাঁস												
হোল্ডিংস রিপোর্টিং							১২৮১৮৩	২৯০৪৯	৯৯১৩৪	৬৫৩৫১	২৭৫৮০	৬২০৩
সকল হোল্ডিংসের শতকরা							৩৮.০৩	২৩.০৭	৪৬.৯৫	৪২.৭৪	৫৬.৯৬	৬৩.০৭
হাঁসের সংখ্যা							৬৮৩২১২	১২৯২৯২	৫৫৩৯২০	৩২২১৮৯	১৭৭৯৬৩	৫৩৭৬৮
শতকরা							১০০	১৮.৯২	৮১.০৮	৫৮.১৭	৩২.১৩	৯.৭১
প্রতি হোল্ডিংস হাঁসের সংখ্যা							২.০৩	১.০৩	২.৬২	২.১১	৩.৬৮	৫.৪৭

Source : BBS: Census of Agriculture 1996: p 30-31

www.pathagar.com

সারণী A-৯.৮: নেত্রকোণা জেলার ১৯৯৬ ও ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি জরিপের তুলনামূলক বিবরণী,
(Holding এর আকার ভিত্তিতে কৃষি ও কৃষি যন্ত্রপাতি কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্য:)

Items	সকল হোল্ডিংস	অকৃষি খামার: অব্যহৃত এলাকা / অসেচ কৃত এলাকা / .০১-.০৪ মধ্যে চাষকৃত এলাকা	কৃষি হোল্ডিংস: ছোট ০.০৫-০.৪৯ একর	ছোট ০.৫০-০.৯৯ একর	ছোট ১.০০-১.৪৯ একর	ছোট ১.৫০-২.৪৯ একর	ছোট মোট হোল্ডিংস	মাঝারি ২.৫০-৭.৪৯ একর	মাঝারি	বড় ৫০+ একর	মোট হোল্ডিংস	
HOLDING REPORTING OWNERSHIP & NUMBER OF AGRICULTURAL EQUIPMENT (কৃষি যন্ত্রপাতির সংখ্যা)												
গভীর নলকূপের সংখ্যা	২৪২৪		৩৮০	২৬	১৩৯	১৪৩	১৫৯	২৮১	৭২২	৮৪০	৪৫৬	২০১৮
Low-Lift Pumps এর সংখ্যা	১০০২০		২৯৭	২৮	২০৫	৩৬৫	৫৯৭	১৩৩৯	২৫০৬	৪৭৩৯	২৪৫০	৯৬৯৫
Power Pumps এর সংখ্যা	২৭৮৮		১৪৪	৮	৫৮	৮০	৯৮	২৯৭	৫৩৩	১০৬৬	১০৩৭	২৬৩৬
Non-Mech.irri tools এর সংখ্যা	২৫২২৯		২৯৬	৬৮	৮১৭	১৫৮৫	২৬৫৫	৪৭১০	৯৭৬৭	১০৪৭৭	৪৬২১	২৪৮৬৫
Power Tillers এর সংখ্যা	১০৬১		৪০	৯	৩১	৩৩	৪২	৮৩	১৮৯	৩৭৫	৪৪৮	১০১২
Tractors এর সংখ্যা	৮৯১		৬৫	৮	৩০	৩৮	৬১	১০৬	২৩৫	৩১৩	২৭০	৮১৮
HOLDING REPORTING OWNERSHIP & NUMBER OF RURAL TRANSPORT (গ্রামীণ যানবাহনের সংখ্যা)												
নৌকার এর সংখ্যা	১১১৭৪		১১৩৪	১১৮	৫৭৭	৭০৯	৯০২	১৫৬২	৩৭৫০	৩৯০১	২২৭১	৯৯২২
গরুর গাড়ী এর সংখ্যা	২৮৭৮		৭৫	৪	৩৯	৫১	৯৭	৩১৯	৫০৬	১২০২	১০৯১	২৭৯৯
রিক্সার এর সংখ্যা	২৬৪১		১০৮৪	১৭৭	৪৫২	২৪২	১৫৯	১৫৮	১০১১	২৬৪	১০৫	১৩৮০

www.pathagar.com

van-rickshaws এর সংখ্যা	৯২৫	১	২৩৩	৩৪	১২২	৭৯	৭৬	৮০	৩৫৭	১৮৭	১১৩	৬৫৭
bi-cycles এর সংখ্যা	৯৩২৭	১	৭০৬	৭৭	৩৮৭	৬৬১	৯৪৩	১৫৩৯	৩৫৩০	৩৫৬১	১৪৫২	৮৫৪৩
কৃষি শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা	১১৩০০৪	৫২	৬৩৬৫৭	৮৫৬৪	২১৩০৬	১১৩৩৫	৪২৫২	২২৯৮	৩৯১৯১	১৩৪৫	১৯৫	৪০৭৩১
POPULATION ENGAGED IN AGRICULTURE (কৃষিকাজে নিয়োজিত জনসংখ্যা)												
আত্ম নির্ভর পুরুষ	২০৫৩০৯	১৭	২১১৪৮	৩৭৩৫	২২৭৭৪	২৮৬৮২	২৮৫০২	৩৬১৫১	১১৬১০৯	৫১৬০৮	১২৬৯২	১৮০৪০৯
আত্ম নির্ভর মহিলা	৯৭০৮৭	১৮	১৪৫৩৭	২০৬২	১০১৮০	১২৩৭১	১২২৯৪	১৬১১৪	৫০৯৫৯	২৩৫১৯	৫৯৯৫	৮০৪৭০
বিনা পারিশ্রমিক সাহায্যকারী (পুরুষ)	১০৭৪৫২	১০	৯৩১৩	১৬৫৯	৯৪১০	১১০২৯	১২১৬৪	১৮২৬০	৫০৮৬৩	৩৪৫২৭	১১০৮০	৯৬৪৭০
বিনা পারিশ্রমিক সাহায্যকারী (মহিলা)	১০০৬৯৫	১০	১৬৪২৩	২৮৮৩	১২১৮৪	১২২৩৮	১১৭০৪	১৪৮০৯	৫০৯৩৫	২৩৮৩৭	৬৬০৭	৮১৩৭৯
অন্যান্য holding শ্রমিক (পুরুষ)	১৩০৭৫২	৫৭	৬৭৩৬৭	৯৩৮১	২৪৭০৭	১৪৩৬২	৬১৭০	৪১৩৮	৪৯৩৭৭	৩৬০৮	৯৬২	৫৩৯৪৭
অন্যান্য holding শ্রমিক (মহিলা)	৩১৫৩০	১৭	১৭০৪৮	১৮০৫	৪৬৯১	২৫৯৯	১৬০০	১৪৯৬	১০৩৮৬	১৭৯০	৪৮৪	১২৬৬০
মোট	৬৭২৮২৫	১২৯	১৪৫৮৩৬	২১৫২৫	৮৩৯৪৬	৮১২৮১	৭২৪৩৪	৯০৯৬৮	৩২৮৬২৯	১৩৮৮৮৬	৩৭৮২০	৫০৫৩৩৫
কৃষিতে কর্মসংস্থানের অংশের হার					২৫.৫৪	২৪.৭৩	২২.০৪	২৭.৬৮	১০০.০০	২৭.৪৮	৭.৪৮	১০০.০০
HOLDING REPORTING COTTAGE INDUSTRY (কুটির শিল্প)												
Handloom	১৩৫১	২	৫৮৩	৫৩	১৩৩	১১১	১০০	১৪৩	৪৮৭	১৮২	৪৪	৭১৩
Blacksmith	২৯৭		৯৪	১৭	৩৩	৩৯	২৪	৩৪	১৩০	৪৮	৮	১৮৬
Pottery	২৪২		৭১	১০	৫২	৩৪	২৭	২৫	১৩৮	২২	১	১৬১
Bamboo, cane work	১৫৬৬	১	৬৫৫	১১৩	২৮৬	২১২	১৪০	৮৪	৭২২	৫৬	১৯	৭৯৭
Wood work	৬৯৯		২৬৬	৩৯	১২৩	১০৬	৬৭	৪৮	৩৪৪	৪৪	৬	৩৯৪
Brass work	১৭৯		৪	৩	৩৮	২৬	২৯	৩৭	১৩০	৩৪	৮	১৭২

www.pathagar.com

পাট ও তুলার কাজ	১৪৬		৫২	৩	৩০	২৭	১৩	১৪	৮৪	৭		৯১
অন্যান্য শিল্প	২৪৮০	২	৯৫৭	৯৩	৩৯৫	২৮০	২১৯	১৯৮	১০৯২	২৬২	৭৪	১৪২৮
অন্যান্য কুটির শিল্প	৬৯৬০	৫	২৬৮২	৩৩১	১০৯০	৮৩৫	৬১৯	৫৮৩	৩১২৭	৬৫৫	১৬০	৩৯৪২
পুরুষ চালিত কুটির শিল্প	৬৭৭৯	৫	২৫৮৩	৩২১	১০৫৪	৮২২	৬১০	৫৭৭	৩০৬৩	৬৪৮	১৫৯	৩৮৭০
মহিলা চালিত কুটির শিল্প	১৮১		৯৯	১০	৩৬	১৩	৯	৬	৬৪	৭	১	৭২

Source :BBS: Census of Agriculture 1996:p69-70

www.pathagar.com

সারণী ৯.৯: নেত্রকোণা জেলায় শস্য আবাদী (শস্য এলাকা খামারের সাইজ অনুসারে)

বিষয়	কৃষি খামার (Area in acres)							
	সকল খামার	ছোট					মাঝারি	বড়
		0.05-0.49 acre	0.50-0.99 acre	1.00-acre	1.50-acres	Total Holdings	2.50-7.49 acres	7.50 + acres
মোট হোল্ডিংস এর শতকরা %	২১১১৫৪	২০.৮৭	১৮.২৫	১৫.৩৪	১৭.৯৬	৭২.৪১	২২.৯৩	৪.৬৬
ব্যবহৃত এলাকা %	৪৬৪৮৮০	২.৫৮	৫.৭৫	৮.১০	১৫.৩৭	৩১.৮০	৪২.৩০	২৫.৮৯
অস্থায়ী নীট শস্য এলাকা %	৪১৫৪৮৭	১.৮৭	৫.২১	৭.৭৭	১৫.১৯	৩০.০৪	৪৩.১৩	২৬.৮২
গ্রস শস্য এলাকা %	৬৬০৪৯০	২.১০	৫.৯১	৮.৭৬	১৬.৪৪	৩৩.২১	৪৩.৪৫	২৩.৩৩
কৃষি তীব্রতা	১৫৯.০	১৭৮.৫	১৮০.৫	১৭৯.১	১৭২.১	১৭৫.৭	১৬০.১	১৩৮.৩
মোট আউশ	৯২৯৯১	২২৪১	৬৬১৫	৯৪৪০	১৭৫৬০	৩৫৮৫৬	৪০৮৩২	১৬৩০৩
% মোট আউসের		২.৪১	৭.১১	১০.১৫	১৮.৮৮	৩৮.৫৬	৪৩.৯১	১৭.৫৩
মোট আমন	২৩৮৩৭৭	৫৩৫১	১৫১৩৭	২২০৫৬	৪০৯১৬	৮৩৪৬০	১০৬৪৯১	৪৮৪২৬
% মোট আমনের		২.২৪	৬.৩৫	৯.২৫	১৭.১৬	৩৫.০১	৪৪.৬৭	২০.৩১
মোট বোরো	২৪৯১৯১	৩৮৫১	১২২৫৭	১৯০৬১	৩৬১৯০	৭১৩৫৯	১০৫৫০৮	৭২৩২৪
% মোট বোরো		১.৫৫	৪.৯২	৭.৬৫	১৪.৫২	২৮.৬৪	৪২.৩৪	২৯.০২
মোট গম	১০৮৮৭	৩২৩	৮৯২	১২০২	২১০৩	৪৫২০	৪৫০৫	১৮৬২
% মোট গমের		২.৯৭	৮.১৯	১১.০৪	১৯.৩২	৪১.৫২	৪১.৩৮	১৭.১০
মোট মাইনর সিরিয়াল	৪৩৭	২৫	৪৯	৪৬	৮৯	২০৯	১৭৩	৫৫
% মোট মাইনর সিরিয়ালের		৫.৭২	১১.২১	১০.৫৩	২০.৩৭	৪৭.৮৩	৩৯.৫৯	১২.৫৯
মোট ডাল	৩৩৩৩	২৮	১১১	২১৫	৫০২	৮৫৬	১৫৬৩	৯১৪
% মোট ডালের		০.৮৪	৩.৩৩	৬.৪৫	১৫.০৬	২৫.৬৮	৪৬.৮৯	২৭.৪২

www.pathagar.com

মোট তৈল বীজের	১৬৮৯৭	২৩৩	৭১৪	১২০৪	২৪৪৮	৪৫৯৯	৭৩৯৯	৪৮৯৯
মোট শাক সব্জী		১.৩৮	৪.২৩	৭.১৩	১৪.৪৯	২৭.২২	৪৩.৭৯	২৮.৯৯
% মোট শাক সবজির	১০৪৩১	৬৭৮	৯০৯	১১২৪	১৮৯৮	৪৬০৯	৪০৫১	১৭৭১
মোট ক্যাশ ক্রপ		৬.৫০	৮.৭১	১০.৭৮	১৮.২০	৪৪.১৯	৩৮.৮৪	১৬.৯৮
% মোট ক্যাশ ক্রপের	২৭৭৭০	৫৭৮	১৫৩৮	২৪২৩	৫০১১	৯৫৫০	১২৫৩০	৫৬৯০
মোট ফসল জাতীয়		২.০৮	৫.৫৪	৮.৭৩	১৮.০৪	৩৪.৩৯	৪৫.১২	২০.৪৯
% মোট ফসল জাতীয়	১০১৬৭	৫৮৭	৮৪০	১০৬৯	১৮৫৭	৪৩৫৩	৩৯৩৬	১৮৭৮
উৎপাদন		৫.৭৭	৮.২৬	১০.৫১	১৮.২৬	৪২.৮১	৩৮.৭১	১৮.৪৭

Source: BBS: Census of Agriculture 1996:p113-116

www.pathagar.com

সারণী ৯.১০: **দুর্গাপুর উপজেলায়** (শস্য এলাকা খামারের সাইজ অনুসারে)

বিষয়	শস্য এলাকা (Area in acres)							
	সকল	ছোট					মাঝারী	বড়
	খামার	0.05-0.49 acre	0.50-0.99 acre	1.00-acre	1.50-acres	Total Holdings	2.50-7.49 acres	7.50 + acres
মোট হোল্ডিংস এর	২২৪৫৯	২৬.৮৩	১৭.৯৬	১৪.৪৬	১৪.৭৯	৭৪.০৪	২১.৬২	৪.৩৫
শতকরা %	৪৭৫৭৫	৩.৫৪	৬.০৫	৮.০৫	১৩.২০	৩০.৮৪	৪১.৫২	২৭.৬৫
ব্যবহৃত এলাকা %	৪১৭১১	২.৬১৮	৫.৫১২	৭.৭২৭	১৩.১৬০	২৯.০১৬	৪২.৭৩২	২৮.২৫২
অস্থায়ী নীট শস্য এলকা %	৬৪৬১০	২.৯১০	৬.০৪৯	৮.৬৪০	১৪.১০৮	৩১.৭০৬	৪৩.২১০	২৫.০৮৪
গ্রস শস্য এলাকা %	১৫৪.৯	১৭২.২	১৭০	১৭৩.২	১৬৬.১	১৬৯.৩	১৫৬.৬	১৩৭.৫
কৃষি তীব্রতা								
মোট আউশ	১০৬৩৭	৩৬৩	৭১৭	১০৬৫	১৫৭২	৩৭১৭	৪৬২৫	২২৯৫
% মোট আউসের		৩.৪১	১৯৭.৫২	১৪৮.৫৪	১৪৭.৬১	২৩৬.৪৫	১২৪.৪৩	৪৯.৬২
মোট আমন	২৯১৩৩	৭৭৪	১৬৭৩	২৪৩৯	৪০৭৪	৮৯৬০	১২৯৬৩	৭২১০
% মোট আমনের		২.৬৬	৫.৭৪	৮.৩৭	১৩.৯৮	৩০.৭৬	৪৪.৫০	২৪.৭৫
মোট বোরো	১৯১৪১	৪৬০	১১৪২	১৫৪২	২৬৫২	৫৭৯৬	৮০৫৯	৫২৮৬
% মোট বোরো		২.৪০	৫.৯৭	৮.০৬	১৩.৮৬	৩০.২৮	৪২.১০	২৭.৬২
মোট গম	১২১৮	৪৮	৯৩	১২১	১৮৩	৪৪৫	৫০১	২৭২
% মোট গমের		৩.৯৪	৭.৬৪	৯.৯৩	১৫.০২	৩৬.৫৪	৪১.১৩	২২.৩৩
মোট মাইনর সিরিয়াল	৩৯		২	৫	৩	১০	৩	২৮
% মোট মাইনর সিরিয়াল			৫.১৩	১২.৮২	৭.৬৯	২৫.৬৪	৭.৬৯	৭১.৭৯
মোট ডাল	৪৭		১	৩	৩	৭	২১	১৯
% মোট ডালের			২.১৩	৬.৩৮	৬.৩৮	১৪.৮৯	৪৪.৬৮	৪০.৪৩

www.pathagar.com

মোট তৈল বীজ	৭৮৮	১৮	৩৭	৬২	১২৬	২৪৩	৩৩৮	২০৭
% মোট তৈল বীজের		২.২৮	৪.৭০	৭.৮৭	১৫.৯৯	৩০.৮৪	৪২.৮৯	২৬.২৭
মোট শাক সব্জী	১১৩৯	১০২	১০০	১২৬	১৭৩	৫০১	৪৪৪	১৯৪
% মোট শাক সব্জীর		৮.৯৬	৮.৭৮	১১.০৬	১৫.১৯	৪৩.৯৯	৩৮.৯৮	১৭.০৩
মোট ক্যাশ ক্রপ	৯৭৬	৩৮	৫৬	৯০	১৩৯	৩২৩	৩৯৯	২৫৪
% মোট ক্যাশ ক্রপের		৩.৮৯	১৪৭.৩৭	১৬০.৭১	১৫৪.৪৪	২৩২.৩৭	১২৩.৫৩	৬৩.৬৬
মোট মসলা জাতীয়	১৪৮৩	৭১	৮৭	১২৭	১৯২	৪৭৭	৫৬৪	৪৪২
% মোট মসলা জাতীয় উৎপাদন		৪.৭৯	৫.৮৭	৮.৫৬	১২.৯৫	৩২.১৬	৩৮.০৩	২৯.৮০

Source:BBS: Census of Agriculture:p125-128

www.pathagar.com

সারণী ৯.১১ঃ কলমাকান্দা উপজেলায় (শস্য এলাকা খামারের সাইজ অনুসারে)

বিষয়	শস্য এলাকা (Area in acres)							
	সকল খামার	ছোট					মাঝারী	বড়
		০.০৫-০.৪৯ একর	০.৫০-০.৯৯ একর	১.০০-একর	১.৫০-একর	মোট হোল্ডিং	২.৫০-৭.৪৯ একর	৭.৫০ + একর
শস্য উৎপাদন এলকা								
মোট হোল্ডিংস এর	২৭০৭৫	২৫.৪২	১৬.৫৫	১৪.৬৯	১৫.০৯	৭১.৭৪	২২.৯৩	৫.৩৩
শতকরা %	৬১১৭২	৩.১৫	৫.১৯	৭.৬৬	১২.৭৭	২৮.৭৭	৪১.৮১	২৯.৪২
ব্যবহৃত এলাকা %	৫৫০২৮	২.৩০	৪.৭৩	৭.৩৫	১২.৬৪	২৭.০৩	৪২.৬২	৩০.৩৫
অস্থায়ী নীট শস্য এলকা %	৭৭৬৮৫	২.৪৯	৫.১৬	৭.৯৯	১৩.২৩	২৮.৮৭	৪২.৭২	২৮.৪১
কৃষি তীব্রতা	১৪১.২	১৫২.৪	১৫৩.৮	১৫৩.৫	১৪৭.৭	১৫০.৮	১৪১.৫	১৩২.২
মোট আউশ	৫৭৯৯	২০৮	৪২৯	৫৬৭	৯২৮	২১৩২	২৫৫৯	১১০৮
% মোট আউসের		৩.৫৯	৭.৪০	৯.৭৮	১৬.০০	৩৬.৭৬	৪৪.১৩	১৯.১১
মোট আমন	২৮৮৪৯	৭৭১	১৫৯৫	২৩৭৬	৩৯৪২	৮৬৮৪	১২৭৫৫	৭৪১০
% মোট আমনের		২.৬৭	৫.৫৩	৮.২৪	১৩.৬৬	৩০.১০	৪৪.২১	২৫.৬৯
মোট বোরো	৩৫০৯৮	৬৪১	১৬০০	২৬৫৬	৪৩৫৫	৯২৫২	১৪৬৪১	১১২০৫
% মোট বোরো		১.৮৩	৪.৫৬	৭.৫৭	১২.৪১	২৬.৩৬	৪১.৭১	৩১.৯২
মোট গম	১০১৬	৩১	৫৭	৮৪	১৪১	৩১৩	৪২৪	২৭৯
% মোট গমের		৩.০৫	৫.৬১	৮.২৭	১৩.৮৮	৩০.৮১	৪১.৭৩	২৭.৪৬
মোট মাইনর সিরিয়াল	৫২	২	৬	৪	১১	২৩	২৩	৬
% মোট মাইনর সিরিয়াল		৩.৮৫	১১.৫৪	৭.৬৯	২১.১৫	৪৪.২৩	৪৪.২৩	১১.৫৪
মোট ডাল	৭১		২	৩	৯	১৪	২৬	৩১
% মোট ডালের			২.৮২	৪.২৩	১২.৬৮	১৯.৭২	৩৬.৬২	৪৩.৬৬

www.pathagar.com

মোট তৈল বীজ	৩১১৮	৪৮	১০০	১৯৫	৩৪৭	৬৯০	১৩৩১	১০৯৭
% মোট তৈল বীজের		১.৫৪	৩.২১	৬.২৫	১১.১৩	২২.১৩	৪২.৬৯	৩৫.১৮
মোট শাক সব্জী	১২০০	৮৯	৮১	১১৭	১৮৫	৪৭২	৪৫৭	২৭১
% মোট শাক সব্জীর		৭.৪২	৬.৭৫	৯.৭৫	১৫.৪২	৩৯.৩৩	৩৮.০৮	২২.৫৮
মোট ক্যাশ ক্রপ	১৪০৩	৪১	৫৭	৯৮	১৮৬	৩৮২	৫৭৭	৪৪৪
% মোট ক্যাশ ক্রপের		২.৯২	৪.০৬	৬.৯৯	১৩.২৬	২৭.২৩	৪১.১৩	৩১.৬৫
মোট মসলা জাতীয়	১০৬৮	৯৭	৭৭	১০৭	১৭১	৪৫২	৩৯৪	২২২
% মোট মসলা জাতীয় উৎপাদন		৯.০৮	৭.২১	১০.০২	১৬.০১	৪২.৩২	৩৬.৮৯	২০.৭৯

Source:BBS: Census of Agriculture, p 133-136

www.pathagar.com

সারণী ৯.১২ : নেত্রকোণা জেলায় সেচ ও সারের ব্যবহার

শ্রেণীর ধরণ	কৃষি খামার (একর)										
	সকল খামার	আবাদী এলাকা				সেচ এলাকা			সার ব্যবহার		
		আবাদী এলাকা	বসতবাড়ী এলাকা	অস্থায়ী শস্য এলাকা	স্থায়ী শস্য এলাকা	হোল্ডিং রিপোটিং	সেচ এলাকা	ব্যবহৃত এলাকায় সেচ আওতাধীন (%)	হোল্ডিং রিপোটিং	সারব্যবহৃত এলাকা	সার ব্যবহারের আওতাধীন (%)
সকল হোল্ডিং	৩৩৭০৭৯	৪৭৪৩০০	২৩৭৯৭	৪১৫৫৯০	৫৮৫২	১৪৭৭১৩	২৪২৫৭৬	৫১.১৪	১৮৯২৭৭	৩৫৮১০৩	৭৫.৫০
অকৃষি খানা	১২৫৯২৫	৯৪২০	৫৫৮৪	১০২	১৭৯	১৩৪৮	৩৬		১৯৩৮	৫১	
অব্যবহৃত এলাকা	২২৬										
অনাবাদী এলাকা	১১২৫৩১	৮২২৫	৫১১৯								
কৃষিযোগ্য এলাকা < ০.০৫ একর	১৩১৬৮	১১৯৫	৪৬৫	১০২	১৭৯	১৩৪৮	৩৬		১৯৩৮	৫১	
মোট ফার্ম হোল্ডিংসে	২১১১৫৪	৪৬৪৮৮০	১৮২১৩	৪১৫৪৮৮	৫৬৭৩	১৪৬৩৬৫	২৪২৫৩১		১৮৭৩৩৯	৩৫৮০৫২	
ছোট ফার্ম হোল্ডিংসে	১৫২৯০০	১৪৭৮৫০	১০৫৯৬	১২৪৮২৯	২৯৭৫	১০০৩৬৪	৭২১৮৭	৪৮.৮২	১৩১৭৮৪	১০৮২০৪	৭৩.১৮
০.৫০-০.৪৯ একর	৪৪০৬৩	১২০০৫	২২৮৬	৭৭৮৫	৭৮৯	২২৩৬৫	৪৩০৬	৩৫.৮৭	৩০৬৮৪	৬৩০২	৫২.৪৯
০.৫০-০.৪৯ একর	৩৮৫৩২	২৬৭১৬	২৪৯৬	২১৬৪৫	৬৩৬	২৫৮৫৬	১২৮৩৯	৪৮.০৬	৩৪৯৩৫	১৮৭৪০	৭০.১৫
১.৫০-২.৪৯ একর	৩২৩৮৬	৩৭৬৫৮	২৪৬৪	৩২২৯৪	৬২০	২৩৪১৬	১৮৯৬৯	৫০.৩৭	৩০১৮৭	২৮২৬৬	৭৫.০৬
১.৫০-২.৪৯ একর	৩৭৯১৯	৭১৪৭১	৩৩৫০	৬৩১০৫	৯৩০	২৮৭২৭	৩৬০৭৩	৫০.৪৭	৩৫৯৭৮	৫৪৮৯৬	৭৬.৮১
মাঝারি ফার্ম হোল্ডিংসে	৪৮৪১৯	১৯৬৬৫৮	৫৭৭১	১৭৯২২১	১৮৯২	৩৭৯০৩	১০৩০২২	৫২.৩৯	৪৬১১৫	১৫৪৮৮১	৭৮.৭৬
২.৫০-৪.৯৯ একর	৩২৪১৪	১০৬৬৪৮	৩৫৫৬	৯৬৪৩১	১১০৬	২৫১৮২	৫৪৮৬০	৫১.৪৪	৩০৮৭৯	৮৩৫৮০	৭৮.৩৭
৫.০০-৭.৪৯ একর	১৬০০৫	৯০০১০	২২১৫	৮২৭৯০	৭৮৬	১২৭২১	৪৮১৬২	৫৩.৫১	১৫২৩৬	৭১৩০১	৭৯.২১
বড় ফার্ম হোল্ডিং	৯৮৩৫	১২০৩৭২	১৮৪৬	১১১৪৩৮	৮০৬	৮০৯৮	৬৭৩২২	৫৫.৯৩	৯৪৪০	৯৪৯৬৭	৭৮.৮৯
৭.৫০-৯.৯৯ একর	৪৭১৫	৩৯৮৪৫	৭৬৪	৩৬৮১৭	৩০০	৩৮০৭	২১৪২২	৫৩.৭৬	৪৫১২	৩১৫৪৯	৭৯.১৮

www.pathagar.com

১০.০০-১৪.৯৯ একর	৩১৭২	৩৬৫০০	৬০৪	৩৩৮৪৬	৩০৩	২৬৪৯	২১০৮১	৫৭.৭৬	৩০৪২	২৮৭৪৪	৭৮.৭৫
১৫.০০-২৪.৯৯ একর	১৪৬৩	২৬৪৩২	৩৩৯	২৪৮৩৪	১৩১	১২৫০	১৫৫৪৬	৫৮.৮২	১৪১৪	২১২৬৮	৮০.৪৬
২৫.০০ একর +	৪৮৫	১৭৫৯৫	১৩৯	১৫৯৪১	৭২	৩৯২	৯২৭৩	৫২.৭০	৪৭২	১৩৪০৬	৭৬.১৯

সারণী ৯.১৩ : দুর্গাপুর জেলায় সেচ ও সারের ব্যবহার

সকল হোল্ডিং	৩৬২৩৩	৪৮৭৯০	২৭৪৫	৪১৭৩০	৭৮৭	১৩১৫২	১৯৭২৫	৪০.৪৩	১৯৩০১	৩৪৬৪৩	৭১.০০
অকৃষি খানা	১৩৭৭৪	১২১৪	৬৩৯	১৯	২৬	২৩৫	৬		৩১১	৯	
অব্যবহৃত এলাকা	২৭										
অনাবাদী এলাকা	১১৬৬৫	১০০৮	৫৫২								
কৃষিযোগ্য এলাকা < ০.০৫ একর	২০৮২	২০৬	৮৭	১৯	২৬	২৩৫	৬		৩১১	৯	
মোট ফার্ম হোল্ডিংসে	২২৪৫৯	৪৭৫৭৬	২১০৬	৪১৭১১	৭৬১	১২৯১৭	১৯৭১৯		১৮৯৯০	৩৪৬৩৪	
ছোট ফার্ম হোল্ডিংসে	১৬৬২৮	১৪৬৭১	১১৯৮	১২১০৩	৩৬৯	৯০৬৪	৬০৫৮	৪১.২৯	১৩৫৭১	১০১৯৬	৬৯.৫০
০.৫০-০.৪৯ একর	৬০২৫	১৬৮৫	৩২২	১০৯২	১০৫	২৭৫৯	৫৩৭	৩১.৮৭	৪১২৭	৮৬০	৫১.০৪
০.৫০-০.৪৯ একর	৪০৩৪	২৮৭৮	২৮১	২২৯৯	৭৯	২২৯৪	১১৭৭	৪০.৯০	৩৪৮০	১৯১৮	৬৬.৬৪
১.৫০-২.৪৯ একর	৩২৪৭	৩৮২৯	২৭৪	৩২২৩	৮১	১৮৭৯	১৫৭১	৪১.০৩	২৯১৪	২৭৫৫	৭১.৯৫
১.৫০-২.৪৯ একর	৩৩২২	৬২৭৯	৩২১	৫৪৮৯	১০৪	২১৩২	২৭৭৩	৪৪.১৬	৩০৫০	৪৬৬৩	৭৪.২৬
মাঝারি ফার্ম হোল্ডিংসে	৪৮৫৫	১৯৭৫২	৬৬৫	১৭৮২৪	২৫৩	৩১৬২	৮৩৯৯	৪২.৫২	৪৫০৭	১৪৮৮৯	৭৫.৩৮
২.৫০-৪.৯৯ একর	৩২৮১	১০৮১৪	৪০২	৯৭০০	১৪৫	২১৩৪	৪৬৩০	৪২.৮১	৩০৫০	৮২০৮	৭৫.৯০
৫.০০-৭.৪৯ একর	১৫৭৪	৮৯৩৮	২৬৩	৮১২৪	১০৮	১০২৮	৩৭৬৯	৪২.১৭	১৪৫৭	৬৬৮১	৭৪.৭৫
বড় ফার্ম হোল্ডিং	৯৭৬	১৩১৫৩	২৪৩	১১৭৮৪	১৩৯	৬৯১	৫২৬২	৪০.০১	৯১২	৯৫৪৯	৭২.৬০
৭.৫০-৯.৯৯ একর	৪৩৫	৩৭০৩	৯০	৩৩৮২	৪৯	৩০০	১৬৩৩	৪৪.১০	৪০১	২৭৫৮	৭৪.৪৮
১০.০০-১৪.৯৯ একর	৩১১	৩৫৩৫	৮৫	৩২০৪	৫৯	২৩৪	১৫৫৮	৪৪.০৭	২৯৩	২৬০৯	৭৩.৮০
১৫.০০-২৪.৯৯ একর	১৪৯	২৬৬২	৪৩	২৪৪৪	২০	১০৯	১১৯০	৪৪.৭০	১৪১	১৯৯১	৭৪.৭৯
২৫.০০ একর +	৮১	৩২৫৩	২৫	২৭৫৪	১১	৪৮	৮৮১	২৭.০৮	৭৭	২১৯১	৬৭.৩৫

www.pathagar.com

সারণী ৯.১৪ : কলমাকান্দা উপজেলায় সেচ ও সারের ব্যবহার

সকল হোল্ডিং	৪২৬৬৩	৬২১৬৭	২৭৯৯	৫৫০৪৩	১০০৬	১৮৭৪৫	৩৩৯৬৪	৫৪.৬৩	২৩৮৩৪	৪৬২৮৩	৭৪.৪৫
অকৃষি খানা	১৫৫৮৮	৯৯৫	৬২৪	১৫	৪০	১৮০	৫		২৮৪	৮	
অব্যবহৃত এলাকা	৩২										
অনাবাদী এলাকা	১৩৪২৪	৭৬৩	৫৩৬								
কৃষিযোগ্য এলাকা < ০.০৫ একর	২১৩২	২৩২	৮৮	১৫	৪০	১৮০	৫		২৮৪	৮	
মোট ফার্ম হোল্ডিংস	২৭০৭৫	৬১১৭২	২১৭৫	৫৫০২৮	৯৬৬	১৮৫৬৫	৩৩৯৫৯		২৩৫৫০	৪৬২৭৫	
ছোট ফার্ম হোল্ডিংস	১৯৪২৪	১৭৬০১	১২৬৩	১৪৮৭৩	৪৯৫	১২৪৮০	৮৯৬০	৫০.৯১	১৬১৮৩	১২৫৯৪	৭১.৫৫
০.৫০-০.৪৯ একর	৬৮৮২	১৯২৮	৩৫৮	১২৬৮	১৫৩	৩৪৯১	৬৮৫	৩৫.৫৩	৪৫৫০	৯৭৯	৫০.৭৮
০.৫০-০.৪৯ একর	৪৪৮০	৩১৭৬	২৭৯	২৬০৫	১০৪	৩০৩৫	১৬২২	৫১.০৭	৪০৩৭	২২১৮	৬৯.৮৪
১.৫০-২.৪৯ একর	৩৯৭৬	৪৬৮৪	২৮৮	৪০৪৩	১০৪	২৮৮৪	২৫১৯	৫৩.৭৮	৩৭০৮	৩৪৭৬	৭৪.২১
১.৫০-২.৪৯ একর	৪০৮৬	৭৮১৩	৩৩৮	৬৯৫৭	১৩৪	৩০৭০	৪১৩৪	৫২.৯১	৩৮৮৮	৫৯২১	৭৫.৭৮
মাঝারি ফার্ম হোল্ডিংস	৬২০৭	২৫৫৭৩	৬৬৫	২৩৪৫৪	৩১৫	৪৮৭৫	১৪২৭০	৫৫.৮০	৫৯৬৬	১৯৮২২	৭৭.৫১
২.৫০-৪.৯৯ একর	৪১২৯	১৩৭০২	৪১০	১২৪৪৬	১৯৪	৩২০৩	৭৪৬১	৫৪.৪৫	৩৯৬০	১০৫২২	৭৬.৭৯
৫.০০-৭.৪৯ একর	২০৭৮	১১৮৭১	২৫৫	১১০০৮	১২১	১৬৭২	৬৮০৯	৫৭.৩৬	২০০৬	৯৩০০	৭৮.৩৪
বড় ফার্ম হোল্ডিং	১৪৪৪	১৭৯৯৮	২৪৭	১৬৭০১	১৫৬	১২১০	১০৭২৯	৫৯.৬১	১৪০১	১৩৮৫৯	৭৭.০০
৭.৫০-৯.৯৯ একর	৬৩৯	৫৩৯৮	৯৬৮৬	৪৯৮৯	৪৭	৫১৩	৩০৩৯	৫৬.৩০	৬২২	৪২০৩	৭৭.৮৬
১০.০০-১৪.৯৯ একর	৫০২	৫৮২৮	৪৫	৫৩৮৮	৬৫	৪২৯	৩৫৫৩	৬০.৯৬	৪৮৪	৪৩৯২	৭৫.৩৬
১৫.০০-২৪.৯৯ একর	২২২	৩৯৭৮	২০	৩৭৮৮	৩০	১৯৬	২৪৩৯	৬১.৩১	২১৬	৩১১৫	৭৮.৩১
২৫.০০ একর +	৮১	২৭৯৪	২৫	২৫৩৬	১৪	৭২	১৬৯৮	৬০.৭৭	৭৯	২১৪৯	৭৬.৯১

Source;BBS:Census for Agriculture; p157-62

www.pathagar.com

Annex - A সারণী ৯.১৫ : নেত্রকোণা জেলায় ভূমি মালিকানার অবস্থা

শ্রেণী বিভাগ	Total		Owner holdings			Tenant holdings		Owner cum tenant holdings				
	Number	Operated area	Number	Rented out area	Operated area	Number	Operated area	Number	Operated area	Owned area	Rented out area	Rented in area
সকল হোল্ডিংস	৩৩৭০৭৯	৪৭৪৩০১	২৪০০৩২	৬২৫৪৯	৩২৯৫৯১	৩৬২৫৮	৪৮০৮	৬০৭৮৯	১৩৯৯০২	৯২৪৩৭	৭০৬৪	৫৪৫২৯
অকৃষি খামার হোল্ডিং	১২৫৯২৫	৯৪২১	৯২৪৫২	১৫৩৮৬	৮১৭৭	৩২১২১	১০০৮	১৩৫২	২৩৬	৭৪৮	৬৪৮	১৩৬
মোট কৃষি হোল্ডিং	২১১১৫৪	৪৬৪৮৮০	১৪৭৫৮০	৪৭১৬৩	৩২১৪১৪	৪১৩৭	৩৮০০	৫৯৪৩৭	১৩৯৬৬৬	৯১৬৮৯	৬৪১৬	৫৪৩৯৩
মোট সংখ্যার %			৬৯.৮৯			১.৯৬		২৮.১৫				
ব্যবহৃত এলাকা %				১০.১৫	৬৯.১৪		০.৮২		৩০.০৪	১৯.৭২	১.৩৮	১১.৭০
ছোট কৃষি হোল্ডিংস	১৫২৯০০	১৪৭৮৫০	১০৭০৮৬	২৪৫২৫	৯৫৪৭৮	৩৯০৭	২৯২৬	৪১৯০৭	৪৯৪৪৬	২৬৫৭০	২৬৮৯	২৫৫৪৫
০.০৫-০.৪৯ একর	৪৪০৬৩	১২০০৫	৩৬৮৮৪	৬১৩১	৯৬৬৫	১৬০৬	৪৬০	৫৫৭৩	১৮৮০	৮৮৭	২২১	১২১৩
০.৫০-০.৯৯ একর	৩৮৫৩২	২৬৭১৬	২৫৪৩৬	৫৩৭২	১৭২৩৪	১১৩৭	৭৭৯	১১৯৫৯	৮৭০৩	৩৯৬৫	৪৮১	৫২২০
১.০০-১.৪৯ একর	৩২৩৮৬	৩৭৬৫৮	২০৯৭৩	৬১০০	২৩৯৬৭	৬৪০	৭৩১	১০৭৭৩	১২৯৬০	৬৬৫৩	৬৮৪	৬৯৯১
১.৫০-২.৪৯ একর	৩৭৯১৯	৭১৪৭১	২৩৭৯৩	৬৯২২	৪৪৬১২	৫২৪	৯৫৬	১৩৬০২	২৫৯০৩	১৫০৬৫	১২৮৩	১২১২১
মোট সংখ্যার %			৭০.০৪			২.৫৬		২৭.৪১				
ব্যবহৃত এলাকা %				১৬.৫৯	৬৪.৫৮		১.৯৮		৩৩.৪৪	১৭.৯৭	১.৮২	১৭.২৮
মাঝারি কৃষি হোল্ডিংস	৪৮৪১৯	১৯৬৬৫৮	৩৩২১৫	১৪৬৯৯	১৩৬১২৬	২২১	৭৮১	১৪৯৮৩	৫৯৭৫১	৪০৭৮৩	২৬৪৯	২১৬১৭
২.৫০-৪.৯৯ একর	৩২৪১৪	১০৬৬৪৮	২১৭৮০	৮২৭৩	৭১৭৮৯	১৮৬	৫৯২	১০৪৪৮	৩৪২৬৭	২২৩২৪	১৫৬৮	১৩৫১১
৫.০০-৭.৪৯ একর	১৬০০৫	৯০০১০	১১৪৩৫	৬৪২৬	৬৪৩৩৭	৩৫	১৮৯	৪৫৩৫	২৫৪৮৪	১৮৪৫৯	১০৮১	৮১০৬
মোট সংখ্যার %			৬৮.৬০			০.৪৬		৩০.৯৪				
ব্যবহৃত এলাকা %				৭.৪৭	৬৯.২২		০.৪০		৩০.৩৮	২০.৭৪	১.৩৫	১০.৯৯
মাঝারি কৃষি হোল্ডিংস	৯৮৩৫	১২০৩৭২	৭২৭৯	৭৯৩৯	৮৯৮১০	৯	৯৩	২৫৪৭	৩০৪৬৯	২৪৩৩৬	১০৯৮	৭২৩১

www.pathagar.com

৭.৫০-৯.৯৯ একর	৪৭১৫	৩৯৮৪৫	৩৪৮৪	২৩৩৭	২৯৩৬১		৫২	১২২৫	১০৪৩২	৮১১১	৪১১	২৭৩৩
১০.০০-১৪.৯৯ একর	৩১৭২	৩৬৫০০	২২৮২	২৫৮৫	২৬১০৮	৬	২২	৮৮৮	১০৩৭০	৮১৪১	৩৪৫	২৫৭৪
১৫.০০-২৪.৯৯ একর	১৪৬৩	২৬৪৩২	১১২৭	২০১১	২০২৭৫	২	১৯	৩৩৫	৬১৩৮	৪৯৬৪	২৩৬	১৪০৯
২৫.০০ একর +	৪৮৫	১৭৫৯৫	৩৮৬	১০০৬	১৪০৬৬	১		৯৯	৩৫২৯	৩১২০	১০৬	৫১৫
মোট সংখ্যার %			৭৪.০১					২৫.৯০				
ব্যবহৃত এলাকা %				৬.৬০	৭৪.৬১	০.০৯	০.০৮		২৫.৩১	২০.২২	০.৯১	৬.০১

Source : BBS: Census of Agriculture 1996: p 168

Annex - A সারণী ৯.১৬ : দূর্গাপুর জেলায় ভূমি মালিকানার ব্যবস্থা

শ্রেণী বিভাগ	Total		Owner holdings			Tenant holdings		Owner cum tenant holdings				
	Number	Operated area	Number	Rented out area	Operated area	Number	Operated area	Number	Operated area	Owned area	Rented out area	Rented in area
সকল হোল্ডিংস	৩৬২৩৩	৪৮৭৯৪	২৪৩৩১	৬৬০৬	৩৩৭০৩	৫৩৩৬	৮৫০	৬৫৬৬	১৪২৪১	৯৪১৩	৭৭৫	৫৬০০
অকৃষিখানা	১৩৭৭৪	১২১৫	৯০০২	১৬২০	৯৬২	৪৫৬৩	২০৮	২০৯	৪৫	১২৬	১১২	৩০
মোট কৃষি হোল্ডিং	২২৪৫৯	৪৭৫৭৯	১৫৩২৯	৪৯৮৬	৩২৭৪১	৭৭৩	৬৪২	৬৩৫৭	১৪১৯৬	৯২৮৭	৬৬৩	৫৫৭০
মোট সংখ্যার %			৬৮.২৫			৩.৪৪		২৮.৩০				
ব্যবহৃত এলাকা %				১০.৪৮	৬৮.৮১		১.৩৫		২৯.৮৪	১৯.৫২	১.৩৯	১১.৭১
ছোট কৃষি হোল্ডিংস	১৬৬২৮	১৪৬৭১	১১৩৭৭	২৫৪২	৯১২৬	৭২৪	৪৬১	৪৫২৭	৫০৮৪	২৮০৩	৩০৬	২৫৮৭
০.০৫-০.৪৯ একর	৬০২৫	১৬৮৫	৪৮৫৬	৬৮৮	১৩০৯	৩৮০	১০৮	৭৮৯	২৬৮	১৪৯	৪২	১৬১
০.৫০-০.৯৯ একর	৪০৩৪	২৮৭৮	২৫১২	৫৩৭	১৭৫৯	১৮২	১২৫	১৩৪০	৯৯৪	৪৬১	৫০	৫৮৩
১.০০-১.৪৯ একর	৩২৪৭	৩৮২৯	২০২৮	৬০৮	২৩৫০	১০০	১১৪	১১১৯	১৩৬৫	৭২৭	৯১	৭২৯
১.৫০-২.৪৯ একর	৩৩২২	৬২৭৯	১৯৮১	৭০৯	৩৭০৮	৬২	১১৪	১২৭৯	২৪৫৭	১৪৬৬	১২৩	১১১৪
মোট সংখ্যার %			৬৮.৪২			৪.৩৫		২৭.২৩				

www.pathagar.com

ব্যবহৃত এলাকা %				১৭.৩৩	৬২.২০		৩.১৪		৩৪.৬৫	১৯.১১	২.০৯	১৭.৬৩
মাঝারি কৃষি হোল্ডিংস	৪৮৫৫	১৯৭৫২	৩১৯৬	১৫৪১	১৩১৯৩	৪৭	১৬১	১৬১২	৬৩৯৮	৪২৭৬	২৬২	২৩৮২
২.৫০-৪.৯৯ একর	৩২৮১	১০৮১৪	২০৯৬	৭৬৭	৬৯১৬	৪২	১৩২	১১৪৩	৩৭৬৬	২৪০৮	১৬৫	১৫২২
৫.০০-৭.৪৯ একর	১৫৭৪	৮৯৩৮	১১০০	৭৭৪	৬২৭৭	৫	২৯	৪৬৯	২৬৩২	১৮৬৮	৯৭	৮৬০
মোট সংখ্যার %			৬৫.৮৩			০.৯৭		৩৩.২০				
ব্যবহৃত এলাকা %				৭.৮০	৬৬.৭৯		০.৮২		৩২.৩৯	২১.৬৫	১.৩৩	১২.০৬
মাঝারি কৃষি হোল্ডিংস	৯৭৬	১৩১৫৬	৭৫৬	৯০৩	১০৪২২	২	২০	২১৮	২৭১৪	২২০৮	৯৫	৬০১
৭.৫০-৯.৯৯ একর	৪৩৫	৩৭০৩	৩২৬	২৬৪	২৭৬৯	১	৯	১০৮	৯২৫	৭২৪	৩২	২৩৩
১০.০০-১৪.৯৯ একর	৩১১	৩৫৩৬	২৪২	৩৪১	২৭৩৫	১	১১	৬৮	৭৯০	৬৫১	২৮	১৬৭
১৫.০০-২৪.৯৯ একর	১৪৯	২৬৬৩	১১৬	১৮১	২০৪১			৩৩	৬২২	৫১৭	৩১	১৩৬
২৫.০০ একর +	৮১	৩২৫৪	৭২	১১৭	২৮৭৭			৯	৩৭৭	৩১৬	৪	৬৫
মোট সংখ্যার %			৭৭.৪৬			০.২০		২২.৩৪				
ব্যবহৃত এলাকা %				৬.৮৬	৭৯.২২		০.১৫		২০.৬৩	১৬.৭৮	০.৭২	৪.৫৭

Source: BBS: Census of Agriculture 1996: p 171

www.pathagar.com

Annex - A সারণী ৯.১৭ : কলমাকান্দা উপজেলার ভূমি মালিকানার অবস্থা

শ্রেণী বিভাগ	Total		Owner holdings			Tenant holdings		Owner cum tenant holdings				
	Number	Operated area	Number	Rented out area	Operated area	Number	Operated area	Number	Operated area	Owned area	Rented out area	Rented in area
সকল হোল্ডিংস	৪২৬৬৩	৬২১৬৯	২৯৬৯৫	৭৪৫৪	৪৪৯৪৮	৬৩৩৭	৭০৭	৬৬৩১	১৬৫১৪	১১১৬১	৮৯৩	৬২৪৬
অকৃষিখানা	১৫৫৮৮	৯৯৫	৯৭৮৮	১৫৯৩	৮০৯	৫৬২৪	১৬০	১৭৬	২৬	৮০	৭০	১৫
মোট কৃষি হোল্ডিং	২৭০৭৫	৬১১৭৪	১৯৯০৭	৫৮৬১	৪৪১৩৯	৭১৩	৫৪৭	৬৪৫৫	১৬৪৮৮	১১০৮১	৮২৩	৬২১৩
মোট সংখ্যার %			৭৩.৫৩			২.৬৩		২৩.৮৪				
ব্যবহৃত এলাকা %				৯.৫৮	৭২.১৫		০.৮৯		২৬.৯৫	১৮.১১	১.৩৫	১০.১৬
ছোট কৃষি হোল্ডিংস	১৯৪২৪	১৭৬০২	১৪৪১৩	২৮৯৬	১১৯১৭	৬৯৪	৪৭৬	৪৩১৭	৫২০৯	২৮২৮	৩৩৪	২৭১৪
০.০৫-০.৪৯ একর	৬৮৮২	১৯২৮	৫৯৪৬	৭১৩	১৬১৬	৩১৭	৯১	৬১৯	২২১	১১৩	২৯	১৩৭
০.৫০-০.৯৯ একর	৪৪৮০	৩১৭৭	৩০৭৩	৫৯০	২১৩৫	২১৩	১৫২	১১৯৪	৮৯০	৪৩১	৫৪	৫১২
১.০০-১.৪৯ একর	৩৯৭৬	৪৬৮৪	২৭৮৮	৭৮৫	৩২২৩	১০৬	১২৬	১০৮২	১৩৩৫	৬৬৬	৭৬	৭৪৪
১.৫০-২.৪৯ একর	৪০৮৬	৭৮১৩	২৬০৬	৮০৮	৪৯৪৩	৫৮	১০৭	১৪২২	২৭৬৩	১৬১৮	১৭৫	১৩২১
মোট সংখ্যার %			৭৪.২০			৩.৫৭		২২.২৩				
ব্যবহৃত এলাকা %				১৬.৪৫	৬৭.৭০		২.৭০		২৯.৫৯	১৬.০৭	১.৯০	১৫.৪২
মাঝারি কৃষি হোল্ডিংস	৬২০৭	২৫৫৭৪	৪৩৮৪	১৯৬৮	১৮২৫৪	১৮	৬৩	১৮০৫	৭২৫৭	৪৯৪৩	৩৪৯	২৬৬৩
২.৫০-৪.৯৯ একর	৪১২৯	১৩৭০৩	২৮৪৬	১১৩৮	৯৪৫০	১৬	৫৩	১২৬৭	৪২০০	২৬৮৩	১৯৫	১৭১২
৫.০০-৭.৪৯ একর	২০৭৮	১১৮৭১	১৫৩৮	৮৩০	৮৮০৪	২	১০	৫৩৮	৩০৫৭	২২৬০	১৫৪	৯৫১
মোট সংখ্যার %			৭০.৬৩			০.২৯		২৯.০৮				
ব্যবহৃত এলাকা %				৭.৭০	৭১.৩৮		০.২৫		২৮.৩৮	১৯.৩৩	১.৩৬	১০.৪১
মাঝারি কৃষি হোল্ডিংস	১৪৪৪	১৭৯৯৮	১১১০	৯৯৭	১৩৯৬৮	১	৮	৩৩৩	৪০২২	৩৩১০	১৪০	৮৫৪
৭.৫০-৯.৯৯ একর	৬৩৯	৫৩৯৮	৪৭৪	৩৩৯	৩৯৮৭	১	৮	১৬৪	১৪০৩	১১২১	৬০	৩৪২

www.pathagar.com

১০.০০-১৪.৯৯ একর	৫০২	৫৮২৮	৩৯৪	৩৫৬	৪৫৭৪			১০৮	১২৫৪	১০১০	৪৫	২৯০
১৫.০০-২৪.৯৯ একর	২২২	৩৯৭৮	১৭৬	১৮০	৩১২৯			৪৬	৮৪৯	৬৯৭	২৭	১৮০
২৫.০০ একর +	৮১	২৭৯৪	৬৬	১২২	২২৭৮			১৫	৫১৬	৪৮২	৮	৪২
মোট সংখ্যার %			৭৬.৮৭			০.০৭		২৩.০৬				
ব্যবহৃত এলাকা %				৫.৫৪	৭৭.৬১		০.০৪		২২.৩৫	১৮.৩৯	০.৭৮	৪.৭৪

Source: BBS: Census of Agriculture 1996: p173

সারণী ৯.১৮ : ভূমি মালিকানা প্রকার ও পরিবার প্রধান অনুসারে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

নির্বাচিত কর্মকান্ড	ব্যবহৃত জমির সংখ্যা					
	মোট	বসতবাটিহীন	বসতবাটি ও ভূমিসহ			
			আবাদী ভূমিহীন	আবাদীভূমি		
				০.৫০ একর পর্যন্ত	০.৫১ - ১.০০ একর	১.০১ একর পর্যন্ত
সকল হোল্ডিংস	৩৩৭০৭৯	২৪৭৪	১১১২৯৮	৭২৭৯৯	৪১৬৬৪	১০৮৮৪৪
পুরুষ প্রধান	৩২৬০৩৫	২৩৭০	১০৬০৭৯	৭০২৭১	৪০৬৪৫	১০৬৬৭০
মহিলা প্রধান	১১০৪৪	১০৪	৫২১৯	২৫২৮	১০১৯	২১৭৪
হোল্ডিং রিপোর্ট কুটির শিল্প	৬৯৬০					
গবাদি পশু	১৪১৪২১	৫০	২৬৫৩	১৭৭৮	৮৪৮	১৬৩১
প্রতি হোল্ডিং গবাদি পশুর সংখ্যা	৩	৪৭৬	৯২২২	১৯৯৯২	২৩৮৫১	৮৭৮৮০
মহিষ	১৬৫৭	৩	২	২	২	৩
প্রতি হোল্ডিং মহিষের সংখ্যা	২	১৫	৩৭২	২৭৮	১৫৩	৮৩৯

Source: BBS: Census of Agriculture 1996

www.pathagar.com

সারণী ৯.১৮-এর বাকী অংশ

নির্বাচিত কর্মকান্ড	ব্যবহৃত জমির সংখ্যা					
	মোট	বসতবাটিহীন	বসতবাটি ও ভূমিসহ			
			আবাদী ভূমিহীন	আবাদীভূমি		
				০.৫০ একর পর্যন্ত	০.৫১ - ১.০০ একর	১.০১ একর পর্যন্ত
ছাগল	৬৭৭৭২	১	৭২	২	২	২
প্রতি হোল্ডিং ছাগলের সংখ্যা	২	২৯৮	২	১৩৭৩৮	৯৬৩২	২৮৯৬৫
ভেড়া	৯৫৫৬	২	১৫১৩৯	২	২	২
প্রতি হোল্ডিং ভেড়ার সংখ্যা	২	৪৭	২	২৪২৩	১৪৬১	৪১৭৩
ফাউলস	২১৪৪১২	৩	১৪৫২	২	২	২
প্রতি হোল্ডিংস ফাউলসের সংখ্যা	৬	৯৭৯	২	৪৫৪২৩	৩০৬১৫	৮৭৪৪৪
হাঁস	১২৮১৮৩	৬	৪৯৯৫১	৫	৬	৭
প্রতি হোল্ডিংস হাসের সংখ্যা	৫	৫৭৫	৫	২৪৯২৪	১৮৬৫৬	৫৮৯০০
সেচ যন্ত্রপাতি	৩০৯৪৫	৫	২৫১২৮	৪	৫	৬
সেচ এলাকা পার হোল্ডিংস (একর)	২.৬৩	৯৭	৪	১৭১৩	৩০২০	২৫১৭৭

Source: BBS: Census of Agriculture 1996

www.pathagar.com

সারণী ৯.১৯ ভূমি মালিকানার প্রকার ও পরিবার প্রধান অনুসারে নির্বাচিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, উপজেলা দুর্গাপুর

সকল হোল্ডিংস	৩৬২৩৩	২৯৩	১১৫১২	৯৫১৭	৪৩৯৩	১০৫১৮
পুরুষ প্রধান	৩৪৭১৮	২৬৭	১০৮২৩	৯০৮২	৪২৬৬	১০২৮০
মহিলা প্রধান	১৫১৫	২৬	৬৮৯	৪৩৫	১২৭	২৩৮
হোল্ডিং রিপোর্ট						
কুটির শিল্প	৭৩৮	২	২৬২	২৪৫	৭২	১৫৭
গবাদি পশু	১৩২১৭	৮৯	১০৩৬	২১৩৬	২১৪৬	৭৮৫০
প্রতি হোল্ডিং গবাদি পশুর সংখ্যা	৩	৩	২	২	২	৩
মহিষ	৩১৩	১	৪৩	৪৫	২০	২০৪
প্রতি হোল্ডিং মহিষের সংখ্যা	২	১	২	২	২	২
ছাগল	৮৮৫৮	৩৪	১৭০৫	২১২০	১২৪৭	৩৭৫২
প্রতি হোল্ডিং ছাগলের সংখ্যা	২	২	২	২	২	৩
ভেড়া	৯৩৩	৮	১৫৩	২৮৯	১৩৫	৩৪৮
প্রতি হোল্ডিং ভেড়ার সংখ্যা	২	২	৩	২	২	৩
ফাউলস	২২৮০৮	১১২	৪৭২৪	৫৯১৫	৩৩০৯	৮৭৪৮
প্রতি হোল্ডিংস ফাউলসের সংখ্যা	৬	৫	৪	৫	৬	৮
হাঁস	১২৪৩৫	৫৮	১৭৮৪	২৮৫৩	১৮৮৪	৫৮৫৬
প্রতি হোল্ডিংস হাসের সংখ্যা	৪	৪	৩	৩	৪	৫
সেচ যন্ত্রপাতি	২৬৬০	১২	৮৭	২৮৭	৩২২	১৯৫২
সেচ এলাকা পার হোল্ডিংস (একর)	২.২৭	১.৪৯		০.১৬	০.৫১	২.৯৭

Source:BBS: Census of Agriculture: p 267,270 &272

www.pathagar.com

সারণী ৯.২০ ভূমি মালিকানা প্রকার ও পরিবার প্রধান অনুসারে নির্বাচিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, উপজেলা কলমাকান্দা

সকল হোল্ডিংস	৪২৬৬৩	২৪৮	১৩২৯৫	১০৩৯৫	৫০৫৯	১৩৬৬৬
পুরুষ প্রধান	৪১০৭০	২৩৬	১২৬২৭	৯৯৭০	৪৯১৫	১৩৩২২
মহিলা প্রধান	১৫৯৩	১২	৬৬৮	৪২৫	১৪৪	৩৪৪
হোল্ডিং রিপোর্ট						
কুটির শিল্প	৭৬০	৪	১৮১	২৯১	৮৭	১৯৭
গবাদি পশু	১৫৬৬৩	৩৬	৭৫৪	২১০৬	২৩০২	১০৪৬৫
প্রতি হোল্ডিং গবাদি পশুর সংখ্যা	৩	৩	২	২	২	৩
মহিষ	২২৪		২৭	৩৬	২৩	১৩৮
প্রতি হোল্ডিং মহিষের সংখ্যা	২		১	২	২	২
ছাগল	৭৮৭৬	২৩	১৩৯৭	১৮৭১	১০৭১	৩৫১৪
প্রতি হোল্ডিং ছাগলের সংখ্যা	২	২	২	২	২	২
ভেড়া	১৫৭৮	৩	১৭১	৪৩৮	২০৬	৭৬০
প্রতি হোল্ডিং ভেড়ার সংখ্যা	২	১	২	২	২	২
ফাউলস	২৫১৪৮	৮৩	৪৯৯৬	৬১৪১	৩৪৫০	১০৪৭৮
প্রতি হোল্ডিংস ফাউলসের সংখ্যা	৬	৫	৪	৪	৫	৭
হাঁস	১৬১২৪	৪৫	২৭৬০	৩৪৭৬	২২৫১	৭৫৯২
প্রতি হোল্ডিংস হাসের সংখ্যা	৬	৫	৪	৫	৫	৭
সেচ যন্ত্রপাতি	৩৮৫৫	৮	১০৩	১৯৭	৩২৪	৩২২৩
সেচ এলাকা পার হোল্ডিংস (একর)	৩.১৪	১.২১		০.১৭	০.৬২	৩.৬৭

Source:BBS: Census of Agriculture: p 267,270 &272

www.pathagar.com

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যার্জনে জাতীয় অবস্থা

চরম দারিদ্র্য ক্ষুধা নির্মূলে জাতীয় পর্যায়ে পরিস্থিতির পর্যালোচনা

পারিবারিক আয়-ব্যয় জরিপ (HES) এর তথ্য বিবরণী অনুযায়ী ১৯৯১-৯২ সালে বাংলাদেশে মাথাপিছু দারিদ্র্য অনুপাত ছিল ৫৮.৮ শতাংশ, ২০০০ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৪৯.৮ শতাংশে দাঁড়ায়। এই সময়কালে প্রতি বছর গড়ে শতকরা মাত্র একভাগ হারে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে।

এমতাবস্থায় এমডিজি লক্ষ্যার্জনের ক্ষেত্রে ১৯৯১ সালের দারিদ্র্য বিমোচনের বিশ্ব মূল্যমান (benchmark) অনুযায়ী ২০১৫ সালে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য মাত্রা হবে ২৯.৪ শতাংশ। তবে ২০০০ সালে এমডিজি ঘোষণার পর সে বৎসরের তুল্যমানকে বেঞ্চমার্ক হিসেবে গণ্য করা হলে বাংলাদেশের জন্য ২০১৫ সালে দারিদ্র্য বিমোচনের অভিষ্ট লক্ষ্য হবে প্রায় ২৫ শতাংশ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিবেচনায় বর্তমান মোট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৬০-৬২ মিলিয়ন। এ পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনে এমডিজি লক্ষ্য অর্জিত হলেও এ দেশে ২০১৫ সালে হত দরিদ্র্যের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৪০-৫০ মিলিয়ন। তাই জাতির সামনে এটাই হবে মারাত্মক চ্যালেঞ্জ। ফলে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতিযোগিতার পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী হবে সবচেয়ে হতভাগা ও অসহায়।

দারিদ্র মাত্রা ঃ আঞ্চলিক তারতম্য

আঞ্চলিক দারিদ্র চিত্র HE Servey 2000 এবং বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, ২০০০ সালে দেশের প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে দারিদ্র্যের প্রকোপ সবচেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হয়, রাজশাহী বিভাগে ৬১ শতাংশ। এরপরই খুলনা বিভাগের অবস্থান ৫১.৪ শতাংশ। দারিদ্র্যের অবস্থা সবচেয়ে কম দেখা যায় বরিশাল বিভাগে যা মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ। দরিদ্র অবস্থা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে চট্টগ্রাম বিভাগ ছাড়া গত দু'দশকে সকল বিভাগেই দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। অঞ্চলভেদে দারিদ্র্যের তুলনামুলক চিত্র সারণী ১০.১ উপস্থাপন করা হল ঃ

www.pathagar.com

সারণী ১০.১ ঃ বাংলাদেশের কতিপয় গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্যের হার

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	পল্লী দারিদ্র্য হার (%)			
			অতি দরিদ্র	দরিদ্র	মোট	বিভাগ (%)
রাজশাহী	কুড়িগ্রাম	চিলমারী	৪৯	৪৬	৯৫	৮০.৫
	বগুড়া	সোনাতলা	৪৫	২১	৬৬	
ঢাকা	জামালপুর	জামালপুর সদর	৪৬.২	১৮.৭	৬৫	৬৪.৪
	নরসিংদী	নরসিংদী সদর	৩২.৫	৩১.৩	৬৩.৭	
খুলনা	দৌলতপুর	দৌলতপুর	৩৫.৫	২৬.৭	৬২.২	৬৮.৫
	শ্যামনগর	শ্যামনগর	৫০.৬	২৪.১	৭৪.৭	
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর	৩৩.৩	২৭.৬	৬০.৯	৬১.৩
	পটুয়াখালী	বাউফল	২০.৯	৪০.৭	৬১.৬	
চট্টগ্রাম	রাংগামাটি	কাউখালি	৪৫.৯	২৮.৪	৭৪.৩	৬৬.৯
	চট্টগ্রাম	পটিয়া	১৫.৯	৪৩.৬	৫৯.৬	
সিলেট	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	৪৮.৩	১৮.৩	৬৬.৭	৬০.৬
	সিলেট	গোলাপগঞ্জ	১০.৬	৪৩.৯	৫৪.৫	
জাতীয়			৩৬.৩	৩১.২		৬৭.৫

উৎস ঃ জনপ্রতিবেদন ২০০৫

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সূচকে তাদের অবস্থা

সহস্রাব্দে উন্নয়ন লক্ষ্য জনপ্রতিবেদন, ২০০৫ এর প্রতিবেদনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজস্ব সূচক অনুযায়ী দরিদ্র, অতি দরিদ্র ও দরিদ্র নয় এ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেভাবে দরিদ্র ও অতিদরিদ্রের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে তা সারণী ১০.২ উপস্থাপন করা হল। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কৃষি কাজে নিয়োজিত শ্রমিকসহ দিন মজুরের মধ্যে দরিদ্রের হার সবচেয়ে বেশী।

সারণী ১০.২ : কৃষি শ্রমিকসহ দিন মজুরদের বিভিন্ন নির্দেশক তাদের অবস্থা

নির্দেশক	দরিদ্র	অতি দরিদ্র
গৃহায়ণ	* বাঁশের তৈরি বাড়িঘর	গৃহহীন (অন্য মানুষের গৃহে অথবা কোনোমতে তৈরি একটি মাথা গোজার ঠাঁইতে বাস)
খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ	* দিনে কোনভাবে দুইবেলার খাবার ব্যবস্থা হয়	* দিনে এক বেলা খাবার

www.pathagar.com

নির্দেশক	দরিদ্র	অতি দরিদ্র
ভূমি	শুধুমাত্র বসত ভিটা	* ভূমিহীন * খুবই সামান্য: শুধুমাত্র বসতভিটা
পেশা	* দিনমজুর / ক্ষেত মজুর * রায়ত / বেশির ভাগ কৃষি কাজ * জেলে / নিম্নস্তরের পরিবহন শ্রমিক / ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	* শারীরিক প্রতিবন্ধী ভিক্ষাবৃত্তি / অন্যের উপর নির্ভরশীল * কদাচিৎ কাজের সুযোগ হয়
পরিস্থিতি মোকাবেলার কৌশল	* সামান্য সঞ্চয় * ঋণ এবং অগ্রীম নিতে পারে * অনেকের সামান্য মুরগী / গবাদি পশু থাকতে পারে	* দুর্যোগ / বন্যা মোকাবেলা করতে অসমর্থ
ঋতুভিত্তিক কর্মসংস্থান	* ঋতু অনুযায়ী ৪/৫ মাস কর্মসংস্থান থাকে	* প্রায় ৮ মাস কর্মহীন থাকে
শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়	* সন্তানের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে অসমর্থ।	* শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞ * সন্তানের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে অসমর্থ
ব্যবসা	* ব্যবসা পরিচালনার জন্য মূলধনের অভাব	* দিন আনা দিন খাওয়া / দিন মজুর
জীবিকা	* দৈনিক আয় ১০০-১২০ টাকা * দৈনিক আয়ের উপর নির্ভরশীল / যদি কাজ না পায় ঋণ / কর্জ নিতে পারে	* কাজ নেই। আহার নেই

উৎস ঃ জন প্রতিবেদন ২০০৫

এমডিজি-২ ঃ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, জাতীয় অবস্থা

ফেব্রুয়ারী ২০০৫ এ পরিচালিত বাংলাদেশ সরকার ইউএনডিপি এর যৌথ প্রতিবেদনের হিসেব অনুযায়ী সে সব ছেলে মেয়ে, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে তাদের বিদ্যালয়ের ভর্তির হার প্রায় ৬৭ শতাংশ। এমডিজির অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুযায়ী ৬-১০ বৎসর বয়সী প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করতে পেরেছে এমন শিশুর হার ২০০৪ সালে ছিল ৫৭ শতাংশ। এমতাবস্থায় বিদ্যমান কর্ম কৌশলের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ২০১৫ সালের মধ্যে এদেশে ১০০ ভাগ (MDGs) এর লক্ষ্যার্জন অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

লক্ষ্য ২ : সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে করণীয়

অভীষ্ট ৩ : ২০১৫ সালের মধ্যে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সকল শিশু যাতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে তা নিশ্চিত করা ; প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে ভর্তির প্রকৃত হার শতকরা ১০০ ভাগ নিশ্চিত করা ; গ্রেড ১-৫ পর্যন্ত উন্নিত শিক্ষার্থীদের অনুপাত বৃদ্ধি করা ; ১৫-২৪ বছর বয়স্কদের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

বয়স্ক শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সরকারী হিসাব অনুযায়ী সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। ২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী এই হার ছিল ৪৭.৫ শতাংশ। বয়স্ক শিক্ষার অন্যান্য হিসাবের মধ্যে পিআরএসপি ও বিএইচডিআর ২০০০ এবং বিআইডিএস - ইউএনডিপি ২০০১ সালের প্রতিবেদনে এই হার ৫৬ শতাংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনে ২০০৩ এ এর হার ছিল ৫৯ শতাংশ। বাস্তব অবস্থা নিরিখে বলা যায় যে এ হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার এর অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, ৬-১০ বৎসর বয়সের শিশুদের মধ্যে প্রায় ৯৭ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এক্ষেত্রে ছেলে মেয়ে মধ্যে গ্রাম নির্বিশেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির পরিমান প্রায় সমান সমান পরিলক্ষিত হচ্ছে।

তবে প্রাথমিক শিক্ষার হারের অগ্রগতি হলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার তুলনামূলকভাবে কমই রয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রেও পরিসংখ্যান বিভ্রাটও রয়েছে। ১৯৮০ সালের এই হার ১৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালে ৬৫ শতাংশ এ উন্নিত হয়েছে (এইচআইইএস ২০০০ আইপিআরএসপি ২০০৩)। ইউএনডিপি ২০০০ সালের হিসেবে দেখা যায় যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির হার আরো কম। ছেলে মেয়েদের মাধ্যমিক স্তরের ভর্তির তুলনামূলক চিত্রে দেখা গেছে, মেয়েদের ভর্তির ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশি (২০০০ সালে ৭১.৫ শতাংশ, পক্ষান্তরে ছেলেদের ভর্তির হার ছিল ৫৯.৪ শতাংশ)। ইউএনডিপি এর ২০০৩ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায় এ সময়ে ছেলে ও মেয়ে শিশুর বিদ্যালয় ভর্তির হার ছিল যথাক্রমে ৪২ ও ৪৪ শতাংশ। মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির ফলে ভর্তি সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এ তথ্যই যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়।

এমডিজি ২০১৫ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সম্পদ আহরণের বিষয় বিবেচনা করা হলেও সরকার ও জাতিসংঘ প্রণীত অগ্রগতি প্রতিবেদনে কৌশল ও চ্যালেঞ্জের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। সর্বোপরি শিক্ষার গুণগতমান নিয়ে বির্তক থাকলেও সংখ্যাগত মান দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে বলা যায় নিঃসন্দেহে।

www.pathagar.com

জনপ্রতিবেদন ২০০৫ এর মাঠ পর্যায়ের জরিপে সুনির্দিষ্ট সূচক ও বিদ্যমান সরকারি তথ্য ব্যবহার করে ১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমীক্ষা চালানো হয়। এতে নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া যায় ঃ

স্কুলে তালিকাভূক্তি ছেলে মেয়েদের অনুপাত যথাক্রমে ৭০:১৩৩, যার গড় ১০৩ ;
প্রতিটি বিদ্যালয়ে গড়ে ৫.৫ জন শিক্ষক রয়েছেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সর্বনিম্ন ৩ এবং সর্বোচ্চ ৮ জন শিক্ষক রয়েছেন। মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত ১ ঃ ৪;
ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত বিদ্যালয় ভেদে ১:৩০ থেকে ১:৭৮, গড়ে ১:৫৭ ;
ঝরে পড়ার গড় হার ২০ শতাংশ, যা বিদ্যালয় ভেদে ১০ থেকে ৩৫ শতাংশ ;
গড় উপস্থিতির হার ৮৩ শতাংশ, বিদ্যালয় ভেদে এর তারতম্য ৭৫ থেকে ৯০ শতাংশ ;
উত্তীর্ণের হার ৬৩ শতাংশ যার তারতম্য বিদ্যালয় ভেদে ৪০ থেকে ৮০ শতাংশ।

সার্বজনীন শিক্ষা সম্প্রসারণে বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সমস্যা, শিক্ষকের অভাব ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব, পাঠ্যপুস্তকের সহজলভ্যতা, অভিভাবকের সচেতনতা, দারিদ্র্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সর্বোপরি অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক পক্ষপাত দুষ্টতা।

অনতিবিলম্বে যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে তা হল ; গরীব ছাত্রদের আর্থিক সহায়তা দান ও উপবৃত্তি প্রদান করা, যথোপযুক্ত পরিবীক্ষণ বৃদ্ধি করা, জনগণকে সচেতন করে তোলা, পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ সুলভ ও সহজলভ্য করে তোলা। দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে অবকাঠামো তৈরী, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষক ও অভিভাবকের নিয়মিত পরামর্শ সভা আয়োজন করা। শিক্ষা বিভাগে দুর্নীতি দমন ও স্থানীয় সরকারের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ।

এমডিজি -৩ জেন্ডার ব্যালেন্স ও নারীক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমতা অর্জিত হয়েছে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রেড ১১-১২ ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ৬৫ঃ৩৫। বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে জেন্ডার ব্যালেন্স সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার উপর বেশী জোর দেয়া যেতে পারে।

নারী ক্ষমতায়ন ও নারী অধিকার ঃ

নারীর মানবাধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হবার ফলেই নারীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের ঘটনা (Violence Against Women - VAW) ঘটে থাকে। সামাজিক মর্যাদা ও স্বীকৃতির অভাবে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে নারী সন্ত্রাসের স্বীকার হয়ে থাক। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের নামে অপসংস্কৃতি ধর্মীয় শিক্ষার ও যথাযথ ব্যাখ্যার অভাবে এ দেশের নারীর

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের ব্যাপকতা ও বিস্তার উৎসাহিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষার সার্বিক ব্যবহার এবং সম্প্রসারণের মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ ও সহমর্মিতা সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও আত্মনির্ভরশীলতা বাড়ছে অত্যন্ত দ্রুত। কিন্তু মারাত্মক অভাব রয়েছে মানসিকতা পরিবর্তনের। আমাদের নারী সমাজ কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও মাত্র ৪৫.৪ শতাংশ নারী কৃষিকাজে নিয়োজিত বলে স্বীকৃত। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাতে তৈরী পোশাক শিল্পে ৭০ শতাংশেরও বেশী নারী শ্রমিক রয়েছে। অথচ তাদের যথোপযুক্ত স্বীকৃতি নেই। নারীরা নির্মাণ কাজ করছে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। শ্রম শক্তির জরিপ ১৯৯৯-২০০০ অনুযায়ী শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ক তথ্য থেকে জানা যায়, ঘরে বাইরে কাজের প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী মাত্র ২৩.৯ শতাংশ নারী শ্রম শক্তিতে অংশ গ্রহণ করেছে, যেখানে পুরুষের অংশ গ্রহণের হার ৮৪ শতাংশ।

সারণী : ১০.৩ : নারী পুরুষের শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণ

সাল	শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার	
১৯৯৯-২০০০	নারী	পুরুষ
	২৩.৯ শতাংশ	৮৪ শতাংশ
[illegible]		
২০০০	নারী প্রধান পরিবার	পুরুষ প্রধান পরিবার
	৪৮ শতাংশ	৪৯.৯ শতাংশ
১৯৯৫-১৯৯৬	৫১.২ শতাংশ	
[illegible]		
১৯৯৫-১৯৯৬	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
	৫৬	৩১.৪
২০০০	৫২	৩৭

উৎস ঃ শ্রমশক্তি জরীপ ১৯৯৯-২০০০, এইচআইইএস, ২০০০

এইচ আই এস ২০০০ এর প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ২০০০ সালে দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে এমন নারী প্রধান পরিবারের হার ৪৮ শতাংশ, পক্ষান্তরে পুরুষ প্রধান পরিবারের হার ছিল মাত্র ৪৯.৯ শতাংশ। ১৯৯৫-৯৬ সালে শহরাঞ্চলে মোট দারিদ্র্য পীড়িত নারী প্রধান পরিবারের হার ছিল ৩১.৪ শতাংশ যা ২০০০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭.০ শতাংশ।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী ক্ষমতায়ন ও বৈষম্য দুরীকরণ

স্থানীয় পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের মোট আসনের তিন আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারী আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। কেবিনেট সদস্যদের মধ্যে নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে। বিচার বিভাগ সহ উচ্চতর চাকুরী ও নিয়োগে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে কোটা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে বেশী করে নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হয়েছে। তদুপরি নারী ক্ষমতায়ন ও বৈষম্য দূরীকরণে কতিপয় চ্যালেঞ্জ রয়েই গেছে তার উল্লেখযোগ্য হল ঃ

সামাজিক বৈষম্য, মানসিক ও মূল্যবোধ পরিবর্তন, বেতন মজুরী বৈষম্য ও দারিদ্র্য ও বাল্য বিবাহ ইত্যাদি। এ লক্ষ্যার্জনে নিম্নোক্ত কৌশলগুলো অবলম্বন করা যেতে পারে, তা হল ; প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির নীতি ও আইনগত কাঠামো সময়োপযোগী করণ। কুসংস্কার দুরীকরণ ও ধর্মীয় বিধানের যথোপযুক্ত সময়োপযোগী ব্যাখ্যা প্রদান করা, সর্বোপরি রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকতে হবে।

এমডিজি -৪ ঃ শিশু মৃত্যু হার হ্রাস করণ

স্বাস্থ্য রক্ষা এমডিজি লক্ষ্য সমূহের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিবিএস এর পরিসংখ্যানে, জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য জরিপ এর হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, নবজাতক মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে অগ্রগতি হয়েছে। ১৯৭০ সালে প্রতি হাজার জীবন্ত শিশুর ভূমিষ্টের ক্ষেত্রে এর হার ছিল ১৩১ যা ১৯৮০ ও ১৯৯০ সালে যথাক্রমে ১০১.৫ ও ৯৪ এ দাঁড়িয়েছে। ২০০০ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৫৭ এ পৌঁছেছে। গ্রামীণ এলাকায় ১৯৯০ সালে ছিল ৯৭ এবং ২০০০ সালে তা কমে ৬৬ তে দাঁড়িয়েছে। শহরাঞ্চলে ১৯৯০ সালে ৭১ থেকে কমে ২০০০ সালে তা ৪৭ এ দাঁড়িয়েছে। উপযুক্ত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে, গ্রামীণ এলাকায় নবজাতকের মৃত্যু সংখ্যা শহরাঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশী। এ বিষয় গ্রামীণ পর্যায়ে মাতৃ পরিচর্যা ও স্বাস্থ্য সেবা আরো উন্নত করা একান্ত অপরিহার্য।

১-৪ বৎসর বয়সী শিশুদের মধ্যে শিশু মৃত্যু হারের হিসেব অনুযায়ী দেখা যায় যে, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বছর গুলোতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। (বিআইডিএস - এইচ ডিআর ২০০১)। শিশু মৃত্যুর হার ১৯৯০ সালে ১৪.২ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৮ সালে প্রতি হাজারে ৬.৩ এ দাঁড়ায়। গ্রামীণ এলাকায় ১৯৯০ সালের ১৪.২ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৮ সালে তা প্রতি হাজারে ৭.৩ এ এসে দাঁড়ায়। এতদসত্ত্বেও আগামী দিনের উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ সমূহ ঃ পর্যাপ্ত পরিমানে দক্ষ চিকিৎসক ও ঔষধের অভাব। হাসপাতালের দুর্বল বিশেষতঃ সরকারী ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র্য, অপুষ্টির বিষয় ও সার্বিক সামাজিক সচেতনতার অভাব।

www.pathagar.com

শিশু মৃত্যুর হার ঃ এক্ষেত্রে বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি

সারণী ১০.৪ ; শিশু মৃত্যুহারের অবস্থা

বয়স	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	২০০১
জাতীয়					
অনূর্ধ্ব ৫ বছর	২৫০	২০৫	১৪৪		৭৭
১-৪ বছর		১২.৭	১৪.২	৬.৩	
গ্রামাঞ্চল					
অনূর্ধ্ব ৫ বছর		১৩.২	১৪.২	৭.৩	
[illegible]					
অনূর্ধ্ব ৫ বছর		৮.০	৮.৩	৫.৪	

উৎস ঃ জনপ্রতিবেদন ২০০৫

এ প্রসংগে কৌশলগত কার্যক্রম ও করণীয় হতে পারে, ব্যাপক নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ, বাল্যবিবাহ নিরোধকরণ, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ এবং সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করণে মসজিদ, মন্দিরসহ রাজনৈতিক ভাবে উদ্বুদ্ধকরণ।

এমডিজি-৫ ঃ মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন

বাংলাদেশের এমডিজি অগ্রগতির কয়েকটি লক্ষ্যের মধ্যে মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন একটি অন্যতম লক্ষ্য। গত দুই দশকে লক্ষ্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে যা ১৯৯০ সালে ৪৮০ থেকে কমে ২০০০ সালে প্রতি লাখে জীবন্ত শিশু জন্মদানে এই হার ৩১৮ এ দাঁড়িয়েছে। ইউএনডিপি এর প্রতিবেদনে ২০০৩ দেখা যায় ১৯৮৫-২০০১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল ৪০০। হিসেবের গড় মিল থাকলেও সংখ্যাটি এ জাতির জন্য আশংকাজনক বলা চলে। এক্ষেত্রে আরো গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

অভীষ্ট ৬ অনুসারে ১৯৯০ এবং ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃ মৃত্যুর হার তিন-চতুর্থাংশ হ্রাস, এ লক্ষ্যার্জনে মাতৃ মৃত্যুহার কমাতে হবে। দক্ষ ধাত্রীর সেবা বৃদ্ধি করতে হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ ইউএনডিপি এর প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ২০০০ সালে ৫ লাখেরও বেশী গর্ভবতী মা মৃত্যুবরণ করেছে এবং এদের ৯৫ শতাংশ এশিয়া এবং আফ্রিকাতে। এসব দেশের মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে, যার মাতৃ মৃত্যুর হার প্রতি হাজার জীবিত শিশুর জন্মদান ৩.২ ছিল। কারণ হিসেবে দেখা যায় যে, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবার অভাব রয়েছে। ১৫-৪৯ বৎসর বয়সী নারীদের মধ্যে ২০ শতাংশের মৃত্যুর কারণ সন্তান প্রসবকারীর জটিলতা। বেশীর ভাগ মহিলারা পুষ্টিহীনতায় ভোগে। তাছাড়া স্বাভাবিকভাবে

www.pathagar.com

তাদের স্বাস্থ্যগত সমস্যাও রয়েছে। এদেশের প্রায় ৭০ ভাগ মা অপুষ্টি ও রক্ত স্বল্পতায় ভোগে। ৪০ শতাংশেরও কম জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ রয়েছে। ৫০ শতাংশ মহিলা গর্ভকালীন সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা পায় না (বাংলাদেশ মাতৃ চিকিৎসা জরিপ ২০০০)।

এ ক্ষেত্রে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করতে হবে তাহলো, মাতৃ ও শিশু সেবা বৃদ্ধি, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, গর্ভকালীন সময়ে মা ও শিশুকে হাসপাতালে যাওয়ার বিষয় সচেতনতা সৃষ্টি করা, নারী সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, নিরক্ষরতা ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ।

এমডিজি-৬ ঃ এইচআইভি যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বাংলাদেশে এইচআইভি/এআইডি বিস্তৃতি ততোটা মারাত্মক না হলেও পার্শ্ববর্তী দেশে সীমান্তে বিশেষত পূর্ব সীমান্তে এর প্রাদুর্ভাব মারাত্মক আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের লোক বিভিন্ন দেশে মাইগ্রেশনের কারণে আমাদের স্বল্প শিক্ষিত ও ঘনবসতিপূর্ব দেশের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

জাতীয় এআইডিএস/এসটিডি কার্যক্রম এনএএসপি প্রতিবেদনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০১ সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে ১৮৮ জন এআইডিএস আক্রান্ত প্রকাশ পেয়েছে। যার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৩৫ (১৯%)। ইউএনডিপি এর প্রতিবেদনে (এইচডিআর) ২০০৩ অনুযায়ী এদেশে প্রতি এক লক্ষ লোকের মধ্যে ২১১ জন যক্ষ্মা রোগী পাওয়া গেছে। যেখানে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ক্ষেত্রে এ হার ছিল মাত্র ৪ জন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন দেখা যায় যে, ১৯৯৯ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬ হয়েছিল (ডব্লিউ ডি আই, ২০০২)। ১৯৯৯ সালে অন্য এক প্রতিবেদনে দেখা যায় প্রতি এক লক্ষ লোকের জন্য ২৪১ জন যক্ষ্মা রোগী পাওয়া যায়। অপরদিকে একই সময়ে ৫৬ জন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায়। সাম্প্রতিককালের ২০০৫ সালের দুটি জরিপের ফলাফলে (বিপিনগঞ্জ, দুর্গাপুর উপজেলার এবং কেশবপুর, কলমাকান্দা উপজেলার) এ সংখ্যা আরো বেশী দেখা যায়।

যেসব চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা প্রয়োজন তা হল -
যুব সমাজের মধ্যে যৌন সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। যা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্তি করা যায়। তাছাড়াও বিভিন্নভাবে যেমন ; টিভি, রেডিও, পত্র পত্রিকার মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমাদের দেশে পরিবার পরিকল্পনার মাঠ কর্মীদের সহজেই কাজে লাগানো যেতে পারে।

www.pathagar.com

সমুদ্র বন্দর বাস ট্রাক স্ট্যান্ড এবং ছোট শহরগুলি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। এসব জায়গায় নিরাপদ যৌন সম্পর্ক বিষয়ে জ্ঞান এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের বিষয় জ্ঞান ও সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। একদেশ থেকে অন্য দেশে প্রবেশাধিকারীদের দ্রুত ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

এমডিজি-৭ পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন

জীববৈচিত্র ও প্রাকৃতিক সম্পদ টেকসই জীবিকা নির্বাহের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ। এ জন্যে এসবের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থা অপরিহার্য। এসব সম্পদে বাংলাদেশ যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু অধিক জনসংখ্যার চাপে সর্বোপরি অবিবেচক উন্নয়ন কর্মকান্ড ও মানুষের অবিবেচক আচরণের ফলে যেমন কৃষি সম্প্রসারণ, প্রাকৃতিক আবাসভূমির বিলুপ্তি, অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে এসব ঐতিহ্যবাহী সম্পদ আজ মারাত্মকভাবে বিলুপ্তির সম্মুখীন। বলা হয়ে থাকে দেশের ১০ শতাংশ এলাকা জুড়ে বনাঞ্চল রয়েছে। যেখানে আন্তর্জাতিক মানদন্ড হিসেবে তা ২৫ শতাংশ থাকা প্রয়োজন। তাও আবার প্রতি বৎসর ৩.৩ শতাংশ করে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

জীববৈচিত্র ঃ বাংলাদেশে ৫টি জাতীয় উদ্যান, বন্য প্রাণীর জন্য অভয়ারণ্য রয়েছে ৮টি। সব মিলে প্রায় ১৪টি সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বন এলাকা রয়েছে। সুন্দরবন ও টাঙ্গুয়ার হাওর বিশ্ব ঐতিহ্যরূপে দুটি প্রাকৃতিক আবাস রয়েছে। মোট কথা এগুলোর কতটুকু টেকসই ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এবিষয়ে বিশদভাবে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন রয়েছে।

পরিবারে নিরাপদ পানীয় জল, পায়খানা এবং পয়ঃনিষ্কাশনের সমস্যা ও নিরসনের উপায় খোঁজে সব নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যার্জনে দুটি গ্রাম ; বিপিনগঞ্জ ও কেশবপুর

লক্ষ্য -১ ঃ দারিদ্র্য

প্রধান পেশা ঃ জরিপাধীন উভয় গ্রামের ১৪২ জন উত্তরদাতা চাষাবাদের সাথে জড়িত, যার মধ্যে দুর্গাপুর উপজেলার বিপিনগঞ্জ গ্রামের ৬৪ (৪৫%) জন এবং কলমাকান্দা উপজেলার কেশবপুর গ্রামের ৭৮ (৫৪.৯%) জন। দুটি গ্রামের ৪৮ জন মানুষ কৃষি মজুর। এদের মধ্যে বিপিনগঞ্জে ৫২ (৮৮%) জন এবং কেশবপুরে ৬ (১৩%) জন। দুইটি গ্রামে পেশাগত পার্থক্যের প্রধান কারণ হল বিপিনগঞ্জ অপেক্ষাকৃত উঁচু এলাকা হওয়ায় অন্যান্য অবস্থাসম্পন্ন কৃষকদের জমিতে কৃষি মজুর হিসেবে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। অপরদিকে কেশবপুর নিম্নাঞ্চল বিধায় তাদের বছরে মাত্র একবার চাষাবাদ করার সুযোগ মিলে, এছাড়া এ গ্রামে হিন্দু জনগোষ্ঠী কৃষি মজুর হিসেবে কাজ করা, তাদের পছন্দসই পেশা নয়।

www.pathagar.com

জরিপে দেখা যায় মৎস্য শিকার কেশবপুর গ্রামের আরেকটি অন্যতম পেশা। উভয় গ্রামের ২০ জন এই পেশার সাথে জড়িত যার মধ্যে কেশবপুরে ১৯ (৯৬.২%) জন এবং বিপিনগঞ্জে রয়েছে মাত্র ১ জন। কেশবপুরে একটি জেলে সম্প্রদায় বসবাস করে যারা বছরের অধিকাংশ সময় মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের চাষাবাদযোগ্য জমি এমনকি বসতবাড়ির জমির পরিমানও খুবই সামান্য। জেলে সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী অংশ ঘোরাডোবা হাওর লিজ নিয়ে থাকে, সাধারণ জেলেরা সেখানে মাছ ধরার সুযোগ একেবারে পায়না বলা চলে। অন্যান্য পেশার মধ্যে রয়েছে, হাঁস-মুরগী পালন, তেলের ঘানি, কুটির শিল্প, মিষ্টি প্রস্তুতকারী এবং কাঁথা সেলাই এর কাজ, যদিও উভয় গ্রামেই এসব পেশায় নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা খুবই সামান্য।

দারিদ্র্য মাত্রা যাচাইয়ের জন্য তাদের শিক্ষার হার অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা এসবের অবদান বিশেষতঃ কৃষি ও চাষাবাদের জন্য এবং বসতবাড়ির জমির পরিমান জানা একান্ত আবশ্যক।

আয়ের উৎস

গবাদি পশু পালন

জরিপকালে অনুসন্ধান করে জানা যায় কিভাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে বিভিন্ন বাড়তি আয়বর্ধক কর্মকান্ডে জড়িত করে। জরিপের ফলে দেখা যায় দুর্গাপুর উপজেলার বিপিনগঞ্জে ৪৮% জনগোষ্ঠী এবং কলমাকান্দা উপজেলার কেশবপুরে ৫১% জনগোষ্ঠী গৃহপালিত গবাদি পশু লালন-পালন করে থাকে। যার অধিকাংশই গৃহস্থালী প্রয়োজনে করে থাকে। উভয় গ্রামেই তারা ছাগল ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু পালন করে আয় বর্ধনের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রয়েছে কিন্তু এ প্রচেষ্টা কাংঙ্খিত মাত্রায় করা হচ্ছে না। প্রথমতঃ এজন্য রয়েছে সচেতনতার অভাব, এছাড়া অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, যেমন মূলধন, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

হাঁস-মুরগী পালনের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিপিনগঞ্জের ৫৮% বাড়ীতে এবং কেশবপুরের ৪১% বাড়ীতে এর প্রচলন আছে। উভয় গ্রামে এ ধরণের পেশাগত পার্থ্যক্যের জন্য কতগুলো কারণ রয়েছে, প্রথমতঃ কেশবপুর নিম্নাঞ্চল যা হাঁস মুরগী পালনের জন্য উপযুক্ত নয়, দ্বিতীয়তঃ কেশবপুরের মানুষজন আশেপাশের এলাকা থেকে অপেক্ষাকৃত গরীব। তাছাড়া অর্থনৈতিকভাবেও তারা দুর্বল এবং স্থানীয় বাজারের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না হওয়ায় তাদের উৎপাদিত পণ্যের স্থানীয়ভাবে তেমন একটা চাহিদা নেই। ফলে এসব পণ্য বাজারজাতকরণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও কঠিন ব্যাপার।

মৎস্য চাষ

বিপিনগঞ্জ উঁচু ভূমিতে অবস্থিত হওয়ায় এবং সেখানে কোন বড় পুকুর বা হাওড় না থাকায় মৎস্য চাষ খুব একটা লাভজনক হয় না। অপরপক্ষে কেশবপুর নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত যা

www.pathagar.com

বছরের অধিকাংশ সময় পানির নীচে থাকে। এছাড়া ঘোরাডোবা নামে কেশবপুরে একটি বড় হাওড় রয়েছে। এসব কারণে দুটি গ্রামে মৎস্য চাষের সম্ভাবনায় ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। তাছাড়া তাদের মধ্যে রয়েছে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য।

শাক-সবজি চাষ

উভয় গ্রামের মানুষের মধ্যেই শাঁক-সবজি চাষাবাদের অভ্যাস রয়েছে, উৎপাদিত ফসলের যার অর্ধেক শুধুমাত্র নিজেদের খাদ্য চাহিদা পুরণের জন্যই করে থাকে। কিন্তু জরিপের সময় দেখা যায় এই গৃহস্থালী শাঁক-সবজি চাষ ও গৃহস্থালী বন সম্প্রসারণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থিক অথবা ঋণ সুবিধা এবং বিপনণ ব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে এ সম্ভাবনাকে আয় বর্ধনের শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে।

সারণী -১০.৫ বিক্রিত শস্যের শতকরা গড় (Income Poverty)

উপজেলা	বিক্রিত শস্য	মধ্যক (Mean)	N
দূর্গাপুর	বোরো	৩২.৬৫	৪২
	শাকসব্জি	৪৪.০০	৫
	অন্যান্য	৭০.০০	১
	মোট	১৪৬.৬৫	৪৮
কলমাকান্দা	আমন	৪০.০০	১
	বোরো	৪০.২৬	৬৫
	আলু	৬৫.০০	১
	চিনি	১০.০০	১
	সরিষা	৫০.০০	৩
	মোট	২০৫.২৬	৭১
যৌথ	আমন	৪০.০০	১
	বোরো	৭২.৯১	১০৭
	আলু	৬৫.০০	১
	চিনি	১০.০০	১
	সরিষা	১০.০০	১
	শাকসব্জি	৪৪.০০	৫
	অন্যান্য	৭০.০০	১
	মোট	৩১১.৯১	১১৭

উৎস : নিজস্ব জরিপ : Environment Poverty Interface Towards Achiving MDGs, 2006

www.pathagar.com

কলমাকান্দা উপজেলার কেশবপুর একটি অত্যন্ত নিম্নাঞ্চল। এই গ্রামে বোরো ধানের ফলন খুব বেশী (প্রতি পরিবারে উৎপাদন হার ৬৫%)। বোরো চাষ এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান অর্থকরী ফসল। এ গ্রামের প্রায় ৪০.২৬% পরিবার সংসারের অন্যান্য প্রয়োজন মিটানোর জন্য বোরো ধান বিক্রি করে। অন্যান্য ফসল ও অর্থকরী ফসলের মধ্যেও রয়েছে; যেমন - গড়ে আমন ধান ৪০, আলু ৬৫, আখ ১০ এবং সরিষা ৫০ ভাগ তারা বিক্রি করে। গড়ে আলু বিক্রির হার সবচেয়ে বেশী (সারণী ১০.৫)।

দুর্গাপুর উপজেলার বিপিনগঞ্জ উঁচু ও সমতল ভূমি এলাকা। এখানে ১০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪২ জন বোরো ধান উৎপাদন করে, মাত্র ৫ জন শাক সব্জি চাষাবাদ করে। এছাড়া অন্যান্য ফসল ও সেখানে চাষাবাদ করা হয়। এ এলাকার লোকজন তাদের উৎপাদিত ফসলের মধ্যে গড়ে বোরো ধানের ৩২.৬৫, শাক-সবজির ৪৫ এবং অন্যান্য ফসলের ৭০ ভাগ বিক্রি করে (সারণী ১০.৫)। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন করতে আয় বৈষম্য দুর করতে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনা এবং এসবের বাণিজ্যিকীকরণ অত্যন্ত জরুরী।

উৎপাদিত ফসল বিক্রয়

জরিপাধীন উভয় গ্রামের অধিকাংশ গ্রামবাসী তাদের উৎপাদিত ফসল 'ফরিয়া'র (মধ্যস্বত্বভোগী) কাছে বিক্রি করে। জরিপকালে দেখা যায় বিপিনগঞ্জের ৪১টি পরিবারের মধ্যে ২৪টি এবং কেশবপুরের ৬৮টি পরিবারের মধ্যে ৪১টি তাদের উৎপাদিত ফসল ফরিয়ার কাছে বিক্রি করে। জরিপের তথ্য পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে এই দুটি গ্রামের বাজার একচেটিয়া ফারিয়াদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। বাজার মূল্যের উপরও তাদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এর কারণ হলো হাটবাজার গুলো গ্রাম দুটি থেকে বেশ দূরে অবস্থিত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাও তেমন ভাল নয়। ফলে গ্রামবাসীরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বরাবরই বঞ্চিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা তাদের উৎপাদন খরচটুকু তুলে আনতেও ব্যর্থ হয়।

দুটি গ্রামের খুব অল্প সংখ্যক পরিবারই আড়তদারের কাছে তাদের ফসল বিক্রি করতে পারে দুর্গাপুর ১৭.১% এবং কলমাকান্দায় ৩৬.৮%। অপর্যাপ্ত বিপনন ব্যবস্থার প্রথমত; দরিদ্ররা দরিদ্রই থেকে যায়, কেননা তারা তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না। অনেক ক্ষেত্রে মূলধনই উঠে আসেনা দ্বিতীয়ত; উৎপাদন ব্যয় উঠে না আসা এবং পর্যাপ্ত সার ও বীজের সহজলভ্যতার অভাবে জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম করার প্রতি বিমুখ হয়ে যায়। তাই এ অঞ্চলে দারিদ্র্য দূর করতে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির জন্য বাজার সুবিধা সৃষ্টি, সম্প্রসারণ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা আশু প্রয়োজন।

www.pathagar.com

সারণী -১০.৬ ঃ কম মূল্যে বিক্রিত ফসল (শতকরা হারে)

উপজেলা	শস্যের নাম	মধ্যক (Mean)	N
দূর্গাপুর	বোরো	১৩.৩৪	৩৮
	শাকসব্জি	১০.০০	১
	মোট		
কলমাকান্দা	বোরো	১৪.৩২	৬২
	মোট	১৪.৩২	৬২
মোট	বোরো	২৭.৬৬	১০০
	শাকসব্জি	১০.০০	১
	মোট	৩৭.৬৬	১০১

উৎস ঃ নিজস্ব জরিপ ঃ Environment Poverty Interface Towards Achiving MDGs, 2006

জরিপে দেখা যায় গ্রামবাসীরা যে মূল্যে তাদের বোরো ধান বিক্রি করবে তা স্থানীয় বাজার মূল্যের চেয়ে গড়ে প্রায় ২৮ টাকা কম। ফসলের প্রকৃত মূল্য বিক্রিত ফসলের মূল্যের চেয়ে নিশ্চিতভাবে বেশী হতে পারে (সারণী ১০.৬) এ বিষয়ে একটি বিবরণী দেয়া হল।

সারণী - ১০.৭ ঃ কম মূল্যে শস্য বিক্রির কারণ

উপজেলা	কমমূল্যে শস্য বিক্রির কারণ			
	নিম্ন বাজার মূল্য	ঋণ পরিশোধের জন্য পূর্বাহ্নে বিক্রি	ফরিয়ারা উপযুক্ত মূল্য দেয় না	অন্যান্য
দূর্গাপুর	১৭	১৯	১	২
	৪৪.৭%	৫০.০%	২.৬%	৫.৩%
কলমাকান্দা	২১	৪০	৪	২
	৩৩.৯%	৬৪.৫%	৬.৫%	৩.২%
মোট যৌথ	৩৮	৫৯	৫	৪

উৎস ঃ নিজস্ব জরিপ ঃ Environment Poverty Interface Towards Achiving MDGs, 2006

ফসলের বাজার মূল্য কম হওয়ার কারণ জানতে গিয়ে জরিপে দুর্গাপুর উপজেলার বিপিনগঞ্জ গ্রামের ৩৮ জন এবং কলমাকান্দা উপজেলার কেশবপুর গ্রামের ৬২ জন গ্রামবাসী তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। এতে দেখা যায় দুর্গাপুরের প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ ঋণ পরিশোধের জন্য তাদের আগেভাগে ফসল বিক্রি করতে হয়। প্রায় ৪৪.৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যোগাযোগ সুবিধা না থাকায় উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য কম থাকে (সারণী ১০.৭)।

তিন শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন ফরিয়ারা ন্যায্য মূল্য দেয়না এবং ৫.৩ শতাংশ উত্তরদাতা অন্যান্য কারণের কথা উল্লেখ করেছেন যেমন শিক্ষা, বাজার মূল্যের অবস্থা সম্বন্ধে নিয়মিত অবগত না থাকা ইত্যাদি।

অপরদিকে কলমাকান্দা উপজেলার ৩৩.৯ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যোগাযোগের অভাবে বাজার মূল্য কম থাকে, ৬৪.৫ শতাংশ জানান ঋণ পরিশোধের জন্য আগে ভাগে ফসল বিক্রি, ৬.৫ শতাংশ বলেন ফরিয়ারা ন্যায্য মূল্য দেয় না এবং বাকী ৩.২ শতাংশ বলেন অন্যান্য কারণ যেমন - সীমিত কেনাবেচা, পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব এবং খারাপ যাতায়াত ব্যবস্থা। জরিপের জন্য উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় উভয় ক্ষেত্রেই গ্রামবাসীরা তাদের ফসলের মূল্য কম পাওয়ার কারণ হিসেবে ঋণ পরিশোধের জন্য আগে ভাগে ফসল বিক্রিকেই প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ তারা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মধ্যে আছে এবং দিন দিন আরো দরিদ্র হয়ে পড়ছে।

এ সমস্ত গ্রামের অধিকাংশ গ্রামবাসীরাই গ্রামের মহাজনদের কাছ থেকে অগ্রিম ঋণ নিয়ে থাকে, এ ঋণ পরিশোধের জন্য তাদের আগে ভাগে ফসল বিক্রি করে দিতে হয়। ফলে তারা ফসলের কাঙ্খিত মূল্য পায় না। যার ফলশ্রুতিতে সামাজিক ভেদাভেদ, অবিচার ও চরম দরিদ্র্যতার সৃষ্টি হয়।

কৃষি বিপনণ ব্যবস্থা

সারণী ১০.৮ ঃ নিকটবর্তী বাজারের সাথে যাতায়াত সুবিধা

উপজেলা	নিকটতম বাজারে যাতায়াতের বাহন			
	পায়ে হাটা	নৌকা	রিক্সা/ভ্যান	ট্রলার
দূর্গাপুর	৯৮	১	১	
	৯৮.০%	১.০%	১.০%	
কলমাকান্দা	৮৮	৯৪		১
	৮৯.৮%	৯৫.৯%		১.০%
মোট	১৮৬	৯৫	১	১

উৎস ঃ নিজস্ব জরিপ -Environment Poverty Interface Towards Achiving MDGs, 2006

www.pathagar.com

জরিপকালে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের বিষয় উত্তরদাতাদের মতামত গ্রহণ করা হলে দেখা যায় যে, বিপিনগঞ্জ হতে নিকটবর্তী হাট/বাজারের দূরত্ব গড়ে প্রায় ০.৬৯ কি.মি.। গ্রামবাসীরা পায়ে হেঁটে বাজারে যায় প্রায় ৯৮% এবং এ জন্য গড়ে ১১ মিনিট সময় লাগে। কেশবপুর হতে নিকটবর্তী হাট/বাজারের দূরত্ব প্রায় ৫.১৬ কি.মি. এবং নৌকায় অথবা পায়ে হেটে সেখানে পৌঁছাতে সময় লাগে ৭৩ মিনিট। কেশবপুর থেকে বিভিন্ন উপায়ে বাজার যাতায়াত করা যায়। অধিকাংশ গ্রামবাসী নৌকায় (৯৫.৯%) অথবা পায়ে হেটে (৮৯.৮%) এবং খুব নগন্য সংখ্যক লোক সামর্থ্য অনুযায়ী ট্রলারেও (১%) যাতায়াত করে (সারণী ১০.৮)। জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় অধিকাংশ গ্রামবাসীকে যে সমস্ত কারণে পায়ে হেঁটে বাজারে যেতে হয়, তা হল ; ক) দারিদ্র্য, রিক্সায় করে যাবার সামর্থ্য নেই ; খ) যাতায়াত ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধার অভাব, রিক্সায় যাতায়াতের জন্য গ্রামবাসীদের নিজস্ব যানবাহন নেই ; গ) রাস্তাঘাট থাকলেও সেগুলোর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রীজ/কালভার্ট নেই, রাস্তা কর্দমাক্ত হওয়ায় রিক্সা বা বাই-সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করাও অত্যন্ত দূরূহ ও কষ্টকর।

জরিপকৃত গ্রাম দুইটির বাজারের অবস্থান তুলনা করলে দেখা যায় দুর্গাপুরের বিপিনগঞ্জ অপেক্ষা কেশবপুরের বাজারের দূরত্ব অনেক বেশী, ফলে বাজারে ফসল বিক্রি করতে নিয়ে যাবার জন্য খরচও বেড়ে যায়। এতে করে বিপিনগঞ্জের তুলনায় কেশবপুরের গ্রামবাসীদের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। ফলে দরিদ্র্যতার মাত্রা আর কমছে না।

www.pathagar.com

সারণী ১০.৯ : তিন মাসে উৎপাদিত শাকসব্জীর বিবরণ

উপজেলা	লাল শাক	মূলা শাক	ঢেঁকি শাক	পুঁই শাক	পাট শাক	পালং শাক	কলমী শাক	ডাটা শাক	সরিষা শাক	বেগুন	মূলা	শালগম	কুমড়া	শসা	ধনিয়া পাতা	লাউ	লাউ শাক	বরবটি	ঢেঁড়শ	পেঁপে	ফুলকপি	অন্যান্য	মোট
দুর্গাপুর	২০	৫	১	৯	৫		১	৯		২	৪		৩৭	১১	১	৪২	১০	১৬	১	১৫		২	৫৮
	৩৪.৫%	৮.৬%	১.৭%	১৫.৫%	৮.৬%		১.৭%	১৫.৫%		৩.৪%	৬.৯%		৬৩.৮%	১৯.০%	১.৭%	৭২.৪%	১৭.২%	২৭.৬%	১.৭%	২৫.৯%	২	৩.৪%	১০০.০%
কলমাকান্দা	১২	২০	১	১৯	৪	৩	২	৬	১২	২৬	১৮	১	১৭	৪	২	২৭	১৩	১৩	২	৪	৪.১%	১৫	৪৯
	২৪.৫%	৪০.৮%	২.০%	৩৮.৮%	৮.২%	৬.১%	৪.১%	১২.২%	২৪.৫%	৫৩.১%	৩৬.৭%	২.০%	৩৪.৭%	৮.২%	৪.১%	৫৫.১%	২৬.৫%	২৬.৫%	৪.১%	৮.২%	২	৩০.৬%	১০০.০%
মোট সংখ্যা	৩২	২৫	২	২৮	৯	৩	৩	১৫	১২	২৮	২২	১	৫৪	১৫	৩	৬৯	২৩	২৯	৩	১৯		১৭	১০৭

উৎস : নিজস্ব জরিপ : Environment Poverty Interface Towards Achiving MDGs, 2006

www.pathagar.com

তিন মাসে উৎপাদিত শাকসব্জি থেকে আয়

বিপিনগঞ্জ গ্রামের উৎপাদিত প্রধান প্রধান শাকসবজির মধ্যে রয়েছে কুমড়া, লাউ, সীম এবং পেঁপে (সারণী ১০.৯)। এ গ্রামে জরিপকৃত ৩৫টি পরিবারের প্রতিটি শাকসবজি উৎপাদন থেকে তিন মাসের গড় আয় ৭৬৫.৭১ টাকা (চিত্র-১০.১)। অপরদিকে কলমাকান্দা গ্রামে চাষাবাদকৃত প্রধান প্রধান শাকসবজির মধ্যে রয়েছে বেগুন, মূলা, কুমড়া এবং লাউ (সারণী -১০.৯)। এ গ্রামে ৪২টি পরিবারের প্রতিটির শাকসবজি উৎপাদন থেকে গত তিন মাসের গড় আয় ৯৬৮.১০ টাকা (চিত্র-১০.১)।

চিত্র ১০.১ : গত তিনমাসে শাকসবজি বিক্রির গড় আয়

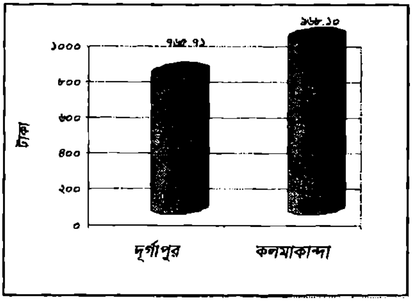

অন্যান্য উৎস হতে গত তিন মাসে দুর্গাপুর উপজেলার বিপিনগঞ্জ গ্রামের ৯৯টি পরিবারের গড় আয় ৪,২৩০.১০ টাকা এবং কলমাকান্দা উপজেলার কেশবপুর গ্রামের ৯৬টি পরিবারের গড় আয় ৪,৮৬৮.৭৫ টাকা। গত তিন মাসে উভয় গ্রামের মাত্র একটি পরিবারকে বিদেশ থেকে টাকা পাঠানো হয়েছে। প্রেরিত এ অর্থের পরিমান বিপিনগঞ্জ ও কেশবপুরে যথাক্রমে ১,৫০০ ও ৫,০০০ টাকা। অর্থ উপার্জনের জন্য বিদেশে গমনের প্রবণতা এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে খুবই কম। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে এই অঞ্চলের মানুষের আয়ে বিদেশ থেকে পাঠানো টাকার অবদান খুবই নগন্য। জরিপের তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনায় বলা যায় ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্ধ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য আয়ের দারিদ্র সীমার মাত্রা হ্রাস করবার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট অতিরিক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তৃণমূল পর্যায়ে প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন করতে হলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করে স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব ও জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

ঋণগ্রস্থ পরিবার

আমাদের সংবিধানে এমন একটি উন্নয়নমূখী ও স্থায়ী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে যেখানে সকল মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করা সম্ভব হবে এবং প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে উন্নতি লাভ করতে পারবে এবং একটি মুক্ত সমাজ ব্যবস্থায় আদর্শ ও মূল্যবোধ গুলি উপভোগ করতে পারবে। এ বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রে আগামী প্রজন্মের জন্য বাস্তবিক অর্থে দারিদ্র্য হ্রাস করবার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে।

www.pathagar.com

জরিপে দেখা যায় বিপিনগঞ্জ এবং কেশবপুর গ্রামে যথাক্রমে ১০০টির মধ্যে ৪৩ এবং ৯৮টির মধ্যে ৭০টি পরিবারের ঋণগ্রস্থ রয়েছে (চিত্র -১০.২)।

চিত্র ১০.২ : ঋণগ্রস্থ পরিবার (শতকরা)

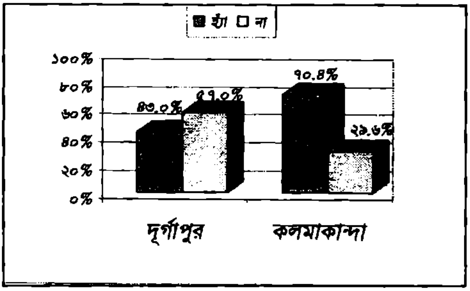

অর্থাৎ সবসময়ই তাদের মাথার উপর একটি ঋণের বোঝা রয়েছে যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আয়ের স্বল্পতা এখানে খুবই সাধারণ ঘটনা এবং অধিকাংশ গ্রামবাসী দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে। ফলে তারা তাদের আয় দিয়ে মৌলিক চাহিদাগুলি পুরণ করতে পারে না। এতে করে তারা বিভিন্ন উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে এবং পরিশোধ করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ফসল উঠার সময় কম মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। অনেক সময় দীর্ঘ দিনের অপরিশোধিত ঋণ শোধ করতে তারা নিজের বসতভিটা পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

২০০৩ সনে ঋণ গ্রহণ করবার কারণ ও উৎস

বিপিনগঞ্জে ২০০৩ সনে একটি পরিবারের ঋণ গ্রহণের পরিমান ৮,০০০ টাকা এবং পরিশোধের পরিমান ৩,০০০ টাকা। বৈশাখ (এপ্রিল -মে) মাসে ব্যবসা করার উদ্দেশ্য ১০ শতাংশ হারে সুদে মহাজনের কাছ থেকে এ ঋণ গ্রহণ করা হয়েছিল। কেশবপুর গ্রামে ২০০৩ সনে দুইটি পরিবারের ঋণ গ্রহণের পরিমান প্রায় ৩,০০০ টাকা এবং তা পারিশোধের পরিমান প্রায় ২৮৭৫.০০ টাকা। বৈশাখ থেকে (এপ্রিল-মে) মাসে ব্যবসা করবার উদ্দেশ্যে ১০ শতাংশ সুদে মহাজন এবং এনজিওর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছিল (চিত্র-১০.৩)।

চিত্র ১০.৩ : ২০০৩ সালের ঋণের উৎস

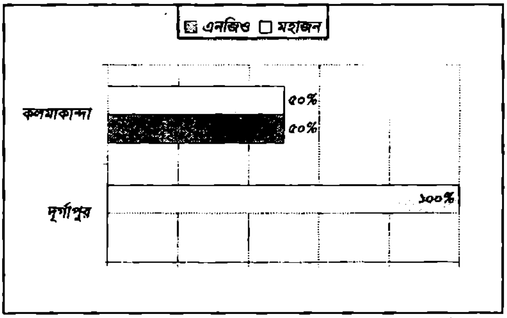

www.pathagar.com

উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় বছরের সঙ্কটময় সময় বৈশাখ (এপ্রিল-মে) মাসে তারা ঋণ গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের প্রকৃত সুদের হার কত তা কখনো নির্ণয় করা হয়নি। আগে ভাগে ফসল বিক্রির মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করতে হয় বলে তারা তুলনামূলকভাবে ফসলের মূল্য কম পেয়ে থাকে। উৎপাদিত ফসলের যে অংশটুকু মহাজনকে পরিশোধ করতে হয় সেটা যদি তারা কিছুদিন পরে বিক্রি করতে পারতো তবে অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্য পেত। যদিও সাধারণভাবে সুদের হার ১০ শতাংশ বলা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় তাদের এ ঋণের বোঝা দিন দিন না কমে বরং বাড়তেই থাকে। এনজিও ও ঋণ প্রদানকারী অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হলে যে সকল শর্ত পূরণ করতে হয় গ্রামবাসীরা অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলো পূরণ করতে পারে না। সে কারণে তারা উচ্চ সুদের হার হওয়া সত্ত্বেও মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে অধিক বরাদ্দ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সামাজিক ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

২০০৪ সালে ঋণ গ্রহণের উৎস ও কারণ

বছরের সঙ্কটময় সময়গুলোতে গরু -ছাগল ক্রয়, চাষাবাদ, চিকিৎসা, ব্যবসা, জীবিকা নির্বাহ সহ অন্যান্য কারণে তারা ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। দুটি গ্রামে জরিপকার্য পরিচালনার সময় দেখা যায়, বিপিনগঞ্জে ১৫টি এবং কেশবপুরে ১১টি পরিবার ২০০৪ সালে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য গড়ে যথাক্রমে ৯১৬৬.৬৭ টাকা ও ৫৬৩৬.৩৬ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে (চিত্র ১০.৪)। ঐ সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা মহাজন ও বিভিন্ন স্থানীয় এনজিও দের কাছ থেকে এ ঋণ গ্রহণ করে। এদের মধ্যে বিপিনগঞ্জে ৪টি পরিবার এবং কেশবপুরে ২টি পরিবার এনজিওর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে (চিত্র-১০.৫)।

চিত্র ১০.৪ : ২০০৪ সালে ঋণ গ্রহণের কারণ

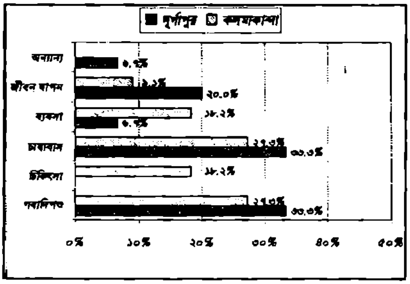

চিত্র ১০.৫ : ২০০৪ সালে ঋণের উৎস

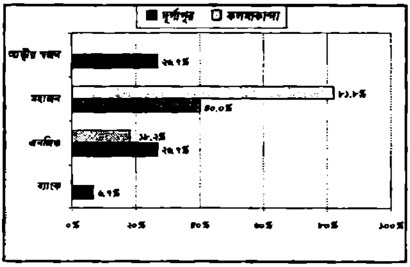

আগের বছরগুলোর তুলনায় ইদানিংকালে এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করবার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ বর্তমানে এনজিও গুলো তাদের কার্যাবলীতে দরিদ্র পরিবার গুলোর আয় বৃদ্ধি কল্পে বিভিন্ন অপ্রচলিত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে। এক বছরে গড়ে

www.pathagar.com

সর্বোচ্চ সুদের হার দেখা যায় বিপিনগঞ্জে ১৪.২২% এবং কেশবপুরে ১৬.৫২%। গড়ে পরিশোধিত ঋণের পরিমান দেখা যায় বিপিনগঞ্জে ৩৬৪৬.৪৩ (৩২%) টাকা এবং কেশবপুরে ১৫৪২.৭৩ (৩৫%) টাকা।

২০০৫ সালে ঋণ গ্রহণ করার কারণ

২০০৫ সনে বিপিনগঞ্জে ৩১টি পরিবার এবং কেশবপুরে ৫৫টি পরিবার যথাক্রমে ৯,১১২.৯০ টাকা এবং ১০,১৪১.৮২ টাকা ঋণ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু সেই একই সময়ে তা পরিশোধের ক্ষেত্রে দেখা যায় গড়ে যথাক্রমে ৩,২০১.৬১ টাকা এবং ২,৪৪১.০২ টাকা (চিত্র - ১০.৬)।

চিত্র ১০.৬ : ২০০৫ সালে ঋণের পরিমাণ এবং ঋণ পরিশোধ

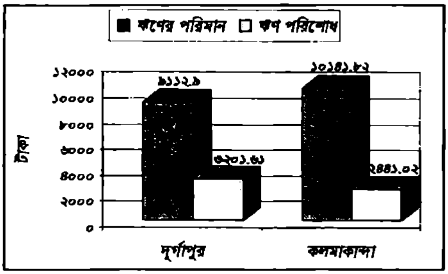

এদের অধিকাংশই মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে। যার মধ্যে বিপিনগঞ্জে ১২টি (৩৮%) পরিবার এবং কেশবপুরে ৪৪টি (৮০%) পরিবার গড়ে শতকরা ১৪.৪৭ হার সুদে (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী), চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল) ও কার্তিক (অক্টোবর-নভেম্বর) মাসে এ ঋণ গ্রহণ করে। বছরের এই সংকটময় সময়ে তাদের হাতে কোন কাজ থাকে না। এ কারণে পশুপালন (বিপিনগঞ্জের ১২টি পরিবার) ও বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য (কেশবপুরে ১৫টি পরিবার) করার জন্য তারা ঋণ গ্রহণ করেছিল। (চিত্র - ১০.৭)।

চিত্র ১০.৭ : ঋণ পরিশোধের ধরণ

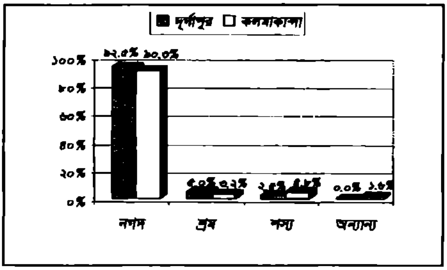

২০০৩-০৫ সাল পর্যন্ত অবস্থা পর্যালোচনায় স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, দুটি গ্রামের অধিকাংশ গ্রামবাসী প্রান্তিক চাষী। সুতরাং বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য তাদের ঋণ নিতে হয়।

www.pathagar.com

এদের অধিকাংশই এনজিও ও সরকারী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করার বাড়তি সুবিধা সমূহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না। আবার তাদের জানা থাকলেও এ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতাও শর্তসমূহ পূরন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই বাধ্য হয়েই তাদেরকে মহাজনদের নিকট ঋণ গ্রহণ করতে হয়। একারণে ঋণ পরিশোধের জন্য ফসল আহরণের সময়ই অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে তাদেরকে ফসল বিক্রি করতে হয়। ফলস্বরূপ গ্রামবাসীরা ফসল বা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয় বা তাদের অবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

বিশ্লেষণে দেখা যায় এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণের হার নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এনজিওগুলোর বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড বিশেষ করে দরিদ্র পরিবার সমূহের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা রাখছে।

সারণী - ১০.১০ : খাদ্য ঘাটতির মূল কারণ

উপজেলা	খাদ্য ঘাটতির কারণ				
	নিঃশেষিত খাদ্য	কর্মসংস্থান নেই	কৃষি উৎপাদন নেই	অপর্যাপ্ত আয়	অন্যান্য
দূর্গাপুর	২০	২০	১৫	৫১	২
	২২.০%	২২.০%	১৬.৫%	৫৬.০%	২.২%
কলমাকান্দা	৩৯	২৪	১৭	৪৪	১১
	৪৭.০%	২৮.৯%	২০.৫%	৫৩.০%	১৩.৩%
মোট যৌথ	৫৯	৪৪	৩২	৯৫	১৩

উৎস ঃ নিজস্ব জরিপ ঃ Environment Poverty Interface Towards Achiving MDGs, 2006

জরিপে দেখা যায় অধিকাংশ মানুষই সারা বছর পর্যাপ্ত খাদ্য পায়না এবং খাদ্য ঘাটতি বহু বছর ধরেই এ এলাকার একটি প্রধান সমস্যা। সাধারণত ফাল্গুন-চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল) মাসে এ খাদ্য ঘাটতি দেখা যায়। ঐ সময়ে খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য অন্যান্য কাজের উৎসগুলো থেকেও তেমন একটা আয়ও হয় না। খাদ্য উৎপাদনে অনিশ্চয়তা ও দীর্ঘস্থায়ী উপার্জনের সংস্থানের অভাবে দরিদ্র্যতার সৃষ্টি হয় যা এ অঞ্চলের গ্রামবাসীদের জন্য খুবই পরিচিত ঘটনা। জরিপে দেখা যায় বিপিনগঞ্জের মানুষ অগ্রহায়ণ (নভেঃ-ডিসেঃ) মাসে এবং কেশবপুরের মানুষ জৈষ্ঠ্য (মে-জুন) মাসে তাদের শস্য আহরণ করে থাকে। সে সময়ে তাদের যথেষ্ট পরিমানে খাদ্যের যোগান থাকে কিন্তু দৈনন্দিন অন্যান্য চাহিদা পুরণের জন্য স্বল্প মূল্যে তাদের শস্য বিক্রি করতে হয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য তাদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে চরম দরিদ্রতা থেকে মুক্ত হতে আয়ের অন্যান্য উৎস খুঁজে বের করা অত্যাবশ্যক।

www.pathagar.com

সারণী ঃ ১০.১১- পরিবারের সদস্যদের যারা বেশী খায়

উপজেলা	যারা বেশী খায়					
	ছেলে শিশু	মেয়ে শিশু	বয়স্ক পুর"ষ	বয়স্ক মহিলা	গর্ভবতী মা	অন্যান্য
দূর্গাপুর	৩১	৩২	৭	৩	৪	১
	৫৯.৬%	৬১.৫%	১৩.৫%	৫.৮%	৭.৭%	১.৯%
কলমাকান্দা	২৭	২৭	১৬	১	৬	৩
	৬১.৪%	৬১.৪%	৩৬.৪%	২.৩%	১৩.৬%	৬.৮%
মোট যৌথ	৫৮	৫৯	২৩	৪	১০	৪

উৎস ঃ নিজস্ব জরিপ -Environment Poverty Interface Towards Achiving MDGs, 2006

বছরের সংকটময় সময়ে একটি পরিবারের বিভিন্ন বয়সের প্রত্যেক সদস্যই সমপরিমান খাদ্য পায় না। কিন্তু বয়স্ক পুরুষ ও নারীর তুলনায় ছেলে মেয়ে ও শিশু উভয়েই তুলনামুলকভাবে বেশী খাদ্য পেয়ে থাকে। বিপিনগঞ্জে ছেলে ৩১ (৫৯.৬%) এবং মেয়ে ৩২ (৬১.৫%) এবং কলমাকান্দায় ছেলে ২৭ (৬১.৫%) এবং মেয়ে ২৭ (৬১.৪%) [সারণী ১০.১১]। লক্ষ্য করা যায় বয়স্ক পুরুষেরা বয়স্ক নারীদের তুলনায় বেশী খাদ্য পেয়ে থাকে। অর্থাৎ বলা যায় উভয় গ্রামেই শিশু অপুষ্টির ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দুর হয়েছে কিন্তু বয়স্কদের ক্ষেত্রে সঙ্কটময় সময়ে খাদ্য প্রাপ্তি বিষয়ে সমতা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর কারণটা সহজেই অনুমেয় কেননা আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় মায়েরা খাবার রান্না ও পরিবেশন করেন এবং নিজেরা সবার শেষে খাওয়া দাওয়া করেন। ফলে স্বভাবতই তাদের ভাগ্যে খাবার কমই জোটে।

সঙ্কটময় সময়ে খাদ্য সংগ্রহ

প্রয়োজনীয় জিডিপির হার অর্জনের মাধ্যমে দেশের সমৃদ্ধির জন্য আয় সৃষ্টির উৎস সমূহ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে বিবেচনায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। সঠিকভাবে স্বাস্থ্যগত অবস্থা উন্নয়নের জন্য মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণজনিত ব্যয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কিন্তু উভয় গ্রামের মানুষেরাই তাদের খাদ্য চাহিদা পূরণ করতে পারে না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ খাদ্য স্বল্পতা দূর করবার জন্য তাদেরকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। ক্ষুধা, খাদ্য অনিশ্চয়তা, চরম অভাব এবং দীর্ঘস্থায়ী দরিদ্র দূরীকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্যের কুৎসিৎ চেহারাটা দূর করবার জন্য আশু দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সমীক্ষায় দেখা যায় বিপিনগঞ্জের ৫৫.১% এবং কেশবপুরের ৯৫.৩% মানুষ খাদ্য ও বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদা সমূহ পূরণের জন্য সঙ্কটময় সময়ে ঋণ গ্রহণ করে থাকে (চিত্র-১০.৮)।

পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের সাথে স্বাস্থ্যগত দরিদ্রতা জড়িত। জরিপে দেখা যায় বিপিনগঞ্জের মানুষ সপ্তাহে ২১ বেলার মধ্যে ৫ বেলা মাছ ও ১ বেলা করে মাংস ও ডিম খায়। অপরদিকে কেশবপুরের মানুষ সপ্তাহে ২১ বেলার মধ্যে ৬ বেলা মাছ খেয়ে থাকে কেননা তারা ঘোরাডোবা হাওড়ের পাশে বসবাস করে।

www.pathagar.com

চিত্র ১০.৮ : দূর্যোগের সময় খাদ্য ব্যবস্থা

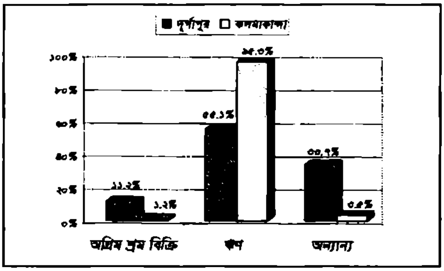

খাদ্য তালিকায় শাকসজির পরিমান বৃদ্ধির সম্ভাবনাও কম কারণ খুব কম পরিবারই নিজেদের চাহিদা পুরণের জন্য শাকসবজি উৎপাদন করে থাকে। অন্যভাবে বলা যায় শাকসবজি কেনার জন্য অতিরিক্ত আয়ও তাদের নেই। শাকসবজির ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বিপনণ ব্যবস্থাও বেশ দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত। এতে করে স্পষ্টভাবেই বলা যায় উভয় গ্রামের অধিবাসীরাই স্বাস্থ্যগত দরিদ্রতার শিকার।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী (Social Safety-Net)

সারণী ১০.১২ ঃ ওএমএস / ভিজিএফ/ভিজিডি কার্ডের মাধ্যমে খাদ্য বিতরণকৃত মাসসমূহ

ওএমএস / ভিজিএফ / ভিজিডি এর মাধ্যমে খাদ্য প্রাপ্তি

উপজেলা	খাদ্য প্রাপ্তি												মোট
	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রাহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র	
দূর্গাপুর (বিপিনগঞ্জ)	১	১	৫	২	২	২	২				১	১	১০
	১০.০%	১০.০%	৫০.০%	২০.০%	২০.০%	২০.০%	২০.০%				১০.০%	১০.০%	১০০.০%
কলমাকান্দা (কেশবপুর)	১	২	২	১০	১১	১২	৬	২	২	৩	৩	৩	৩১
	৩.২%	৬.৫%	৬.৫%	৩২.৩%	৩৫.৫%	৩৮.৭%	১৯.৪%	৬.৫%	৬.৫%	৯.৭%	৯.৭%	৯.৭%	১০০.০%
মোট	২	৩	৭	১২	১৩	১৪	৮	২	২	৩	৪	৪	৪১

উৎস ঃ নিজস্ব জরিপ -Environment Poverty Interface Towards Achiving MDGs, 2006

দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বিধান সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত পদক্ষেপ এ সুবিধা কি পরিমানে দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা উপজেলায় এসে পৌঁছেছে তা জরিপের মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছে। জরিপে দেখা যায় বিপিনগঞ্জে ১৭% পরিবার ভিজিএফ ও ভিজিডি কার্ডের মাধ্যমে সুবিধা পাচ্ছে এবং কেশবপুরে ২১.২% পরিবার এই নিরাপত্তা সুবিধা ভোগ করছে। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে গত বছরে ওএমএস ভিজিডি, ভিজিএফ ও বয়স্ক ভাতার আওতায় বিপিনগঞ্জের প্রায় ১৭% পরিবার খাদ্য সাহায্য পেয়েছে এবং কেশবপুরে এর পরিমান ছিল প্রায় ৩০%।

www.pathagar.com

এই সুবিধা বিপিনগঞ্জে আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাসে সর্বোচ্চ সম্প্রসারিত হতে দেখা যায় এবং কেশবপুরে তা শ্রাবণ (জুলাই-অগাষ্ট), ভাদ্র (অগাষ্ট-সেপ্টেম্বর) ও আশ্বিন (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাস পর্যন্ত দেখা যায় (সারণী-১০.১২)। এ সকল খাদ্য সাহায্যের উৎস হিসেবে দেখা যায় সরকার, এনজিও, স্থানীয় জনগণ এবং আত্মীয় স্বজন।

স্কুল থেকে টিফিনের ব্যবস্থা

কথা আছে গ্রামাঞ্চলে শিশুরা স্কুলে যেতে পারে না, কারণ তাদের নিজেদের ও পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্য আয়বর্ধক কাজে জড়িত থাকতে হয়। আরও অধিক সংখ্যক শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসতে সরকার শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুল থেকে ঝরে যাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমাতে এ কর্মসূচী ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এছাড়া অনেক স্কুলে বাচ্চাদের জন্য টিফিন দেওয়ার প্রথাও চালু করা হয়েছে। প্রশ্নোত্তরে দেখা যায় শিক্ষার জন্য খাদ্য বা টিফিন দেওয়ার কোনটিই গ্রাম দুটিতে এখনও চালু হয়নি। ফলে স্কুল থেকে ঝরে যাওয়া ছাত্রছাত্রীর হার হ্রাস হবার সম্ভাবনা এখানে খুবই কম। একইভাবে অপেক্ষাকৃত বড় শিশুরাও খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় আসেনি। ফলে জরিপকৃত গ্রাম দুটিতে স্বাস্থ্যজনিত দরিদ্রতা হ্রাসের ব্যাপারে কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোন পথে!

পাঁচ বছর পূর্বের অর্থনৈতিক অবস্থা

সমীক্ষাধীন গ্রাম দুটিতে দরিদ্রতার মাত্রা পর্যবেক্ষণের জন্য তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে পাচ বছর পূর্বে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমানের তুলনায় কেমন ছিল। এর উত্তরে দেখা যায় বিপিনগঞ্জের ৪৫.৫% মানুষ এবং কেশবপুরের ৩৮.৮% মানুষ মনে করে তাদের অবস্থা খারাপ ছিল। আবার বিপিনগঞ্জের ৩৩.৩% এবং কেশবপুরের ৪২.৯% মানুষ বলেছে ৫ বৎসর পূর্বে তাদের অবস্থা বর্তমানের তুলনায় ভালো ছিল। (চিত্র - ১০.৯)।

চিত্র ১০.৯ : গত পাঁচ বছরের তুলনায় জরিপকালে পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা

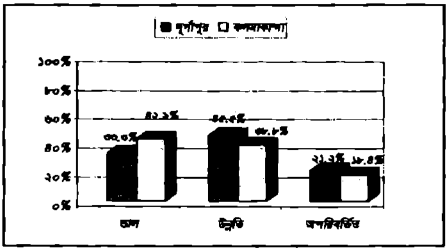

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও অন্যান্য উপকরণের স্বল্পতা, উৎপাদিত ফসল বিপণনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাবই হচ্ছে ৫ বৎসর পূর্বে তাদের খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থার

www.pathagar.com

প্রধান কারণ। যদিও বাংলাদেশ বিপুল পরিমানে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠি রয়েছে কিন্তু এদের একটি বড় অংশ মূলত অশিক্ষিত, অদক্ষ, কম মজুরীপ্রাপ্ত এবং বেকার। উন্নয়নের জন্য এদিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। এ জন্যে জাতীয়নীতি ও স্থানীয় উদ্যোগের অভাব রয়েছে।

পরিবার প্রতি প্রতিদিন ভাত গ্রহণের পরিমান

সমীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় বিপিনগঞ্জের প্রতি পরিবার গড়ে প্রতিদিন ২.৫৬০ কেজি এবং কেশবপুরে ৩.৯৭৪ কেজি ভাত রান্না করে বা খেয়ে থাকে। ফলে শিশু অপুষ্টি সেখানে একটি সাধারণ বিষয়। সুতরাং এ অঞ্চলে কাজের বিনিময়ে খাদ্য এর মত বিভিন্ন কর্মসূচী আরও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। জরিপে দেখা যায় ৪-৫ সদস্যের একটি পরিবারে খাদ্য গ্রহণের পরিমান চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয়। তাদের শাকসব্জি, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি গ্রহণের ধরণ দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রতিদিন মাথাপিছু ন্যূনতম চাহিদা ২১২২ কিলো ক্যালরীর চেয়ে তারা অনেক কম পেয়ে থাকে।

লক্ষ্য ২ ঃ প্রাথমিক শিক্ষা

স্কুলে না পাঠানোর কারণসমূহ

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন। জরিপকৃত গ্রাম দুটিতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায় উভয় গ্রামের ৯ জন করে ছেলে শিশু তাদের প্রাথমিক স্কুল পর্যায় শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার আগেই পড়াশুনা ত্যাগ করে। ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যায়ে উভয় গ্রামের ১ জন করে ঝরে যায়। কারণ হিসেবে লক্ষ্য করা যায় খরচ যোগাতে অপরাগতা, জীবন ধারণের জন্য কাজে জড়িয়ে পড়া, যাতায়াত সমস্যা এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার আশংকা (সারণী - ১০.১৩)

সারণী ১০.১৩ : স্কুলে না পাঠানোর কারণ

উপজেলা	স্কুলো না পাঠানোর কারণ						
	বিবাহিত	ব্যয় নির্বাহ করতে পারে না	গৃহকর্ম অধিক লাভজনক	আয়বর্ধক কর্মকান্ড বেশী লাভজনক	ফলপ্রসু শিক্ষা সম্বন্ধে সন্দেহ	যাতায়াত সমস্যা	মোট
দূর্গাপুর		৩	২	১		২	৫
		৬০.০%	৪০.০%	২০.০%		৪০.০%	১০০.০%
কলমাকান্দা	২	১৪	৪		১	১	১৬
	১২.৫%	৮৭.৫%	২৫.০%		৬.৩%	৬.৩%	১০০.০%
মোট যৌথ	২	১৭	৬	১	১	৩	২১

উৎস ঃ নিজস্ব জরিপ -Environment Poverty Interface Towards Achiving MDGs, 2006

www.pathagar.com

বয়স্ক শিক্ষা

সহস্রাব্দ উন্নয়নের ২য় লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বয়স্ক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও অত্যন্ত জরুরী। অধিকাংশ মানুষ বয়স্ক শিক্ষার গুরুত্বের পক্ষে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছে (বিপিনগঞ্জে ৯২%) এবং (কেশবপুরে ৭৪.৫%)। কিন্তু জরিপে দেখা যায় অধিকাংশ এলাকাতেই কোন বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র নাই এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে (বিপিনগঞ্জে ১টি এবং কেশবপুরে ১৪টি) এ সমস্ত বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলি পরিচালনা করে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের উদ্দেশ্য সমূহ অর্জনের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা অত্যন্ত জরুরী। এই লক্ষ্যে সরকার এবং এনজিও সমূহকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য যৌথভাবে কাজ করতে হবে।

লক্ষ্য-৩ ঃ জেন্ডার সমতাকরণ

নারী পুরুষ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন অর্জন সহস্রাব্ধ লক্ষ্যার্জনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে নারী পুরুষ সমতাকরণ তুলনামূলকভাবে অনেকটা অর্জিত হয়েছে নিঃসন্দেহে। তবে জরিপকৃত গ্রাম দুটির অবস্থা পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, তৃতীয় শ্রেণী পর্যায়ে পড়াশুনা শেষ করার আগেই পড়াশুনা ছেড়ে দেয়া মেয়েদের সংখ্যা বেশী। কারণ হিসেবে দেখা যায় সামর্থ্যের অভাব, গৃহস্থালীয় কাজে সহায়তা করণ; যাতায়াতের সমস্যা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যার্জনকে অত্র এলাকায় সর্বোচ্চমান শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রামে নারী পুরুষ সমতা লক্ষ্যার্জন অনিশ্চিত বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অত্র এলাকায় উন্নয়নের বিষয়ে সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় প্রশাসনকে আরো তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

এস এস সি পর্যায়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান

জরিপকালে দেখা যায় যে, ৮৮ শতাংশ জনগোষ্ঠী বিপিনগঞ্জ এবং ৯২ শতাংশ জনগোষ্ঠী কেশবপুরে জানে যে, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে মেয়েদের সরকারী সহায়তা দেয়া হয়ে থাকে। তবে বেশীর ভাগ জনগোষ্ঠী এখনো এ সুবিধার আওতায় আসেনি। বিপিনগঞ্জ ২২ শতাংশ এবং কেশবপুর ৪২ শতাংশ পরিবার এ সুযোগের আওতাধীন রয়েছে। অন্যরা তাদের পড়াশুনা শেষ করতে পরেনি কারণ তাদের স্কুলে যাতায়াত সমস্যাও আনুষাঙ্গিক খরচ বহন করতে সক্ষম নয়। তাই বলা যায় শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে জরিপকৃত গ্রাম গুলির নারী ক্ষমতায়ন সন্তোষজনকভাবে অর্জিত হচ্ছে না। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে গ্রামদ্বয়ের ৭০-৮০ শতাংশ জনগোষ্ঠী মনে করে নারী শিক্ষায় বিনিয়োগ অত্যাবশ্যক এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। গ্রাম পর্যায়ে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও সময়োপযোগী নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ অত্যাবশ্যক বলেও সবাই মনে করেন।

www.pathagar.com

সারণী ১০.১৪ ঃ বিপিনগঞ্জ ও কেশবপুরের শিক্ষার স্তর

উপজেলা		শ্রেণী-১	শ্রেণী-২	শ্রেণী-৩	শ্রেণী-৪	শ্রেণী-৫	শ্রেণী-৬	শ্রেণী-৭	শ্রেণী-৮	শ্রেণী-৯	শ্রেণী-১০	এসএসসি / দাখিল	এইচএসসি / আলিম	বিএ/ ফাজিল	এমএ/ কামিল	প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই	১-৭ বছরের নিচে	শ্রেণী-১
দূর্গাপুর	কাউন্ট	৩২	১৪	১০	২১	৬৯	১৩	১১	১০	১৫	২০	৯	৩	২	১	১৯১	৫৮	৪৭৯
	রো%	৬.৬৮	২.৯২	২.০৯	৪.৩৮	১৪.৪১	২.৭১	২.৩০	২.০৯	৩.১৩	৪.১৮	১.৮৮	০.৬৩	০.৪২	০.২১	৩৯.৮৭	১২.১১	১০০
	কলাম %	৫৪.২৪	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৫.৫৯	৪৩.১৩	৩৯.৩৯	৪২.৩১	২৬.৩২	৩৯.৪৭	৫৮.৮২	৪২.৮৬	১৫.৭৯	১৪.২৯	২৫	৫০.৮০	৫০.৪৩	৪৪.৮৫
কলমাকান্দা	রো%	২৭	২৮	২০	৩৮	৯১	২০	১৫	২৮	২৩	১৪	১২	১৬	১২	৩	১৮৫	৫৭	৫৮৯
	কলাম %	৪.৫৮	৪.৭৫	৩.৪০	৬.৪৫	১৫.৪৫	৩.৪০	২.৫৫	৪.৭৫	৩.৯০	২.৩৮	২.০৪	২.৭২	২.০৪	০.৫১	৩১.৪১	৯.৬৮	১০০
	রো%	৪৫.৭৬	৬৬.৬৭	৬৬.৬৭	৬৪.৪১	৫৬.৮৮	৬০.৬১	৫৭.৬৯	৭৩.৬৮	৬০.৫৩	৪১.১৮	৫৭.১৪	৮৪.২১	৮৫.৭১	৭৫	৪৯.২০	৪৯.৫৭	৫৫.১৫
মোট	কলাম %	৫৯	৪২	৩০	৫৯	১৬০	৩৩	২৬	৩৮	৩৮	৩৪	২১	১৯	১৪	৪	৩৭৬	১১৫	১০৬৮
	রো%	৫.৫২	৩.৯৩	২.৮১	৫.৫২	১৪.৯৮	৩.০৯	২.৪৩	৩.৫৬	৩.৫৬	৩.১৮	১.৯৭	১.৭৮	১.৩১	০.৩৭	৩৫.২১	১০.৭৭	১০০
	কলাম %	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ নিজস্ব জরিপ -Environment Poverty Interface Towards Achiving MDGs, 2006

লক্ষ্য-৪ শিশু স্বাস্থ্য

এমডিজি লক্ষ্য সমূহের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা একটি অতি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। এ লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে পাঁচ বৎসরের কম বয়সীদের মৃত্যুর হার দুই তৃতীয়াংশে হ্রাস করা। অনূর্ধ্ব পাচঁ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যুর হার হ্রাস করা এবং এক বছর বয়সী শিশুদের হামের টিকা দেয়ার অনুপাত বৃদ্ধি করা। জরিপকালে দেখা যায় যে, শিশু মৃত্যুর হার বিপিনগঞ্জে ১৪ শতাংশ এবং কেশবপুরে ২৬.৪ শতাংশ যা জাতীয় অবস্থার তুলনায় অত্যন্ত বেশী। বেশীর ভাগ শিশু এ এলাকায় যে সব রোগে মারা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু জ্বর ও নিউমোনিয়া। এ সব তথ্য থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে এ সব এলাকায় স্বাস্থ্য সেবা অত্যন্ত অপ্রতুল। যার জন্য প্রয়োজন রয়েছে উন্নত শিশু খাদ্য ব্যবস্থা, সময়মত পুষ্টি সরবরাহ ও সংক্রামক (infectious) রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী গ্রহণ করা।

মাতৃ মৃত্যুর হার

জরিপাধীন গ্রাম দুইটিতে মাতৃ মৃত্যু হারও অত্যন্ত বেশী। জাতিসংঘ মিলিয়ন উন্নয়ন লক্ষ্য বিশ্ব প্রতিবেদন অনুসারে প্রতি বছর প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক নারী গর্ভকালীন অবস্থায় ও সন্তান প্রসব কালীন সময়ে মারা যায়। এর বিশ গুণ নারী গুরুতর জখম বা পঙ্গুত্বের শিকার হয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশেও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় অগ্রগতি হলেও জরিপাধীন গ্রাম দুটিতে এর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী।

পুষ্টিহীনতায় ভোগে আর প্রসব কালীন মাতৃ মৃত্যুও অত্যন্ত ব্যাপক। নবজাতকদের বিভিন্ন জটিল রোগের অবস্থা বিপিনগঞ্জে ১২ শতাংশ কেশবপুরে ৩৯ শতাংশ। বেশীর ভাগ শিশু মারাত্মক শ্বাস কষ্টে ভোগে (বিপিনগঞ্জে ৩১ শতাংশ এবং কেশবপুরে ৪৫ শতাংশ)। ডায়রিয়া এবং ডিহাইড্রেসনে বিপিনগঞ্জে ২৩ শতাংশ, কেশবপুরে ২৬.৩ শতাংশ শিশু ভোগে। তাছাড়া বিপিনগঞ্জে ম্যালেরিয়া রোগে প্রায় ৩১ শতাংশ শিশু ভোগে।

সারণী ১০.১৫ : সর্বশেষে যে সমস্ত রোগে ভূগেছে

উপজেলা	সর্বশেষ যে সমস্ত রোগে ভোগেছে								
	মারাত্মক শ্বাসকষ্ট	ডায়রিয়া এবং ডিহাইড্রেশন	মেনেন্জাইটিস	ম্যালেরিয়া	মিসল	পুষ্টিহীনতা	এনমিয়া	ভূতের প্রভাব /আছর	অন্যান্য
দূর্গাপুর	৪	৩	১	৪		৩			১
	৩০.৮%	২৩.১%	৭.৭%	৩০.৮%		২৩.১%			৭.৭%
কলমাকান্দা	১৭	১০	১		১	৬	১১	২	৮
	৪৪.৭%	২৬.৩%	২.৬%		২.৬%	১৫.৮%	২৮.৯%	৫.৩%	২১.১%
মোট	২১	১৩	২	৪	১	৯	১১	২	৯

উৎস : নিজস্ব জরিপ -Environment Poverty Interface Towards Achiving MDGs, 2006

নিঃসন্দেহে সরকারি চলমান কর্মসূচীর ফলে সঞ্চারিত (Communicable)রোগ এবং গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃ সেবার ফলে দরিদ্র শিশু ও মা উপকৃত হচ্ছে। তবে তা একেবারেই অপর্যাপ্ত। চিকিৎসার জন্য বেশীর ভাগ ব্যয় সমভাবে গ্রামে এবং শহরের মধ্যে বরাদ্দ হয়নি বলে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী এ সেবা থেকে বঞ্চিত থাকে। ফলে বিপিনগঞ্জের ৬৯ শতাংশ এবং কেশবপুরের ৩৭ শতাংশ রোগী স্বাস্থ্যসেবার জন্য গ্রামীণ ডাক্তারদের কাছে যেতে হয় (সারণী ১০.১৬) এসব গ্রামীণ ডাক্তারের যাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণেরও অভাব রয়েছে।

সারণী ১০.১৬ : যার কাছ থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেছে

উপজেলা	যার কাছ থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেছে				
	কোন চিকিৎসা করেনি	গ্রাম্য ডাক্তার	কবিরাজ	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডাক্তার	হোমিওপ্যাথ
দূর্গাপুর	১	৯	৪	২	
	৭.৭%	৬৯.২%	৩০.৮%	১৫.৪%	২
কলমাকান্দা	২	১৪	৬	১৫	৫.৩%
	৫.৩%	৩৬.৮%	১৫.৮%	৩৯.৫%	২
মোট	৩	২৩	১০	১৭	

উৎস : নিজস্ব জরিপ -Environment Poverty Interface Towards Achiving MDGs, 2006

www.pathagar.com

লক্ষ্য-৫ : মাতৃ স্বাস্থ্য

এমডিজি ৫ এর অবস্থা পর্যালোচনার জন্য জরিপাধীন দুইটি গ্রামের অবস্থা পরিদর্শনে দেখা যায় যে, গত পাঁচ বৎসরে বিপিনগঞ্জে ২.১ শতাংশ মাতৃ মৃত্য ঘটে প্রায় প্রসবকালীন সময়। কিন্তু কেশবপুরে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি বলে জানা যায়। তাতে দেখা যায় মাতৃ মৃত্যুর অবস্থা বেশ খানিকটা উন্নতি ঘটেছে বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জেও। তবে জরিপকালীন সময় শিশুর জন্ম তার নিজ গৃহে না হাসপাতালে তা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিপিনগঞ্জ শত ভাগ শিশু এবং কেশবপুরে ৯৮ শতাংশ শিশু নিজ গৃহে জন্মায় অর্থাৎ হাসপাতালে যাবার সুযোগ নেই। ফলে বিভিন্ন প্রসূতিদের স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন জটিলতা দেখা যাচ্ছে যেমন ৫.৩ শতাংশ বিপিনগঞ্জে এবং ২৯.২ শতাংশ কেশবপুরে।

গর্ভবতীদের স্বাস্থ্য সেবা

গর্ভবতী অবস্থায় স্বাস্থ্য সমস্যার ব্যাপক অভিযোগের তথ্য পাওয়া যায়নি। মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যার অভিযোগের মধ্যে রয়েছে ১৭ শতাংশ বিপিনগঞ্জ এবং ৩৩ শতাংশ কেশবপুরে। এর তাৎপর্য এমনও হতে পারে গ্রামের মানুষ সাধারণ সমস্যাটির বিষয়ে কখনো অভিযোগ করেনা অথবা আমলে আনেনা। তাছাড়া রয়েছে পুষ্টিহীনতা, আয়রণ ডিফিসিয়েন্সি, সামাজিক সচেতনতার অভাব, অজ্ঞতা, দুর্বল সুশাসন, স্বাস্থ্য সেবার অভাব অত্যন্ত প্রকটই বলা যেতে পারে। সর্বোপরি দারিদ্র্যই সকল সমস্যার মূল কারণ, ফলে গর্ভবতীদের ওজন কমে যায়, রক্তশূণ্যতাসহ বহুবিধ সমস্যা তাদের লেগেই থাকে।

সারণী ১০.১৭ : গর্ভবতী মাকে পরীক্ষা করে

উপজেলা	গর্ভবতী মাকে পরীক্ষা করে					
	বয়োজ্যেষ্ঠরা	গ্রাম্য দাই	সেবিকা (নার্স)	গ্রাম্য ডাক্তার	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডাক্তার	অন্যান্য
দূর্গাপুর	০	১	৫	১৫	৮	৭
	০.০০%	২.৭৮%	১৩.৮৯%	৪১.৬৭%	২২.২২%	১৯.৪৪%
কলমাকান্দা	৪	১৪	১০	১৯	১৮	১
	৬.০৬%	২১.২১%	১৫.১৫%	২৮.৭৯%	২৭.২৭%	১.৫২%
মোট	৪	১৫	১৫	৩৪	২৬	৮

উৎস : নিজস্ব জরিপ -Environment Poverty Interface Towards Achiving MDGs, 2006

স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা

জরিপকৃত গ্রামদ্বয়ে স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ একেবারেই অবহেলিত। প্রথমত গ্রাম গুলোর সাথে উপজেলা গ্রোথ সেন্টারগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নয় দ্বিতীয়তঃ গ্রামদ্বয়ের ভৌগোলিক অবস্থান ও সুবিধাজনক স্থানে নয়। বিপিনগঞ্জ পাহাড়ের পাদদেশে অন্যটি অত্যন্ত নিচু এলাকায় হাওরের ধারে। বিপিনগঞ্জে নিকটতম স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তিন মাইল দুরে অবস্থিত।

www.pathagar.com

কেশবপুরের ক্ষেত্রে এ দুরুত্ব প্রায় ৩.৭৫ মাইল। বিপিনগঞ্জের উত্তর দাতাদের ১৯ শতাংশ এবং কেশবপুরের উত্তর দাতাদের ৮৬ শতাংশ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যায় না। কারণ সেখানে ডাক্তার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অভাব রয়েছে। (সারণী ১০.১৮)।

সারণী ১০.১৮ : ক্লিনিক / হাসপাতালে না পাঠানোর কারণ

উপজেলা	কেন ক্লিনিক/হাসপাতালে যায় না			
	ডাক্তার পাওয়া যায় না	অত্যধিক চিকিৎসা খরচ	যাতায়াত ব্যবস্থার সমস্যা	অন্যান্য ১২
দূর্গাপুর	৩		১	৭৫.০%
	১৮.৮%		৬.৩%	
কলমাকান্দা	১৮	২	৫	
	৮৫.৭%	৯.৫%	২৩.৮%	১২
মোট	২১	২	৬	

উৎস ঃ নিজস্ব জরিপ -Environment Poverty Interface Towards Achiving MDGs, 2006

টিকাদান (Vaccination)

বাংলাদেশে টিকা দান কর্মসূচী অত্যন্ত সফল হয়েছে এ কথা বলা চলে নিঃসন্দেহে। জরিপাধীন গ্রামদ্বয় জরিপকালে দেখা যায় যে, ৭৩ শতাংশ গ্রামবাসী তাদের শিশুদের নিয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাচ্ছে। উল্লেখ্য অত্র এলাকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এ কর্মসূচীর সুফল সম্বন্ধে অবহিত রয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতাধীন রয়েছে বিসিজি, পোলিও, হেপাটাইটিস, হোপিং কফ, ডিপিটি এবং অন্যান্যা (চিত্র ঃ ১০.১০)।

চিত্র ১০.১০ : বিভিন্ন টীকার লভ্যতা

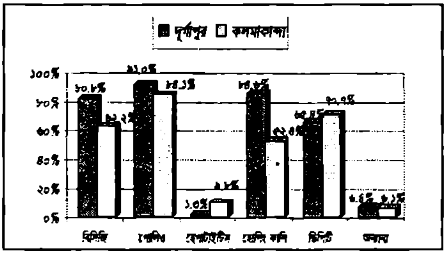

জরিপের ফলাফলে এও দেখা যায় যে, কখন তাদের শিশুদের হাসপাতালে টিকা দানের জন্য নিতে হয় গ্রামের মানুষ তা ও জানে। ফলে কর্মসূচীটি সফল হতে সহায়ক হয়েছে। এ ভাবে প্রতিটি আন্দোলন ও কর্মসূচীকে সফল করতে হলে গণসচেতনতা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। জরিপে দেখা যায় যে, সম্পূর্ন টিকাদান কর্মসূচীর আওতায় পাঁচ বৎসরের নিচে শিশুর সংখ্যা বিপিনগঞ্জে ৬২ জনের মধ্যে ৪৬ জন এবং কেশবপুরে ৭৮ জনের মধ্যে ৬০ জন (চিত্র ১০.১১)।

www.pathagar.com

চিত্র ১০.১১ : শিশুদের বিভিন্ন টীকা প্রদান

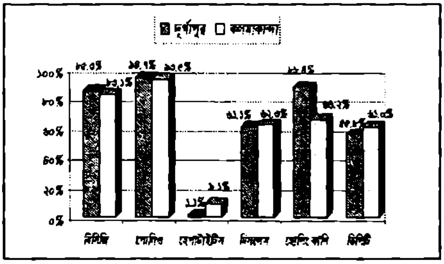

চিত্রের সাহায্যে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৮০ থেকে ১০০ স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মীরা সহায়তা দান করে থাকে। জাতীয় ও স্থানীয় গণমাধ্যমে তারা এসব বিষয় অবহিত হয়েছে এবং মাতাপিতারা এভাবেই সচেতন হয়ে উঠেছেন।

লক্ষ্য-৬ : এইচ আইভি/এইডস ও অন্যান্যা রোগ বালাই

ম্যালেরিয়া

নেত্রকোণা জেলার ভাটি এলাকায় বহু পূর্বে থেকেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল। কোন কোন এলাকায় বিশেষ মৌসুমে হয় আবার কোন কোন এলাকায় প্রায় সারা বৎসর এ রোগ থাকে। জরিপকালে দেখা যায় যে, গত বৎসরে বিপিনগঞ্জে ৬১ শতাংশ এবং কেশবপুরে প্রায় ৩৫ শতাংশ লোক জানায় তাদের এলাকায় ম্যালেরিয়া রোগ রয়েছে। কারণ বিপিনগঞ্জে ১০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩৯ জন এবং কেশবপুরে ৯৮ জনের মধ্যে ১৮ জন ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে এর প্রাদুর্ভাব বেশী বলে তারা উল্লেখ করেন।

জরিপকালে আরো দেখা যায় যে, তারা স্থানীয় ভাবেই চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকে। তাদের হাসপাতালের বড় ধরণের কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। ম্যালেরিয়ার এতো প্রাদুর্ভাবে থাকা সত্ত্বেও এসব এলাকায় ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার কোন প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেই। জরিপ এলাকার গ্রামদ্বয়ে, প্রায় ৯৮ শতাংশ লোক জানায় মশা নিধনের কোন কর্মসূচী অত্র এলাকায় নেয়া হয়নি। এমডিজি-৬ এর টারগেট-৪ অর্জনের জন্য জরুরী সরকারী উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন, সেখানে সামাজিক সচেতনতার জন্য এনজিও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এসব কর্মসূচী সফল করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কর্মসূচীর সুপারিশ করা যেতে পারে তাহলো ;

ক) স্থানীয় ভাবে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন।
খ) সকল পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা পাঠ্যসূচীতে বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।
গ) সহজ ও সস্তা চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ।
ঘ) গ্রামীণ সমাজে সর্বস্তরে মশা নিধন ও মশারি ব্যবহারের সচেতনতা ও অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

www.pathagar.com

যক্ষ্মা রোগ

যক্ষ্মা একটি সংক্রামক রোগ যা বাংলাদেশের জন্য একটি মারাত্মক সমস্যা। জরিপাধীন গ্রামদ্বয়ের ১৮ শতাংশ লোক বিপিনগঞ্জের এবং কেশবপুরের মাত্র ৩ শতাংশ জনগোষ্ঠী গত এক বৎসরে যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ পাওয়া যায় বলে জানা যায়। তবে প্রতিবেশী গ্রাম গুলোতে অনুরূপ সমস্যা প্রাদুর্ভাব আছে বলে কিছু কিছু উত্তরদাতা জানায়। উত্তরদাতাদের বেশী ভাগ জনগোষ্ঠীর জানা নেই এজন্য কি ধরণের প্রতিকার মূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে। এ এলাকায় যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার সুবিধাও অত্যন্ত সীমিত। এ রোগে আক্রান্ত বেশীর ভাগ রোগীর চিকিৎসাই হাসপাতালে করা হয়। তবে স্থানীয়ভাবে ও কিছু কিছু চিকিৎসা এখানে হয়। (চিত্র ১০.১২) জরিপকৃত গ্রামের যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসা সুবিধা চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল।

চিত্র ১০.১২ : যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসার সুবিধা

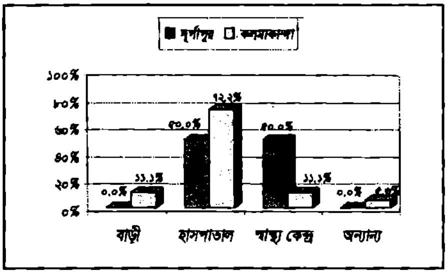

লক্ষ্য-৭ : পরিবেশ সংরক্ষণ

বাঁশের ব্যবহার ও উৎপাদন - পাহাড়ী ও সীমান্ত এলাকা হিসেবে এ অঞ্চলের বাঁশের উৎপাদন ও ব্যবহার ব্যাপক। তবে কেশবপুর নিচু এলাকা বলে এখানে উৎপাদন কম।

নার্সারী - জরিপাধীন দুটি গ্রামে নার্সারীর অবস্থা ভালো। উচু এলাকা বলে বিপিনগঞ্জ গ্রামের লোকজন নার্সারী তৈরীতে কেশবপুরের লোকজনের চেয়ে বেশী আগ্রহী। তার অর্থ দাঁড়ায় মানুষের মধ্যে বৃক্ষরোপনে স্বতস্ফূর্ততা রয়েছে। তবে অভাব রয়েছে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করার ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের। তাছাড়া উপর্যুক্ত আর্থিক ও কারিগরি জ্ঞানের সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারলে এ বিষয়ে তারা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারতো খুব সহজেই।

www.pathagar.com

জ্বালানী কাঠ - জরিপে দেখা যায় যে, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বিপিনগঞ্জ এলাকায় বৃক্ষ রোপনের জন্য কেশবপুরের চেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে। এ গ্রামের ৩৩ শতাংশ জনগোষ্ঠী জালানীর বৃক্ষ রোপন করে থাকে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো পাহাড় এলাকার লোকজন এ কাজে বেশী উৎসাহী। ইদানিং কালে সমতল ভূমির জনগোষ্ঠী পাহাড়ী এলাকায় বসবাস স্থাপন করাতে দুটি বিষয়ে জরিপ কালে লক্ষ্য করা গেছে। তা'হল আদিবাসিরা পাহাড় কাটে না এবং পাহাড়ের ধারে ধারে তারা বৃক্ষ রোপন করে। পক্ষান্তরে সমতল ভূমি থেকে আসা অধিবাসীদের প্রধান দুটি কাজের মধ্যে রয়েছে পাহাড় কাটা ও বাড়িতে আলো বাতাস প্রবেশ করানোর জন্য বৃক্ষ নিধন। এক্ষেত্রে পাহাড়ের লোকজনকে সামাজিক বনায়নের কাজে সম্পৃক্ত করে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করে অত্র এলাকায় সামাজিক বনায়ন সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

মৎস্য চাষ :- মৎস্য চাষ বিষয়ে জরিপকালে দুইটি গ্রামের ভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বিপিনগঞ্জে লোকজনের পাহাড়ী এলাকায় বাস নিজেদের খাবারের প্রয়োজনে খালে বিলে মাছ আহরণ করে থাকে। পক্ষান্তরে কেশবপুর নিচু এলাকায় বিধায় মাছ আহরণ করে থাকে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করার জন্য। দুর্গাপুর উপজেলায় বিপিনগঞ্জ গ্রামে প্রায় ৯১ শতাংশ জনগোষ্ঠী জানায় মৎস্য সম্পদ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। কেশবপুর গ্রামের মানুষকে মূলতঃ মৎস্য সম্পদের উপরই নির্ভর করতে হয়। তাদের ৯৮ শতাংশ মানুষের ধারণা মৎস্য সম্পদ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। তার পরিনাম হচ্ছে মৎস্য সম্পদ দ্রুত বিলুপ্তির ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠী সহজলভ্য ও সস্তা প্রোটিন থেকে তারা মারাত্মক ভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে স্বাস্থ্যগত দারিদ্র বাড়ছে দ্রুত হারে।

বন্য পশু ও উদ্ভিদ

এক সময় সীমান্তবর্তী পাহাড়ী উপজেলা দুর্গাপুর ও কলমাকান্দার উপজাতিরা বেশীর ভাগই স্থানীয় উদ্ভিদ ও স্থানীয় বন্য পশু পাখী শিকার করে জীবন ধারণ করতো। দুর্গাপুর কলমাকান্দা বাজার, নাজিরপুর ও শিবগঞ্জ বাজারগুলোতে বন্য প্রাণী যেমন ভাল্লুক, কোড়া বিভিন্ন প্রজাতির কচ্ছপ ইত্যাদি বিক্রি হতো। বর্তমানে এসব একেবারেই নেই। তার দুটি কারণ রয়েছে : প্রথম এবং প্রধান কারণ অত্র এলাকায় একদশক পূর্বেও যে, বন্য প্রাণীর আবাসস্থান ছিল তা আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ফলে বন্য প্রাণী ও বন্য উদ্ভিদের অস্তিত্ব একেবারেই বিরল। দ্বিতীয় কারণ শিক্ষা ও সচেতনতার ফলে সাধারণ মানুষ বর্তমানে বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদ শিকার করছে না। তাই যে কোন কারণেই হোক স্থানীয় জনগোষ্ঠী পরিবেশের ক্ষতির তেমন কোন কারণ ঘটাচ্ছে না। জরিপে দেখা যায় যে, দুর্গাপুরের বিপিনগঞ্জ গ্রামের ৯০ শতাংশ মানুষ আজ কাল আর বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদ আহরণ করছে না। কেশবপুরের ৭০-৮০ শতাংশ লোক বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদ আহরণ করে না।

www.pathagar.com

জরিপকালীন সময় লক্ষ্যণীয় মজার ব্যপার হল, দুর্গাপুরের পাহাড় এলাকার কাঠ, পাথর ও চুনা মাটি দিয়ে এলাকার বাইরের লোকজন নির্বিঘ্নে ব্যবসা বাণিজ্য করছে অথচ স্থানীয় লোকজন খুব সামান্যই এসব ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে। তাই এখন প্রয়োজন এ স্থানীয় সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে এসবের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

সুমেশ্বরীর পাথর ও কয়লা

সুমেশ্বরী নদীর কয়লা ও পাথরের প্রাচুর্যের কথা দেশের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর কাছে পরিচিত। হিমালয় থেকে আগত বালু, মাটি, পাথর ও কয়লা এ এলাকায় জনগোষ্ঠীর অফুরন্ত জীবিকার্জন ও বহু কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। প্রতি বৎসর পাহাড়ি বন্যায় সুমেশ্বরীর তলদেশকে পাথরে সমৃদ্ধ করে দেয় এবং সারা বৎসর স্থানীয় জনগোষ্ঠি এ সব পাথর আহরণ করে অতি সহজেই তাদের জীবিকা অর্জন করতে পারে। কিন্তু নদী ভরাট, স্থানীয় পেশাদার রাজনৈতিক চক্র ও রাঘববোয়ালদের কারণে এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, স্থানীয় দারিদ্র জনগোষ্ঠী। তাই দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এসব প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা একান্ত অপরিহার্য।

দুর্গাপুরের অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ সাদা মাটি, যা বিভিন্ন কোম্পানী গুলো নির্বিচারে আহরণ করে যাচ্ছে। অপরিকল্পিত পাহাড় কাটার ফলে অত্র এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে মারাত্মকভাবে। জরিপকালে দেখা যায় যে, বিপিনগঞ্জের ৭২ শতাংশ উত্তরদাতা জানায় যে এ পাহাড়ী এলাকায় চুনা মাটি / পাথর তারা ব্যবহার করে না। এলাকাটি পরিদর্শন কালে জরিপকৃত ফলাফল থেকে জানা যায় যে, বহিরাগত স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় এ সম্পদ নির্বিচারে আহরণ করে যাচ্ছে। তাই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাদের সম্পৃক্ত করে এ সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের প্রয়োজন। বিশেষতঃ দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, উপযুক্ত মজুরি, ঝুঁকিপূর্ন কাজের জন্য তাদের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রাখা অত্যাবশ্যক। এ বিশাল সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অত্র এলাকায় সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানা গড়ে তোলা যেতে পারে। সাথে গড়ে উঠতে পারে রাস্তাঘাট অন্যান্য শিল্প কারখানা, পাহাড়ী এলাকায় পর্যটনের সুবিধা ও সে সমস্ত এলাকায় পাহাড় কেটে চুনা মাটি/সাদা মাটি আহরণ করা হচ্ছে। সেগুলো পূণর্ভবন করে পরিকল্পিত ভাবে বনায়নসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যবহার না হয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। যার আশু পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন উদ্যোগ অত্যন্ত অপরিহার্য।

অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থান দেশের জনগোষ্ঠীর শাসনতান্ত্রিক অধিকার। সার্বিক ভাবে এদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মূলতঃ দুইটি সমস্যা রয়েছে। প্রধানত বসত ভিটার অভাব। দ্বিতীয়ত;

www.pathagar.com

যদিও অনেকেরই বসত ভিটা রয়েছে, তবে তাদের গৃহ নির্মাণ সামগ্রী উপকরণ নেই। প্রথমত বা অভ্যাসগত ভাবে তারা স্থানীয় উৎস থেকে এসব উপকরণ আহরণ করে থাকে। যেমন স্থানীয় বনাঞ্চল/পাহাড়ি এলাকা থেকে বাঁশ সংগ্রহ করে থাকে। বর্তমানে এ উৎসগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। টেক্সই উন্নয়ন ও গৃহ নির্মান সামগ্রী ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও গৃহ নির্মাণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অশিক্ষা ও সামর্থ্যের বিষয় প্রশ্ন করা হলে প্রায় ১৯ শতাংশ উত্তর দাতা জানায় তারা পাহাড়ি কাঠ ব্যবহার করে থাকে। জরিপকালে লক্ষ্য করা যায় যে, পাহাড়ী কাঠের সরবরাহ মারাত্মকভাবে কমে গিয়েছে। প্রধান কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেন পাহাড়ী বন উজার হয়ে গিয়েছে। তারা একথাও উল্লেখ করেন যে, এক দশক আগেও পাহাড়ী কাঠের সরবরাহ ছিল পর্যাপ্ত।

কুপের পানি সরবরাহ

কুপের পানির সরবরাহ জনস্বাস্থ্য ও জীবিকার্জনের অপরিহার্য উপাদান। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিশুদ্ধ পানি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত অপরিহার্য। কারণ প্যাথোজিন সংক্রমিত পানি পান করার ফলে অতি তাড়াতাড়ি ও সহজে মানুষ বিভিন্ন পানি বাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে যেমন আমাশয়, কলেরা, হেপাটাইটিস ইত্যাদি (সারণী ১০.১৯)।

সারণী ঃ ১০:১৯ ঃ পানিবাহিত রোগবালাই (পানীয় জল দ্বারা)

উপজেলা	পানিবাহিত রোগ বালাই				
	ডায়রিয়া	আমাশয়	কলেরা	হেপাটাইটিস	অন্যান্য
দূর্গাপুর	৯০	৬৯	৪৬		৯
	৯০.০%	৬৯.০%	৪৬.০%		৯.০%
কলমাকান্দা	৮৫	৫৪	৫১	৩	৫
	৮৭.৬%	৫৫.৭%	৫২.৬%	৩.১%	৫.২%
মোট	১৭৫	১২৩	৯৭	৩	১৪

পানিবাহিত রোগ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের সচেতনতার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে দেখা যায় যে, ৯৫ শতাংশ মানুষ পানি দূষণের ফলে বহুবিধ রোগ আক্রান্ত হতে পারে এ বিষয়ে তারা সম্যকভাবে অবহিত রয়েছে। তাই জরিপকালে দেখা যায় যে, বিপিনগঞ্জের ৭৪ শতাংশ উত্তরদাতা প্রতিবেশীর টিউবওয়েল থেকে খাবার পানি সরবরাহ করে থাকে। কেশবপুরে এ বিষয়ে উত্তরদাতা রয়েছে প্রায় ৭০ শতাংশ লোক। কেশবপুরে টিউবয়েল রয়েছে ১৪.৩ শতাংশ লোকের, বিপিনগঞ্জে ১ শতাংশ লোক পুকুরের পানি ব্যবহার করে, এবং কেশবপুরে ১৬ শতাংশ লোক নদীর পানি ব্যবহার করে থাকে (চিত্র ১০.১৩)।

www.pathagar.com

চিত্র ১০.১৩ : খাবার পানির উৎস

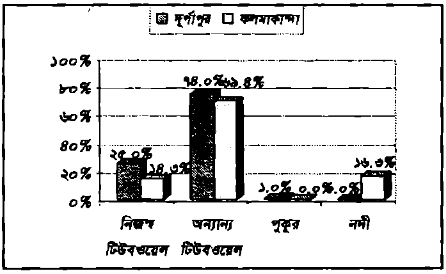

জরিপকালে দেখা যায় যে, প্রায় ৭৫ শতাংশ বাড়িতে তাদের নিজস্ব টিউবওয়েল নেই। তবে অন্যের টিউবওয়েলের পানি পেতে তাদের তেমন অসুবিধা হয় না। প্রায় ৮০ শতাংশ উত্তর দাতারা জানায় টিউবওয়েল স্থাপন করা ব্যয়বহুল বিধায় তারা তা স্থাপন করতে পারেনা। যাদের টিউবওয়েল তাদের অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি চিত্র ১০.১৪ দেখানো হল।

চিত্র ১০.১৪ : টিউবওয়েল ক্রয়ের অর্থায়ন

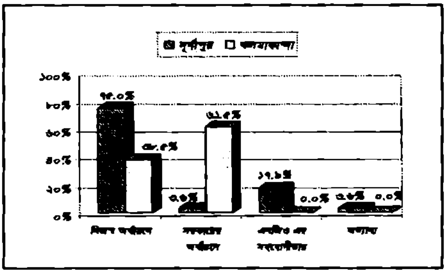

সারণী ঃ ১০:২০ ঃ টিউবওয়েল না থাকার কারণ

উপজেলা	টিউবওয়েল না থাকার কারণ			
	ব্যয় বহুল	প্রতিবেশীর আছে	প্রয়োজন মনে হয় না	অন্যান্য
দূর্গাপুর	৫২	৪	১	১৫
	৭২.২%	৫.৬%	১.৪%	২০.৮%
কলমাকান্দা	৭৪	৭	১	৬
	৮৭.১%	৮.২%	১.২%	৭.১%
মোট	১২৬	১১	২	২১

উৎস ঃ নিজস্ব জরিপ -Environment Poverty Interface Towards Achiving MDGs, 2006

www.pathagar.com

জরিপকালে কেশবপুর গ্রামে আর্সেনিক সমস্যাটির বিষয়ে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে বিপিনগঞ্জ এলাকায় এ সমস্যা রয়েছে বলে জরীপকালে সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করা গেছে। ওয়ার্ল্ড ভিশনের উদ্যোগে একটি উপজাতীয় বাড়িতে বৃষ্টির পানি আহরণের চমৎকার সুবন্দোবস্ত দেখা যায়। তাতে আনুমানিক খরচ হয়েছে প্রায় লাখ টাকা, সুযোগ পায় প্রায় আট দশটি প্রতিবেশী পরিবার যা অতি সহজেই অন্যন্যা আর্সেনিক যুক্ত এলাকায় অনুসরণ করা যেতে পারে।

পয়ঃ নিষ্কাশন

স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হল স্বাস্থ্য সম্মত পয়:নিষ্কাশন। এর সাথে দারিদ্র্য এবং শিশু মৃত্যুর হারের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। জরীপকালে দেখা যায় যে, বিপিনগঞ্জ গ্রামে ৬ শতাংশ এবং কেশবপুর গ্রামের ৩৯ শতাংশ উত্তরদাতার কাচা পায়খানা ব্যবহার করে। প্রায় ৭-১৩ শতাংশ উত্তরদাতা জানায় তাদের কোন পায়খানা নেই। তবে বিপিনগঞ্জে ৭৮ শতাংশ উত্তরদাতা এবং কেশবপুর গ্রামে ৪১ শতাংশ উত্তরদাতা রিং স্লাপ ব্যবহার করে। চিত্র ১০.১৫ জরিপাধীন গ্রামদ্বয়ে ল্যাট্রিন ব্যবহারের অবস্থা দেখানো হল।

চিত্র ১০.১৫ : পায়খানার শ্রেণী

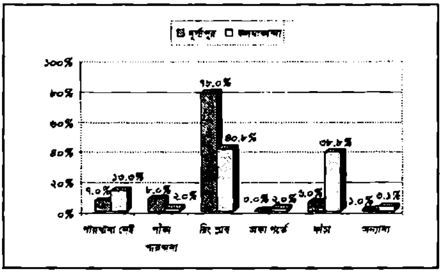

সারণী ঃ ১০:২১ ঃ স্যানিটারী পায়খানা ব্যবহার না করার কারণ

উপজেলা	স্যানিটারী পায়খানা ব্যবহার না করার কারণ		
	ব্যয় বহন করতে পারে না	ব্যবহার জানে না	অন্যান্য
দূর্গাপুর	১৪		
	১০০.০%		
কলমাকান্দা	৫২	৩	৩
	৯২.৯%	৫.৪%	৫.৪%
মোট	৬৬	৩	৩

উৎস ঃ নিজস্ব জরিপ -Environment Poverty Interface Towards Achiving MDGs, 2006

www.pathagar.com

সারণী ১০.২১ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রায় ৯৩ শতাংশ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সম্মত পয়:নিষ্কাশন ব্যবহার বিষয়ে সচেতন রয়েছে, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকজনেরই সামর্থ্যের অভাব।

পানি বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব অতি সহজেই পরিস্কার করা যায় যদি পায়খানার পর সাবান দিয়ে হাত পরিস্কার রাখা হয়। এর ফলে আমাশয় ও ডায়রিয়া রোগের পরিমান অনেকাংশে কমানো সম্ভব। জরিপে দেখা যায় যে, দূর্গাপুরের ৪৪ শতাংশ এবং কলমাকান্দার ৩১ শতাংশ লোক পায়খানার পর সাবান ব্যবহার করে থাকে (সারণী ১০.২২)।

সারণী ঃ ১০:২২ ঃ পায়খানা ব্যবহারের পর হাত পরিস্কার করে

উপজেলা					
	সাবান	ছাঁই	শুধু পানি	হাত ধুয় না	অন্যান্য
দূর্গাপুর	৪৪	৫৪	৪		২
	৪৪.৪%	৫৪.৫%	৪.০%		২.০%
কলমাকান্দা	৩০	১৬	১২	৪	৪০
	৩০.৯%	১৬.৫%	১২.৪%	৪.১%	৪১.২%
মোট	৭৪	৭০	১৬	৪	৪২

উৎস ঃ নিজস্ব জরিপ -Environment Poverty Interface Towards Achiving MDGs, 2006

বৃক্ষ রোপন : সারণী ১০.২৪ জরিপাধীন গ্রামদ্বয়ের বৃক্ষরোপন চিত্র দেখানো হল। সর্বত্র যেখানে ব্যাপক বৃক্ষ নিধন সেখানে বৃক্ষ রোপনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। প্রয়োজনের তুলনায় জরিপকৃত গ্রামদ্বয়ের বৃক্ষ রোপনের হার পর্যাপ্ত নয়। বৃক্ষরোপনের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিপিনগঞ্জ ৮২ শতাংশ ফলজ বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কেশবপুরে ৬৭ শতাংশ টিম্বার বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। তবে ঔষধি বৃক্ষের গুরুত্ব ও পরিচিতি বৃদ্ধি পাওয়ার গ্রামাঞ্চলে ঔষধি বৃক্ষরোপণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী ঃ ১০.২৩ : ঔষধি গাছ রোপন

উপজেলা	বিভিন্ন ঔষধি গাছ রোপণ					
	নিম	আমলকি	হরতকি	বহেরা	অর্জুন	অন্যান্য
দূর্গাপুর	১৬	৯	৩	৪	৩	৪
	৭৬.২%	৪২.৯%	১৪.৩%	১৯.০%	১৪.৩%	১৯.০%
কলমাকান্দা	৫				১	১
	৮৩.৩%				১৬.৭%	১৬.৭%
মোট	২১	৯	৩	৪	৪	৫

উৎস ঃ নিজস্ব জরিপ -Environment Poverty Interface Towards Achiving MDGs, 2006

www.pathagar.com

সারণী ঃ ১০:২৪ ঃ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপণ

উপজেলা	উদ্দেশ্য				
	জ্বালানী কাঠ	ফলজ গাছ	টিম্বার (কাঠ)	ঔষধি	অন্যান্য উদ্দেশ্যে
দূর্গাপুর	১১	৩৩	৮	৫	১
	২৭.৫%	৮২.৫%	২০.০%	১২.৫%	২.৫%
কলমাকান্দা	৫	১৭	২১		১
	১৫.৬%	৫৩.১%	৬৫.৬%		৩.১%
মোট	১৬	৫০	২৯	৫	২

উৎস ঃ নিজস্ব জরিপ -Environment Poverty Interface Towards Achiving MDGs, 2006

জ্বালানী কাঠ :

গ্রামের লোকজন জ্বালানী হিসেবে সাধারণত, কাঠ, বাঁশ, গোবর, পাটশুল, গাছের লতা পাতা, খড় ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। দূর্গাপুর কলমাকান্দা পাহাড়ি এলাকা বিধায় বিপিনগঞ্জের ৮৪ শতাংশ জনগোষ্ঠী জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করে এবং কেশবপুরে এর সংখ্যা ৫০ শতাংশ। জ্বালানী কাঠ ব্যবহারের উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি ফলে পাহাড়ি বন মারাত্মক ভাবে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে পাহাড়ী গ্রামবাসীদের জীবন ও সামাজিক ব্যবস্থা ভারসাম্যহীন প্রাকৃতি পরিবেশের মুখোমুখি। জরীপ এলাকায় জ্বালানী চিত্র সারণী ১০.২৫ এ উপস্থাপন করা হল।

সারণী ঃ ১০:২৫ ঃ জ্বালানীর শ্রেণী

উপজেলা	জ্বালানীর শ্রেণী							
	পাট শুলা	খড়	বাঁশ/কাঠ	গোবর	কলা পাতা	বাঁশের পাতা	সুপারী পাতা	অন্যান্য
দূর্গাপুর		১৮	৮৪	২৫	৭	১১	৫	৫
		১৮.০%	৮৪.০%	২৫.০%	৭.০%	১১.০%	৫.০%	৫.০%
কলমাকান্দা	৪	৩২	৪৯	৪৮	১১	৬	৬	৫৭
	৪.১%	৩২.৭%	৫০.০%	৪৯.০%	১১.২%	৬.১%	৬.১%	৫৮.২%
মোট	৪	৫০	১৩৩	৭৩	১৮	১৭	১১	৬২

উৎস ঃ নিজস্ব জরিপ -Environment Poverty Interface Towards Achiving MDGs, 2006

লক্ষ্য- ৮ উন্নয়নে বিশ্বজনীন সহযোগিতা

এ লক্ষ্যে অভিষ্ট-১৮ নতুন প্রযুক্তি বিশেষ করে তথ্য এবং যোগাযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা, প্রতি হাজার জনসংখ্যার জন্য টেলিফোন লাইন, প্রতি হাজার জনসংখ্যার জন্য কম্পিউটারের ব্যবহার। গ্রাম দুটিতে জরিপকালে দেখা যায় যে, দুর্গাপুরের প্রায় ৭০ শতাংশ লোক টেলিভিশন দেখতে পায় না এবং কলমাকান্দার প্রায় ৬৬.৩ শতাংশ জনগোষ্ঠী। তবে যারা টেলিভিশন দেখে তাদের প্রিয় প্রোগ্রাম সিনেমা/নাটক। মানব সভ্যতার বিকাশ এবং টেক্সই

www.pathagar.com

রাখার জন্য শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, পুঞ্জিভূত অভিজ্ঞতা সবকিছুর সমন্বয় ও সম্প্রসারণ একান্ত অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির সর্বত্র ব্যবহার ও সম্প্রসারণের কোন বিকল্প নাই। অথচ এক্ষেত্রে আমাদের সমাজ আজো অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

টেলিযোগাযোগ এর ব্যবহার বর্তমান বিশ্বের সভ্যতার ও উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মানদন্ড। আমাদের গ্রামের বেশীর ভাগ লোকই টেলিফোন ব্যবহার করে না। বর্তমানে মোবাইল ফোনের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে গ্রামের প্রতিটি বাজারে অথবা বড় রাস্তার ধারে ফোনের দোকান গড়ে উঠেছে। এখন পর্যন্ত এগুলো সংবাদ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। সচেতনতা সৃষ্টি হলে এ সব মোবাইল তথ্য প্রবাহের কাজে সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন বাজার মূল্য, ভালো চারা ও বীজ প্রাপ্তিরও সহজলভ্যতার বিষয়। বীজ ও সারের ব্যবহারের বিষয় কৃষি কর্মকর্তা অভিজ্ঞ লোকজনের সাথে পরামর্শের কাজ এবং বাজার মূল্য ইত্যাদি বিষয় যোগাযোগ করা যায়। জরিপকৃত দুই গ্রামে মোবাইল ব্যবহারের অবস্থা চিত্র ১০.১৬ ও ১০.১৭ এ দেখানো হল।

চিত্র ১০.১৬ : ফোন কল করার অধিকার

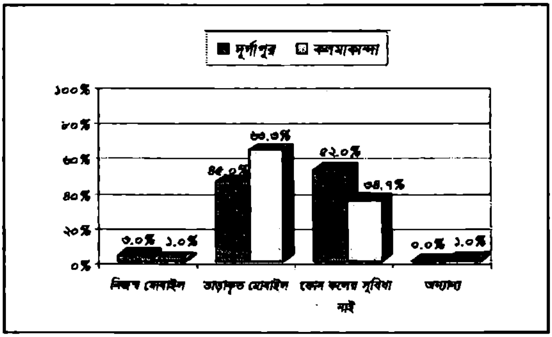

চিত্র ১০.১৭ : মোবাইল ফোনের লভ্যতা

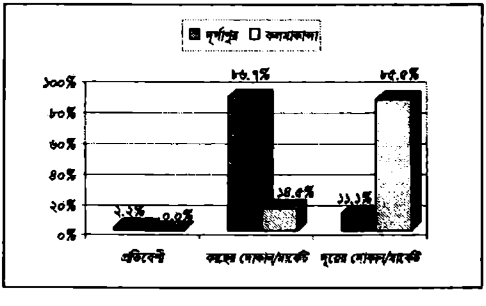

www.pathagar.com

সারণী ঃ ১০:২৬ ঃ টেলিভিশন অনুষ্ঠান ও জনগণের পছন্দ

উপজেলা	কোন অনুষ্ঠান কতভাগ জনগণ পছন্দ করে			
	গান	সিনেমা	কৃষি সম্প্রচার	অন্যান্য
দূর্গাপুর	১২	২১	২	৯
	৩৮.৭%	৬৭.৭%	৬.৫%	২৯.০%
কলমাকান্দা	১৬	২১	৮	১৮
	৪৮.৫%	৬৩.৬%	২৪.২%	৫৪.৫%
মোট	২৮	৪২	১০	২৭

উৎস ঃ নিজস্ব জরিপ -Environment Poverty Interface Towards Achiving MDGs, 2006

সুপারিশ

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন ধরাবাধা বা প্রতিষ্ঠিত কোন নিয়ম নেই। তাই প্রত্যেক জাতি বা দেশকে তার নিজস্ব আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটের আলোকে নিজ নিজ কৌশল উদ্ভাবন করে তা নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গত দুদশকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে যেমন টোটাল ফার্টিলিটি হার (TFR) স্থিতিশীল করা হয়েছে, নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের ব্যাপক সম্প্রসারণ করা হয়েছে, শিশু জন্ম ক্ষেত্রে জীবন প্রত্যাশা বৃদ্ধি পেয়েছে, ইপিআই কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন হয়েছে, সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক ধারার ও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বাস্তব সত্য হল ১৯৯০ পরবর্তী সময় কালের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে অত্যন্ত শ্লথ গতিতে (বছরে মাত্র ১ শতাংশ)। সহস্রাব্দ লক্ষ্যার্জনের জন্য প্রবৃদ্ধির প্রয়োজন ৭ শতাংশের ও বেশী। যা অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। এ বাস্তব অবস্থাকে মোকাবিলা করতে হলে তৃনমূল পর্যায়ে বিভিন্ন বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন হবে। তাহলে শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন (Promoting Strong Economic Growth) করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনান্তে দেখা যায় এমডিজি লক্ষ্যার্জন করতে হলে দেশের অর্থনীতির কিছুটা কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে। তাহলে উন্নত কৃষি ব্যবস্থার পাশাপাশি গ্রামীন অর্থনীতি বহুমূখী করা যেতে পারে; তাহল ব্যাপক ক্ষুদ্র ও মাঝারী এন্টারপ্রাইজের সম্প্রসারণ। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পিআরএসপি বাস্তবায়ন সমন্বিত প্লান গ্রহণ করা প্রয়োজন। এজন্যে প্রয়োজন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে শক্তিশালীকরণ, গণসচেতনতা সৃষ্টি ও ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদান, সরল ও সহজশর্তে ঋণ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এসব কর্মসূচী সফল করতে হলে পরিবিক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

www.pathagar.com

দারিদ্র্য বিমোচন সহায়ক প্রবৃদ্ধি (Pro-Poor Economic Growth) অর্জনের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানমূখী সামাজিক নিরাপত্তা মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, ভিজিডি/ভিজিএফ কর্মসূচী বিশেষ মৌসুম এবং এলাকা ভিত্তিক হতে পারে। এসব কর্মসূচীতে তাদের ঘরে বসে কিছু করতে পারে এমন কিছু কর্মসংস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে দেয়া যেতে পারে যেন তারা সাহায্যমূখী এবং কর্মবিমুখ না হয়ে যায়। সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর আওতায় আরো প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। এ জন্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে আরো সংগঠিত ও কর্মমূখী করার জন্য গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক্ষুধা ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ

এই উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে প্রধানত যে সমস্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে তা হল, দেশে টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে খাদ্যাভাস পরিবর্তন করতে হবে, শিশুদের খাদ্যাভ্যাস উন্নত করতে হবে যেমন বুকের দুধ খাওয়ানোর অভ্যাস, নিরাপদ পানীয় নিশ্চিত করণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করণ। শুধুমাত্র সরকারী উদ্যোগে এ সব লক্ষ্যার্জন অত্যন্ত দুঃসাধ্য ও কষ্টকর। তাই সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ আরো উৎসাহিত এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

সার্বজনীন শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞান

এমডিজি-২ অর্জন করতে হলে, স্থানীয় ব্যবস্থাপনা সম্পদের আহরণ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল ঝড়া ছাত্রের সংখ্যা কমানো এবং কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক। দেশের বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুধুমাত্র সময়োপযোগী শিক্ষা পাঠ্যসূচী মাদ্রাসা ও সকল সর্বস্তরের প্রবর্তন করে, ব্যাপক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন আন্তরিক ইচ্ছা, সচেতনতা, সমন্বয় ও সম্প্রসারণ।

জেন্ডার ক্ষমতায়ন ও নারীক্ষমতায়ন

গত দেড় দশকে বাংলাদেশে জেন্ডার সমতাকরণে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ শ্রমিক কল্যাণ ও গণতন্ত্র চর্চায় অংশগ্রহণ। তথাপি বাংলাদেশকে আরো বহুদূর যেতে হবে ভবিষ্যতে। এ জন্যে একান্ত অপরিহার্য শর্তের মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ। নারী ক্ষমতায়নের বিষয়টি তাদের নিজস্ব গন্ডির মধ্যে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তা যেন কোন অবস্থাতেই অন্যের অধিক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের কারণ না হয়, তাহলে পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে আমাদের সমাজের বহুদিনের পারিবারিক শৃংখলাও শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে আমাদের

www.pathagar.com

পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অনন্য ও অসাধারণ। এমনকি রাজনৈতিক প্রশাসনিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। তাই উপরোক্ত খাতগুলোকে শক্তিশালী ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তাদের সময়োপযোগী উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, মানব সম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে শক্তিশালীকরণ অত্যাবশ্যক। বিদ্যমান নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের যথাযথ ও সমন্বিত ভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারলে নারী সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে নারী সমাজকে অধিক হারে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে পারলে নারী ক্ষমতায়নের তাৎপর্য আরো অনেক হারে বৃদ্ধি পাবে।

সাফল্য বহাল রাখা

গত দুই দশকে বাংলাদেশে ইপিআই সংক্রামক ব্যাধি এবং প্যারাসিটিক রোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এ সাফল্যকে টেক্সই করে রাখতে হলে শিশু ও নারীদের পুষ্টির অভাব কমাতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ এলাকা এবং বয়সের জনগোষ্ঠীকে বিশেষ বিবেচনায় আনতে হবে। তাদের মধ্যে রয়েছে গর্ভবতী বা শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ। বিশেষ এলাকার মধ্যে রয়েছে, শহরের বস্তি, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকা ও উপকূলীয় অঞ্চল নদীভাঙ্গন, বন্যা দুর্গত ও মঙ্গা এলাকা। এ ছাড়াও সর্বোপরি মোট প্রজনন হার, দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মী বৃদ্ধি করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এজন্যে ব্যাপক স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্প্রসারণ ও সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষা

টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে এবং উন্নত জীবন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষা পূর্ব শর্ত। এজন্যে তৃণমূল পর্যায়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণে যে সকল বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে তা হল গৃহ আঙ্গিনায়, রাস্তার ধারে, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের আঙ্গিনায় বনায়ন ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ। তাছাড়া সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও হাইজিন বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে। এ জন্যে স্থানীয় এনজিও ও স্থানীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসন অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। আর্সেনিক সমস্যা থেকে পরিত্রাণের সর্বোত্তম উপায় ও বৃষ্টির পানি ব্যবহার বৃদ্ধি করা। এসব কার্যক্রমকে সফল করতে হলে বিদ্যমান আইন কাঠামোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এজন্যে প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ, তৃণমূল পর্যায়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গ্রামীণ সম্প্রদায় এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এসব বিষয়ে সাফল্যের চাবিকাঠি হতে পারে দক্ষ আইন ও দক্ষ প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানবসম্পদ। সর্বোপরি রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গীকার থাকতে হবে।

www.pathagar.com

সহায়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থপুঞ্জি

বিবিএস, পারিবারিক আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০০

বিবিএস, আদম শুমারী ১৯৯১ ও ২০০১

বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ প্রতিবেদন ১৯৯৯-২০০০

UNDP 2005, Millinium Development Goods, Newyork

UNDP 2003 Human Development Report 2003, Oxford University Press, New York

UNDP 2004 Human Development Report 2004, Oxford University Press, New york

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য জনপ্রতিবেদন, ২০০৫ বাংলাদেশ, পিপলস ফোরাম অন এমডিজিএস (পিএমএফ) বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত।

Billah AHM. Mustain (2006) Environment Poverty Interface towards Achieving MDGs, submitted to Bangladesh Social Research Council, Planning Commission.

লেখকের সরেজমিনে পরিদর্শন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

ড. এ এইচ এম মোস্তাইন বিল্লাহ সরকারী চাকুরীজীবি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএসএস, Tufts University, Boston থেকে এমএস, পরিবেশ অর্থনীতিতে ইউপিএম, মালয়েশিয়া থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিশেষ বিষয়গুলো হচ্ছে, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ আইন ও নীতি এবং পরিবেশ অর্থনীতি। বিশেষত Valuation of natural resources and Green Accounting। তাছাড়া Environmental Impact Assessment (EIA), Energy Economics & Management ও Urban Waste Management বিষয়ে তাঁর বহু গবেষণা কর্ম রয়েছে।

তাঁর লেখা গ্রন্থ Green Accounting: Tropical Experience ও বিভিন্ন বইয়ের অধ্যায় হিসেবে দেশে বিদেশে বহু প্রকাশনা রয়েছে। যেমন Indian Journal of Economics, Indian Journal of Forestry, Indian Journal of Agricultural Economics, Journal of Bangladesh Development Studies (BIDS), BIISS Journal and Solar for Energy Security: A Potential Subsitute for National Energy in Bangladesh, Tata Energy Research Institute (TERI) দিল্লিতে প্রকাশিত হয়েছে।

কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ। তাছাড়া তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, (BPATC) সাভার, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS) এ চাকুরী করেছেন। USAID এর নিসর্গ প্রকল্পের পরামর্শক, মধুমতি মডেল টাউন EIA Study গ্রুপের পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। ট্যাংরাটিলা গ্যাস ফায়ার এর অর্থনৈতিক মূল্যায়ন কমিটিতে ও ঢাকা সিটি করপোরেশনের Urban Waste Management প্রকল্পে পরিবেশ অর্থনীতিবিদ বিশেষজ্ঞ ও কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি State University তে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ আইন ও নীতি বিষয়ক খন্ডকালীন শিক্ষকতা করছেন।

তাঁর সাম্প্রতিক সমাপ্ত গবেষণার মধ্যে রয়েছে Environment-Poverty Interface Towards Achieving MDGs, Sponsored by Planning Commission। তাঁর চলমান গবেষণার মধ্যে রয়েছে- Integrating Environment and Economic Concerns into Planning Process with BIDS and Urban Waste Management। তাঁর অপর একটি গ্রন্থ 'পরিবেশ সংরক্ষণে ধর্মীয় মূল্যবোধ' প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

ISBN 984 445 199 10

www.pathagar.com

তোমরা কি দেখনা আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য/অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।
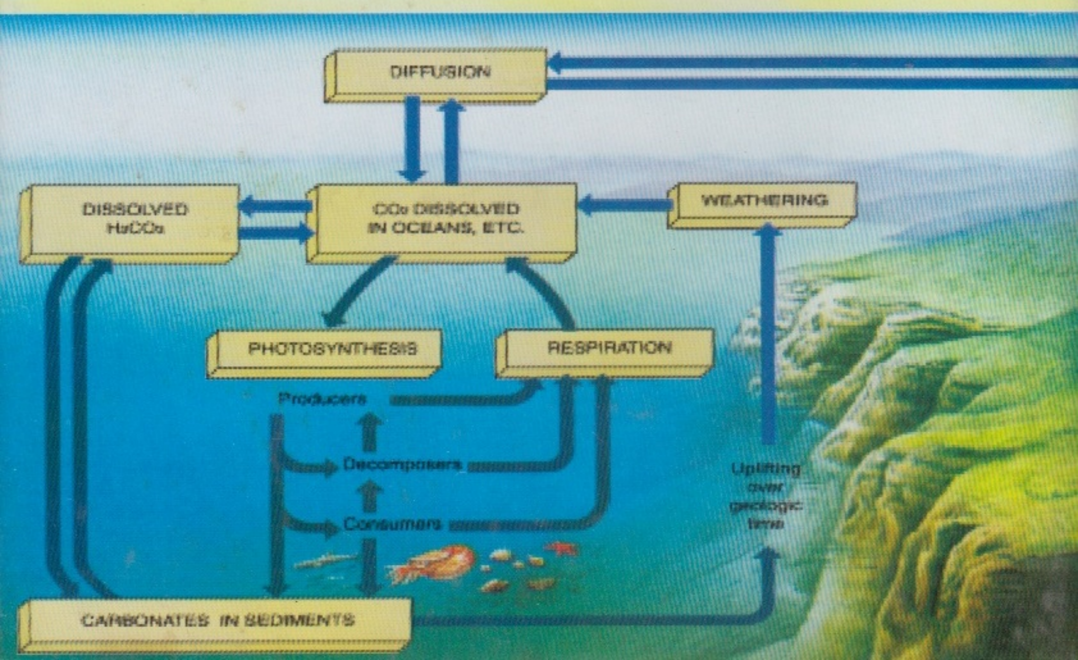
(আল কোরআন, সুরা- লোকমান, আয়াত-২০)